দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা

অশোককুমার রায়

অজন্তা হাউস

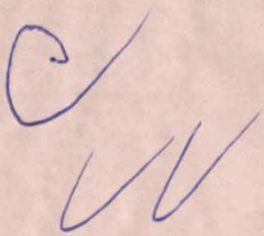

"He for God only,
She for God in him."—Milton.

"The Husband hath not the power of his own body, but the Wife hath. And likewisely the Wife hath not the power of her own body, but the Husband hath."—Holy Bible.

"Nothing is obscene in the world. Only Thinking makes it so."—Oscar Wilde

"Poetry (Creative) is the sponteneus overflow of powerful imagination, that is recolleted in tranquility."—Dr. Samuel Tailor Coleridge

অশোককুমার রায়
জন্ম : ২২শে অক্টোবর, ১৯৩৮
পাবনা, পূর্ব বাংলা।

"If the Moms are not happy from the matrimonial bond for having million pleasures from the fullest swing in adult relationship, not in the bondage—and again the Moms not getting the most coveted expectating want, namely "Orgasm"—which is incarnated in a couple by God,—if not mated and rated duly ruly—then none else can't be happy."

—Author : Asoka K. Ray

ইনফর্মী কিছুলায় ইছুলয়ী বিশেষীত্

প্রোজী ডোজ্ যেন হয়ে যায়
গ্রোজী গর্জাসে—শ্লোজী পোয়েমা।
তাই গদ্য চলতে, চলতে, এসে যায়—
পদ্য। এই বই-এ যে—বেশ কিছু পাতা জুড়ে
লেখক, দেরীতে হোলেও—
কবি হোয়ে কবিতা লিখতায় বাধ্য
হন—রুল্ জানানোর ঐ ক্যাট্-ই
ক্ল্যান ভালোবাসায়। ভালো ভেট্ নেই,
তায় তায় চলেও যায়—বেশীরভাগই, ইন্
ডীহাইড্রেশনে। ওদের নেই থাকাটা,
কবিতে লিখতে পরে রোজেয়ীক
ফ্লেভারে, পোয়েজীক্টা এমতি ক্লেভারায়।
নতুনত্ব দিয়ে আঁকছেন। পুরনো
নিয়মেই। মিল রেখে। ছন্দ মেনে।
তবে ভরে বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন। একটি স্ট্যাঞ্জার
প্রতিটি লাইনের প্রতিটি শব্দের
সাথে, অবশ্যই মানেটা মানোয়েতে—
পরের লাইনের প্রতিটি শব্দের
মধ্যে ছন্দীল মিল দিয়ে
গেছেন। ওঁর পরিচিত ঐ ঐ
বিশেষই পৃথিবীর য়্যালীটরা
শিরোপা দিয়েছেন—এ যে এ
একেবারে নতুন কিছু। তবে
রচয়িতা যেন ভাব ও কাবকে—
জগত অব্স্কিয়োরার পথে ও
প্রান্তে—দাঁড় করিয়েছেন। কবি
অশোক বলে—সবই যদি বুঝলে
তবে চলে কী? না বোঝারও যে আছে ভেতরায়
মন্তয়ীতী আনন্দধারা, সানন্দভার।—১০/৯/০৭ জায়া সন্ধ্যা রায়

দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা

সেই সময় শুচিস্মিতা সন্ধ্যা

অশোককুমার রায়

এই সময় রুচিস্মিতা সন্ধ্যা

অজন্তা হাউস

ভবানীপুর, কলিকাতা-৭০০০২৫

Library West Bengal
25/3, B. C. Road

যাঁদের পুণ্য সান্নিধ্যের কথা না জানালে নয়

আচার্য্য রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ দত্ত
বিপ্লবী ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত } *(বিবেকের দুই ভাই)*
স্যার যদুনাথ সরকার
ভারত সচিব দি অনারেবল লর্ড পেথিক্ লরেন্স
দি রাইট অনারেবল প্রীমিয়ার লর্ড ক্লীমেন্ট এটলি
স্যার আর্থার ট্রেভর হ্যারীস্
স্যার জে.বি.এস্. হ্যালডেন
স্যার ডাঃ এডমণ্ড্ ব্লাণ্ডেন্
স্যার ডাঃ স্টিফেন স্পেণ্ডার
আচার্য্য ডাঃ মেঘনাদ সাহা
আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বোস
আই. সি. এস. চারুচন্দ্র দত্ত (শ্রী অরবিন্দের সতীর্থ)
আই. সি. এস. ক্ষিতীশচন্দ্র সেন (রবীন্দ্র সচিব)
স্যার অশোকুমার রায়
স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়
স্যার ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র
স্যার সুধাংশুমোহন বসু
স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী
স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দজী
স্বামী ওঁকরানন্দজী
ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় (মেজো মামা)
ডাঃ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (দাদামণি)
আই. সি. এস. স্যার জ্যোৎস্নাকুমার ঘোষাল (রবীন্দ্র ভাগিনেয়)
আই. সি. এস. স্যার সত্যেন্দ্রনাথ রায় (কবি কামিনী রায়ের ছেলে)
ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
আন্তর্জাতিক ডাঃ রাধাবিনোদ পাল
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
প্রধান বিচারপতি ডাঃ বিজন মুখার্জি
প্রধান বিচারপতি ডাঃ সুধীরঞ্জন দাস
প্রধান বিচারপতি অমলকুমার সরকার
প্রধান বিচারপতি সুরজিত চন্দ্র লাহিড়ী
প্রধান বিচারপতি সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়
ডাঃ মুরারী মুখোপাধ্যায়
ডাঃ অমিয়কুমার সেন (কবির য়্যাটেণ্ডিঙ্ সার্জন এবং নার্স)
ডাঃ নীহার মুন্সী

LIBRARY
Date 18.11.2008
Acc. No. 13745

উৎসর্গ

কর্মযোগী স্যার ও লেডী হেনরী ফোর্ড সমীপায়।

আমার বইটি—কর্মযোগ বলে এই পৃথিবীতে কিছু থেকে থাকলে—সেই যজ্ঞের বিরাটতম কর্মযোগী—স্যার হেনরী ফোর্ডকে করা হোলো—ডেডীকেটেড সহিতায় ডেলিবারেটী এই ডীভোশন্। ফোর্ড—তুমি ও তোমার প্রিয়তমা ঘরনী—দু'জনে মিলে—কত অধ্যবসায়ী সাধনার শেষে—একদিন পৃথিবীকে উপহার দিলে—বিশ্বের প্রথম গাড়ী—চার চাকার মোটর কার। তুমি ইমাজীনেশনকে চরমায় বাস্তবায়িত করার পথে—আন্-ক্যমন্ টেক্নোলজিস্ট ছিলে। তোমারই ঐ ডেট্রয়েটেয় কাছাকাছি এসে—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীকে বলেছিলেন—"লেট আস টু ভিজিট হিজ ডেট্রয়েট। য়্যারেঞ্জ ফর দ্যাট্।" কি হোয়েছিলো—জানি না। একথা—সে সময়ে উপস্থিত সেখানে—স্বয়ং প্রশান্ত মহলানবীশেরও কাছ থেকে জানি। যাক্। স্যার হেনরী—তুমি পৃথিবীময় যে সুসহযোগিতার এন্‌ডেভারে সাজিয়ে দিয়েছিলে—মুহূর্তে স্টীয়ারিঙ্ ধরে, য়্যাক্সিলেটারে পা চেপে, গীয়ার ঠিক রাখোয়ে—হোতে পরে চলমান—তা বিরাটত্বে স্বরাট। তুমি, নোবেল পাওনি—জানি। কিন্তু সুইডিশ্ একাডেমীর কর্তারা মিটীঙে বোসতে আসেন—সবাই গাড়ী চড়ে। মোটরী ভেহীক্যালে। তাই না ? যাক্—আনন্দের কথা এই যে—তুমি আজ বৃদ্ধ-দাদাশ্বশুর একজন সুন্দরী সুশিক্ষিতা বাঙালী কন্যার—নৈহাটীর শাস্ত্রী বাড়ীর শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য যে—তোমার একমাত্র নাতির একমাত্র ছেলে—আজকের কর্ণধার শ্রীমান্ ফোর্ডের—সুগৃহিনী। কলকাতায় এলে—ফোর্ড গঙ্গায়—সাঁতার কেটে যায় ঘণ্টা ধরে। গৃহী—কিন্তু, দু'জনাই—আজ ঘরে থেকেও—সন্ন্যাসব্রত নিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায়েত—এরা দু'জনাই আজ মশগুল। স্যার ও শ্রীমতী হেনরী, তোমরা না থাকলেও—তোমরা যে বাঙালী বাড়ী—ঐ শাস্ত্রী বাড়ীর—অতি-বৃদ্ধ বেয়াই ও অতি-বৃদ্ধা বেয়ান্।

"Enthusiasm is the bottom of all progress
With it, there is success.
Without it, there are only alibis."—**Sir Henry Ford**

লেখক অশোককুমার রায়ের অন্যান্য রচনা

ভালবাসার শিল্পকথা
লাজপসন্দ
দু'জনে নির্জনে
মোর উত্তরীয়ে রঙ্ লাগায়েছি প্রিয়ে
তুমি সন্ধ্যার রভস
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি
Tagore, the Worlds' Unparallal
Swamiji, the Socialist

পরবর্তী প্রকাশনা

আই. সি. এস.
অধরের কানে যেন অধরের ভাষা
বাঙলার বধূ বুক ভরা মধু
আপন মনের মাধুরী মিশায়ে

ঃ প্রকাশনায় ঃ
অরিস্মিত ঘোষ

ঃ পরিকল্পনায় ঃ
চয়নিকা ঘোষ

© আনন্দিতা সোমা চক্রবর্তী

ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ
১০ই সেপ্টেম্বর, ২০০৭ (২৩শে ভাদ্র ১৩১৪)
সন্ধ্যা রায়ের জন্মদিনে।

ঃ মুদ্রক ঃ
অলক দত্ত ও উৎপল কুণ্ডু
স্পেকট্রাম অফসেট
কলকাতা-৭০০ ০৩৭

।। ৫০০ ৲।।

ঃ অক্ষর বিন্যাস ঃ
গৌতম, উত্তম, সুকুমার ও দিপীকা
অক্ষর লেজার
কলকাতা-৭০০ ০০৬

রোমাণ্টিক অশোকের আদরী এই বেটার—হাফেরও আছে কিছু কথা

সন্ধ্যা রায়

আমি লেখকের জায়া, স্পাউজ্। আছে আমারও তরফায় বলার কিছু, এই অশোক রায়, পরিচিতদের কাছটায় যে আজ খুবই শ্রদ্ধার, খুবই ডীয়ারার, খুবই নীয়ারার। কিন্তু আমি যতোটা কাছের আর প্রিয়লীত্ ঘনিষ্ঠতয়ীতে—অন্তরার এ আন্তরার—তেমতিটা আর নেই কারুর। ও স্রষ্টা। আগাগোড়া লেখালেখিতে—থেকে বছর চৌদ্দয়ার ঐ সুইটীল্ টীন্, আনটীল্ এখনায়ও—ফার্স্ট বিলিভেবলী বীলাভেড—টু রোমাণ্টিসিজম্। তার মানেই—বেশ রকমাতেই ব্যক্তিত্বয়তার একজন পার্সন্, যে তার সব ভার্সানেই থাকে পার্সোনালীতে—অরিজিনাল। সে ভাব পুরনোই হোক, কী নতুনী কিছুয়াতে হোক্—প্রণয়ার পরিগণিতয়ীর প্রণয়ীত্। ধার ধারে না—কে কী বললো, না বললোর। জানি—স্বরাজ্যে স্বরাট তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লেখকের সামনায়, সাহিত্যিক-পুত্র কটুদা, অর্থাৎ সনৎকুমারকে বলেছিলেন,—"শ্রীমান অশোকের লেখাটা আমায় নিয়ে শুনলি ত। নো কমেন্ট, শুধু বলবো, অশোক লিখবে। আমরা তারিয়ে তারিয়ে রস ও ভাব উপভোগ কোরবো। আর ভাববোও, কেন না—এ কিছু বেশ স্বকীয়তায়—ভাবময় কাব্-রাজ্যে টেনে নিয়ে যায়।" সনৎদাও সায় জানিয়েছিলো—স্বনামধন্য পিতার কথায়। আর এ বাড়ীতে অশোকের বাবার সাথে দেখা কোরতে আসতেন—স্বয়ং রাণুর স্রষ্টা, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—দ্বারভাঙ্গা থেকে শিবপুরের বেতাইতলার বাড়ীতে, ছোটো বোন খুকীর কাছে এলে পর। তিনি বলতেন, "মিঃ রায়। আমি একজন গল্পকার ছাড়া আর কিছু নই। নই অন্নদাবাবুর মতো আই.সি.এস.। কী বড়ো মাপের কোনো ইনটেলেকচুয়্যাল। অশোক—অন্নদাবাবুর ছেলের মতো, যতোটা লেখা নিয়ে, ঠিক ততোটাই ওর জ্ঞানের এখনি এই বাইশ-তেইশেতেই অর্জিত পরিধিয়ী পরিচিতিতে। অশোক, আমাকে যেভাবে তাঁর ঐ বিশ্লেষণী প্রবন্ধায় আবিষ্কারে নতুনভাবে পেয়েছে, বা দেখায়েছে টো টো—তা আজ পর্য্যন্ত কেউ পারেনি। এতো অল্প বয়েস্। আশীর্বাদ থাকছে, ইনজিনীয়ার রায়কে অখুশী রাখলেও ইনজিনীয়ার না হোয়ে—লেটার অন্ হি মাস্ট সারপাশ্ ইভেন্ অন্নদাবাবু—ইন স্টাইল্ অফ রাইটিঙ, য়্যাণ্ড ইন্ হিজ আন্-কমন থিঙ্কিংস। এ কথা মিথ্যে হবে না। আর এর লেখার পাঠক হবো—আমরাই। সমাজের মান্য-গণ্যরা। নয়, জেনারেল রাণ্।" বিভূতিবাবু—থুড়ি, আমাদের অতি প্রিয় 'মেজ-কা'—তোমার ঐ ভবিষ্যৎ-বাণী—মিথ্যে হয়নি।

আমি ওর আদরার বেটার হাফ্ বলে জানি—বলাইবাবু (বনফুল) ভাগলপুরের গোলাবাড়ী থেকে,—আর ব্যোমকেশের স্রষ্টা, শরদিন্দু পুনার বিজয়নগর থেকে—কমন্-ফ্রেণ্ড এই বিভূতিবাবুকে জানিয়েছিলেন—ঐ একই ধরনার প্রেক্ষায়িতীতে প্রেরণীত্ প্রেরণাটা—"আমাদের নিয়ে অশোক যা যা য়্যাসেসমেন্ট্ কোরেছে ওঁর লেখায়—তা সত্যি অনবদ্য ত বটেই, সেই সাথে ওঁর লেখার মাধুরা আপন স্টাইলী স্মাইলায়—বারে বারে পড়ার জন্যেই পড়তে, টানে।"

লেখক, তাই আজ বলে—"সন্ধ্যা, এগুলোই ত আমার পাওয়া পুরস্কার।" আর একটু বলে, খুবই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রয়ী বলে—"জানবে সন্ধ্যা, তথাকথিত ঐ পুরস্কারগুলোর কোনোটাই পাবো না, তার কারণ, আমি সরকারকে তেল মাখাতে পারবো না, আর যারা ওর কমিটীয়ী কমিটেমেন্টে—তারা কেউই আমার—না-পছন্দের। আমিও তাই,—তাদেরেতে, এজন্য, যে,—ওরা ওদের তল্পীয়ী ধারীতায় নিজেরাই যে—সরকারীর দান-ধান্যের দয়ায় পুষ্ট। আই নেভার কম্প্রমাইজী—সহিতায় তাদেরা।"

ঐ বয়সেরই আগে টুকিটাকি লেখায়—সেদিনকার সহাধ্যায়িনীলা—এই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সানন্দী ভুবনার সহযোগিতায়—যা কিছু লেখে—"কিশলয়ে"। মিনি-পত্রিকায়—পুণ্যশ্লোক ডাঃ কালিদাস নাগ, দ্য ডয়েন অফ্ ভারতীয় সাংবাদিকতা, ঐ আচার্য্য হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, আরেকধারার "মাণিক" ঐ 'পদ্মদীঘীর বেদেনী" এবং "চর কাশেমে"র বোধিদীপ্ত সাহিত্যিক অমরেন্দ্র ঘোষ, দেবোপম ঋদ্ধিলার আজকের স্বামী গহনানন্দ মহারাজ, আর সাংবাদিক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষণায়—তা আর তা তখনি আশীর্বাদধন্য হোয়েছিলো—পাশের দুই বাড়ির—অনারেবল্ সুরজিৎ চন্দ্র লাহিড়ী ও আই.সি.এস. জ্ঞানাঙ্কুর দে'র অনুজ—অধ্যক্ষ ডাঃ প্রেমাঙ্কুর দের কাছ থেকে। অন্যদিকে ঐ যৌবন আসি আসি অশোক—লেখার জন্য আর্শীবাদীত হয়—থেকে পরে স্যার আর্থার ট্রেভর হ্যারিস ও তাঁরই বেঞ্চের হবু প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তীর। আর, আর ভাইস্‌রয়্যাল ভারতের শ্রমমন্ত্রী স্যার কে.সি. রায়চৌধুরী, আই.সি.এস. কুলদাচরণ দাশগুপ্ত, সেরামীক্‌সের জনক সত্যসুন্দর দেব, দার্শনিক সতীশ চট্টোপাধ্যায়, স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দজী ও স্বামী ওঁকরানন্দজী। সেই সাথে কাকুরা—অন্নদাশঙ্কর রায় ও দেবেশচন্দ্র দাস। আমার জানার, আমার চেনার সবাই বলে—"অশোকের পনেরো থেকে আপন প্রয়াসায় তৈরি করা ঐ ভাগ্য—শুচিস্মিতা সন্ধ্যার অনুরাগবতীতায়।" খুবই যা ইর্ষার। এমনটা সহজায় কয়েকটি মাত্র লেখা লিখে—অর্জন করা অসম্ভব। অনঙ্গ মহারাজ, ওঁকরানন্দজী একদিন স্বামী গহনানন্দকে—অশোকের সামনেই বলে ফেলেন—"লাভেবল ন্যাচারের, তাই মনে হয় হী ইজ্ নাউ ইন লাভ্। লাইক্ কীটস্ ফর্ ফ্যানী ব্রন।" বলেই কী হাসি। দরাজজানে। গহনানন্দ ছিলেন অবশ্যই মূক।

যাক। গহনানন্দজী, আর কাকা-কাম-মেশো অন্নদাশঙ্কর এবং লীলা-মাসী সমেত—আমাদের দু'জনার মধ্যেই আজও রেখে যাচ্ছে—গ্রেটেস্ট ইম্প্যাক্ট। আর, আর কেউ অতটা এমনটা,—পারেনি।

কথা আছে। হোয়াই কাকা-কাম মেশো-তারয় খোলসায় আসছি। সেই কবে, বিলেতে পিকাডোলীর কাছে ছিলো—দার্শনিক ডাঃ সরোজকুমার দাস ও শিক্ষাবিদ্ ডাঃ তটিনী দাসের একটি চার কামরার নিজস্ব ফ্ল্যাট। একখানা ঘর নিজেদের জন্য রেখে—বাকী তিনটা ভারতীয়, বিশেষ কোরে বাঙালী ছেলেদের—পড়তে এসে থাকার জন্য—ব্যবস্থায় দিতেন। অশোকের বাবা—বিশ বছর বয়সে পড়াশোনা কোরতে লণ্ডন যান। আত্মীয়দের হেল্প ছাড়াই—বিরাট বিরাট চার ভারতীয় ব্যক্তিত্বের শলা-পরামর্শয়ী—কো-অপারেশনে। ভারতাত্মা ডাঃ য়্যানী বেসান্ট, মহাত্মা গান্ধী, তস্য সচিব মহান প্রাণের মহাদেব দেশাই—আর আর, ভারতীয় ডাক ও তারের প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর জেনারেল—আই.সি.এস. স্যার জি.পি.রে (গুরুপ্রসাদ রায়)। ইনি প্রথম ভারতীয় ডাক্তার ও সেই সাথে প্রথম ভারতীয় আই.এম্.এস্—ডাঃ গুডিভ্ সূর্য্যকুমার চক্রবর্তীর নাতি, মেয়েকে দিয়ে। যাক্ ও কথা। এইসব আজ অজানার অন্ধকারে।

বাবা—ডঃ দাসের একটা ঘরে—দশ বছর পর্যন্ত ছিলো। এরই মধ্যে অনেকেই এসেছেন, আর থেকেছেন। পড়া শেষে চলেও গেছেন। মাঝে জ্যোতি বসুর সাম্যবাদের দীক্ষা-গুরু, প্রবাদী-ব্যক্তিত্ব ঐ বাঙালী রজনী পামী দত্তও—কিছুদিন ছিলেন। বাবা বলতেন—একাধারে জ্ঞানী, তায় দারুণ আড্ডাবাজ ছিলেন—এই রজনী প্যামী। এরই মধ্যে দু' বছরার জন্য—আই.সি.এস.-এ শিক্ষনবীশার কড়াড়ে এসে ওঠে—অন্নদাশঙ্কর ও হিরণ্ময় ব্যানার্জী। এরা আলাদা আলাদা দু'খানা ঘরে ছিলেন। আর অন্য পাঁচজন বাঙালী শিক্ষানবীশ—বীরেন, রবি, সুবিমল, করুণা ও দ্বিজেন্দ্রলাল, ছিলেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। অন্নদা ও হিরণ্ময়ের সাথে—ভাব হয় বাবার। ঠিক যেন হরিহর-আত্মীয়ার।

সেই মেলামেশার টান—আপটার্নে ইন রীটার্নায়—হেয়ে যায়—কাকা, কাকু অন্নদাশঙ্কর ও হিরণ্ময় ব্যানার্জী। নিজের আত্মীয়ের চাইতেও—অনেক আন্তরার গভীরায়। কাকা কী কাকু ডাকতে বাদ সাধেন—লীলা রায়।—"না। আমি কাকীমা ডাক শুনতে চাই না। আমি ধরে নাও—অশোক, তোমারই মায়ের সহদরা বোন। তা হোলে কী হোলো—আমি হোয়ে যাচ্ছি—মাসীমা। কী সুন্দর ডাক বলত। কাকীমাতে মা কথাটা একবার সাউণ্ডিত হয়। আর মাসীমাতে মা দু' দুইবার আসে। আর কথাটা অর্থদ্যোতক। মা, আসি মা—যেন ছেলে কোথাও যাচ্ছে। যাবার বেলায় জানিয়ে গেলো—আসছি ফিরে। আমি তোমার মাসীমা হলাম, আজ থেকে। তারপর কাকুর দিকে তাকিয়ে বলেছিলো লীলা রায়, "ওগো বলি, তোমার আপত্তি নেই

তো।" কাকু জানায়—"নো আপত্তি।" আচ্ছা, অত বড়ো কোটিপটির আদরের একমাত্র কন্যা, আমেরিকা ছেড়ে—বাঙ্গলার ঘরের বৌ হোলেন, আর সাথে সাথে—স্বামীর ভাষায় ব্যুৎপত্তি পেলেন—যৌথয়ীতে থাকা বাঙ্গালী মেয়েদের—ঐ রান্নার ঘরে থেকে ও বোসে। রান্নার সময় প্রয়োজনীয় যে সব কথা হয়—তা বাংলা ভোকাবুলারীর মধ্যেকার অনেকটাই, ইভেন ইন ভাষায়ী আটপৌরায়, গ্রামীয় উীক্শানেও। মাসীমা মেশোকে ডাকতেন—"এই শুনছো, বলি এই, কীগো, ওগো আর হ্যাঁগোয়।" মেশোও তাই ডাকতো—মাসী লীলাকে। সত্যি বাঙালী ঘরানার এই দাম্পত্যীয় ডাকাডাক—এমনি অনামিকে,—যার তুলনা হয় না। এ যে মধুরার তরে—আদরার ডাক। ইন্‌টিমেসী য়্যাড্রেস্।

মাসীমা কত বই লিখেছেন ইংরেজীতে। দেশে-বিদেশে নামও তখন। বছর বছর রোম যান—পি.ই.এন. কনফারেন্সে। কিন্তু বাঙালীর সাথে সবসময়ই কথা বলতেন—চোস্ত ও চেস্ট বাঙলাতেই। বইও লিখেছেন—বাঙলায়। "একদা" নামে। মাসীমা ছিলেন—আমাদের বাঙালী মায়েদেরই মাথীয়ী মমতায়। তখন আমাদের "ধামবু" হয়নি। অনেকদিন পর। একাদিন গেছি—উনাদের বাড়ীতে। প্রণাম কোরতেই—গালে-মাথায়, আদর ঢেলে—আমার মুখটা দুহাতে ধরে কাছে টেনে নিয়ে স্বাভাবিক মেয়েলী কৌতুহলটা অবসনান্তে, জানতে চেয়ে জানালেন—"সন্ধ্যা, বলি বৌমা, আমাদের নাতি বা নাতনি কবে হবে। আর দেরী কোরো না। শুভস্য শীঘ্রম্।" বলেই আদর, আর হাসি—অফুরানার যা। একটা কথা বলেছিলেন, "বৌমা, তোমার সিঁথিতে আঁকা সিঁদুর ত ভালোভাবে এঁকে নাও। দেখতে কী ভালো লাগে। এই সিঁদুর পরাটাকে, বৌমা, তুমি রীচ্যুয়ালে ধর্মীয় সংস্কার বলতেও পারো, আবার এটাকে অর্নামেন্টেশন্‌ও বলতে পারো। বলি, একজন ঘরের মিষ্টি দেখতে বৌকে—সিথান পারি আঁকা সিঁদুরী টান—তাকে আরো মধুর কোরে তোলায়—তাই না? জানো, বৌমা বিয়ের পর যখন ঢেনকানেলে শ্বশুর ঘর কোরতে এলাম—শাশুড়ী নেই। শ্বশুর আছেন। সিঁদুর পরতাম। চওড়ায়। লম্বায়ও। পরতাম—দু'হাতে শাঁখা আর পলাও। বাঙালী কাল্‌চারে এগুলো নববধূর জন্য—অবশ্যয়ীতে গ্রহণীয়। এগুলো হোল—সিম্বল্ অফ অল্ গুড্। সিম্বল্ অফ্ পিয়োরীটি। মঙ্গলময়ী। সবার জন্য। নিজের বাড়ির জন্য, মানুষটির জন্যও।

মাসীমা'র ঐ উত্তরীলী কথার পিঠোয় অন্নদাশঙ্কর জুড়ে দেন—"তা সন্ধ্যা, তোমার মাসীমাকে বেশ দেবী-দেবী লাগতো—প্রথম থেকেই পুরোপুরী বাঙালী স্ত্রীর সব সাজ, রীচ্যুয়ালী তৈরি ছিলো—তা বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায়—আপন কোরে নিতো।"

"সন্ধ্যা, ওসব স্তুতি শোনার আর প্রয়োজন নেই, এই বয়সায়। তবে পরে কখন জানি, একে একে সব হারিয়ে ফেললাম, বয়স এগিয়ে চলার সাথেতে। এতো সুখী ছিলাম যে—শাঁখা পড়বো, তা হতে হবে কালীঘাটের, ঐ মায়ের তীর্থের। যাক, এ কথা। শোনো, শাশুড়ী ত তোমার আজ কিছুদিন হোলো—নেই। বাবা, মানে শ্বশুর ত আছেন। তাই বলি এসব, মানে শাঁখা বা পলা যদি নাই রাখো হাতে, কিন্তু কোনো দিনও রেখো না—সিঁদুর হীন এই সিঁথা। আমি বলি, এটাকে এক ধরনের প্রসাধন হিসেবেই—গণ্য করো। মুখটায় যখন প্রসাধনী সাজ দেওয়াবে, তার আগে ফাইনাল্ টাচে নয়, সাত তাড়ায় লাল ঐ রেখাকে টেনে দেবে ফ্রেশলি নতুন কোরে—পরাগ ঐ সিঁদুরায়। জানো, ত—এ দেশে মেয়েরা অভিমান কোরলে বা লজ্জা পেলে, অন্যেরা বলে থাকে সেটাকে বোঝাতে—একেবারে সিঁদুর হয়ে উঠেছে। লাল নয়, লাল সিঁদুর। বেশ শুনতে লাগে, তাই না বৌমা!"

মেশো উঠে গেলে—লীলা রায় সেদিন অশোককে উনার ঘরে গিয়ে কথা বলতে বোলে—আমায় কাছে টেনে অকপটে, বলেছিলেন—"শোন বৌমা, তোমাকে আমরা ভালোবাসি খু-উ-ব। তাই বলি, যতো তাড়াতাড়ি পারো কোনো একজনের মা হোয়ো। অযথা সময় নিয়ো না। নেভার বী লেট্ টু কন্সীভ। অশোক ত বেশ ভালো ছেলে। তাড়াতাড়ি তোমাতে সাজিয়ে দেয়নি—মাতৃত্ব। শোনো, উনি এতোটাই সেন্সুয়্যাল ছিলেন, বলতে বাধা নেই—শিল্পী বা গুণী ব্যক্তিত্বরা জানবে—খুবই সেক্স কন্শাস থাকায়—হয় টু মাচ্ সেক্সি। প্রতিভার সাথে কী বলে—এই যৌনতা জড়ানো—অঙ্গাঙ্গীতে। দুটোই দুটোর—পরিপূরক। জানো ত—তোমাদের লীলা মাসী উনাকে তাই অখুশী না রাখতে চেয়ে—বিয়ের মাসেই তড়িঘড়ি নয়—সুন্দর কোরে গড়া মন থেকেই চেয়েছিলাম—উনার সন্তানের মা হোতে। তবে তখন হানিমুনে—ব্যস্ত। ছবির মতো রানীক্ষেত আর আলমোড়ায়—থাকছি। মিশনের প্রধান—জিতেন মহারাজ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী আমায় মেয়ের মতো ভালোবেসে ফেলেন। রোজই প্রায় যেতাম উনার কাছে। এভাবে সারা ভারত ঘুরছি। তার একটি বছর পার কোরে, যখন উনি উনি কালেক্টারীতে থিতু হোলেন—ছবির মতো বাংলোয়, ঐ পূর্ব বাঙলায়—তখন সেখানে আমরা সেলিব্রেট করি ঐ বিয়ের প্রথম য়্যানীভারসারীটা, সেই বিয়ের দিন তেইশে অক্টোবর। নিজেদের মধ্যেই। হেসো না—উনি তখন জবরদস্ত হাকিম হোলে কী হবে, একটু ভালোবাসার আদর—এই যখন কী তখন পেতে—ব্যবহারে নামতো—শিশু হোয়ে, যেন অবুঝ। কিছুই বুঝিতে নাহি চাহি। সেই সারা দিন ছুটিতে ছিলো। চুমো দিয়ে শুরু সকাল। শেষ রাতের মাঝ তক। ওর ইরোটসিটির কাছে আমি তখন কবিগুরুর—এক যুবতী স্ত্রীতে—"নৈবদ্য" গীতা। ঠিক তাই। আর দেরী নয়। জানো, সেই বছর ঘুরতেই দ্বিতীয় বছরার শেষে—

প্রথম সন্তান—ঐ পুণ্যকে জন্ম দেই। সে যে কী আনন্দ যার শেষ ছিলো না—অতো না জানার ব্যথায়ী ডেলীভারার সময়ার—আনবিয়ারেবল পেন আর পেন—সহ্য কোরেও। জানো, আবার ঐটুকু পুণ্য থাকাতেই—দু বছরার ও-ধারায় ফের মা হই—জয়াকে জন্ম দিয়ে। আবার পুণ্য তখন পাঁচের কাছাকাছি—জয়ার আড়াই—আবার পৃথিবীতে আলো দেখাতে আনলাম—চিত্ররূপকে। শোনো, লীলা মাসীর একটা কথা মেনে চলবে। তাড়াতাড়ি মা হও সন্ধ্যা, যদি পারো একটিতে খুশী থেকো। অশোক যতোই চায় যদি আরেকটী, বুদ্ধি খাটিয়ে ওকে নিরস্ত কোরবে। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। আর আমি, তখন চাইনি উনাকে—বাধা দিতে—আর নয় বলে। মানুষটি খুবই দুর্বল হোয়ে পড়তো—আবারো সেটা হোক।"

"সন্ধ্যা উনাকে আমি দেবতা-জ্ঞানে শিবময় ধ্যানে—আজও ঐ অ্যাড্‌মায়ারী য়্যাপ্রীশিয়সনে রেখেছি। উনার চাওয়ার কাছে, সব সময়ই হ্যাঁ জানিয়েছি। সহজায় ইল্ড্ করিয়েছি নিজেকে—অপারগাতা ছিড়ে, অনিচ্ছাকে কুড়ে। ছুঁড়ে দিয়ে। এই যা—কত কিছু শোনালাম বৌমা, তোমাকে। তবে জানবে, এটাই আবহমানকালের তৈরি থাকা স্বামীদের মন তাড়িতয়ী নয়-নয়, স্বামীর দেহকাড়িতয়ী ফন্দীয়ী ফিকিরা। কখনো সখনো সন্ধ থেকে—তাই মনে হয়।"

কথা শেষ কোরলেন।

আমি উঠে, উনাকে প্রণাম কোরে সত্যিটা জানিয়েছিলাম—"মাসী মা, অলরেডী মা হোতে চলেছি। "ধামবু" ইজ্ অন্ দ্য ওয়ে—হোতে শিশুতীর্থেরই আরো একজন—এই বিশ্বে। আশীর্বাদ করুন।"

লীলা রায় জড়িয়ে ধরলেন। আমার গালে আদর রেখে বললেন—

"ব্লেশেড্ ইয়্যু আর—অল্‌রেডী। তুমি কন্‌সীভড্, তার মানে তুমি বৌমা আজ রীসীভ্ কোরেছো—স্বর্গের সৃষ্টি লোকীয়—অপার সুষমা। জানবে, ছেলে হোক্ মেয়ে হোক্—দুই আজ সমান আদরের। ভালো থেকো। অশোককে ভালোবেসো। শ্বশুরের সেবায় থেকো। আর কী।"

অশোক রায়ের ভালোলাগার ভালোবাসাটা ছিলো যেমনি রোম্যান্টিক—তেমনি সেন্সেটিভ্, টু মাচ্। আর, আর সেন্‌স্যুয়ালিটি—সে যেন হাজারায় যাজারোয়ীত্ রাজোয়াররী—কাড়। তারই ধাবালোয়ী ভার। ধীরাদত্ত নয়। অধীরায়ও। ভাবে কাব-রতি ফোটাতে যেন হিজ্ ম্যাজেস্টীতে—এক রাজন। বিয়ের, ঐ রাতে সেই মার্চই দশে, ফাগুনার ছাব্বিশায়—সারারাত গটারীলী ঐ খোলামেলী খেলনায়ী খেলানায়—কবিমন অশোক রায় ভেরী জুডীশাস্‌লী এই নতুনা সন্ধ্যাকে বারেক তরে, অনেক অনেক, শতয়ীতে ঝলমলী কথার পিছে কথা সাজুয়ে বুকে বন্দিনী এই আমাকে রাজপুত্রয়ী বিরাট অভয় জানিয়েছিলো—বলেছিলো, "এই, তুমি আঁদ্রে মারোয়াকে

চেনো ? পড়েছো ? পড়োনি ! থাক। শোনো ফরাসী পণ্ডিত, তায় কুশলী লেখক। তায় নোবেল্ লোরিয়েট্। উনি "এরীয়েল্" নামে মহাকবি শেলীর উপন্যাসময় জীবনটাকে নিয়ে—বই লিখেছিলেন। যা থেকে আমাদের প্রিয় শিশু-সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—বেশ সুন্দরীল্ এক বই লিখে গেছেন—"শেলী" নামে। সব বই আমার কালেকশনে মজুত আছে। ধর না কেন মধুরা, আছে তোমারই জন্য। শোনো সন্ধ্যা, নো ঘুম প্লীজ, এ রাত শুধু জেগে থাকার রাত। এ রাতের রাত। নাইট্ অফ্ নাইটস্—দ্য জুবীলেণ্টী ন্যুপচীয়াল্ সীলেসচীয়ালী অল্সো ! শোনো, আঁদ্রে প্রথম রাতে ছেলেটি মেয়েটির সাথে ব্যবহারে যেন সৌজন্যময় থাকে। ছেলেরা জেনডারী বায়াসে অনেক কিছু হোতে পারে। পারেও অনেক কিছু করাতে, নয় ত চাপাতে শরীরীর প্রিয়াতে, প্রিয়ারই অনুমতি কণাটাক নহি নিয়েও। কী চেয়েও। আঁদ্রে বলছেন—মেয়েদের বিয়ের রাতে শরীরময় স্বত্বাটা হয় যেন—একটা বাদ্যযন্ত্রীর ঐ ভায়োলীনটা। হ্যাঁ, সন্ধ্যা, আমিও ঐ ব্যাখ্যাতেই জানাই—এই ভায়োলীন রূপী শরীরায়, হ্যাঁ, তোমাতে আজ নাহি নাহি বাজাবোয়া—কোনো বেসুরের কিছুয়াটা। আমি কবি। সুন্দরের ঘরের ঘরকন্না কোরে থাকি। সময় হোলে যথাযথে, অবশ্যই অনুমতির তুমিয়ী সাপেক্ষে—বাজন বাজাতেয়ে পর আনন্দাই জোয়ারী রাজারোয়ে—তবে পরে ভাসবো ও ভাসাবোয়া, ওগো তোমারে। নট্ নাউ। এই এখনি।"

মনীষী আঁদ্রে বলেছেন—বিয়ের রাতে নব্বুই ভাগ ম্যারেডী ছেলেরা ভাবে—বৈধ বিয়ে যখন, তখন আর দেরীতে যাই কেন—আজই এখনাতেই এই যেন-তেন-প্রকরায়—কেড়ে তক কাড়য়ে চাই-চাই হোতে পরে—মেটেড্ ঐ বিউটীফুলার নম্র, কম্পতায় লগ্নয়ী নগ্নতায় ফর্ দ্য ফার্স্ট কোর্স লয়ী—ইন্টারকোর্সটা ! এই, দুষ্টু, নাহি লাজ, নাহি অসোয়াস্ত। কথা দিলাম—তুমি যেদিন নিজে থেকে আমার কাছটিতে চাহিবায় রে তাহা—পাহিবায়—ঠিক-ঠিকই—ঠিক-ঠাকে—তা সেই তখনি। হ্যাঁ হ্যাঁ। মোস্ট দ্য হাজব্যাণ্ডস্ বীহেভ্ লাইক এ ওরাংওটাং—টু প্লে দ্য বডি-ভায়োলীন্ অফ ইয়োরস্। আই ক্যান্ট্ বীহেভ্ বীস্ট্লি। য়্যাজ্ য়্যাবাইডায়—আমি যে মানুষ হিসেবায় তুমি জানবায়া—আই এম্ র‍্যাশান্যাল্। বোধীতায় চলি। না চলি নির্বোধায়ায়। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড, সন্ধ্যা ? আজ আর কাল, যতক্ষণ না তুমি কনসেন্টাতে আমায় চাইছো করাতে মিথুনেতে অভিযেকী—ততক্ষণ, সেই কটা দিন নাও নাও অফুরানায় যতো চাও ততোতাই পাও—হাগস্, ড্রোগস, স্কুইজিঙ, সাকিং, ফণ্ডলিঙ্স্, মাই লিপস্ য়্যামবোসিঙ্ দ্য দাউ—"অফ লাখস্ অফ কীসেস। ইভেন ক্রোরস্।"

অনেক কিছু বলার আছে। সব বলা যায় না। ভিড় কোরে আসে, এ বলে আমাকে লেখায় জায়গা দাও, ও বলে আমাকেও। বলি, ব্যক্তিক বলে কথাটা পার্সোনিফাই করে এর আর ওর আপন অনেক কিছুই, যা স্বামীরটা জানে টু মাচ্

বোঝালায়ী বৃত্তে, তারই কৃতে—এই, এই চুমিলী চুমিতার—স্ত্রীরা। স্বামীরা অতটা নয়। ধারও ধারে না। এটা আমার মত। ওরা ভাবে, অত ভাবার কী আছে। স্ত্রী ত আজ আমার। সবটাই আমার। যা চাইবো যখন কী তখন—তাই যাবো পেয়ে কত্ অনুসারিকে! তাই কী? না—তা নয়। এই একতরফাই কতৃত্বগিরির চাপান-উতোরায় মেয়েরা স্ত্রীর ভূমিকায়—বেশীরভাগই নয়—সুখী। সত্যি। ছেলেরা—অবস্থাটা কী কখন তার স্ত্রীর—না, বোঝেও না। জানেও না। কিন্তু স্ত্রীরা এ ব্যাপারে—খুব কনশাস্। বোঝদারে স্টেপ্ বাই স্টেপ পা ফেলে—চলতে জানে। ওরা নয়। বিয়েতে ইনটিমেসীটা যেভাবে ইনটিমেটলি হয় মেটেড্—স্ত্রীতে,—তা, সত্যি ছেলেরা তার ধার নাহি ধারিতম, এই বলে যে—মেয়েদেরও আছে একটা আপনার নিজয়ীত্ মন। সত্যি হয় না কো প্রয়োজন—টু নো হারস্ মাইণ্ড। ল্যাগ্ করে রাখে যোজনীতে অনেক দূরেকার। মনকে জয় না করেই,—চায় দেহকে জয় করাতে। আর সেখানেই হাজিরা দেয়—হাজার এক অসোয়াস্তিয়ীর অশান্তি। তাই বলছি—মেয়েটি দিন কয়েকেই বুঝে নেয়—ছেলেটি কেমন। সত্যি তাই। এই নিরীখে আমি—লেখক স্বামীকে যতোটা জানি বা চিনি—থার্ড পারসন নাহি পায়—তার জন্য তেমতিটা। বলি, অশোক রায়—বাইরের পৃথিবীতে যতোটা নাম পেয়েছে, তার জন্য কিন্তু স্বীকার করে—এর পেছনে—আছি আমি। ও বলে—লেখক শিল্পী স্ত্রীর সাহচার্য্য বিনে নাই হোতে পারে—কোনো বড়ো বা ভালো কিছুটি। সাত দশক পেরুতে চলেছে—এখনো অনেক ব্যাপারে—শিশুয়ীত্। ইনোসেন্ট লাইক এ চাইল্ড। নামকরণের মহামানবশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ আজ থাকলে বলতেন—এই ত আমার শিশুতীর্থের কাব্-শিশু। শিশু ভোলানাথ। অশোক রায় মহান—বাইরের সংস্কৃতীয়ী জগতায়, কিন্তু একটুয়ে আছে পিছুয়ে—ঘর-সংসারের কথা ও কাহিনীতে। কোনো দিনই অশোক রায়—হাল্ ধরেনি সংসারের। আপন ফ্যামিলীর। বাবা থাকতে—উনিই ছিলেন—ওঁর ও আমার—গ্রেট্ কেয়ারটেকার। আজ এঁর জীবনের-প্রীতময়ী কেয়ারটেকারের দেখভালটা, অতি স্বচ্ছন্দে ছেড়ে রেখেছে, এই আমাতে। ফলে কী খুশী। অহরহ তার এই সন্ধ্যা ঘর ও বাইরে—দুটোকে দিয়ে চলেছে—সামাল। তাতে আমার নেই কোনো কষ্ট। নেই কোনো—অভিযোগ। ও ত লেখক। শুধু স্বামী বলে আমার একাকীর নয়। অশোক রায়—দশজনের। ওঁর দুনিয়াদারি এখন দেশের গণ্য-মান্যদের সাথে। এঁরাই ওঁর লেখার সুইটী সোয়দ্ গ্রহণেতে—আছে খুশীয়াল্। অবশ্য লেখকের স্ত্রীর কাছে—এটা মনে করি মস্তয়ীতী এক পাওয়া। গেটেথ্ দ্য গাস্টো অফ হিজ ফেম্। অশোক বলে—নো রাগরাগিয়ী বিজিনেস্। ভাবো ত দেশের এক নম্বররা—তোমার এই চিত্ততোষে আজও শিশু হোয়ে থাকা স্বামীকে ভালোবাসে—তাঁর লেখা পড়ে। এ ভাগ্য হয় কয় জনার!

মানি তা। তবে আবার মানিও না তা। আমি ডাঃ ইবসেনের নোরা নই। হতাম—যদি স্বামী আমাকে সব কিছুতে ভুল বোঝাচ্ছে। সে সুযোগ ও দেয়নি। ঘর আর বারের দেখভাল কোরে আমি আজ খুশী, আজ সুখী—অশোকের জন্য। মূলত এঁর সাহিত্যয়ী বিশিষ্টতার জন্য। অশোক রায়কে একটুয়ে রাগিয়ে দিলে বলে—"সন্ধ্যা, আমি যেভাবে নতুন নতুন শব্দ চয়নান্তে, আর ভাব নতুনায় বয়নান্তে লিখছি, আমারই মনপসন্দায়—তা আর কেউ ওভাবে পারেনি আজ পর্য্যন্ত—সাজাতে, বাজাতে। জানো সন্ধ্যা, আমি লেখক হোয়ে বাঁচবো চিরদিনের তরে। শুধু স্টাইলে এমতি স্মাইলায় লিখি বলে।'

হ্যাঁ, আমি জানি। ভালোতেই। মনে আছে নীমপীঠ আশ্রমে বেড়াতে গেছি। প্রতিষ্ঠাতা বিভূতি মহারাজ (স্বামী বুদ্ধানন্দজী) সংসারে থাকলে হোতেন বিরাট মাপের প্রশাসক। য়্যাডমিনিষ্ট্রেটর। উনি আমার স্বামী অশোকের থেকে—শন্ আটান্নয় দশটি টাকার চাঁদা নেন—ঐ আশ্রম গড়ার ছকী পরিকল্পনায়। আর সেদিনই মন্ত্রী অশোক সেন দেন—দশ হাজার টাকা য়্যাজ্ ডোনেশন। তাই বুদ্ধানন্দ ওখান থেকে বিদায় বেলায়—বলেন আমাকে "আয়ুষ্মতী" হওয়ার আশীষায় মাথায় হাত রেখে, আমার ছোট "ধামবু"কে কোলে নিয়ে—"সন্ধ্যা, তুমি জেনে যাও এই আশ্রম গড়ার পেছনে সেদিন এই অশোকের দশটি টাকা অনেক আশা জাগিয়েছিলো। অশোকই প্রথম ডোনার, হোলে অঙ্কটা অতি সামান্য। তুমি যখন সন্ধ্যা নামের মতোই শান্তশ্রীর এক বধূ, তেমনি জানবে এই অশোকের মধ্যে আছে—সৃষ্টির অফুরন্ত শক্তি। ওর "ভালোবাসার শিল্পকথা" পড়ে—আজ এই সন্ন্যাসীও তার মধ্যে মণি-মাণিক্যে সন্ধান পেয়েছে। শোনো সন্ধ্যা, বলে ধামবুকে আমার কোলে স্থানান্তর কোরতে কোরতে কথা চেয়ে নেন—"সন্ধ্যা, তুমি অশোকের লেখা যাতে আরো, আরো অনেক কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে ব্যাপ্তি পায়—সেটির জন্য সজাগ থেকো কিন্তু। জানো, তখন ভবানীপুরে, ঐ সেবা প্রতিষ্ঠানে আমার কাজ ছিলো অত অত লোকের—খাওয়া দাওয়ার তদারকির কাজ। অশোক প্রায়ই সন্ধ্যায় আমারই বয়সী নরেশের, স্বামী গহনানন্দর, কাছে বোসে—কত না গল্প শোনাতো—এ দেশ ও দেশ—সব বিখ্যাতদের গল্প। কাজ কোরতে কোরতে কর্মযোগী নরশে শুনতো, প্রয়োজনে প্রশ্নও কোরতো, অশোককে। আর আমি শুনে শুনে বিস্মিত হতাম এই একুশ-বাইশের ছেলেটার জানার পরিধিটা যে—সীমাহীন। সত্যি বাউণ্ডলেশ, বুঝলে সন্ধ্যা, অশোক চলে গেলে পর নরেশ আমাকে ক্ষোভ নিয়ে একটাই কথা অনেকদিনেই শুনিয়েছে—"মহারাজ। অশোকের কাছে আমি হেরে গেছি। প্রথম আলাপেই মুগ্ধ বিজয়দা (স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ) আমাকে বলেছিলেন, 'নরশে, ট্রাই টু হ্যাভ দিস আন্-কমন ইয়ুথ—ইন ভেল্। সন্ন্যাসী কোরে। বাব্ বা, আর নয়। অশোকের জন্য জানেন ত ঝানু

ওকালতিতে কথা আদায় কয়েন অনঙ্গদা (স্বামী ওঁকরানন্দ)—যেন অশোককে সন্ন্যাসী না করি। একে যেন ফ্যামিলীতে—ফ্যামিলীম্যান থাকার মধ্যেই উৎসাহ দেই, লিখতে, লেখককে নামজাদা হোতে। বুঝলে সন্ধ্যা, জানি না তুমি কোন মত পোষণ করো—আপন স্বামীর জন্য। তবে আমার, মানে তোমাদের বিভূতিদার একটাই মত্—অশোক, অল্প লেখালেখি কোরলেও, ভাবীকালে অশোকের জায়গা থাকবে—লেখকমহলায় প্রথম সারিতে। তাই দেখবে, সন্ধ্যা। আমি তখন থাকবো না।"

মনে পড়ে। পাড়ার শ্রীমতী মৃণালিনী দাশগুপ্তাকে, এই রাজনীতি-সচেতনা মাসীমাকে। এখানকার সেই বাংলো বাড়ীতে, যেখানে কবি কামিনী রায়ের জন্ম,—আর যে বাড়ীটায় উনার ছোটো ভাই কলকাতার য়্যারিস্টোক্রেট মেয়র, ব্যারীস্টার নিশীথচন্দ্র সেন—তাঁর মে ফেয়ারের বাড়িতে উঠে যাওয়া পর্য্যন্ত ছিলেন—এথাতেই। পরে এইখানে হোলো সরকারি বেসিক ট্রেনিঙ্ কলেজ। তারই অধ্যক্ষা—এই মাসীমা। ইনি—বর্তমান অর্থমন্ত্রী, স্নেহভাজন ডাঃ অসীম দাশগুপ্তের মা। খুবই ফরওয়ার্ড ছিলেন, চলনে-বলনে, কথায়-বার্তায়, কাজেও। অশোকের "ভালোবাসার শিল্পকথা" উনার প্রিয় গ্রন্থ ছিলো। উনি বলতেন—"অন্ হিউম্যান লাভ, ইট্ ইজ্ এ গুড্ ট্রীটীজ্। একদিন, আমার সামনায়—অন্নদাশঙ্করের লেখা নিয়ে কেউ একজন বলেছিলো—অন্নদাবাবুর মতো স্টাইলিস্ট লেখক আর কেউ এলো না। সাথে সাথে ঝাঁঝিয়ে উঠে মৃণালিনী মাসী একটু যেন অভিমানী সুরে জানালেন, "হাঙ্ ইয়োর অন্নদাশঙ্কর, নাউ টোটালী। উনি ফুরিয়ে গেছেন। চেষ্টা কোরলেও কোটিবার—রবিবাবু হওয়া যায় না। কিন্তু কিছু আন্তরিকতা থাকলে তুমিও অন্নদাশঙ্কর হোতে পারো।" বলেই, "এই যে সন্ধ্যাকে দেখছো, এর বর শ্রীমান অশোক এখনই আপন বৈশেষ্ট্যেয় বিশিষ্টতা পেয়েছে। বলতে পারো এই বৃদ্ধাও—এঁর মানে এই মেয়েটির বরের ফ্যান হোয়ে গেছি। এতো ভাষার জ্ঞান আর নিত্য নতুন শব্দ তৈরি—আর কারুর লেখায় পাইনি। আমি আমার দুই ছেলে—অতীশ ও অসীম, আর দুই বৌমাকেই বলেছি বারেক পড়ে দেখো—অশোকের এ বইটা। বুঝলে সন্ধ্যা, এ মাসীমা রাজনীতি কোরলেও—মানি মানবনীতিটা। তোমার অশোক নিজের জায়গা বাংলা সাহিত্যে ঠিকই কোরে রেখে যাবে। জানবে তা।"

মৃণাল-মাসীর কথা—সত্যিই আজ সবার মুখে—যদিও এই পাঠকরা সবাই এলীট্-সম্প্রদায়ের। ধন্য আমার অশোক, ধন্যা তাই বধূ-রূপী—এই সন্ধ্যাও। অশোক রায় সেই রাত প্রথমার প্রথম যামে বলেছিলো আমায়, "সন্ধ্যা, মাই সুইট্ ইভেনিঙ্—তুমি আজ থেকে পাহাড়ায় মনের মিতলিতী মিটিয়ী মিতা হোলে কৃতয়ায়, প্রীতয়ায়। আর দিন কয় পরে আমারই অভিলাষী অনুসারিকাটা মান্যে হবে—তাপ ঝরার এ দেহেরে গ্রহণান্তে—তোমাতে হবে দেহী-পূর্ণমিদমা, যার দেবলোকীয়

মতোটি প্রাপ্তিযোগটা—হ্যাঁ, বধূত্বের ভরাটীল্ এ সায়রায় এ বায়রায়—একমাত্র তুমিই সক্ষমা, তাতে চান করাতে—এই তোমারই হয়ী এই আজকার এই আমারে। তাই করাবে।"

আধো আলোর বাধো-বাধো সেই লুকোচুরীয়ী মধুটাতে, তুমি শুধিয়েছিলে নবনীত্ এই প্রিয়ালী বধূয়ায়—"সন্ধ্যা, কথা কইতায় হইবায় না শুধু কাটায়াটা এ রাত। গহীন রাত যেন হবেয়েতে শেষ—বেশ বেশ দের্-এ,—টু ওয়েলকাম দ্য ব্লজোমড্ ঐ ভোরটা, সকালাটা। তাই খালি এ রাতটা কথা কইতায় একাকী-রে—পারি টু গো অন, টক্স্ য়্যালাউয়িঙ্ দ্য টক্স্! তাই যে মুহূর্তায়—আমি হবো থমকিতে চুপ—আর নাই বলে যেন কোনো কথাটির তরে পায়ী তলাশীল খোঁজ—ইয়েস্, বধূয়া মধুরালা, তুমি ত' শোনায় মশগুলা। খালি হ্যাঁ, আর হ্যাঁ। নাই শুনি সেই—না-না। যাহা যাহারায় মেয়েলীতে হয় আবারোয় পাল্টায়ী পটে—হ্যাঁ-হ্যাঁ। খুব দুষ্টু তোমরা। সরাসরি কিছু চাও না। না-টাকে বোঝাও—ঐ হ্যাঁ উষ্ণায়িতে। আর চাও, দ্য ওয়ান্ট-টাকে সোঝাতে দরাদরি করার, জারিজুরিলী ধারার—তৈ না-য়ে না-না বলিতায়, তস্য অর্থোদ্ধার আণ্ডারস্টাণ্ডে বলে—হ্যাঁ, করো। কোরবো। নাও। দোবো। সো অল দিস। তাই গুনগুনাই, কানে কানে—"Between a woman's yes and no there is no room for a pin to go." তারপর লেখক, তুমি ইনটিমেসীটা আরো ইনট্যুইশন্ দিয়ে সাজাতে—অতি লাজকাস্টোয়ায় বলেছিলে—সন্ধ্যা, শোনো—when we are gravelled for lack of matter, then the cleanliest shift is to kiss. তাই আমরা করি, এই দুষ্টু!

আমি কথা বলিনি। আধারেই সাধারীতে যেন আধোয়া বোলে বলেছিলাম ভাবুলেতে—

"If the kiss be denied?—then?"

তুমি বলেছিলে। "তাই বুঝি। তাই-ই কী রাইটী টল্। হাইটী ডল্!"

ভুল বুঝে, শোধরাতেয়ে আমি যেন বলে ফেলেছিলাম কবি মনেরে—

"Then she puts you to extreaty
And there begins a new matter."

যাক্ যাক্, এ রাত প্রথমার যুগলালিয়ত্ কন্‌যুগালার—সব সব কথা কম্‌ফোর্টী।

লেখা নয়, শেখালো অশোক রায় সে রাতের নাই ঘুমেলার সুহেশীলায় সুরেলায়—তুমি যুবক—কত বেশি খেলারই ভালোবাস্ ঐ ঝুলন-মেলায়—নববধূর যৌবনকে, যুবতী পরমাকে কোরে পরে রাখোলায়—একতরফাই সংগ্রামশীল্ সংক্রামীল্ আকর্ষায়, তয় বিকর্ষায়। ভারীরীত ধাবীদৃতে। হ্যাঁ, শিল্পী—বুঝিলাম তোমার রবাবী কথার ঝরনা ধারায় চান সারতে সারতে, তোমারই হাতের ইতি-উতি করিতে রয়ী—চাহা ঐ দুষ্টুয়ার কাজ-বহিরঙ্গতা, আর হাসিতোড়ী হাসিগোড়ী

হাসিদৌড়ী—ঐ নট-লাজী অধরার হটী-কাজী ছোঁয়া—বার বার আমায় বোঝাদারীলায় এই বলে নামালো—"তুমি কবিতায় যে আঁকি-বুঁকি খেলাটা সাজাচ্ছোয়া—এই আধ বোজা বধূয়ার চোখীলী পাতায়, পুরোটা বোজায়ে অধরার ছাপ-ছোপেলে, আর আধো-আধো বোল্ আমি যখন আহ্লাদার সাথ "এই" কী "এই" কী "ইষ্ ইষ্" কী "কী যে না গো তুমি" কী "অতান জোরে" কী "ততান চাপুয়ে" কী "দস্যু যে" কী "যদি জানতেম" কী "তবে জানি নাই পেতাম ছাড় কী ছোড়্"—এই কথা হারিয়ে ফেলছিলো, যেই ঝোড়ীল্ পুনোরপি লুট করাতে বধূ-ঠোঁটই সোয়াদার সয়দায় নামিতয়ে—হয়ে যাই তিন-তিনখানা যাম ধরিতায়—লিপ্-লিপায়—লীপ্-লক্ড্। প্রথম প্রথম, প্রিয়তমর তা ছিলো ছন্দয়ীল হাল্কাই, সো ভাইটাল সো লিটল্ দাউ ম্যাকস্। তারপর, দ্বিতীয় যাম থেকে শুরু হোলো—লক্ থাকা ঐ ভাবীলীর বদ্ধ ঠোঁটেয়েতে—আছাড়ীত্ পাছাড়ীত বাইটস্,—ফলোড্ বাই স্কুইজেস্, হলোড্ দাই সাকিঙস্। বাব্,-বা—রাজন মশায়, অশোক রায় তুমি আমার মুখের পুরো অবয়বী জোন-টায় যে দুষ্টুলি কবিতার তরে আরো কবিতায়ী ছবি ও জাঁক সাজালেতে—বাজ তক রাজুরাই, আমি প্রথম রাতকার ঐ দ্বিতীয় যামেই বুঝে পরে হলাম—প্রথম ধাপের জানানাই ভালোবাসা, লেখক, যদি এমনি হয়—তবে পরে আর কী কথা—ভয় নয়, শঙ্কা নয়—আমি থাকবোয়া প্রস্তুতা—দিতে পরে সব সব, আমারই মধ্যয়ায় এতোদিন অবধি স্টোর করা স্টোরেজের সব কটি অর্গল দেওয়া দরোজা—খোলায় মেলায়—দেবো দেবো, সময় মততায়—আন-বোল্টেড্, আন-হুক্ড্। তুমি পাবে অধিকারেরই অধিবাসে—টু ড্রপ্ মাই ড্রেপস্। টু রব মাই রোবস্। য়্যাণ্ড দেন আই উইল্ অর্ডার ইয়্যু—ইন্ আর্ডারারী ফার্ভারায়—টু সোয়াম্ ইন্ মাই জোন্ পেলভিসা, ইন মাই টোনড্ ভার্জিনাল মডেস্টায়—প্লীজ, প্লীজ, টীয়ার আপ্। ব্রেক আপ।"

বুঝিলাম, অতোয়া বছরার ওধারী আর্য্যে, তার ঔদার্য্যে—যে কবি হোলেও, লেখক হোলেও—তুমি যেমন কথায় আর শব্দে আঁকিজাঁকি কলমার চলমায়—ছবিলীত প্রেমের দারুণ ইরোটিসিটী—যুবতীর—ঐ ঐ জুয়েলীল ইরোজোনেসায়—প্রস্ফুটায়ী লেখ তার লেখনা কোরে এসেছো—ঐ গ্রন্থ "লাজপসন্দে"—তাই যে তাই বাস্তবায়—সত্যি বাস্তবায়ীতায় এঁকে বসাবে—আমারই বধূত্বয় সাথ রত্ন সমাহারী তরে—রত্ন-জমাহোরে। ইয়্যু, দ্য স্কলারলি পোয়েট—ইয়্যু আর ও গ্রেট ইয়ুথ অফ আর্ডেন্টী আটমোস্টী সেনস্যুয়ালিটিস্।

তুমি ঘুম তাড়ানিয়া যাদুকাঠি যাচিয়ে রেখে—বলেছিলে অশোক রায়, বধূ সন্ধ্যাকে—"আমি তোমাতে ফোটাবো হাজার ধারার—ট্রান্সসেনডালিটিস্। আমি হোতে চাই না গো—ঐ সংসারেতে সব টীরীস্ট্রীয়ালের ঘরে, পাটোয়ারী বোধে,—নাহি চাহি বার্টার করিতায়ী ঐ বাটোয়ারে।"

অনেক বললাম। আদরীলী বধূ ত লেখকেরই ভাষাময় এই দুনিয়াদারিরই—রোমান্সী রেমান্টিসিজমায়—তাই ভাবে আর চাপে—এরই ভাষায়ার মধ্যে যেন একাকারী হলেম—এইসব সব পেয়েছির আর সব লিখেছির—রেশে ও খেশে।

শেষ কথায় জানাই—

লীলা রায় আমায় বলতেন—"আগে তুমি বৌমা, পরে তোমার অশোক—স্নেহেরি এই আমাদের কাছে। তুমি রুচিরী স্বভাবার। সবাইকে রুচিরা মাখাতেয়ে—সক্ষমা। তাই, বলি—বৌমা তোমাদের মেয়ের নাম যেমন উনি দিয়েছেন—আনন্দিতা, তেমনি আমি নিজে থেকে নাম নয়। একটা বিশেষণে করোনেশন করাতে চাই—এই তুমি বৌমাকে। তোমার সন্ধ্যা বজায় থাকুক পোশাকীতে—খুশীয়ালে তুমি আমাদের কাছে—রুচিস্মিতা, আজ থেকে। সত্যি, রুচিস্মিতা।"

আনন্দে আমি দিশাহারা। চোখে সুখীলীত অশ্রু-দানা।

প্রণাম দিলাম। উনি টানলেন বুকে। "মাসীমা," আমিও বলি—"মা, আসি, মা।" চোখ ছলছলায়ে।

শেষেরও শেষ কথাটিতে—কী নটে গাছটি মুড়োলো। না-না। কথা কখনো শেষ হয় না।

আমাদের ধামবু-সোনা, সেই ডিসেম্বরী আটের, বিকালার সাড়ে পাঁচটায় এলো—পৃথিবীর তরে গোধূলীয়ী আলোটায়—স্নান কোরে। ও তখন ইনকিউবেটারে—আমি আমার বিছানায়। মুখ ছাড়া—সারা শরীর চাদরে ঢাকা। কই ব্যথা, কই আর আন্-টলারেবল্ পেন্। নাথিঙ্ ইজ নাউ। আনন্দধারায় আমি তখন খোশবু মাখছি। মেট্রন্ এসে বলে গেলো—মহারাজ আপনাকে দেখতে আসছেন। এখন এখানে অন্য ভিজিটরদের আসা নিষেধ।

এরই মধ্যে, নার্স সমভিব্যাহারে সামনে উপস্থিত—নরেশদা। পুণ্যশ্লোক গহনানন্দজী। দেখলেন। হাসলেন। দুটো কুশলী বার্তা বিনিময় হোলো। সেই হাসি। আজও যা অটুট—অন্য কোনো আর সন্ন্যাসীর তরে—হয় নাই আবেশীলে—ধাতস্থ। "দরকার হোলে, আমায় জানাতে বোলবে। আমি তোমার শ্বশুরকে ফোন কোরে সাথে সাথেই—দাদু হওয়ার খবরটা দিয়েছি। যাই নবজাতিকাকে একবারটি দেখে যাই।" মেট্রন বললো, "চলুন, দেখবেন।" বেরিয়ে গেলেন ওয়ার্ড থেকে। আবার রেখে গেলেন—সেই হাসি। পরে একদিন বলেছিলেন—"সন্ধ্যা তোমার নাম আর পদবী এমন—যে, সারা হাসপাতালে রটে গেছে—এ নিশ্চয়ই, অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়।—কী হাসি। 'সন্ধ্যা, তা না হোলেও তুমি ভি-আই-পি বনে গেছিলে। সব স্টাফ, সব ডাক্তাররা তোমাকে চিনে যায়। হোক্ না তুমি আমার খুবই কাছের। জানবে, তোমারও কিছু মাধুর্য্য এতে কাজ করেছিলো।"

Date 18.11.2008
Acc. No. 13745

যাক্ যাক্।

তিনজন—বাবা আর মা ছাড়া—দুনিয়া বিখ্যাতোয়ার ঐ মেসো অন্নদাশঙ্কর রায় আর মাসীমা লীলা রায়—আর, আর—অবিসংবাদিতায়, নরেশদা, স্বামী গহনানন্দজী—স্বামী অশোক রায়ের সাথে—মাথ মাথেলায়ী খুশীলব্ আথেলায় জানাই, এই মুহূর্তায়—তোমরা তিনজন—অশোক রায়ের আপন মাধুরী সাজীত যাজত সৃষ্টির মধ্যয়—দ্য গ্রেটেস্ট ইমপ্যাক্টস, ইন থ্রী।

আর একটু আছে।

ভাবছি, আবার কবে ওঁর অন্য কোনো নতুন বই আত্মপ্রকাশে আসবে, জানি না—কেননা—আমার এই অন্তরার এই আদরার জন, বড়োই লেজারায় থাকতেয়ে ভালোবাসে—প্লেজারারী। আবার মুখবন্ধনায়—হবে কী এমনি আন-ক্যমনী বেটার-হাফের বলিতে চাওয়ী অন্য কোনো—যাচতীর যাচনা!

তাই, বিশ্বকবির জননী—যিনি বিশ্বময়ী আপন সন্তানের আলোর লাখো লাখো ঝলকানিতে ধাঁধিয়ে তক মাত-মাতী মশগুলায় রেখেছেন—তিনি, তাঁর ও আমার মতে—নন্-সামান্যা। অতীলীতী অসমান্যা। পৃথিবীর ঐ আঁকিজুঁকি সাহিত্যের মায়েরা,—মানে গোর্কির 'মাদার', গ্রাত্সিয়া দেলেদ্দার (নোবেল লোরিয়েটা) 'মাদার', শ্রীমতী পার্ল বাকের মায়েরা, বিভূতি মুখার্জীর 'স্বর্গাদপি গরীয়সীর' মা, কী অনুরূপা দেবীর 'মা'—বা মানিক ব্যানার্জীর 'জননী'—কেউই কিন্তু—শ্রীমতী সারদা ঠাকুরের মতো আন্-প্যারালাল্ সৃষ্টিতে রাখাতে পারেনি, দেখাতে পারেনি—কোনো ঐ ধারাতা। অশোক রায়—বরাবরই অভিধা দিয়ে রেখেছে—কবির মায়ে—তুমি যে তুমি—চরমা সুকৃতি সারদা। সত্যিই ত'—তোমার সৃষ্টীয়ী—যে—সু-কৃতী। মনে পড়ে—সেই শন্ চুয়াত্তরে, সরলা রায় মেমোরীয়ালে—সুভদ্রতায় সুবেশী ভবানী মুখোপাধ্যায়—'কাকামণি'র সাথে—পরিচয় করিয়ে দেন—"এই অচিন্ত্য, এই দেখ্ আমাদের অশোকের বৌ-কে। আগে ত দেখিস নি। আলাপ করে নে।"

হাসি-হাসি অচিন্ত্য এগুতেই—ঢিপ্ কোরে প্রণাম কোরলাম। সাথে সাথে অচিন্ত্যকুমার মাথায় আশীষ রেখে বলেছিলেন—"সন্ধ্যা, বুঝবে অশোকের দৌরাত্মিময় লেখা নিয়ে, লেখকদের নিয়ে। সাংঘাতিক ছেলে—এখনি এই বয়সে হোয়ে গেছে—লেখকদের লেখক। আমার ওপরে লেখা ঐ লেখাটা পড়েছো! পড়বে। এতো ভীভীড্লি কেউ আমার সৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। অশোক করেছে। আই ওয়াজ্ স্ট্যানড্ হ্যাপিলী—ঐ লেখাটা পড়ে। চিন্ময়ী যা মৃন্ময়ীত—তা জানবে। বাড়ী এসো, সারদার জীবনী 'পরমাপ্রকৃতি' তোমাকে দেবো। উপহার। এই অশোক, নিয়ে আসবি। তোর বাড়ী থেকে আমার আস্তানা—হবে পোয়াটাক পথ্। এসো কিন্তু মা।"

কথা শেষ হোতেই, রোমান্টিক অশোক বলে উঠেছিলো—"কাকামণি, আমি পরমার আরেক ধারেকার ঐ চরমা কথাটায় বিশেষিতা রেখে—নো প্রকৃতি, ও যে সুকৃতি বসায়ে লিখবো—অন্য সারদার জীবনী।"

অতো বড়ো লেখক, অতো বড়ো বিচারক—তিনি জানতে চাইলেন—"হ্যাঁ রে অশোক, তোর সব কিছুই নতুন ধরনের। অন্য সারদাটা কে?"

উনি মানে, আমাদের 'কাকামণি' তা জানেন না দেখে—আমিও সেদিন ভেতরায় বিস্ময়ী কৌতুহলে—হেসে ফেলেছিলাম। ভাবলাম তুমি কাকামণি—গুরুদেবকে নিয়ে "ভাগবতী তনু" লিখেছো, যদিও তা পঁচাত্তরভাই ইন্‌কপ্লীটে রেখে—অথচ তুমি কবির মায়েরও যে নাম—সারদা, জানো না। শুধু ঐ ভক্তিমার্গের সারদা দেবী ছাড়া আর অন্য কেউ সারদা নেই, যে বা যিনি সত্যিই মেন্‌শেনেবলায়—থিংক্কেবল্।

অশোক জানালো—মহর্ষির সাধ্বী জায়া—উনিও নামে সারদা। জানিয়েই, অতো বছর আগে; প্রায় চল্লিশের মতো—বলেছিলো, 'কাকামণি' আমি এই সারদা ঠাকুরানীকে নিয়ে যদি পারি কোনো দিন, লিখবো একখানা ছোটো বই—নাম দেবো—"চরমা সুকৃতি সারদা"। বল্, বল কাকামণি কেমন হবে।"

"এই ভবানী চল্। তবে সন্ধ্যা মা পালাই এবার, তোমার অশোকের জানার পৃথিবীতে এবার আমি নিজেই পড়ে যাবো রে—জল অথৈয়ে। শোনো মা, তোমার অশোক অসাধারণ। এতো ব্যাপকতা ভরা নামকরণ কোরতে আমি পারতাম না। সুকৃতি, সুকৃতি ও যে চিন্ময়ীতী আর চরমা যখন তখন ত মৃন্ময়ীত। সাবাস্ বেটা। তুই ত লেখদেরও কব্জী কোরে রেখেছিস্ তাঁদেরই ওপরার করা—ঐ সব লেখী ভ্যালুয়েশনে, তাই ত রে তা, কী বলিস ভবানী। বাব্-বা। অশোক তুই যদি রবির মা-কে নিয়ে এই বই লিখতে পারিস—জানবে, তা আমার বুকে নয়, রাখবো মাথায় কোরে।"

বলতে বলতে—বন্ধু ভবানীর সাথে ধরলো—পথটা শম্ভুনাথ পণ্ডিতে, টু গেট মুখার্জী আশুতোষটা।

আজ এতোদিন, পরে—এতো লেজারে থাকুয়া অশোক রায় লীজার্ থেকে সময় নিচ্ছে—করাতে সমাধা—জীবনীটা ঐ ঐ নামকরণার—"চরমা সুকৃতি শ্রীমতী সারদা"-য়।

আরেকটা কথা—জানানোর, বিদেশী চিন্তা আর বিদেশীয়ী মননী ক্যাথোলিসিটিটা—অশোক রায় অর্জন কোরেছিলো,—মাত্র পনেরো বছরায়। ক্লাস নাইনে পড়তে পড়তে—'কিশলয়' নামে পত্রিকা বার করার সুবাদে—সে সময়কার সত্যিই খানদান প্রধান বিচারপতি স্যার আর্থার ট্রেভর্ হ্যারীসের—শুভেচ্ছা চয়নায়। আরো,

আঠারোর হোয়ে লাস্ট ঐ টীন্ এজ্টার উনিশে পা দিয়ে, ঐ কবি নামাঙ্কিত এ 'আম্রপালী'তে তখন থাকা—বিশ্রুত কীর্তির জীববিজ্ঞানী, নোবেল লোরিয়েট্ স্যার জে.বি.এস্. হ্যালডেনের—সানন্দয়ীত ভুবনায় মাঝে মধ্যে হোতো আলাপচারীতায়ী। এও বড়ো ইম্প্যাক্ট। সত্যি—জীবনে যৌবনকালটা হেলায় হারিয়ে দেওয়া কারুরই, উচিৎ নয়—এই বিশ্বাসে বলীয়ান্ স্যার জে.বি.এস্. এবং তাঁর গুণবতী স্ত্রী বার বার বলেছিলেন—"সুযোগ পেলেই বিয়েটা কোরে নেবে। ব্যাচেলার থাকা একটা প্রকৃতিয়ী অভিশাপ্। ইট ইজ এ স্যোস্যাল্ ক্রাইমও অলসো। আর নিঃসন্তান হ্যালডেনরা—দু'জনাই অশোককে বলেছিলো—বিয়েটা জানবে তখনই বাইবেলী জবানায়—তোমাদেরকে স্বর্গের কাছাকাছি নিয়ে যাবে,—যে মুহূর্তে তুমি তোমার জুডিশাস চাহিদায়—তোমারই বিলাভেডকে প্রিয়া থেকে,—মাদার, জননীতে পারলে পরে—অভিষেকটা দেওয়াতে।"

এ কথা মণিকুট্টিমী। রত্ন-কুট্টিমী।

আজ এখন দুর্লভ ব্যক্তিত্বদের বড়োই অভাব—সারা পৃথিবী জুড়ে। তার অভাবায়—হাহাকারী অসোয়াস্ত দিন দিন উপছাচ্ছে। উঠলাচ্ছে।

শেষ কোরছি। এইসব মহান মানবদের জানাই—হাজার প্রণাম।

রোমান্টিক অশোকের সৃষ্টিশীল এই রোমান্সী দুনিয়ায়, অন্তরঙ্গমতা থেকে, আজও এই আজকার এই বৃষ্টিয়ী সাঁঝে যেন পাই ঝাঁঝ—এই ষাট দশকা অতিক্রান্তা এই সন্ধ্যাতে, লীলা রায়ের আদরীত্ ডাক-ডাকী ঐ 'রুচিস্মিতা'তে।

ওগো শিল্পী—আপনাতে উজারীলী তোমারই আপন মনের সব মাধুরীর ভাব সদালস্, কাব্ রসালস্—আবারোয় বলি ওগো দয়িত-রাজ—বাজাই চাণ্ট্ কবিতায় আজও হাণ্ট্ করি তোমারই তরে ঐ তরতজায় ছোটো কোনো ঐ পি.বি.-শেলীর ইউটোপিয়ারে, যেথায় তুমি মুহূর্তায়ও—আন বাউণ্ড, রঙ্ ও রাস সাজাতেয়ে, আর যাজাতেয়ে—

আজও এ বধূত্ব অতিযোগেয়ে তরতাজ মনেরই ছন্দ
বাজও এ বধূত্ব যতিকোয়ে দরদাজ দেহেরই বন্দ।

—হ্যাঁ গো, হাউ মাই লাভেড্ লর্ড অফ অল ফাইনেসী, হাইনেসী—কীস্ মী, হাগ্ মী, আনটীল্ ইয়্যু ড্রেগ্ মী হানী। আই এম্ ইন্ গাষ্টোয়ী ফার্ভারা। আই এম্ ইন্ কাস্টোয়ী সার্ভারা।

একত্রিশে জুলাই, ২০০৭ (১৪ই শ্রাবণ ১৪১৪)
অশোকের মা, শ্রীমতী প্রমীলা রায়ের স্মরণায়,
এই আজ।

সন্ধ্যা রায়

আই কন্‌ফেস্ লেখালেখে এবং যৌবনী সীক্রেসায়ী সীরীনী সেক্রেডায়

অশোককুমার রায়

আমার বিশ্বময়ী অনেক অসাধরণ ব্যক্তিত্বের মধ্যয় এ মুহূর্তে ভালো লাগার—এই মহান স্রষ্টা কাম প্রবক্তা, জ্যাঁ জ্যাঁকুইস রুশোর তানানায় চাহিলাম—কথা সাজাতেয়ে এথা টু জানানায়, এটাও যে—রুশো তাঁর শিল্পপ্রতিভার, আরেক শাখায় ছিলেন—একজন ক্রীতি রসায়নবিদ। কেমিস্ট। তাঁর লেখা—"দ্য ইনডেক্স য়্যাণ্ড্ ইণ্ডিকেশনস্ অফ কেমিস্ট্রী"—একটি অগ্রগণ্য বই হিসেবায়—আজও তা অনবদ্য। যাক্—এ কথা।

প্রীভীলেজী এই প্রীফেসায় চাই আমি কহিতায় ফেস্ টু ফেস্—আমারই ভাবে ও কাবে—মেরীলী মেরীলী আই উইল্ লিভ্ আণ্ডার দ্য ব্লজম্ দ্যাট্ হ্যাঙ্স্ অন্ দ্য বাউ। হ্যাঁ, ঐ আণ্ডার দ্য গ্রীন্ উড্ ট্রী থেকে ফার ফ্রম্ দ্য ম্যাডীঙ্ ক্রাউড্—সহিতায় ও মোহিতায়, ওয়ান নয়,—টু পেয়ারস্ অফ্ ব্লু-ও নয়-নয়, হয়-হয় ব্ল্যাক্ জুয়েলী আইস্—যা আছেলেতে এই কছেলারই—ঐ আর এ—বাথ্ দাই য়্যাকজলটেড্ ইভেনিঙস্—ও সন্ধ্যা আর এ সন্ধ্যা, রই যৌথয়ায়—টু টেল্-তা বলিতায় রাজায়েতে মনই বেল্-তা—আমারই স্নিগ্ধিত শিল্পায়ীত জীবন ও যৌবন-বাসবার প্রাইভেসীরে, আহা, ঐ যাহা সেক্রেড্‌লী সীক্রেট্। ইনারী সব থটস্, রয় যা দিস্ লীন বাডী-তে হটী-টা—ইয়েস, হাঁ—মোর য়্যাণ্ড মাচ্—ইনটিমেটে। ধরে ধরে-তানটা "পূরবী"য়ী, মনটা "মহুয়া"র জোড়ীলী ধর-চড়ে "সোনার তরী" নামিলাম "বৌ ঠাকুরাণীর হাটে",—পরে যেই গাইলাম "সন্ধ্যা সঙ্গীত"—ঐ ছন্দ "কড়ি ও কোমল"য়া, আর হয়েও "ঘরে বাইরে"র—কথায় আই লুকড্ ইন সার্চ "সভ্যতার সঙ্কট"। আর ঠিকই তাই পর্য্যায়ীত তাৎসমীক্ষায় সাজাই বারে বারে ধারেলেতে ও ভারেলেতে "নৈবদ্য"য়ী রেলে-তে শুধুতে শুধাতোয় "গীতাঞ্জলী"র ভরাট-দরাট ও স্বরাট্ "সঙ্ অফারিঙস্" যে এই আজও রে এই বয়সায় ও ভালো বাসাবাসিরই কল্পনাই ঘরটা, ভরাভাতী ইমাজিনেশনী গার্টস্ জেনে—আর তা মেনে ঐ "সাশপেনশান অফ্ ডীস্‌বীলীফ্'টা—জন্যে তরে দরেলী রণ্যে ঐ ঐ ট্রান্সসেণ্ডালিটী ও ট্রাঙ্কুইলিটী হোয়ে চোয়ে জোয়ে—"পরিব্রাজক"ই ভেঞ্চরে খুঁজি আর ফিরি "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের"র হাজার এক একটা "ভাববার কথা"-রে—রচিতায় ঘরা ভরা রোমান্টিকী যৌবনালেখ্য, যেথায় যথাযথে সব কিছুরই সাহিত্যিক "সামিঙ্ আপ্" তক—এই "অফ্ হিউম্যান বণ্ডেজে"রে মেনে আর না মেনে—আমার আর আদরের এই মিটিলী কনসর্টের

জন্য—"ফর্ হুম্ দ্য বেল্ টোলস্"-টা যে কার জন্য আর কখন তক আগুয়ান্, তা জেনেও থৈ থৈয়ী মাল্যে ছাড়িতে চাহি না এই সুন্দরীল্ পৃথিবীটা—এই এই—"ব্রেভ্ নিউ ওয়ার্ল্ডী"তে—নিশ্চয়ই থামতায়ে "দ্য টাইম্ মাস্ট্ হাভ্ এ স্টপ"। তবু, তবুয়াতে রবু রবুয়াতীত্, আর পর আরও কিছুদিন—টু রাইট্, লিখিতায় চাহি চাহি—মোর্ য়্যাণ্ড্ মোর—"টু অর থ্রী গ্রেসেস্"—এই আমারই সাথ মিলিমিশিল—আর মিলি জুলিলি, ঐ ঐ পেছনায় রেখে আসা—যৌবন ঢলঢলী কথায়—দুই মধুরিকারই—জুঁই আর জেস্মিনী ঐ ঐ সখ্যতারই কাহিনী মনে মনে গুণগুণাই—সারাদিন সারা বেলা। খোলামেলে।

ভালো কথাটা এখন ইচ্ছেয়েত্ কৃতে যেন অভিধানে—রহী। নেই নাম তার। নেই কাম ধার। মনে আছে, বিশ্ববিখ্যাত হাক্সলি ভায়েদের ছোটো—ঐ অলডাসের "য়্যাডেনেস্ য়্যাণ্ড্ সাম আদার য়্যাসেস্" বইয়ের কোথাও, লেখক সখেদে লিখেছিলেন—"এখনকার সমাজ-ব্যবস্থায় যা আছে, তাতে কিন্তু ভালো মায়ের অভাব বোধ জাগছে।" কথাটা নয়—হেলা-ফেলার। আরো সাংঘাতিক আজকের এই ছুটে চলা দুনিয়া-জোড়া। আর মানেই দুনিয়া-তোড়, কুড়ে কুড়ে। আমি বলি, আরো ব্যাপকায়। ভালো, সত্যিকারের ভালো মানুষের অভাব—এখন ট্রীমেনডাস্লী রাণ্-য়্যাওয়ে। হ্যারায়ীত্।

যাক্। নাহি দুঃখ, নাহি সরোজেস্ নো মোর্, আই আমাতে—সত্যি নো মোর্ রীগ্রেট্স্। কারণ এইটাই, স্মৃতির পথ সরণি ধরে যতোই পিছুয়ীত্ হই, ততোই সামনায় এসে যায় ও যাচ্ছে—ভালো আকরী অর্নামেন্টশন্—সেই সময়কার দেশ নয় শুধু, যাঁরা দেশকালের উর্দ্ধে ছিলেন—বিখ্যাততর। আপন জোরে। আপন আলোকায়। তাই বলি, এ ভূমিকায়ী ভ্রমণায়, মানসে জারিত হৃদয়ায়।

বয়স পাঁচ। আমার দাদু শ্রীমান ঋকুবাবু, ওরফায় অরিস্মিত ঘোষ, ডন্ বস্কোর শিশু-শ্রেণীর তালিমধারী, এই এখন। ওকে দেখি, আর ভাবি—এমন বুদ্ধিদীপ্ত নাতির মতো, তখন অতোটা বড়ো আকারের খোলামেলা পরিচিতির পরিবেশ না পেলেও—যা পেয়েছি একাকীত্বের মধ্যে—ঘন-নির্জনায় বড়ো হোতে হোতে—তার তুলনা নেই।

বেয়াল্লিশী সংগ্রাম অনেক রক্ত ঝরিয়ে তখন শান্ত। সে যে কী তাণ্ডব, বাড়ীর কাছেই পুলিশী সেক্শান্ হোভস্ থাকায়—চার ভছরার আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছি—লোক দল বেঁধে আক্রমণে এসে স্বাধীনতার জন্য হোলো বলিপ্রদত্ত—পুলিশী বুলেটের কাছে। বাড়ীতে মা ও ঠাম্মা ছাড়া কেউ নেই। সবাই যার যার কাজে বহিরেতে—তখন। বন্দেমাতরম ধ্বনি তখনো উতালী-মাতালী, আকাশায়, বাতাসায়। গুলি চলছে। বড়ো রাস্তা—রসা রোডের ওপরায়। "বাবলু চলে আয়,

চলে আয় ভেতরে।" বলে মা এসে হাজির, আমায় নিতে। মা টানছে, আমি যাবো না, এরই মধ্যে দেখেছি—বুক দিয়ে কারুর রক্ত অঝোরে ঝরছে, কাত হোচ্ছে দেশমাতৃকার মাটির দিকে। তখনো চিৎকারিচ্ছে—ধ্বনি-মন্ত্র "বন্দেমাতরমে।"

থাক। আমি ধন্য, চার বছরার বোঝদার মন এখনও এই ব্যথাতুর ছবির ভারটা কী ধারটা—হারাইনি। জ্বলজ্বলেয়ী স্মৃতে ঋদ্ধয়ীতী। মা টেনে ঘরে নিলো, পেছনে ঠাকুমা এসে হাজির, নাতির সাথে ঠাট্টাই বাক্‌চাতুরায়—আমি বরাবরই ঐ বয়সায় শরীরী ওপরটা ঢাকতাম, শুধু ফুল-হাতা শার্টে। নীচটা খালি থাকতো। অসোয়াস্তি বোধ কোরতাম। কিন্তু বাড়ীর সবাই স্বস্তি পেতো না—এতে। কী করবো—আমি যে ছিলাম—ব্যারনার দ্যাঁ হ্যাঁ দে স্যাঁ পীয়ারের "পৌল ও ভার্জিনী"র মতো—প্রকৃতিবিলাসী এক অপাপবিদ্ধ—শিশু। ইন্‌ফেন্সী ইজ্ এ নোবলেস্ট টাইম্।—" ও বৌমা। দ্যাখো ত বাবলুর নঙ্কিটা ইন্ ট্যাক্ট্ আছে ত, না পুলিশ্ এক গুলিতে উড়িয়ে দিয়েছে।" বলেই, আমি হলাম স্থানান্তরিত মা থেকে, ঠাকুমার কোলে। ১৯৪২, সেই রক্তঝরা দিনের পবিত্র ডাক "বন্দেমাতরম্", আর রাইফেলী চার্জ ও ডিসচার্জ-টু ভীস্‌বার্স দ্য যোদ্ধাস্—আর, আর আমাকে নিয়ে মা ও ঠাকুমার এই শঙ্কার মধ্যেও—তামাশায় টানা,—আজও ভাবলে পর—চোখে ভাসে আনন্দাশ্রু। আজ ঠাকুমার স্নেহভরা "বৌমা" ডাকটা, মায়ের জন্য, না যায় শোনা এই শহরার—অতি দ্রুতয়ীত্ চলমান—এক অসুস্থয়ী সমাজ-মানসায়। এখন ত মিনি পরিবার, যার অপর নাম-এ ফ্যামিলী অফ্ টু সেল্‌ফিস্ জেন্‌ডারস্। সামটাইমস্ ইন্‌হিউম্যান্ অলসো—টু আদারস্। ইস্‌স্পেশ্যালী—টু দেয়ারস্ অনলি দ্য ওয়ান্—"সবে ধন নীলমণি" ঐ ছেলেতে, কী মেয়েতে। এখানে কালচার—একে অপরকে নাম ধরে—ডাকা। নো মধুরার ভাসী প্রতিভাস—ওগো-য়, কী এই—হ্যাঁ—এই। নাম তখন ভালোবাসার ভাবডোরে—দু'জনাই যেন অনামিক। অনামিকা। "এই" কথাটাই—সব কিছুর তরে সাদরীতী, আহ্লাদিতী—সম্ভাষণ। বর, তার বধূ-রত্নাকে। বধূ—তার বর সুজনককে। বাড়ীতে সন্ধ্যাকে বাবা ডাকতো "বৌমা" বলে। মা কিন্তু ডাকতো, সারা দিনমান অবধি সন্ধ্যা বলে। বলতো, "এতো সুন্দর মিষ্টি ভরা নাম কী না ডেকে পারা যায়। আমি সন্ধ্যাই বলবো।" তবে আমাদের মেয়ে হোলে পর, বিয়ের অনেক পরে—মা তখন নাতনির দেখভালিতে থেকে একতলায় কথা যাতে দোতলা থেকে পৌঁছয় তাড়াড়ে—তার জন্য আপন গলার ডীপ্‌থঙ্ ঠিক রাখতে কখনো হাঁক রাখতেন, "বৌমা"য়। আজ—বধূ সন্ধ্যাকে বৌমা বলে ডাকার—আর কেউ নেই। এ ডাক এখন হারিয়ে যাচ্ছে। গেছেও। যেমনটা—শহর শুনতো কয় দশক আগেও—সাঁঝবেলাকার সন্ধ্যা রাতির বাজয়ীত্ ঐ বাজন্। কাঁসর-ঘণ্টার, টোন্ ধরা টোনান্। আর আর—শঙ্খধ্বনি! নাই যায় শোনা। ওটা ত মঙ্গলীতে মঙ্গলবাচক্। ডীল্ দ্য সেক্রেডীস্। হীল্ দ্য অল শর্ট্ অফ্—অসোয়াস্ত্, থেকে ক্লান্তয়ীত্ কী শ্রানতয়ীত্—

মানুষী মানস। ও ধ্বনি বয়ে আনে—সীরীনীটী, সোলেম্‌নিটী। আজ—তা শোনা যায়, শহর ছেড়ে, এই মেকী কাল্‌চার্ তোড়—বেশ দূরেকার শহরতলীরও, –ওপারে—গ্রামীণ্ সভ্যতার দেশে—হেসে আর খেশে।

অনেক কথা, অনেক রকমার আসছেয়—টু ফেস্ তরে এই প্রীফেসায়—দিতে ধরা হোয়ে পরে লেখমাল্য—ঝড় হোয়ে, দোদুলায়—হৃদিতীয়ে কথালী হার্দ্যতা।

করিতায় কসোয়াস্তী কারুকাজ কোনো কোনো—ভাবরঙ্গিমায়, ধাব সঞ্চিলায়ী মঞ্জুলিতায়—যেন যেন, হয়—মঞ্জু-বিকচ কুসুম-পুঞ্জ। গুঞ্জরীলী। রঞ্জুরীলী।

মনে পড়ে—সন্ধ্যা শুচিস্মিতা বলতো, সেই কবে, যৌবনের সন্ধিযোগে, যখন যৌবনী ভাবলুতা জড়াতো দোঁহে—আষ্টেপৃষ্টে। বলতো—"অশোক, আমাদের মন চালিত শরীরী মাধুর্য্যার সব, হ্যাঁ গো সবটাই ত তোমাদের জন্য। দেখার জন্য। শেখার জন্যও বটে। পাওয়াটা পরে। নেবে বলে নেওয়াটা—আরো পরের। আগে বোঝো, আগে জানো—আমাদের। আমরা এক একজন মেয়ে—যৌবনকালে যৌবনেরই ঢালে ও ডালে সাজুতীয়ে হই বাজুতয়ী এক-একটা—লিরিক্যাল্ ব্যালাড্। সুললিতায় সুছন্দতয়ী—কবিতা। পোয়েম্, ফ্যাদমী ফুলেলে। রীদ্‌মী দুলেলে। কখনোও বা কেউ হোয়ে যাই—জুয়েলিকীতে ভ্যালুটী। জানোত'—ভগবান যতো মাধুর্য্য আর যতো ঔদার্য্য ধরে ধরে—সৌন্দর্য্যের বেদীতে করায়েছে—মেয়েদেরই যৌবনান্বিত অভিষেক্। করোনেশন্। যখনি বুঝি যে—তুমি ছেলেটা সত্যিই আমাদের ভালোবেসেছো মনের–আন্তর কোণে, তখনি বডি ল্যাংগুয়েজ জানায়, ওগো মিতা—এবার তুমি গট্ দ্য পারমিশেবল্ প্রীভিলেজ্—টু সী অল্ দ্য অর্নামেন্টস্ অফ আওয়ার বডি—ইন্ ফ্রেশী ফ্রেশ্‌ড্। গ্লশিলী ড্রেশড্। দেন সো আন্-রোবিলী। দেন সী য়্যাট হিয়ার অর দেয়ার—হোল্ দ্য ফীজীকী স্ফীয়ারা। অল ইজ্ সেক্রেড্—ইন্ ন্যুড। সীনারীতে দ্য ন্যুডীটী। জানো, ন্যুডীটী ওয়েলকামস্—সীরীনীটী, দ্য গডস্ ইনকার্নেশন্—উইদিন দ্য বডি-টেরীটরী। আমরা, তোমাদের চোখের দুটি কুট্টিমী মণিতে হাজার যাচনার ভালোটাই দেখাই—খোলামেলে, খোলা দেহে—ডিরেকটড্ বাই আওয়ার উয়োম্যান্‌লী,—ঐ ম্যানডেটে। এক রতি সুতো পর্য্যন্ত—স্থান পায় না—শরীরার কোথাও। ইট্ মাস্ট বী রেকোনড্ য়্যাজ দ্য পিউরিফিকেশন অফ ফীজীক, বাই ফীমেলিয়ান সাইকী। ভগবান, মানে দ্য অলমাইটি—সব ফেভারই আমাদেরই জন্য—রীজার্ভারী এ দেহে দেহে রেখেছেন—প্রাইভিসায়ে প্রীজাভর্ড। প্রিয়র অধিকারে, বিবাহের স্বাধীকারে—ওগো, তখন তোমরা যে শরীরার তরে—হও রাজা, রাজন্। ধীরে, মীড়া মন্তয়ী ধারারে—আপন মহিমায় একে একে করা ফীলী ডীলে—তা খুলে মেলে দেখবায়, শেখবায়, লেখবায়—ঐ না দেখাকে, ঐ না শেখাকে—তা আর লিখেয়ী যাবেয়ে বধূয়ী সম্ভারীল শরীরারই—ইতি-উতি

হোয়ারী এভ্‌রীয়ে। নট্ লীভিঙ্ এনি হোয়ারা আন-টার্নড বাই ইয়োর পার্মিশেবল্ পারফোরেন্সায়—বটিলী টটিলী, হটিলী—য়্যাণ্ড থটিলী য়্যাবাইডেড্ হান্টস্—ফর দ্য ব্রাইডী আন্-নোউন্ আন-কন্‌কার—ইন্ কোয়েস্টী কাউন্টার, হুইচ্ সামটাইমস যে কী ফেসড্ বাই ব্রাইড্‌স নটিলী রেনডারড্ এন্‌কাউন্টারস্ অনলি—টু রাউজ্ ইয়োর উীড্ ইন্ নীড্—টু হাভ্ দ্য এণ্ড—ফাইনালী ইন্ ফুলেস্ট স্যুইঙ্‌স্। হাঁ, গো, তাই হাঁ। ঐ দিনটায়,—যে কোনো প্রেমময়ী মেয়ের বধূ-জীবনার দরোজায়,—হয় হাজিরায় থেকে বোঝদারীল্ সত্ত্বেও ছেলেটির স্বামীত্ব—যেন কেমন—অবুঝপনার। বারে বারে হোঁচট্ খায় রোচট্ না মানয়ে। আহি মিতাল্ মাতি আরেক দেহীবিতানে ঐ মিতয়ীত্ মোস্ট্ ইনটীমেট্ সখ্যতা পাতাতে—যেন ভুল কোরে—ভুলটাই করাতে চায়। বসাতে চায়। জানবে, ভালোবাসা পেলে পর তখনি তোমার যুবতী বধূ সজাগ প্রহরিণী থেকে—পথ দেখাবে তোমাকে, দেখাবেই। এটাই—সীক্রেট্ সেক্রামেন্ট্ টু গেট্ এ ট্রায়ামফ্ ওভার হারস্—গিভেথ হোয়াট্ দ্য শট্ ম্যাটরীমনীয়ীলী—এ সেক্রেড্। এ য়্যাক্ট্ সীন্ ডেইটী।

মনে আছে। ঋতালিত্ এই সুন্দরী ভুবনার মধুবৃত ডুবনায়—সন্ধ্যা শুচিস্মিতা দিয়েছিলে অকপটতায়—ষোলোর ছোঁয়া। ষোলোর ষোলোকলা ছাপীল ঐ সুইটী টীন্ তখন সবে—কলেজের চৌকাঠে দাঁড়ীয়ে,—স্কুলেরে দিয়ে বিদায়। আর আর সন্ধ্যা রমতি সে সময়—বিদায় জানাচ্ছে আপন শরীরার—য়্যাডোলিসেন্সেরে। বয়ঃসন্ধিরে। যৌবন জড়াটী দেহ থেকে। মন থেকে। অল্ গ্রীন্ থেকে—শুধুই সজীব সবুজার—ইয়্যুথ্‌ফুলী জোভিলীয়াল্—আমন্ত্রণে। হ্যাঁ, ইয়েস্—সেই রম্য সময়জকার জম্য ফেয়ারীওয়েলী স্যোয়েলে—আমি করোনেটেড্ মনে মনে তারই—মনের মিতলীত হিতঝয়ী মিতলায়। তাই বুঝে, তারই স্বর্ণস্বাক্ষরায় হোয়ে জড়িতলত আমাতে—রেখেছিলো দিতয়ীতে এই আবেশীল্ মন আমাতে—মোর দ্য মেরীয়ার—হোয়ে এক ফেয়ারী ক্যুইন্—যুবতী হয়ী-হয়ী সে দেহী দেখভালিতার প্রথম সহজ এক পাঠ—প্রথম খুলিতয়ী সরমার দরোজাটা মুক্তোয়ে করা ওপেইনে—নিবেদনমিদং সন্ধ্যা শুচিস্মিতা—বাই হার বডিলী ভাষায় গডিলী চাওয়ায়—সী, প্লীজ সী মাই মেয়েলীত্ব। ধিকি-ধিকিতায়, হয়ী হয়ী ব্রাইটেনী যৌবন পথে—হাইটেনী যথে, সবুজ সবুজতরর মধ্যে হোচ্ছে—যুবতী। উয়োম্যানলি উয়্যোম্যান। সন্ধ্যা, তাই অভিলাষিতা—তার মনে তার দেহেও। মহাকবি গ্যেটের কথা, মহাকাব্য ঐ "ফাউস্ত" থেকে তুলে বলতো—"জানবে অশোক, এ উয়োম্যান্‌লী উয়োম্যানহুড্ ড্রজ্ আস্—ঐ আপ ওয়ার্ল্ডলি। যাক্, উনি ঐ য়্যালীট্ সমাজীয় মহামানব। আমি একজন নামী অভিনেত্রীর আপন মেয়েলীপনার উপলব্ধি জাত কথাটাও জানাই। বিখ্যাত ব্রীজীত বার্দোত একজনের অটোগ্রাফের খাতায় লিখেছিলো, য়্যাডেজ্ মতোটি—"এ

উয়োম্যান্ ইজ্ এ উয়োম্যান, হোয়েন ইন ডীড্ য়্যাণ্ড্ ইন্ নীড্—সী ইজ্ এ উয়োম্যান।" বলি, আই কন্‌ফেসে—বঁধু সন্ধ্যা তার স্নিগ্ধয়ী ভাবমোকাবিলায় কাবরচিলায়—অনন্য সাধারণী এক প্রেক্ষিতায়ী প্রেরণা হোয়ে—এক প্রণয়-গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলো, সত্যি সত্যি—দু'জনারই দুধারী সমাবর্ত্যে—একের মধুঋতলী যৌবন, মেলাতে দিয়ে—প্রিয়রই বঁধুয়ার রাধাস্বত্বায়ীতেই যেন—আপন রাজরাজীরীরী ঐ ফিমেলী যৌবনার মধ্যে—বারে বারে অনিবারে এক অনির্বচনয়ের সোয়াদায় ঘুরিয়েছিলো, আর আর বেসেছিলোও—ভালোরই ভালোটা—ঐ সন্ধ্যালীনী অনুরাগী দীপবর্তিকায় রেখে ও দেখে—যৌবনীন যৌবনী মৌতাতায়—যদিও, রভসিতায় নাহি ছিলো—নাথিঙ্ অফ্ দ্য যৌনানী। ওগো মিতা বিয়েরই বণ্ডেজ্ মানো, তবে পরে যৌনতায়ী যৌববিলাস—ফুল্ কণ্টেক্স্টে পাবেই। সন্ধ্যার মিনতি।

বধূঁ সন্ধ্যা, দ্য গ্রেটেস্ট ফ্রেণ্ড্ য়্যাণ্ড য়্যাড্‌মাররায়, আমার জন্যে সেই শুচিস্মিতেতে, যে দিয়েছে অনেক কিছু, বেশীটাই সাহিত্য সৃষ্টিতে, আর আর অল্পটাক আপন দেহবিতানে—হোতে দিয়ে মিততয়ী মিতা।—নাও প্রিয়তম। এ শুচিস্মিতার বহিঃরঙ্গে যা যা সঞ্চিতয়ী সম্ভারী রত্ন আছে—তা দেখো। তাকে আদর করাও। আদরায় রাঙাও। ইয়্যু ক্যান রব্ মাই রোব্ ফ্রম হিয়ার অর্ দেয়ার, প্লীজ্ ডান্ দ্য কেয়ারেস্ কেয়ারফুলি য়্যাণ্ড ফেভারেবলী—আপ টু দিস্।"—বলতো সন্ধ্যা হোয়ে বার্ডি, কবিতায়ী সোয়াদ্—"অশোক, দ্য লীটারীয়েটার, ফার্স্ট—সাইন্ দ্য সেক্রেড্ বণ্ড্ অফ ম্যারেজ্, দেন দ্য হোল্ অফ ইয়োর বডি উইথ্ ইজ্—ক্যান প্লে দ্য আলটেরীয়র নাইসেস্ট গেম্ নট্ ওভার-ওভার, উপরি-উপরি। মাস্ট কন্‌কার মাই ফীজীক্, ইন্‌টিমেটলি মেটেড্ ইনটিরীয়োরলী। জানি, দ্য গ্লোরীয়াস ইভেনিঙ্ অফ মাই জয়াস্ য়্যাণ্ড্ রীজয়াস ইয়্যুথ—দ্যাট ফর্ আন-নোউন্ রীজন্, সীজড্ নট টু বী! হোয়ে গেলে—সন্ধ্যা, সন্ধ্যা, সুন্দরী সন্ধ্যা জড়লিত মন্দ্রিকা বন্দনে বন্ধ্যা। আজও, তুমি, ওগো শুচিস্মিতে, হোয়ে থাকলে জ্বাজলীতে, দ্য লেডী অফ্ স্যালোট্! তুমি দেবী, তুমি থেমে, থমকিত্ আমারে খুশীয়াল্ হোতে—দিয়েছিলে রাজপথটি তৈয়ারেলে—যে পথ দিয়ে এলো পরে এ লিটল্ বিট্ অফ হাইমী টাইম্—সাত পাকের বাঁধনায় আমায় গ্রহীতায়—আজকের এই বধূ সন্ধ্যা। বধূ-রত্না শ্রীমতী সন্ধ্যা রুচিস্মিতা। এ যে আমার যৌবনতরীটা বহিতায়ে, ভাব ও কাবের রূপনারাণের কূলে—করাতে পারলো অভিষিক্ত, হ্যাঁ, যা সন্ধ্যা শুচিস্মিতা, তুমি ধারে ও ভারে—নিজেকে দিয়ে ধ্যান-নিষিক্তা, করাতে পেরেছিলে। সত্যি প্রথম ভালোলাগার জন্য ভালোবাসাটা—হোলো সত্যি ট্রান্সমিউটেশন্ অফ লাভ—টু দ্য ট্রান্সপোরটেশন্ অফ্ ম্যারেজ—আরেক নতুনা যুবতী, ঐ সন্ধ্যাতে। বলি কমন্ নেম্‌শেক, তোমারটাই বহমান যেন বহুতয়ী মিনতিয়ায়—এ সন্ধ্যাতে। লর্ড টেনিসীয়ান্ মীথ্ ও

রোমান্টিসিজম্—যেন ওন্ আপ ওভার দিস্ নিয়্যু সন্ধ্যা—য়্যাজ্ ইফ্ দ্য স্যার ওয়াল্টার স্কটীয়ান ক্র্যাফ্টী রীয়ালিজম্, লাইকওয়াইজ্লি 'দ্য ব্রাইড্ অফ ল্যামারম্যুর"। একজন আমাকে লেখক করার জন্য সেই ষোলোর সুইটী টীন্ থেকেই আমার কল্পনাকে সাজিয়ে দিয়ে—এসেছিলো। অনেক বছরী সাধনায় নিজের যৌবন-সুখ হিসেবায়, আমার যৌবনকে, সাহিত্যাভিষেকে, আর রোমান্সী টার্নআউটি, ডিউটীফুলী, বিউটিফুলী, য়্যাণ্ড স্পীরীটেড্লী। এ সন্ধ্যা-লগন সন্ধ্যাটাকে সাজাতেয়ে আর রাজাতেয়েই যেন অপেক্ষায় রেখেছিলো,—আরেক নতুনা সন্ধ্যার জন্য যৌবন-টইটম্বুরায়, না দিয়ে না নিয়ে তুমি যৌগী যৌনানের অনির্বচনীয়তা,—যা দেবলোকে ঘটে—ইন্ ম্যারেজ।

যুবতীর প্রাইসস্লেস্ যৌবনটা কী ও কেমন—তা আদর দিয়ে, সৌহার্য্য নাচিয়ে—ওর তখনকার এই আমাকে, রেখেছিলো—ট্রু আণ্ডারস্ট্যাণ্ডেবল্ ফর দ্য ইনটিমেট্ ফীমেলীয়া ওয়ান—য়্যাজ সী ইজ্। আজ যদিও—সী ওয়াজ্। সন্ধ্যা শুচিস্মিতা—অনারেবল্ স্যার মন্মথনাথ মুখার্জীর আদরের নাতনি, মোস্ট্ অনারেবল স্যার এস. নাসিম আলী ও রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীর অতি আদরের এবং মহানায়ক উত্তমকুমার ও সঙ্গীতনায়ক হেমন্তকুমার মুখার্জীর পরমা স্নেহভাজনীয়া—তুমি এই অশোককে বন্ধু-প্রিয়তম মনে কোরে—আন্তরলোকীয় ইন্টেমেসীয়ীটা সুবিস্তারায় আপন যুবতীকা ঘিরে অধিকার দিয়েছিলে—টু হাগ্, টু কীস্, টু য়্যামব্রেস্—হার আউটার ফীজীক্,—য়্যাণ্ড দেয়ার বাই নট পারমিটিঙ্ মী টু প্লে দ্য ইনটিরীয়োরী ডেকোরেশন। রীট্ দাই কণ্ডিশনড্ বেস্ট্যুড্ আপন মী। আই, দ্য সন্ধ্যা মুখার্জী ওয়ান্ট্স টু ওপাইন্ দিস্,—আনলেশ য়্যাণ্ড আনটীল ইয়্যু আর নট্ ওয়েডেড উইথ্ মী—ইয়্যু দ্য বিলাভেড্ ডীয়ারী অফ মাইন্—উইল্ নট বী য়্যামপাওয়ারড্ টু কেয়ারেস্ ইয়োর সন্ধ্যাস্ দ্যাট টু মোস্ট্ ইরোটিক্যালী ইরোজোনস্ জোনস্, দ্য মোস্ট্ হীডেন্ ট্রেজারস্, এক্সট্রাঅর্ডিনারীলী—কভারর্ড বাই রোব্স্ কন্টেইনিঙ, দ্য ফোর ফেজ্—শাড়ী, শাটিকা, অঙ্গরাখা ও কাঁচল্। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ? হ্যাভ্ ওয়েড্লক্। ওয়ান্স্ ইয়্যু লকড্ দাইশেল্ফ উইথ্ মাইন্—হোয়াই লিপ-লকড্ অনলি ! দেন, দাউ দ্য ম্যারেড্ স্পাউজ্—ইয়্যু উইল বী আর্ডেন্ট লাভেবল পার্টনার ইন্ য়্যাক্টিভ—টু য়্যাকটিভেট দ্য হাজব্যাণ্ডস্ রাইটী ডিউটি ইন্ রোবিঙ্, অল মাই রোবস্ টু বিউটিফাই দেয়ারস্—মাস্ট্ ডু দ্যাট্, সেক্রেড্লী য়্যাণ্ড সীরীনলী,—হোয়েন ইয়োর মোস্ট কোভেটেডী ফীমেলীয়া শোয়েথ্ পজ্ অফ প্যাসিভীজম্ ইন্ সাই এন্গেজড সাইলেশলি টু ইয়্যু—টু লজ্ ইয়োর অল্ সেনস্যুয়ালিটীস্ আনটু মী, দ্য মোমেন্টস্ টাইডী, হাইডী, শ্লাইডী স্লিপিলীয়া, গ্লাইডী আণ্ডার দ্য থার্স্ট থ্রাশী রাইডী ড্রাইভস্—বাউণ্ডস্, রাউণ্ডস্ য়্যাণ্ড হাউণ্ডস মীশেল্ফ, ট্রীমলেশে ট্রীমেণ্ডাস্লি, তাই

ত কবি। তাই না সাহিত্যিক, আমার! সন্ধ্যা বোলতে, মনের আন্তরার সায়ে, "কবি, তুমি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কোলে চড়েছিলে—এক বছরার যখন। তুমি দেশে-খেশে দশ দিশিতে—ধন্যতোয়া। পুণ্যতোয়া। বলি, সেই অশোক রায়ের চব্বিশ পার পার ভরাট বসন্তগুলো, যদি বিয়ের পবিত্রতায় আমার এই তোমার এই, আর তোমারই মতো চব্বিশ শেষ-শেষ এতোগুলো শরৎ, এতো অটাম—হয় তাহাতে করোনেটেড, মেটেড়ে, রেটেড্—আমি তখন আর সামান্যা কেউ থাকবো না, তোমারই জন্য হয়ে যাবো—যশোময়ে নতুনা এক যশোমতী। নতুনা এক শ্রীরাধা। প্লীজ, প্লীজ ওয়েট্ এ বীট্ ফর দ্যাট রীলেশন্ দ্য এ্যাডাল্‌টী। ঠিক তাই............."

আরো, আরো অনেক কিছুই সুবচনায় শোনাতে, সুসুযোগায় বোঝাতে, একটু হওয়া ক্ষণিকের তরে অবুঝ আমারে, তোমারই মন-দাপিল ক্ষণ জাঁপলি-দেহ কাঁাপিল-এ মিতারে। জানি, হয় নাহি তা। হয় নি ইন্ ফ্যাক্ট। তবে পরে এ সবই য়্যাক্টে আর য়্যাক্টে নাইসি—ট্যাক্টায় দিয়েছে মধুঝোড়েলে—হাজারো বার নতুনা সন্ধ্যা,—অন্নদাশঙ্কর ও লীলা রায়ের আদরের বধূ সদৃশী ও সম্ভাবিতয়ী—এই "রুচিস্মিতা"।

আমাকে পৌঁছে দেয়—ঐ যৌবন বাহানার টু মাচ্ ওয়ান্টেডী ঐ যৌগীক সম্পর্কায়, হ্যাঁ, এই যৌবন খচিতায় যাহা হয় রুচিরারই খোশবাই রোশরাই, সেই যৌনানে, সেই জুয়েলীকী পার্ল-হারবারায়, অন্ বোটিঙ্ য়্যাণ্ড রোয়িঙ্ দ্য ক্যয়শনস্—দ্য সেক্রেড্ ডীডস্ ইন ডীয়ারী নীডস্—টু য়্যাসেণ্ড নীয়ার বাই দ্য অলমাইটি, দ্য অমনিপোটেন্ট—ইয়া, ইয়েস—এটাই সত্য। পূর্ণমিদম্ বলে যদি আমার তোমার—দম্পতিদের কিছু থাকে, তবে তা—এইটাই। যা এক মাত্র সম্ভব এইখানেতে—কন্‌যুগালে মিউটেড্‌লী মেটেড্—যেই ক্যয়শনাল্ কণ্ডিশন্—ফুলফীলে, মাত্র দু'জনায়—যাহা বাহানাই বাহারী মাধুর্য্যায়—শুধু রজ্জুলিত। মধু মঞ্জুলিতত্। তুমি আর আমি—আমার বধূ সন্ধ্যা—যুগলিতয়ী এ ঝুলন মেলায় এ মিথুন খেলায়—ফুল ফ্যাদমতায় হই যে হই—মেটোরিকারীল্ সুখী। আপ টু দ্য ব্রীম্। শোনো, শুচিস্মিতা সন্ধ্যা, তোমারই শত সাধের হাজার আবদাবার সেই জীবন তার যৌবন নিয়ে হয় অভিসারক অন্যত্র, আবাধিতয়ী অন্যায়ায়—আরেক সন্ধ্যায়—বাই বণ্ড্ অফ ম্যারেজ। কথায় আছে—ম্যারেজেস্ ডু মেড্ ইন হেভেন। হ্যাঁ, তুমি সন্ধ্যা, বোল্ডী আউট্‌লুকীয়ান্ সন্ধ্যা, রোমান্টিকা সন্ধ্যা—নতুন রাধা হোতে হোতে অযাচিতয়ায় অনামধেয়ায় কোথায় যেন চলে যাও—হ্যাঁ, যাও। সেই অসম্পূর্ণতাকে, কাব্যিক পথ ও পাথেয়ায় টেনে নিয়ে—নতুন সন্ধ্যা হোলো—আমার জীবন যৌবন স্নাতকান্তে, স্মিতশান্তে, আরেক নতুনা রাধা। হেসে খলখল। গেঁয়ে কল্ কল্—যৌবনের তাবে ডালি সাজাতে কোনো কার্পণ্য করেনি—পল কী অনুপলে। কখনোই। সুখ দিয়ে,

সুখ নিয়ে—দু'জনাই খুশীয়াল্ তারপর। দ্যাট ইজ মাইন স্টোরী, স্কোরড্ বাই হার, দ্য নতুনা সন্ধ্যা, দ্য ডল্সী হোলিয়ার সন্ধ্যা—এই রুচিস্মিতা। আমি বলি, পৃথিবীতে স্বর্গ বলে যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে—তবে পরে তার চেহারা আমরা দেখেছি। আমরা জেনেছি। ওগো, শুচিস্মিতা সন্ধ্যা, তোমাকে অভিনন্দনী বন্দনায় বন্দিতায়ে এখনো মন-মাঝারে বন্দিনী-বধুঁটি রেখে, এ গ্রেট ফ্রেণ্ড ইন্ স্পিরিট অফ ওভারহোয়েল্ম্—আমি আর বধূ সন্ধ্যা মনে মনে জপিতায় জমিতায় আছি হোয়ে রচিতায়ী, —আর তাই বলি—স্বর্গ রচেছি আমরা—দুজনাই। আমি আমার সাহিত্যে। সন্ধ্যা তার কাণ্ডারীর ভূমিকায়—মম চিত্তয়ী চিত্ততোষে, মধুরিকার আপন সাংসারিকতায়। সংসার নামী—সংগ্রামায়। এনাদার টাইপ্ অফ—টীরেস্ট্রীয়াল ওয়ার্লডে। আমি তরী বেয়ে ভাবের আর চিন্তেরই হিন্তে-বিন্তে সোনার সে তরণী ভরাই, কুল্ থেকে কুলে রূপনারায়ণের। আর তারই হাল ধরে আছে—ইন্ আনবীলেভেবল স্ট্রঙ্ গ্রীপ্ অফ হারস, রুচিস্মিতার। আলেখ্যেয়ে গিয়ে, গান তানে তানে তোড়ী-জোড়ীলায়, জানাই, —হয়, 'এথা'। নয় 'অন্য কোথা'। নয় নয়—'অন্য কোনখানে'। এখানেই রাজে স্বর্গের সুরভি। স্বর্গের রৌরব। ইয়েস—য়্যাট্ হিয়ার্। নেভার—সাম্ হোয়ার এলস্। বলো না—এলস্ হোয়ার। সবই এখানার।

আই কনফেস্। এগেইন্। পিতৃবন্ধু ডাঃ বি. এস. কেশবন, তাঁর দপ্তরে—দেখেন, —সন্ধ্যাকে প্রথম। আমি নিয়ে যাই। লাল পেড়ে ঝকঝকে তাঁত-শাড়ী। আর গ্লসী রেড্ ব্লাউজ। দু ধারার বক্ষয়ীতে উন্নীত যৌবন—ব্লজম্ড্। যেন দুটি ফায়ারী দোদুলা বক্ষীতে—বহী। কাজল চোখে পাই ভাবভরাটী। অধরায় জমজমাটিল—হাস—মিতাল। রীত প্রীতাল্। প্রণাম কোরতেই, চেয়ার ছেড়ে উঠে কেশবন-কাকু, —সন্ধ্যার মাথায় ও কপোলে—হাতের আদরী স্নেহটা রেখে বললেন—"তেমার শান্তশ্রী ভরা মুখ দেখে নাইস্লি আই প্লীজড্। ভালো কথা তোমার মতো প্লেজাণ্ট লুকিঙ্ গার্ল—ইন টাইম্ মাস্ট গর্ভান দিস অশোক, দ্য নটী ওয়ান। সন্ধ্যা, ইজ এ বিউটিফুল নেম। হ্যাজ্ মাধুর্য্য। হ্যাজ ঔদার্য্য। কী খাবে বল, কফি না চা। আর প্যাসট্রী। বোসো বোসো। এইমাত্র গ্র্যাণ্ডে রোটারীর মীটিঙ্ সেরে আসছি। খোশ মেজাজে আছি। কিছু সময় দিতে পারি। জানো নিশ্চয়, সন্ধ্যা মুখার্জীয়া—এই ছেলেটা গুরুদেবর আশীর্বাদ ত পেয়েছেই। এমন, কী স্যাট আপন দ্য ওয়ার্ল্ড লীজেণ্ডারীস্ ল্যাপ্। হিংসে হয় এই ছেলেকে। জানো ত—রবীন্দ্রনাথ আমাকে পেয়ে বোসেছে। এক বছরের মধ্যে বাছা বাছা একশত ছোটো-বড়ো কবিতা মুখস্থ কোরেছি। কোনো ফাংশনে, গেছি, কেউ বললো—কেশবন সাব্ আবৃতি কোরে শোনান। শোনাই তখনি। আর শুনিয়ে বাহবাও পাই। অশোক, পরীক্ষা হোয়ে যাচ্ছে। তিন মাসের ছুটি। ভালো করে পড়াশোনা চালাও—বাইরের জ্ঞান নিয়ে। রিডিঙ্ রুমের দোতলায় তোমাকে একটা

য়্যালকভ্ দিচ্ছি। মৌজ কোরে পড়াশোনা, কোরবে। জানি, নানান বিষয়ে তোমার আগ্রহটা অপরিসীম। সন্ধ্যা, তুমিও এসো ওর সাহচার্য্য হয়ে। দ্য ডীয়ারী হেল্পিঙ্ হ্যাণ্ড্। সন্ধ্যাকে কেশবনের দেওয়া পিতৃময় আদরা। ওর টৌল খাওয়া ডান কপোলায় টুক্ হয় টোকায়ী—স্নেহাদর।

সন্ধ্যা একদিন, ব্যালকনির গোল-টেবলার ধারে মুখোমুখি ঢাউস্ সোফায় বোসে বলেছিলে—"জানো, বিবাহিত জীবনে, কীনস পরিসংখ্যান নিয়ে দেখেছেন—প্রায় নব্বুই জন স্ত্রী—চীটেড্ হয় স্বামীদের দিয়ে—নট্ ইভেন্ গেটিঙ্ দ্য অর্গানিকী অর্গাজম, দ্য ল্যস্ট ক্যাটাস্ট্রফী ফর দ্য স্পাউজেস—হু লেনড্ দেয়ার ফীজীক ফর দ্য গ্রেটেস্ট্ মোমেন্টস্ অফ ডেলাইটেড্ প্লেজার অফ প্লেজারস। জানো ত'—নট হ্যাভিঙ্ দ্যাট, চীটেড্ বাই সেলফিস্ জায়েন্ট লাইক হাজব্যাণ্ডস্—ওরা, মানে বিশ্বময় এই স্ত্রীরা চায়,—ঠকেছি, তা আর কী করার আছে। প্রভু তুমি ত সব দেহী সুখ অঝোরার জোরেজারে কেড়ে কেড়ে নিয়েছো—তা এর সোলেশ পাই, তোমারই সন্তানের মধ্যে, তোমারই আরোপিত করা মাতৃত্বে। জানো অশোক, দুটি নয়, তিন থেকে পাঁচটি সন্তানের মা হোয়ে—এই অসুখী স্ত্রীরা—তার তার সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে বিলীয়ে রাখে, ওটাই শেষ রীসোর্টী সুখ, আপ্-রীঙই রসাবেশ। সত্যি। সত্যি।

"জানবে, তোমার সন্ধ্যা পড়াশোনার পর এই সিদ্ধান্তে আজ পৌঁছেছে, আমারই এই একুশ-বাইশী বসন্তায়, যে—রতিজীবনে যে দম্পতি অতি যুক্তে ছন্দ-যতি মিলময়ী আবেশায় হয় বাথেড্, রয় মেল্টেড্—তারা সুখী হোয়ে পৃথিবীটার জন্য আবারও আকার হয়। আরো সুন্দর করে তোলে এই লাইভ্লি গ্রহিতায় যেন পরে বলে—হে বিশ্ব, তুমি আমাদের সৌন্দর্য্য। মাধুর্য্য। আর, আর ঔদার্য্য।"

ও কথায় আজও, মনে আছে—এই সত্তর ছুঁই-ছুঁই বয়েসায়, এখনও যে গাহিতে পারি ফেলে আসা যৌবনেরই যুবতীতে—পুনোরপি—নতুনা এ ঐ—সোয়ান্-সঙ্। বলি—স্যার আলেক্জাণ্ডার মাগুনের বিখ্যাত "লাভ য়্যাণ্ড ম্যারেজ" ছিলো ইয়্যথ্ফুল সেন্স্যুয়ালিটীর ভাষ্যময়—এক গীতা। একদিন, এই নিয়ে সন্ধ্যাকে জাতীয় গ্রন্থাগারের, পুকুরধারের বাঁধানো বেঞ্চে বোসে শুনিয়েছিলাম—একরতি রতিকাজী কথা নিয়ে লেখা যতিয়ীতক—এক চীট্। কণিকায়ী লেখ। তা উদ্ধৃত কোরছি—যেমনটা, আই রেড্ অন্ দ্যাট টইমী হাইকায়—"হ্যাঁ, শিশুকালে, ঐ শিশুতীর্থে ঐ ইন্ফেন্টাইলী ইনট্যুইশনটা শিশু না বুঝলেও, পৃথিবীটা তাকে বোঝদারী পথে টেনে নিয়ে চলে—বড়ো পথী দড়ারে।..............

মনে পড়ে আনন্দ কুমারস্বামীর কথা। পড়েছো ঐ "ডান্সেস্ অফ্ শিবা।" বলি—জি.ডি.-র বড়ো ছেলে লক্ষীনাথ বিড়লার 'দ্য তপস্যা অফ উমা'। দুটো বইয়ে একটা জিনিস সামারাইজে—বয়ীতয়ীত এই আমাতে যে—শিব পূজিত হয় সর্বত্র। দেশে-

বিদেশায়ও। তবে ভাবরাঙ্গে রূপ-তরঙ্গায়িত্ তখনি, যখন দেখি—এদেশে, আর পৃথিবীর অনেক দেশেই পূজিত হয়—দেবাদিদেব এই ভিখারী শিবের—শরীরার একটি বিশেষ—অঙ্গ। তার ঐ অঙ্গটি অর্চায়—হয় কালচারালী রীলিজায়ীসে, এই বেশ কিছুটা—যা সত্যি সত্যি। পূজীতয়েতে থাকে কৈশিরোকী অতিক্রান্তা সবে যুবতীত্বে অভিষিক্তারা। হোয়াই ? ফর হোয়াট্ রীজন ? এটা যে—মেয়েটির যৌবনী ভালে মিথুনী চালে, যেই হয় বলে যায় হোয়ে পুণ্য মাতয়ী এ বিবাহটা—সাথ একটি চেনা কী অচেনার—ঐ ছেলেয়ীর ইয়্যুথায়—তবে, পরে ঐ স্বর্গে যেন খচিতয়ী অর্নামেন্টা সৃষ্টির কাজেতে যেন হয় মেয়েটি,—হ্যাঁ, ঐ বধূ-মেয়েটিই হাজার সুখে তক খুশীলাই রভসে—পূর্ণমিদমা। দোলীলী য়্যাণ্ড্ শোলীলী—প্লেজারীল্ প্লেজরাসায়—পীয়োরলী কপিউলেটেড্। রীচলী মেটেড্। হ্যাঁ, ঐ "ওয়ারিশিপ অফ্ ফ্যালাস্" ওদের, আর আমাদের অর্চনা কুমারীত্বের ঘরে, হোলী ভার্জিনত্বের দরে—ঐ রুজ্যয়ী পূজ্যটা—"শিবলিঙ্গে"। জানো, সন্ধ্যা—নাথিঙ্ য়্যাবসার্ডিটি—এমনি রীচ্যুয়ালে। এটা বিজ্ঞানেরই ধরিতয়ী—এক প্রজ্ঞা। তাই, তাই বলি—ঐ প্রতিটি শিশুর, ধরো ঐ পল্ কী পৌল্, ঐ টিল্‌টিল্ কী ঐ শিশুয়ীত্ ভোলানাথেকে ঐ ইন্‌ফেন্টাইলীটির 'নঙ্কি'টাই যে—বয়সীতে, সবুজী সবুজায় ছেলেটিকে—বিবাহের হোলি নট্-এ স্বাক্ষরিতীয়ে—মহান সৃষ্টিলোকের সিসৃক্ষুয়ী অর্ডারী আর্ডারেতে—গ্রীণ রঙী কার্ড পায়ীল্ রয়ীতায় পর পর—ঐ রেড কালারার ভ্যালারী বার্ডীতে—হয় হয়—বধূয়ার মধুঋতাল্ শরীরার সাথেলে ও আথেলে তক মাথেলে—চয় যৌবন সাঁতারায়। আপন প্রিয়ারই অল্‌মোস্ট্ সমার্পিনয়ীত মাধুরীতায়ীতী মধুলাসে মদালাসে—ইন্ টাইমী মীটোয়ারীল প্লেয়ারার ঐ রীজোয়ারালে সীজনড্ সাইজায়, যা হয় মেটোয়ারে আর রেটোয়ারে—রাইজী। প্রাইজায়—ঐ কখনোর দরকারেতে দরোদরীলেয়, জয় জয়—অবশ্যায় শ্রীমতীয়ীর কন্‌সেন্টী থাকাটায়—হয়ী হবয়ী ভিজিটটা সারপ্রাইজে—ক্লীক্ দ্য ক্লীটোরীস্—রীয়েলী ডান বাই হী, দ্য লর্ড—জাস্ট নাও—বাউণ্ড ডাউনায়—সত্যি সত্যি, ক্রাউনড্ হার ম্যাজেস্টীস্ ঐ ভাবরাক্ষেতে সঁপে দেওয়ীতে রাখা—জৈয়ে ঝৈ থৈ-থৈয়া—ঐ ভেজানোয়ী রুম ভেজাইনায়—চুম্-চুমেলে সাজুয়ায় ও বাজুয়ায় ও রাজুয়ায়—রীয়েলীল্ রীয়ালিটীর ডিয়েলায়—কণ্ডিশনড্ দ্য ক্যয়শনস্।

বলি, সন্ধ্যা তারপর। আমি যে এক অপাপ-বিদ্ধ শিশু ভোলানাথ। মা নয়, বাব নয়, নয় ঠাম্মা, নয় দাদু—কেউই কোনো আদরীল্—তোড় ভরা শাসনায় পারেনি—আমার শিশুয়ীতী রোমান্টিকী ঐ ছোটোবেলাকার শরীরী ঐ লোয়ারাটাকে—ফ্রম্ লোয়ীন্-লাইনা—ঢাকায়ী আবরণায় দেওয়াতে—ঢাক-ঢাকুই। রাইম অনুভরতিয়ী মতায়—শিশুতেয়ে। তখন সারা বাড়ী ঘুর-ঘুর। সারাটা দিন দৌড়-দৌড়, ঝাপ মারা ঝাপটায়—ওপর তলা থেকে নীচয়, কী নীচ থেকে—পথ ওপরায়। আমার শার্ট—

ঝুলী-ঝুলে ঢাকা জামার নীচেকায়—প্রায়, প্রায় হাফ্ আবরণীত—ঐ নীচেকার লাইনী ঝুলটা ছাড় বলে ছাড়িয়ে থাকতো না রে না—কোনো আণ্ডারালী—ঐ ওয়্যারা। ওঠা থেকে ঐ লোয়ারে, আরো পথ লোয়ারায়—হাফ্ ফ্রম্ দ্য থাই যুগলা—নাহি নাহি সাজ বলে হইতোয়া যাজীতে—নো নো ঠাইটা—জন্যে কোনো আভরণী আবরণার। বলতে পারি, সন্ধ্যা—শিশুমনের চরিত্রয়ী চরিতার্থতায়—এটা তুষীরই ছিলো। রুশীরই ছিলো—যতোই আসুক ভাসুকায় রফা। ঝকাটা হোতে তায়ে—নো নো রফাতী।......................"

একদিন সন্ধ্যা। স্ট্যাক্‌রুমে ঢুকে—মহামতি ডাঃ কীনসের দুটি ভলিমুন্যাস বই—ঘাটাঘাটি শুরু করে। বলে, "ধ্যাৎ, ওটি পড়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না। এটি মানে—"সেক্স্যুয়াল্ বীহেভীয়ার ইন্ হিউম্যান্ ফীমেল্"। বইটি দেখে সন্ধ্যা বলেছিলো, শুধু মেয়ে নৈ—যুবতী ত! তাই নট্ ইনটারেসেটেড্। আমাদের বোধ আছে, আছে সূক্ষ্ম অনুভূতি-গ্রাহ্য—আণ্ডারস্ট্যাণ্ডইঙ্। কিন্তু তোমরা, ছেলেরা অন্য ধাতের। সময় বিশেষে—বন্য কাতেও—কাত হও। তাই জানতে চাই বলে—বরো কোরতে চাই অন্য বইটা। ঐ "সেক্সুয়্যাল্ বীহেভীয়ার ইন্ হিউম্যান মেল্।"

বরো করা হোল বাড়ীর জন্যে—ও.পি. ছাপ মারা হোলেও—কাকু অবনী সেনগুপ্ত ও খোদ ডাঃ কেশবনের সুপারিশে—ভায়া নকুল চ্যাটার্জী, টি.এ.।

সারারাত জেগে, সন্ধ্যা বই পড়লো। পাতার পর পাতা উলোটি-পালোটায়—বুঝলো, কীনস্ যৌবনেরও যৌবন ছোড় মানুষ, অর্থাৎ ম্যানরা কীভাবে আর কী আচরণে—মেট্ করে স্ত্রীর সাথে—তারই বাস্তব সব চিত্র-বিচিত্রায়ে। ফোনে সন্ধ্যা, পরদিন জানালো, আধো আধো গলায় আদর ঢেলে—"স্যার অশোক, তুমি কিন্তু আমায় বিয়ে কোরে, কীনসের খুঁজে পাওয়া ম্যান্‌গুলোর মতো বীস্টলি ব্যবহার করো না, যা দেখে সীজনাল্ মেটিঙ্-এ সীজনড্ য়্যানিমেলী কিংডম্ও—চোখ ঢাকবে, লজ্জায়, ঘৃণায়,। এই ম্যান্‌লি বীহেভীয়ার, সেক্স-এ মেটিঙ্ লগ্নে! মেয়েটি মেটিং-এ রাজী নয়। কারণ আছে বলেই ঐ স্ত্রীরা—তবু মিথুন চাহিয়ে নাছোড়বান্দার দল—হী-ম্যানশিপী জারিজুরীতে—ঐ কাজটা—সত্যিই সমাধায়—নিয়ে নেয়। এ ব্যাপারে স্ত্রীদের মাতমতের বা অনীহার কোনো মূল্য দিতে জানে না। চায়ও না। জানো ত একজন ছেলে যদি আরেকজন মেয়ের যৌনতায়ে মেয়েটির না-না-টা-না শুনে—কাজ কাম সারে—আইন বলে, ডাঃ কীনসও মনে করেন—সেটা পাশবিকতা। রেপিঙ্।

ঐ মেটিঙ্ থেকে পরে অনিচ্ছায়ই মা হয়—অনেকেই। হয় না কো দুইয়ের যৌথয়ী ইচ্ছায়—স্ত্রীতে আরোপিত শিল্পীতী ঐ কন্‌সীভ্‌টা। এ ছেলেগুলো স্বামীত্বের দরোজায় গোবেচারা নয়-নয়। এক একজন ধতয়ীতে রাজ;সেয়ানা। ম্যান্ চীটস্ দ্য

উয়োম্যান। হাজব্যাণ্ড চীটস দ্যা ওয়াইফ্। বুঝলে স্যার অশোক, কভি নয়, কখনোও নয়—নেভার য়্যাক্ট লাইক অল্ দিস্ ইনহিউম্যান স্কাউণ্ড্রেলিঙ্। সন্ধ্যা বলতে চায়, সব কিছু দেখে আর বুঝে—ম্যানরূপী হাজব্যাণ্ড্ বেগুস্ অলওয়েজ ওভার হিজ ওয়োম্যান্লি ওয়াইফ—টু কপিউলেট্ অনলি, য়্যাণ্ড নাথিঙ্ মোর। অনলি রেগুারস বোরডোম, আফটার বোরডোম—টু হার। য়্যাণ্ড, বাই দ্যা ল অফ প্রোক্রীয়েশন—শী দ্যা গুড্ ওয়াইফ্ পপুলেটস্ দেন।—দ্যা ভেরী ভেরী ডীড্—দো আনউইলিঙ্লি।"

আমি তখন পুরুলিয়ায়। মিশন স্কুলের প্রতিষ্ঠালগ্নে। দেওঘর থেকে ক্লাস নাইন হোলো ট্রান্সফারড্ হিয়ারায়। সুপণ্ডিত সুবক্তা হিরণ্ময়ানন্দজীর স্নেহময় চয়েস্ হিসেবে—আই জয়েনজড্ দেয়ারা। সন্ধ্যা, মনে আছে সেই সময় একটা চুমো দাগা চিঠি আমায় পাঠিয়েছিলো, তাতে মেয়েলী যৌবনঢালে, ওরা নিজেরা কতটা ধৈর্য্য দেখাতে সক্ষম, কতটাই বা ধৈর্য্যবতী—হাউ মাচ য়্যাণ্ড্ মোর দে ক্যান্ বীয়ার এনি ট্রাবল্সাম টারবুলেন্স—উইথ্ আন্‌বীলেভবল্ পেশেন্স্ য়্যাণ্ড পারসীভিয়ারেন্স্। লিখেছিলো সন্ধ্যা দুষ্টুকা—মহামতি ডাঃ কীনস্ শেষ পর্য্যন্ত মেয়েদেরে বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর ভূমিকায় আপন আপন যৌবন-সুখটায়—সুখ না পেলেও, সুখী দাম্পত্যিকতায় জায়গা না পেলেও—তারা, মানে মধুরা স্বভাবজতায় জাত ও জ্ঞাতা, এমন কি প্রজ্ঞাময়ীতা—যার ফলে স্বতঃস্ফূর্ত সহজতায়—স্বামীর দ্বারা তার একচ্ছত্র লীড্ করা ভোগ সমাপনান্তে—নিজে পতি-লোকটা অতি জয়ীর তৃপ্ততায় নিজেকে সার্থক মনে করলেও, যদিও অল দ্যা অল মোটিভ্স ওয়াজ পারফর্মড্, সাম হাউ, বাট নট্ জুডিশাস্লি—হাউ, দে রীয়েলী চীটস্ দেয়ার, স্পাউজী বেটার-হাফ্স্। আউট অফ দিস্—তবু মেয়েরা বার বার ভোলাপচ্যুয়াস্লী য়্যাণ্ড ইমোশ্নালী—ম্যাটরীমোনীয়ালী রেপড্ হোয়েও—জানো ত অশোক, মাই ব্লেশেড্ ফ্রেণ্ড্ আউট অফ্ দীস্, দে উইথ্ ইজ্ য়্যাণ্ড রেভারেন্স্—ঐ ঐ পাশবিকতার আউট-টার্ন রূপী—জার্মিনেশনটা সাদরায়, মেনে নেয়। ওযে ওটা, মেয়েলী প্রমা। শিক্ষিতা হোলেও, না হোলেও। ওরা, মানে আমরা, প্রণয়ে ও পরিণয়ী মিথুনে—চীটেড্ হোয়েও—ঐ অমানুষী ধ্যান-ধারণার অমানুষগুলোকে—উপহার দিয়ে থাকি—সন্তান। পুত্র-সুখ। কন্যা-সুখ। চীটেভ্ স্ত্রীরা প্রেম-ভালোবাসা না পেয়ে—তার স্থান পরিবর্তনে নামে—স্ত্রী থেকে—মায়ে। জননীত্বে। কীনস তাই, দৃপ্তভাবে ফর্‌মান্ জারিয়ে, বলেছেন—"মেয়েরা বিশ্ব-জুড়ে একই ছন্দেয় ঘর বাঁধতে চায়—কোনো ছেলের সাথে—বিবাহের নট্-টা বেঁধে। সুখ পেলে ভালো, না পেলেই নাই কোনো—সরোজ্। তখন তারা চায়, কয়েকটি সন্তানের মা হোতে। মাইণ্ড্ ইট্—একটা নয়। এমন কী দুটিও নয়। কয়েকটি সন্তান। সে কী রাইজ্ টু হাফ্ এ জডন্। চাইল্ড বীয়াবিঙ্—ইজ্ আফটার অল্—নট এ—যে সে কাজ। বিরাট ব্যাপার। মেয়েরা, হাজার ধারারই

ধৈর্য্যবতীকা। কনসীভ্‌কালীন্—শরীরী ভেতরার ভার ভার সব অসোয়াস্তিকেই—মনে করে, এ যে এ মেয়েলী—সোয়াস্তিকা। লেবার পেন্—হ্যাঁ, পৃথিবীর সব চাইতে গ্রেটেস্ট্ পেন্ যা শেষ পর্য্যায়ে—কোটি, হ্যাঁ ক্রোরস্ অফ প্লেজার ঢালে—জননী হওয়ার পর। সন্তানের মুখ দর্শন মাত্রেই, হ্যাঁ। বল, অশোক, মেয়েরা না থাকলে পৃথিবীর মানুষনামক ঐ ম্যানগুলোর স্যাম্, মানে নকল ম্যান্‌হুড্—যেতো গুড়িয়ে। জানো অশোক—পৃথীবীতে সবচেয়ে বড়ো মাপের মানবী—কামদেবী, মা গডেস্ কে বল ত ?' কে আবার, বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথের মা—দেবী সারদা দেবী। জানো ত !—আমি একজনকার বিয়েতে প্রিয় লেখক অচিন্ত্য কাকুকে (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত) বলেছিলাম—"একবার কি কাকু, তুমি কী ভেবে দেখেছো—সত্যিকারের পরমাপ্রকৃতির পরিচিতি যদি দিতেই হয়, তবে পরে তা—রবীন্দ্রনাথের মা—শ্রীমতী সারদা ঠাকুরকে।"

সন্ধ্যা রুচিস্মিতে, কামেথ্ টু মিঙ্গেল উইথ্ দ্য টু কাইণ্ড অফ লোন্‌লি সিঙ্গলুরাটিস্—ফর হ্যাভেথ্ দ্য ওয়ান্ ইন টু—ভেরী নাইসলী—বয়স ঐ ছাব্বিশায়ী যৌবনী—ব্রাইটায়—এই তিরিশার ক্রাইটায়—মিলি-জুলিতী দিলি-দুলিতী। মীটোয়ারী মেটোরায় টু হ্যাভ্ শী-র জন্যে—ফর্ এভারা, ধন্যে ফর সেভারাই শীভারায় দিয়ে-থুয়ে পাহারা জোরদারীলে—ফ্রম্ অল্ আনক্যানী আন্-কাম্‌লি থেকে পরে। তাই তাই। দোলী স্ক্রীপচারায়, আছে পর বাছ-বাছুয়ে, যথাযথী এ কথা—"দ্য হাজব্যাণ্ড হ্যাথ্ নট্ দ্য পাওয়ার অফ হিজ্ ওন্ বডি, বাট দ্য ওয়াইফ্ হ্যাথ্—লাইকওয়াজ্‌লি দ্য ওয়াইফ্ হ্যাথ্ নট দ্য পাওয়ার অফ হার ওন্ বডি, বাট দ্য হাজব্যাণ্ড হ্যাথ্।" সন্ধ্যা ঘর সাজাতায়ে, ঘরের ঘরণী হোয়ে—রাজাতেয়ে আমারে কোরে তোলে—মাসেরই মধ্যায়ায় এর স্বত্বায়ীতী রাজা, ভিজ্ আ ভে—অবশ্যই রত্নায়ীলে যত্নায়ীলে—আপন রমণীত্বে।

মহাকবি মিলটনে, আছে "প্যারাডাইস্ লস্টে"—হী, মানে স্বামী হোলো—ফর্ গড্ অন্‌লি। আর তারই শী, মানে প্রিয়া বধূয়ার স্থিতিটা আরো, আরো উঁচ্ পর্য্যায়ের, বাজ্ হেতুয়াই—বধূ, দ্য দ্যাট শী থাকে আর থাকারেয়ে এই নোবেলায়—শী ফর্ গড্ ইন হীম্।"

সন্ধ্যা, বাঙলার বধূ ত তুমি, তাই যে তোমার মধ্যায় আছে ধোরো ডিপোজিটা, নয়-নয়, জয়কায় দ্য রীপোজারেটরী অফ—বুক ভরা মধু। হানি আর হানি। সুইট্-এ সুইটী। ডায়েটেয়ে এ যে ডেইটীয়ী।

তুমি সন্ধ্যা, বধূ রত্না—এজন্য ধন্যয়েতে যে—হোয়াট্ ওয়ান্ পার্সন টোটালীতে অজানা পুরোপুরীল্—হাও হি য়্যাক্টস্ আপন্ হার দ্য আননোউন গার্ল, নাউ দ্য ব্রাইড্ ! বলি সন্ধ্যা, ইট ইজ বাই নট হাউ, বাই সাম হাউ—টু হ্যাভ কন্‌কার হার,

ডিসরোব্ হার, ইমিডীয়েটী ফুলিশনেসে—ইয়েস্—রব হার মডেস্টি, হোয়াট্ ইজ কনজুমেটেড্ টীল নাউ উইথ চেস্টিটি—অন্, অন ইয়েস—অন দ্য ফার্স্ট নাইট অফ্ ন্যুপ্‌চিয়ালিটি। এ স্ট্রেঞ্জ য়্যাবসার্ডিটী এটা। আমার মতে। বিন্ গোড়ী অনুমতি উইদাউটায়—কেমনে হয় এই এক তরফাই বন্ধুত্ব গড়ানোতে—মনকে শত যোজন দূরেত্বেয়ে পাশ কাটিয়ে—তুমি বর কেমনে আটায়েতে চাও—শুধু স্ত্রী শরীরায়। নট্ টেকিঙ্ দ্য কনসর্টস্ কন্‌সেন্টী ফার্ভার—তুমি অচেনা হোয়েও—আরেক অচেনাকে যেভাবে জিতে নিচ্ছো, প্রিয়া তখনো না হয়ী বধূয়ায়—দ্যাট কন্‌কারড্ অফ অল্ দ্য হীডেন ট্রেজারস্—ইজ নাথিঙ্—বাট এ ফাউল্ প্লে—ডান্ বারবারাসলি। আমি বীস্টলী বা য়্যানীমেলী—এই কথাগুলোয়—লুটেরাই মেজাজের বরদের—সম্ভাষিত করাতে চাই না—এ জন্য যে—ঐ কিংডমী য়্যানীমালীটীতেও আছে—সীজনড্ কিছু রীজন, টু মেট্—রীজনেবলী। বাট্ ইট্ ইজ রীজনলেস য়্যাণ্ড আন্‌থিঙ্কেবল্ বুচারীঙ্ অফ্ দ্য নিউলী ওয়েডেড—ঐ স্পাউজেরে, যার মন না পেয়েও কণামাত্রে রণাটাক তুমি মিথ্যা জয়ের গর্বে জয়িত, যে—প্রিয়ার পুরো আইকনটাকে, ইয়া, ইয়্যু দ্য ওয়াইফ্ যে হও দারুণায়—পার্ট ও পার্শেল অফ—হোলি ডেইটী, শ্রী ভগবান। তবু, বর-রূপী থীফ্‌টা, ঐ ডার্টি মনার ডাকতটা—সব সব মাধুয়ার মডেস্টিটাকে ছিনে নেয় যেন—যেন এটা যে ওর বিয়েয়ীতে অর্জিতায়ী আরেক রকমাই—ডুইঙ্ বলে মেনশান। থাক্, থাক—ভালো লাগে না বলেই এতোটায় যুদ্ধং দেহীতায়—আই ক্রীটিসাইজড্। নো মোর্—আর।

বধূ সন্ধ্যা—আমাকে রাজা কোরেছিলো—এরই ঔদার্য্যায়ীতী ঐ কন্‌সেন্সী কন্‌সেন্টায়। আমি আমার অনেকদিন চেনারও ওপর ওপরায় জানার—এই যুবতী কন্যাকে—প্রথম যেদিন দেখি, সেই অনেক, অনেক দিনের—ও-পারে। ফেলে বিস্তারিয়েতে আমার আকর্ষণটা—তার প্রতিয়ী প্রতিমায়ী মাধুরারই ঘরে—প্রথম যেদিন দেখি,—সেই সেদিন থেকেই। একটি নোট্—শুচিস্মিতা সন্ধ্যাকে য়্যাডীয়্যুই বিদায় লগ্নে—কথা দিয়েছিলাম। ওরই অভিলাষ অনুযায়ী, যেন একা না থাকি, মাস্ট গেট্ ইন্ ম্যারেজ বাই ইয়োর লাইকলি, হুইচ্ ইন এ হাইক্‌লি ম্যাটার—আমি যাঁকে বিয়ে কোরবো—তার নামটাও হোতে হবে—অনুরাগবতী ইভেনিঙ্ই—হবে আরেক সন্ধ্যা। ঐ নাম যদিও পছন্দায় আর এক ধাপ এগুয়ে পায় শুচিস্মিতা তোমারই মতো—শান্তশ্রীতে শ্রীলতা, তবে সেই সন্ধ্যাকে তাৎপর্য্যায়ী তাৎক্ষণিকায় চিনে নেবো—বিবাহের পর আই, পরম করুণাময় ঐ পরমাশক্তির—প্রকৃতিলী প্রতিভাসে।

অভিরুচিতে—মীরাক্যালী যেন ভজনায়ী ভিখারিনী রাজকন্যে—ঐ মীরার মতো ছন্দে মিলে—যতিতে শেষ চুমাটা দিয়ে, শেষ আদরার চুমাটা নিয়ে—আবেশ

দোদুলী আলিঙ্গনটা—গেটেথ্। এ গ্রেট্ স্টপেজ্। জানি না—কেন। আজও নয়। যাজও নয়। শুচিস্মিতা সন্ধ্যা, যাবার বেলায়, গুনগুনিয়েছিলো ঐ কথাটাই—

আমি—যাবার বেলায় এই কথাটি বলে যেন যাই
তোমার থেকে—যা পেয়েছি যা দেখেছি তুলনা তার নাই।

প্রিয়তম অশোক রায়, ভাবীকালের সাহিত্যিক—

ভালো কী মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে—

হ্যাঁ, তাই অশোক রায়—

হয়েছে সময় বিদায় দেহ তাই।—'ভাই' পাল্টে।

সন্ধ্যা, শুচিস্মিতে—আমায় নিয়ে আমার ভেতরার ভালোটা আর বাহিরার অপছন্দটা নিয়ে—অতি আন্তরিকী ইনটিমেটে—একটি লাল রেক্সিনে মোড়া খাতায়—নক্সী কাঁথার মাঠের মতো আগাগোড়া ডেকোরেশনে ভরিয়ে—দিয়ে গেছে—এক উপহার,—লিখে লিখে চিরন্তনী মেয়েলীত্বে,—এই প্রিয়াল্ মানুষটি কেমন। যৌবনিক কন্‌ফেশন্ আপন যুবতীকারই ধৃতয়ে রাখা, হৃতয়ে মাখা প্রীতয়ে দ্যাখা—অশোককে লিপিবিবেকায়—সাজায়ে আর রাজায়ে। হয়ত কোনো দিন এটি প্রকাশ পাবে। ইট্ ইজ এ ট্রীটিজ অফ লাভ—য়্যাণ্ড ইটস্ ফারভারাস্ কো-অপারেশন ফর মী—মেকিঙ্ মী এ গুড্ মাস্টার মাইণ্ডেড্—অথার। লিটারীয়েটার। বলতো সন্ধ্যা, শুচিস্মিততায় হাসির ঝিলিক ঝলকায়ে—কোনো লেখাটি লেখার পর, আর পড়ার পর, খুবই উত্তেজিতায় আমার ভাব ও চিন্ত মথিতায়, বলতো—"ওগো, ও শিল্পী—তুমি যে সাধারণ পাঠকদের জন্য লিখছো না—এ সব। এ যে এলিটস্‌দের জন্য। আমি মানে তোমার সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়িনী নিশ্চিতা, যে তুমি—অশোক রায় হবে—লেখকদের লেখক। অথার ফর দ্য অথারস।"—সন্ধ্যার এই অকৃত্রিম আন্তর সমীক্ষাতায় আমার লেখা পড়ে ও আমারই মুখ থেকে পড়া পাঠ শুনে শুনে—এই একই সন্ধ্যালীকী সত্বাটায় ভয়ানক সায় দিয়ে গেছেন। আজ নয়, সেই যখন এ রচয়িতার বয়স চব্বিশ থেকে পঁচিশ ছুঁই ছুঁই। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, মেজকা বিভূতি মুখোপাধ্যায়, কাকা-কাম-মেশো অন্নদাশঙ্কর রায়, কাকামণি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কাকু দেবেশ দাস, কাকু হুমায়ুন কবীর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, আতাউর রহমান, ডাঃ সুশীল রায়, আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—এবং ওঁকরানন্দজী, হিরণ্ময়ানন্দজী, সর্বোপরি নরেশদা, গহনানন্দজী। কেউ কেউ সন্ধ্যার উপস্থিতিতেই—এ কথা জানান। আমি বলি—আমার জীবনে নাই কো চাহিদা পেতে পরে কোনো ছাপ-মারিতয়ী—ঐ সব পুরস্কার। আমি আগে ভাগেই যে পুরস্কৃত—বাই দ্য মোস্ট স্টল্‌ওয়ার্টস অফ্ লিটারারী ওয়ার্ল্ড। আর আর এর সবটারই কৃতিত্ব—ইজ লাইইঙ্

উইথ হার রেগুরিঙ্ ম্যাজেস্টিসিটিস্। সব কৃতির কৃতত্বটা অবশ্যই—শুচিস্মিতা সন্ধ্যার। আমার নয়। বলি, শেষ একটা চিরকুটে লিখেছিলে বিশ্বকবির বিশ্বচিন্তয়ীতী এক ব্যথাশূণ্য ব্যথা নয় বলে—যথাটি ঐ ঐ যেন শ্রীমতী লাবণ্য হোয়ে—

হে ঐশ্বর্যবান, ওগো নিরুপম
গ্রহণ কোরেছো যতো ঋণী ততো
কোরেছো আমায়—
হে বন্ধু বিদায়।

ফুট নোটে বলেছিলো ইন্ কারেকশন—বন্ধু নও গো, তুমি যে ছিলে অনেক বছরার আদরা, যে আমার মুখশ্রীর শান্তশ্রীতে বারে বারে জাগিয়ে গেছে—শতেক সিক্তনী চুমায়-চুমায়। আর আর, তোমার অতি পসন্দীয়তেক লাজ মাখানিয়ার, লাজ কাড়ানিয়েতে সিঙ্ক, এ অশোক রায়—জাপানী কন্যা ও হারুর বুকে শোভিতয়ীময় দুই যুথীবদ্ধ পারিজাত-গুচ্ছে—ইয়্যু, দ্য আর্টিস্ট্—অর্নামেন্টেড্ ইন হাগিঙ্ ইন ড্রেগিঙ্ ইন্ পুলিঙ্ ইন্, ইন স্কুইজিঙ্ দ্য প্লেজারস, প্লেজারাস্লি ওরিয়েন্টেড্। বিদায় নয়। তবু বিদায় চাহি যে। লহ লহ, একটি নমস্কারের মধ্যে—হাজার প্রণাম। একদা জয়ী এ প্রিয়তমা থেকে, তোমারই প্রিয়ালাতে।

জানাই শেষ দিন, শেষ সন্ধ্যায়, মাস মেয়েতে—ঐ রবীন্দ্র সরোবরে, লিলি পুলের কাছে—শুধু আমরা দু'জনই নই। ছিলেন গার্জিয়ান লাইক—আজকের দিনের একজন যথার্থই সারা ভারতের কোটিকে আর গোটিকে—কয়েকজন মাত্র ভালো মানুষের ঐ একজনা—স্বামী গহনানন্দজী। সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে উনার সন্ধান পাই—সেই ইভেনিঙ্-এ। উনি অফিসীয় সব কাজ শেষে রুটিনমাফিক—সান্ধ্যভ্রমণে বেরুতেন—একাকী। সেদিন উনি বেরুচ্ছেন। আমরা হাজির। কথা কাটাকাটিয়ী আটা-আটীতে। উনি বললেন, "চল। আমার সাথে।"

হাঁটলাম। ল্যান্সডাউন ধরে—লেক্ অবধি। এ-দিন আমাদের দু'জনাকেই—শান্ত করাতে—আর একটু এগুলেন। লিলি পুল পর্য্যন্ত। নিজে বোসলেন। আমাদের সামনায় বসালেন। বন্ধু-সখা-দার্শনিকের মতো। বেশীটায় আমাকে বোঝালেন—এ হেন পরিস্থিতীয় অসোয়াস্তিটা কাটাতে। সন্ধ্যাকে বেশি বোঝালেন না। আমাকেই। শুধু বলেছিলেন—"সন্ধ্যা তোমার চাইতে অনেক—ধীমতী। ও মোশানে চলতে জানে। এতোদিনে—তাই আমার ধারণা। তুমি যেমন রোম্যান্টিক মনের তেমনি—ইমোশনাল। তোমার চৌদ্দ বছর বয়স থেকে তোমাকে তোমাদের এই নরেশদা দেখে আসছে। আমি কিছু জানতে চাই না। তোমাদের অবস্থাটা বুঝতে পারছি। একটা কথা জেনে রাখো, মন যা চায়—তাই চাইবে। মন যা বলে করতে তাই কোরবে। এর মধ্যে কোনো আশা, বা প্রাপ্তিযোগ্য রেখো না—সেটাই ভুলটাকে টেনে আনে।

এটা আমার উপলব্ধির কথা। শোনো অশোক, সন্ধ্যা তুমিও শোনো—আস্থা হারিয়ো না। একটু ডীপার্টে থাকো দিন কয়েক। দরকার হোলে মাস কিছু। দেখবে, আবার ফিরে আসবে—আগের অবস্থা। হবে পার্ট অফ এনাদার! তুমি তোমরা আমায় কোনো অস্বস্তিয়ে ফেলোনি। সমাজবদ্ধ সামাজিকতায় এমন হয়, হয়ও। শোনো অশোক, শোনো সন্ধ্যা, আমার বা বিজয়দার (হিরন্ময়ানন্দজী) ইচ্ছেটা পূরণ হয়নি, হ্যাঁ অশোক তোমাকে নিয়ে। এটাও বলতে চাই, যে—প্রথমে চিন্তামনদা (নিত্যস্বরূপানন্দজী) তোমার সামনায় বলেছিলে আমাকে লক্ষ্য করে,—"নরেশ। এদের বয়স অল্প। হোই না আমরা মনাস্টিক লাইফের, ইয়্যু মাস্ট গাইড্ দিস অশোক, য়্যাণ্ড হিজ কম্পেনিয়ন, দিস নাইস্ গার্ল।" জানবে তোমরা, ওদিকে এমনটাই ফরমাশ ছিলো অনঙ্গদার (ওকরানন্দজীর)—"নরেশ। দে আর ইন্ লাভ্। য়্যাট্ দিস লিটিল্ এজ্। নরেশ, আই লাভ দিস ডুয়ো—য়্যাফেক্শানেটলি। আমি দেখেছি, দু'জনার মধ্যে অন্য ধারার 'ব্লু বার্ড', অবশ্যই ব্লু ব্লাডেতে প্রবাহিত। এরা যেন টিলটিল আর মিটিল্। শিশু-মনী এই য়্যাডেলিসেন্সে হোতে পরে ক্রস্।" শোনো তোমরা দু'জনই—আমি আছি। আমি দেখবো। এখন যে যার বাড়ী যাও। আমার আর্জি থাকছেয়—কেউ এমন কিছু ভুল কোরে বোসো না—যা দুঃখকে আরো বাড়াতে পারে। যাই হোক, বলি তোমাদের মহাকবি শেলীর কথায়—আওয়ার সুইটেন্ট সঙ্স আর দোজ, দ্যাট্ টেল্ অফ স্যাডেস্ট্ থট্স্। এটাও মনে রেখো।

'যা চাই তা ভুল করে চাই।
যা পাই তা চাই না।'

বলে উঠলেন, 'চল। ফেরা যাক্। আমি আমার ডর্মেটিরীতে ফিরছি। এখন ছুটির মধ্যে গিয়ে পুজার্চনায় আর ধ্যানে বোসবো। চল, আমার প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত। শান্ত মনে, নেভার বী রেস্টলেস্।"

দু'জনার মাথায় ও কপালে হাত ছোঁয়ালেন—ইম্প্যাথ্টী ঐ রাজ—আশীষার। সন্ধ্যাকে একটু আলতোয়। অতো অশান্ত অবস্থায় থেকেও—বোধমতী সন্ধ্যা হেসে ফেলেছিলো—সন্ন্যাসী জীবনের এই অতি সামান্যয়ী—দ্বিধাধন্দ্বে।

আজ মনে পড়ছে। এই তিন কুড়ি দশ-এ—যখন ছুঁই ছুঁই।

ঐ সন্ধ্যার মতো, যে ইতিহাস রচনার পরেও, যেন ঐ ত আশ-পাশ দিয়ে এখনও সাহিত্যয়ী লব্ধিত উপলব্ধিতে—স্নিগ্ধতায়ী ছোঁয়া বারে বারে দিয়ে যায়—আরেক সন্ধ্যার আবেশ ঝরীল দুনিয়াভোর্ এই এই স্বর্ণালী—সুপ্রভাতায়।

গহনানন্দজী—তুমি এই হোম-মিনিস্টার এই সন্ধ্যাকেও খুবই স্নেহাদর দিয়েছো, এই আজও তা রেখেছো। ইয়্যু হাভ্ এ গ্রেট ইমপ্যাট্ আপন হার।

আজ এ মুহূর্তায়—প্রীফেসীটা যবনিকায়ী হয়ী-হয়ী ঢালে-ভালেলে–এলে পরে এলে যে হিলোলিতা—সন্ধ্যা রুচিস্মিতা।

পুরো দু বছরার মাথায়—খুঁজি ফিরির অধ্যায়ীত আরধ্যতায়—সন্ধ্যা নামেতেই পাই—বধূ সন্ধ্যার—রত্নয়ীতী এক মাধুরীল স্বত্বার যত্নয়ীতীটা।

গল্পটা আঁকি—আপন প্রিয়াল্ ঘরনীর কথায়—হাউ আই গট হার। বলি বোললী দোলেদালে—

কথায় কথায়—পরিচিত এক যুবতী কন্যে, নাম আরতি—সে জানায় আমার দিদির নাম—সন্ধ্যা।

রূপকথার দেশের অচিনপুরের রাজকন্যার যেন—সন্ধান পেয়ে যাই।

প্রশ্ন ছিলো—তিনটি।

দেখতে কেমন—"ভালো। খুবই ভালো।" মুখে-চোখে যেন আরতির ঝলকেছিলো মেয়েলী কৌতুহল। সামলে নিয়েই জবান—"আমার ওপরের দিদি ত। তব ভালো বলবোই। সেটা যে দেখবে, সে বুঝবে আমার কথাটা কতটা সত্যি ছিলো।"—বিস্ময়ীলী হাসি।

দুই—"কত বসন্তর"।

উত্তর—"ব্যাপার কী! বয়স দিয়ে খোঁজ—এ ত অন্য ব্যাখ্যা রাখছে! চব্বিশ, বুঝলে।"

তিন, ও শেষ প্রশ্ন—"সাহিত্য ভালোবাসে?"

আরতির চোখ দুটো আরো বিস্ময়ীতে কোরলো—ক্লজ্ ভরা ডান্স!

উত্তর—"বাসে। খুবই। পড়তে। পড়ে তারিফায় নাচে। তবে, তবে আপনার মতো লেখালেখিতে মন নেই।" এবার হাসি ঝকমকালো। "সহজ কোরে করা এ সব প্রশ্নের মানে আমরা বুঝি। আমরা মেয়ে ত'! সামনের রোববার—দিন কয়েকের জন্য দিদি আসবে। আসুন না, এসে দেখুন যা বললাম তা ঠিক কিনা।" হেসে আরতি পালিয়েছিলো। সত্যি আমি যেন বড়ো কিছুতে ধরা পড়ে গেছি।

তবে পরে কোনো এক দিন পথ ঘুরিতায়—গিয়ে হাজির ওঠায়। আরতি দেখেই হাসিলী দুষ্টুটায় রাঙীয়ে বললো "আপনার খোঁজ নেওয়ার সন্ধ্যা এখানে উপস্থিত। বসুন চা খান। ডাকছি। ও একটা বাচ্চার পড়াশোনা দেখছে।"

দরোজা খোলা। পর্দা সরানো। দেখলাম—পড়তে আসা ছোটো পড়ুয়াকে বিদায় দিচ্ছে নীচু হোয়ে—গালে ভালে আদর কোরে। হবেই আর হবেই বা না কেন। নাম যে—সন্ধ্যা। সবেতেই ভরাট ত দরাট—অনুরাগবতীকা।

চোখাচোখি হয়। হাসি ক্ষণিকের তরে—কল্পলতিকার মতো। হাসে—"আসছি।"

আমি তখন—অবস্থান পাল্টে, পেছন দিয়ে বোসেছি।

একটু পরে পেছনে অনুভূতিলী অনুভব পেলাম কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে চায়ের পেয়ালা বহনকারী সে মুহূর্তে আমারই স্বপ্নের রাজকন্যা—ইনস্টেড্ অফ বোন আরতি।

চেয়ার ঘুরিয়ে—হাসি দিয়ে সম্মাননা জানাতে জানাতে—পেয়ালা হাতে নিয়ে ইশারায় জানালাম, সামনার কেদারায় বোসতে। কাঁপা কাঁপা পায়ে বিলম্বিত ছাঁদে সামনায় বোসতে গিয়ে—প্রণাম জানালো। নীচু হোয়ে—আমি ওর জ্যেষ্ঠাগ্রজের—বন্ধু, মিতা। চায়ের কাপ ছলকায়। একটু টাল খায় এক হাতে, অন্য হাতটি ওর কাঁধে কেয়ারেস রাখে—এটিকেটী। এতে সন্ধ্যা, আনন্যাচারালীতে যাহা হাজারের মধ্যে সঠিক, যাজারোয়,—কোয়ায়েট্ ন্যাচারাল—সেই যুবতীত্বে রেঙে—ও ওর বুকের ওপরকার ঠিক আঁচলকে—আরো মাত্রায়ীতী ঠিকটা দিতে গিয়ে—কোরে তোলে—ঠিকঠাকী রূপকে—বেঠিকী।' লাজ তোড়ী নিলাজ গোড়ী—মেন্টী কন্টূরাকে। পলক দেখেই, খুশী লবী মনটায় সায় রেখে—নতুনা সন্ধ্যার ভাস-ভাস হাসিলী ঐ দু-চোখের কালোর বুদ্ধিদীপ্তল্ ঘুড়িমায়—আমার চোখের প্লেসমেন্ট্ রেখেছিলাম—সেই বিকেল চলি যাওয়ী—লগ্ন গোধূলিয়ায়। হাইমী টাইম অফ্—কাউডাস্ট-এ।

তাকিয়ে আছি। সন্ধ্যা লাজনম্রতায়—টলতায় ঢালুয়েয়ে তাকায়ে দু'চোখেলার—রুচিরী শুভ্রাতাল।

আমি কবিতায়ী মনে ধাবিতয়ী তখন বৈষ্ণবেরই কবি-ভাণ্ডারায়, মন গুণগুণায় নতুনী সন্ধ্যাতে—এ নতুনা রাধাভাবে—"ফুলের গেরুয়া ধরেয়ে লুফিয়া" নাই কোরলেও—তুমি যে আঁচলটার তরে—না সঠিকীয়ী তায় রাখোয়ে দেখালে—

"সঘনে দেখায় পাশ.....
উঁচু কুচযুগে বসন ঘুচে
মুচকি মুচকি হাস......"

বলি, তুমি কী সেই সাঁঝে এ হেন চার-চোখের মিলন-বাসরায়—চেয়েছিলে কী রাত-নিঝুমায় একলা থাকয়ে—

"কানড়া ছান্দে কবরী বান্ধে
নব-মল্লিকার মালে......।"

না-না, তুমি যে রাধা-রঞ্জনী, তুমি উমা নতুনী—এই নতুনার সন্ধ্যায়—তাই তাই তা তা থৈ থৈ, তুমি ভাসে হোলে প্রতিমায়ী প্রতিভাস যতিহাসে, ছন্দয়ীত ব্রেভারীতে—

"আবর্জিতা কিঞ্চিদির স্তনাভ্যাঙ্
বাসো বসনা তরুণার্করাগম্
পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।"

তারপর, হাসি হাসি মুখে রাজ-রাঙা মুখশ্রীটা আড়াল করায়ে বললে—"আমি তা হোলে আসি।" আবার দুষ্টুমী হাসির ম্লানতা। কেউ যেন কাউকে না করিবারে চাহি—সম্বোধনী আপনিটা। ঠিক-ঠিক তাই। অনেক মাস পরে, বেশ দেরীতে যখন বাজলোয় বেল্-টা—ঐ লক্-ই ওয়েডায়—তার মধ্যয় কোনোদিনই—আপনি আসেনি।

রাত প্রথমার পরিণীত্ প্রমিতিটা—না ঘুমিয়ে শুধুই জেগে জাগরিতেয়ে—হাজারো গল্প শোনাই—আর শুনেছিও। অবশ্যই আমারই দুইটি হাত প্রসারণায় তৈরি—টাইট্-লক্ড্ য়্যামব্রেসায়—সন্ধ্যা ছিলো হাসিলায় রভসিলায়—সমর্পিতা। আমি পুরো পোশাকে। সন্ধ্যাও তাই। তবে পরে দ্য ট্রথু লাইস্—আপার শরীরী সাজ ছিলোয়া—নব-মিতার মধ্যে মিততায়—খোলামেলা, বহিতায় মাই অভিলাষী আবেশায়। বেনারসীর আঁচল বুক উচ্ছোলায় ঝাঁপ-খোলেলে সারাটা সময় কাঁপ-দোলেলে ছিলো—বিছানা-ছোড়্। রভসার ছাপ দোলী ব্লজম্-ভার দেখাতে খোলালীল্ ব্লাউজ—টু সাইডীতে রেস্টিভী। ফ্রন্ট-এ মেলায় ধপসীত শুভ্রা কাঁচল—আন্-হুক্ড্। মোল্ডী মাধুরা রোল্ডী সাধুরায়—মৌজীতয়ী সন্ধ্যা—বোল্ডী আদরায়।

খুশীলায় শায়ীত্ ঐ প্রথম রাতটা, ঐ দশই মার্চের বিবাহিতী মার্চ পাস্টে—হাজার এক সুযোগীতী সুবিধার নির্জনত্ব পেয়েও—আই, দ্য হী-স্পাউজ্—চাইনি হোতে পরে—দ্য টীপীক্যাল ব্যাণ্ডী হাজব্যাণ্ড্—হু থিঙ্কস্ অন্ দ্যাট না নইটী ন্যুপচীয়ালে—টু রব্ হার্ টোটালিতে দ্য অল্ ম্যাজেস্টিসিটিস্ অফ,—আন্‌নোঙতা। আনসীন্ ভার্জিনিটি, চেস্টেটি, মডেস্টি—আফটার অল্ উীড্ এ ব্যাড্ য়্যাণ্ড আনকাইণ্ড্ কপিউলেশন—উইদাউট্ পায়ীতে তক্ ধায়ীতে—স্ত্রী-সুমনার কনসেংটটা।—আবারো, আমি খুশী বিভোরায়—অনুমতি-প্রদত্তা। যদিও নই জানবায়া—কণামাত্র প্রমত্তা, এই এই আইনী অন্যায়ে—এই পাশাবার-মত্তয়ে। মাঝে, মাঝে—কথা যেতো সে প্রমূর্তয়ী নাহি প্রমত্তয়ী প্রহরা থেকে—ভয়েস্-লেশে। তখন তাৎক্ষণিকায় আমার সাথ সন্ধ্যার নেতয়ী-দেতয়ী আদরটা থাকতো—লিপ্-লক্ড্। আমার অধারাধরী বন্দীদশা মুক্তি পেলেই—ঝাঁপয় আসতোয়া—রাত জাগানিয়ান্ ঐ সব সব গল্প।

হ্যাঁ, রোজ-বেড্ ঐ একদিন বাদয়ে—তৃতীয়ের হয়ী ফুলেল্ বিছানাটা—যৌথয়ীতে গ্রহণ শোয়াটা—দ্য শেম্ লাইকলি দ্যাট ন্যুপচীয়াল্ সীলেসচীয়ালা—কথায় কথায়, ওপর ওপরার সপি-জঁপি আদরায়। দিস মাচ্। নট মোর দ্য ম্যারীয়ার। একটি কথা জানতে চেয়েছিলাম "ভয় নেই ত, তোমার মনের দেওড়ীতে।"

"নো"। থামলো—"একদমই নয়।" বুকে মুখ প্লেস্ কোরে ফ্রেশী রায়ারায় সন্ধ্যা বলেছিলো—"তুমি বোঝদার।" আর কিছু নয়।

"তাই।" আদরে ঝড় হোয়ে—"শোনো, কিছু চাওয়ার থাকলে—চাইবো আমি—সে চাওয়াটা যেন আসে তোমার তরফায় মিশতে মিশতে। তোমারই তরফা থেকে অর্থ চাইবো—ইয়্যু, মাই সুইটী ব্রাইড্, ইয়্যু মাস্ট্ আসক্ মী ফর দ্যাট্—টু হ্যাভ্—পার্সোনালি দ্যাট অন্‌লি ফ্রম ইয়্যু। নট্ ফ্রম্ আই।"

"ঠিক আছে। তাই হবে। আমিও চাইবো। আমার রাজপুত্রকে আহ্বান জানাবো—তারই রাজকন্যার সব কিছু খোলামেলে দেখুক। দেখে চয়ন করুক।"

গহনান্দজী, ওয়ান্ নোবলেস্ট পার্সোনলিটা—এই আজকের নানান সমস্যায় জর্জরীত মানস-অসুস্থতার—এই ভারতে। তুমি—এই বিয়েতে বাবা তোমায় নেমন্ত্রণ কোরতে গেলে—বললে,—"অশোকের বিয়ে। এতে আমি খুবই খুশী। আর আনন্দিতও। তবে আমাদের একটা কোড্ আছে। বিয়ের অনুষ্ঠান ছাড়া, আর সব সামাজিক অনুষ্ঠানে গিয়ে থাকি। মিঃ রায় কিছু মনে কোরবেন না। আই হাভ য়্যাকসেপটেড্ দ্য ইনভিটেশন—হোল্ হার্টেড্‌লি।"—বলেই, ছোটো আকারের একটা প্যাডের পাতায় ধীরে ধীরে লিখে দিয়েছিলে গহনানন্দজী—

"কল্যাণবরেষু অশোক, আমি সন্ন্যাসী। সেই অন্য ধারার জীবনে থেকেও—তোমার অনেক রকম আবদারের সাথে—আন্তরিকভাবে জড়িয়েছি—প্রয়োজনে, এমন কী অপ্রয়োজনেও। তুমি লেখার মধ্যে দিয়ে অল্‌রেডী আমাদের এই সংগঠনের অনেক অগ্রজ ও অনুজপ্রতিম সন্ন্যাসীর—কাছের আন্তরিকতায় পৌঁছে গেছো। তোমাকে আমি তোমার লেখালেখির অরিজিনালিটির জন্য—খুবই য়্যাড্‌মায়ার করি। সে কথা গনেজবাবু ও প্রমথবাবুকে—বলে থাকি। অনেকের যা নেই, সেটা তোমার করায়ত্ত। দেখেছি—তুমি সামনে বোসে আছো, কোনো নামী-দামী খানদান ভিজিটর ঢুকেই,—তোমাকে দেখেই—আগে তোমাকেই উইশ্ জানাতো। আর যে তোমাকে চিনতো না, আমার পরিচয় করনো মাত্র—দেখেছি পলক মধ্যে তুমি তার ঠিকুজি-কুলুজি জানাতে জানাতে—হোয়ে যেতে কত দিনকার যেন—পরিচিত। এ জিনিস আজ পর্য্যন্ত আর কারুর মধ্যে দেখিনি। এটা আরেক ধরনের—ক্ষমতা। যা—তোমার করায়ত্ত। শোনো, তুমি তোমার "ভালোবাসার শিল্পকথা'র জন্য মনে আছে—আমার সাথে আলোচনা কোরতে। 'Love' নামে, তাতে স্বামীজীর কী কী দর্শন আছে। তড়িঘড়ি একদিন, তুমি নিবেদিতার 'Some Notes on wanderings at Himalayas with Swamiji'—নিয়ে এসে আমায় টিক্ মারা অংশটা দেখিয়েছিলে। যেখানে স্বামীজী নিবেদিতার প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছেন, 'Although the world has accepted the most idealising love can only be possible between a man and a woman. And this love has tremendous impat upon them.'' এই স্বামীজীর কথানুযায়ী, আজ তোমার বাবার হাতে তুলে দিচ্ছি আমার এই চিঠিটায়

'ঐ কথারই অমূল্যতা যাতে—তুমি ও তোমার নববধূ—জীবনে স্বাক্ষরিত করাতে পারো। এটাই আমার আশীর্বাদ তোমাদের বিবাহোপলক্ষে। অয়মারম্ভ শুভায়ু ভবতু।

তোমার চিরকালের

কলিকাতা নরেশদা

১/৩/১৯৭২ (স্বামী গহনানন্দ)

চিঠিটা খামে বন্দী করার আগে তুমি নরেশদা বাবাকে বলেছিলে—"মিঃ রায়, এটা একপেশে হোয়ে গেলো। আপনার নববধূকেও কিছু জানানোর আছে। দু'মিনিট আর একটু অপেক্ষা করুন।"—বলেই প্যাডের আর একটি পাতায়, খস্ খস্ কলমার পথ তুলে তুমি কয়েকটি লাইনে—পত্রালাপ রাখলে আমারই নববধূর জন্যে। লিখেছিলে—

"সুবিনীতাসু, তোমাকে আমি চিনি না। দেখিও নি। তবে তুমি ত অচিরে শ্রীমান অশোকের সাথে বিবাহিত হোচ্ছো। তাই বুঝে লিখছি—অশোক এমন একটি ছেলে—যার পছন্দ-অপছন্দটা—সত্যি যা তা নয়। খুবই কশাস। খুবই জুডিশাস। অন্ততঃ লেখালেখির ব্যাপারে। তুমি যখন ওর পছন্দসই—তখন জানবে—এই নরেশদা নামী সন্ন্যাসীরও কাছে—তাই হবে তুমি। তোমার ভাবী বর একদিন আমাকে কালিদাসের "রঘুবংশ" পড়তে দিয়ে জানিয়েছিলো—য়্যাডেজ্‌রূপী একটি কথা,—যা মেয়েরাই বলতে পারে, যে—"কন্যা বরয়েতে রূপম্"। আমি বলবো, অশোকের রূপ কিন্তু চেহারায় জৌলুস দিতে পারেনি। তবে, হ্যাঁ, তবে অশোকের সৃষ্টিশীল মনেতে—রূপ আর রূপ রেখেছে—রাশি রাশি। তুমি, হ্যাঁ তুমি—রূপ নয়—ওকে বিবাহের মধ্যে বরণ কোরছো বলে, জানবে এটাই, মানে ঐ—"গুণম্"।

আশীর্বাদান্তে।

কলিকাতা আজ থেকে তোমার দাদা

১/৩/১৯৭২ (স্বামী গহনানন্দ)

গহনানন্দজীতে যে ইমপ্যাক্ট চয়ী হয়—আজও তা আছে তেমনটাই। দেখা খুব না একটা হোলেও। দুর্ভাসেও নয় সম্ভব কথা বলাটা—সহিত প্রেসিডেন্ট। আছে ডিপ্লোমেটীক প্যারাফার্নেলিয়া। উনি যখন জেনারেল সেক্রেটারী—তখন থেকেই যাওয়া-আসা কমতির দিকে। প্রথম যেদিন—যাই একা, উনি বেরিয়ে এসে আমায় তার দপ্তরে টানছেন, এই কথা বলে, "বুঝতেই ত পারো স্যার অশোক। কাজ এখন অন্যরকমার। চারোধারের প্রেসার সামাল দিতে হচ্ছে। ফোন কোরে এসো।"

আর যায় কোথায়। যারা এই আমাকে চেনে তা—জানে, ফোন করে য়্যাপ-য়েন্টমেন্ট—নেওয়ায় বিরোধী আমি। গাড়ী আছে। যাবো যখন ইচ্ছে তখন। আমি ত রামকৃষ্ণের—বিশেষিত ঐ ঐ সেই মানসিকতার উমেদার হোয়ে—কিচ্ছু

স্বার্থসিদ্ধির জন্য—নয় যাওয়া। আই, গো হিয়ার য়্যাণ্ড্ দেয়ার—উইথ এ ডিস্-ইন্টারেস্টেড্ য়্যান্‌ডেভার। জানি তুমি আজ গ্রেট্, বিরাট সঙ্ঘীয় কাজে বলি প্রদত্ত, আছে সময়ার অভাব। ভালো কথা, দেখা হোলে ভালো। আর না হোলেও ভালো—কেন না, এজন্য যে—সারা দেশে তোমার মতো যতো গ্রেট্ ব্যক্তিত্ব আছে—অবশ্যই এখন ঐ গ্রেটেদের তালিকায় দশ জনাও নাই অবশিষ্ট—তাই তবুয়ে তোমায় পেলাম না ত—সো হোয়াট্—রাস্তা ত খোলা—রথও আছে, রথীও আছে সাথে—যাবো তারপরই অন্য এলস্—হোয়ারে—টু গেট দ্য এনাদার—লাইক ইয়্যু। তুমি গহনানন্দজী তখন আমায় নিয়ে জি.এস্.-এর চেম্বারে ঢুকছো—তখন সিড়িতে দেতো হাসির বাঙালী বাবুকে দেখেই হাসতে হাসতে বলেছিলে, কাঁধে আদরী হাত রেখে—"অশোক। কিচ্ছু মনে করো না। ব্যস্ত হচ্ছি। অন্য কাজে। পরে এসো।" বলেই আহ্বান জানালেন—মিত্তির সাহেব নামী রাজার-দুলাল—কোনো রেডীওলজিস্টকে। সস্ত্রীক। হাতে খোলা এক শত টাকার কয়টা বাণ্ডিল। শ্যামবাজারী জমিদার, কিন্তু ব্যবহার নাই ছিলো—ব্লু ব্লাডীয়। উনি ভবানীপুরের চেম্বারে, যা কোনো মানুষ বাঁচানোর কারিগর কোনো দিন করেননি—তাই শ্যামবাজারীয় বনেদী-বাবু-ডাক্তার—তাই করেছিলেন। মানে—উনার চেম্বারে দু ধরনের ওয়েটিঙ্ রুম্ ছিলো। একটা সামান্যদের জন্য। হাতল নেই চেয়ার, ছারপোকা ভরা লম্বা বেঞ্চ। অন্য ঘরটি শোফায় সেটিতে বাতানুকুলে সাজানো অপেক্ষার ঘর। জন্যে,—ক্যাল্‌কাটা, টলি, বেঙ্গল, স্যাটরডে, আর ক্যালকাটা রোটারীর—তাবর তাবর মান্য-গণ্যদের জন্য। এমত ডাক্তার সাহেবকে দেখেই, নরেশদার হাঁক-ডাক—"এই, কই গেলি রে তোরা। এদিকে আয়।" সঙ্গে সঙ্গে হাজির দুই অর্ডারলি, ঐ আশ্রমেরই। হাতে বড়ো রেকাবিতে বড়ো বড়ো রাজভোগ সাজিয়ে—ঐ সস্ত্রীক বাবু আর বিবির জন্য—ওদেরই পিছু পিছু সেই বাড়ীর দোতলায়—এখন যেটি মিউজিয়াম্। ঐ যে বড়ো বড়ো রাজভোগ, হয় ত খরিদায়ী নয়, পাওয়ী উপঢৌকন, থেকে কৈ মিঠাই-ঘর। এখনত জনা কয়েক ঘোষের পো আছে—যারা ঠাকুর ভোজন কোরবেন মানসেই—আজও দিয়ে থাকে।

যাক, ও কথা। গহনানন্দজী, যুগের হাওয়ার সাথে, ঐ সন্ন্যাস আশ্রমায় থাকলেও, অধ্যক্ষায় থাকতায়—পুরনো অনেক কিছুই—চেঞ্জেথ্ টু নিয়্যু অর্ডার। তবু বলবো তুমি ভালোর দুনিয়ায়—আজও মহান ব্যক্তিত্ব। শত ভাগেই। বাবা নেই। তিনি আজ থেকে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে লেখক ছেলের জন্য ফরমান রেখে তৈরি কোরে যান—লেখবার জন্য যাতে হারিয়ে না যায়—সত্যিকারের দেড়শত'জন শ্রেষ্ঠতম বাঙালীর এক তালিকা। হ্যাঁ, তাতে বাবা তোমার মানে—সন্ন্যাসীর আধারায় থাকা এক বিরাট কর্মযোগী, এক ত্যাগী কর্মীস্বত্বার—তুমি গহনানন্দজীর নাম

তালিকাবদ্ধ করেন। লিখছি এক এক কোরে। জানি না কবে প্রকাশিত হবে। তবে আমার ও সন্ধ্যার—যৌথয়ে লেখা বই "গহনানন্দজী" শিগগিরই হবে—প্রকাশিত। এটা আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য—উনার কাছে।

ছুটির দিন রবিবার, রবীন্দ্রনাথীয় সেই ছব্বিশী অঘ্রায়ণ যেন এই ছাব্বিশী ফাগুনায়—আমার রোমান্টিকতার ঘরে সাজ-সাজুতায়ে আমিরী ঢলে চলতায় আনলোয়া—ধাব রীয়ালিটীর আর কাব ফাইডেলীটির—বরবর্ণিনী এই সন্ধ্যাকে। বলি, আর জানি—নাউ আই দ্য গ্রুম্ পারমিসেবলী গট্ দ্য গভার্নেন্স ওভার হার ফীজীক্। ভাব যেন—কামে ঝামে নিয়ে কলায়ী কাম, রোল্ই সেক্স—তুমি যা ইচ্ছে তাই দিতে পারো প্রিয়ার মন না বুঝে, ঐ প্রিয়াতেই প্রিয়ার ইচ্ছা কী অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করেই—চাপাতে পারো একতরফাই—তড়ি-ঘড়িতে সারা কপিউলেসন, দ্য ফার্স্ট কাস্টটা ইন ডার্ট, ইন হার্ট। ছিড়ে-খুড়ে। মুড়ায়ী দুমড়ায়ে। নো। নেভার। বিবাহটা কিন্তু বলে—প্রিয়র অধিকারে—ইয়্যু, দ্য গ্রুম্ কানট্ ডু দিস্। ইয়্যু আর নট্ ইন্‌সেন্। ইয়্যু আর সেন্। সো কানট্ বী বিহেভিয়েরালী—এ বীস্ট্। হোয়াট্ ইয়্যু উইল আর্ন ফ্রম্ দ্য আন্‌উইলিঙ্ ব্রাইড্—ইয়্যু গট্ দ্যাট বাই রেপ্ য়্যাণ্ড রেপস্। নট্ জাস্টিফায়েড্‌লি কাস্টেড্ বাই লাভ য়্যাণ্ড য়্যাপ্‌রীসিয়েশন্।

এ ধারণা আমারই। থেকে ঐ বছর ষোলোয়া। এ ভাবনা-রঙ্গী হই—সেই সন্ধ্যার সাথ করা নানা—সন্ধ্যায়ী আলোচনায়। মনে করি—এই য়্যাক্ট্ সমাধায়—লাগে না কো—জানাটা, শোনাটা—শিক্ষানবীশতা।

নো প্রোবেশনারীতা। আপনাই দেয় ঝুপঝাপী প্রণয় ঝাপটা—কাঁপ—কাঁপ আরেক শরীরা' পরি, কী কোরছি কেন কোরছি—তা ভাবার প্রয়োজন শূন্যতায়। মনে হয়—এর জন্যই লর্ড বার্‌য়াট্রেণ্ড রাশেল এবং অনারেল্ জাস্টিস বেন. বি. লিণ্ডসে—দু'জনাই ভেবে-চিন্তে রায় দান কোরেছিলেন—জন্যে, ফর্—প্রী ম্যারীটাল রীলেশনশিপে। বিয়ে যারা কোরবে—তারা জানুক, বুঝুক আর চিনুক—সামনায় দাঁড়ীয়ে অপেক্ষেয়মান তাদের কুন্‌যুগালিটি, হাউ য়্যাণ্ড বাই হোয়াট্ ওয়ে—হাভ্ দ্য পারফেক্ট পারফোরমেনস্—হুইচ্ লীডস টু দ্য রীয়েল কপিউলেটিভ্ ফীজীক্যাল্ ইন্টার-কোর্সেস,—মোস্ট কভেটেড্ ক্যয়শনস্।

যাক পরে কথাটা থাকায় আমারই মন-মানসায়। এটা যে আমারই ইনারী ইন্-ট্যুইশন্ ইন্ মেটিঙ্ য়্যাণ্ড রেটিঙ্ ক্যয়শন্।

গ্রাম-বাঙলা, যে বাঙ্‌লার গ্রামেরা ঘিরে রেখেছে—শহর এই কলকাতাকে। গ্রামই ঐ শহরকে রাখে বাঁচিয়ে। হ্যাঁ মাসীমা—পূণ্যশ্লোকা শ্রীমতী লীলা রায়, দেখা হোলেই—তার আর এক পুত্রবধূ-সদৃশা আমার সন্ধ্যাকে, গালে আর মাথায় আদর করে করে জানাতো—"তুমি সন্ধ্যা যথার্থই এক গৃহবধূ। অনেক স্নেহের বৌমা।

আমাদেরও। আমি বলি সবাইকে, আমার তৃতীয় ছেলে এই অশোকের বৌ বলে—তুমি সন্ধ্যা আমার বৌ-মা, ইন্ থার্ড পরিচিতায়।”

লীলা মাসীমা বলতেন—“রান্না যে এতো ভালো বৌমা তোমার হাতের করা সবেতে, তার কারণ কী জানো, তুমি শহুরে মানসিকতায় বিবাহিত হোলেও—আসলে যে মানুষ হোয়েছো—গ্রাম বাঙলায়। তাই তুমি এতোটা হৃদয়িকী। হার্টফুল। তুমি যে পায়েস কোরে, নিজে এসে দিয়ে যাও—তা আমরা নয়, অনেক বিখ্যাত ভিজিটরকেও খাইয়েছি। খেয়ে জানতে চেয়েছে—আপনি নিশ্চয়ই নন, তবে কে কোরেছে এমন হাইলি টেস্টী-টা।” উত্তরে “জানো সন্ধ্যা, আমি বোললুম—এই বুড়ী মাগীটা কবে আর শিখলো—রান্না বান্না।” বলেই হো হো হাসি। সাথে যোগদান—মনীষী অন্নদাশঙ্করের। “ঠিক, ঠিক তাই। রান্না তুমি আর শিখলে কৈ!” হাসি, যা চট্ করে থামতো না। “ওগো, সন্ধ্যার হাতে তৈরী পৌষালী পিঠে-পুলির কথাই বা বাদ দাও কেন? জানো সন্ধ্যা—গুন্টার গ্রাস্ তখন একবার আমাদের বাড়ী থাকছেন। আবার থাকছেন ঐ বারুইপুরে। নতুন বই লেখার জন্য। উনি এসেছেন। খেতে ভালোবাসতেন। আমি হেসে সেদিন বোললাম, “গ্রাস, টু ডে ইয়্যু উইল হ্যাভ্ এ নাইস আইটেম্ য়্যাট টেবল্। বুঝলে—সন্ধ্যা, তুমি যে রকমে রসে ভেজানো মুগের পুলি দিয়ে গেছিলে, তারই কটি থেকে রেকাবীতে দুটি পীস্ তুলে—তোমাদের মাসীমা গ্রাস্‌কে খেতে বলে জানান—“দিস্, সুইট ইজ মেড্ বাই মাই এনাদার ডটার-ইন্-ল। শী ইজ সন্ধ্যা, ইয়্যু নো অশোক রায়। হিজ্ ওয়াইফ্। ভেরী নাইস্ গার্ল। হেইলস্ ফ্রম এ সুইট রুর‍্যাল প্লেস—উইথ্ গ্রেট্ য়্যাপ্‌টিচ্যুড ফর মেনি এ ম্যাটার।” জানো ত সন্ধ্যা, দেওর মতোটি আমার কথায় সাথে সাথে খেয়ে নেয়—সোয়াদে তখন গুন্টারের জিব জলে জলময়। খেতে খেতেই বলেছিলে, তোমার বানানো পুলি পিঠে সম্পর্কে—“আই ওয়ান্ট, টু সী দিস্ “বৌমা”—ইফ্ পশেবল্। ইট্ ইজ এ ডেলীশাস্ বাই টেস্ট্।”......জানো বৌমা। তোমাদের ফোন খারাপ ছিলো। ডাকাতে পারিনি।”

আজকে—সন্ধ্যা, বধূয়া বুক ভরা মধুয়া—তুমি জেনে রাখো এক নোবেল লোরিয়েট্—ভায়া মাসীমা লীলা রায়—তোমার তৈরি পেলেটেবল্ ঐ গ্রামীন সংস্কৃতিরই পরিচিতার—পিঠে খেয়ে, তারিফ কোরেছিলেন।

কাকু কাম অন্নদাশঙ্কর ত তুমি কিছু তৈরি করে নিয়ে গেলেই, হাঁক দিতে দিতে—অর্ধেন্দু ভ্যালেট্‌কে—“রেকাবীতে কোরে নিয়ে এসো। সন্ধ্যার করা দিয়েই বিকেলী হাই-টী-টা সেরে নেই।” আবার সেই বাজখাই হাসি। মাসীমা তখন, সন্ধ্যার গাল টিপে জানাচ্ছেন—হাগ্। লীলা রায়, বলতো তোমাকে সন্ধ্যা—দেখা হোলেই—“বৌ-মা। তুমি মিষ্টি নাম এই সন্ধ্যার মতোটিই মধুরা। তোমার রান্নার হাত—আবারো তারিফ জানাচ্ছি। যতো দিন বাঁচবো—জানবো এই বৌমা গ্রাম্-বাঙলার রীচ্যুয়ালকে

বাঁচিয়ে রেখেছো। শহরে এই কেক্ আর প্যাস্ট্রির দেশে থেকেও। একটু থেকে, একবার মেসোমশায় কাম কাকুকে বলেছিলেন—"রবিবাবু থাকলে উনাকে প্রণাম কোরে জানাতাম, গুরুদেব, আপনার লেখা ঐ লাইনের "বাঙলার বধূ বুক ভরা মধু" যে—আজকের এই বৌমা,—এই সন্ধ্যাও।"

জানি, আর ভাবি—সন্ধ্যা, তুমি নিজেরই কায়দায়ী ভরা সুকানুনায়—তুমি সবাইকে এক লহমায় খুশী করাবার মতোটি—রাখতে ভরে এক ক্যারিস্মা।

শোনো, এই কনফেশনে—খোলাখুলিতে—জানাই, বিয়ের পর ঐ প্রথম রাতের মাধুরার ঘরে পর-পর পাঁচটি দিন ছেড়ে—সেই ছয়ের দিনে—পনেরোর মার্চই শুক্রবারে, ঐ ফ্রাইডেয়ী নোবলী গুড-ডেতে—যে হয় রাত—যেই শোয়া নিভৃতির নিরালাই কোনে, পিয়োরী প্রাইভাসার তোড়্-তোড়্ প্রায় হোয়ী জোন্-এ-সেদিন প্রথম লিপ্-লক্ড্ থেকে হোয়ে মুক্তি-প্রিয়া, তুমি জানিয়েছিলে চোখের কালো কাজলারে রেখে অবারিতে জ্বলজ্বলি—আধো নয়, ঐ বুলির বোলেবালে—

"ওগো, তুমি কিছু নেবে না।" শুধু পাঁচটি আলদাই শব্দয়ীরার জোড় লাগা একটি প্রশ্নায়িতী—প্রার্থনায়। প্রিয়ার তরে হতে চায়ী ছন্দ-নিলজিতা লাইইভ্ সুপাইন্ ফর্—তাই তরে চায় আপনার জন্যে রয় কোয়েস্টে।—এ যে ডন্টলেশ চায়া। এ যে এ ফীয়ারলেশে রাঙেলী মিনতির—বহতায় সাজ-সাজুতার বলিতয়ী বধূ—প্লীজ টেক্ মী টু ইয়োর এক্সপেক্টী কারনাল্ ডেলাইট্স্। মাই লর্ড, আমার আদর দেওয়ার রাজন্—রব্ মী। ডিস্‌রোব্ মী।"—আমি চাই—য়্যাড্ পিয়োরিটী অফ্ পিয়োরিটীস্ ফর দ্য আনসীন্ ট্রেজারস্। আই য়্যাম্ রেডী নাউ ইন দাউ—টু স্ন্যাচ্ টু ক্যাচ্ টু ওপেন দ্য ল্যাচ্ অফ মাই শাইনেস্, মাই পোয়েসী শেম্ অফ্ শেমস্—বাই দ্য প্লেজারাস টাচ্ অফ ইয়োর টু হ্যাণ্ডস্—ইন আন্কভারিঙ্ মাই ন্যুডীটী—ফর গডস্ শেক। সীন য়্যাণ্ড শোয়েবল ইন্ দিস বেড্। ফর ইন্কারনেট দ্য অমনিপোটেন্সী—নাউ লাই বাই লর্ড অফ মাইন, হোয়েন্ য়্যাণ্ড্ হোয়ার ইয়্যু মাস্ট কনকারে হইলেয়ী ফীজীকায়ী আমি স্পাউজায়—দ্য বিবাহিতেয়ী হিতয়ার প্রয়োজনায়—তুমিরই করা প্রযোজিত—ঐ ঐ ডীড্ ইন্ নীড্-টা—অবধারিতে। রবজারিতে করা ঐ রাজকাজটার পরফর্মী ছবিয়ীত্ রৈ কবিয়ীত্ ঝৈলায়ে—থৈ থৈ শুধুই আরামার আদর বর্ষণার থ্রাশী ক্র্যাশ্‌টা—কপিউলেটেড্ দ্য ফার্স্ট ক্যয়শন্। বোথ্ ফর আওয়ার ফুল্‌লি য়্যাণ্ড রুললি—ফুলফিলমেন্ট অফ্ আলটারীয়র যৌবন-প্ল্যান্, যৌনান-ক্ল্যান।

থাক, থাক, কথাটি, তার, দাপটিয়াই চাপাটিতে। বলি পায়ী এই—মাচ্ য়্যাণ্ড মোর য়্যাডো—ফর এভরিথিঙ্।

সে রাতে, ক্রশ ওভারেতে ছয়-ছয়টা দিন আর রাত থেকে পরে—প্রণিপাতীর ঐ পরিণয়টা—যা বোঝাতে সন্ধ্যাকে বলেছিলাম বিয়ের রাত সাক্ষ্যয়ে—

"ম্যারেজেস ডু স্টীল্ মেড্ হন হেভেন।" কথা সবসময় জময়ীতে রাখবায়া—মনের সে তারে—বেঁধে, বাইন্ধা। আর আর বলেছিলাম—

"বধূ, হয় ত তোমাকে এই চেনা পৃথিবীর অনেকেই অনেক রকমার ভয়-ভোরীল কী জয়-গোড়ীল কথা জানিয়ে রেখেছে—টু মেকেথ্ তোমারে ইন্ য়্যাডভার্সায়—হোতে পরে রহলায় আর বহলায়—কিছু একটুস্—সেফ্-সাইডায়ী। তাই কি। না, তা নয়। ভয় ভয় ভয়টা। ফাইটে যাবে ফীয়ারে!

—জানোত বিয়ের পর যা হবেই, হবে বলে আসবেই—সেই তুমি ছাড়া যা একা এই আমিতে সম্ভব নয়, তুমিই যে অরিজানালে সো গ্লিটারাস্, সো ইরোটোক্যালি জোন্ ভরাটীতে ইরোজোনাস্—তাখন, আমার অল্পটাক সাধয়ীতী সাধেলে—হবে মাতোয়ারীল আতোয়ারীল পজেটিভিটি—কোরে পরে রাজমিথুন সাঙ্গটা, রাজ মিথুন রাঙ্গটা। তুমি, বধূ সন্ধ্যা জানবে—নো, আই এম নট্ দ্য কনকারার অফ দাই গিভেথী ঐ ফীজীকাটায় যোগী যৌনান। হ্যাঁ, তুমিই কিন্তু এখানেতে জয়ী, জিতা—সব দিয়ে সব পাইয়ে অকপটে। তুমি তোমার মেয়ীলীত্বতায়—ডীফীটেড্ মী। হারালে। সত্যিই। এজন্য যে—ঐ একটি মিথুনী—রাজদরবারীর ছন্দ মীড় যতি, যদি হয়ে যায়—অচিরায় প্রজাবতী—তবে পরে তুমি যে তখনি আরূঢ়া ঐ দেবীকার আসনোপরি। আর তাই—এই মিথুনার ভেতরায় মেতরায়ে তুমি যে স্বর্গের কাছাকাছি পৌছে দিলে—এই আমাকে। ওয়ান ডেলাইটফুল ক্যয়শন ইন ইটস ফুলেস্ট ফ্যাদম্—লীডস বোথ্ দ্য দাই—টু রীচ্ দ্য কিংডস্ অফ প্যারাডাসো। ইট্ ইজ এ গেম্ অফ ডেইটী—ইন্ দ্য ফর্ম অফ্ হিউম্যান্।

যাক। সন্ধ্যা সেই ছয়ের ছয়লাপী ঐ দিনে রতিসায়রায় নামতে চেয়ে—বহুতায়ী মিনতায় তুমি নিজেই—আসকেথ্ মী, প্লীজ হ্যাভ্ মী—ফর ডেইটীস্ শেক্—অল্। কত সুখ হাসে। কত সুখ ঠাশে। এই ভাবুলীল রাবুলীল ছন্দেরই ঐ বাসরায়—সেই রন্দুরী ভালোয়ার রাতে, অনেক কথা অনেক আলোহাস ভালোবাস নিয়ে দিয়ে—তৈরী,—কেননা সন্ধ্যা রুচিস্মিতা—একটু আগে চোখের আধেক আধো দিঠিয়ী মিঠিয়া ছুঁড়ে আর ছড়িয়ে, কাঁপনময় জাঁক ভরীলী অধরার চুমায়িত রভসাকে সোয়াদায় রেখে—আধো আধো শিশুয়ী বোলে জানালো, বুকে ঢেকে, জড়োনো হাতের লতা-জড়িতকে আমাকে জাপটিয়ে—"মাই স্পাউজ, মাই লর্ড—উইল্ ইয়্যু রেডী টু হ্যাভ্ দ্যাট—ডেফিনিটলি? হোয়াই, হ্যাভ্ টু ওয়েট্ মোর? ইজ ইট ফর এনাদার নাইট, অর টু মেট—টেল্ মী ইন্ হ্যাপীয়ার ভয়েস! আই আম মেকেথ্ মাই মাইণ্ড কনট্রোলিঙ্ দিস ফীজিক, হুইচ্ ইজ্ জাস্ট্ নাও রেস্টেড্ ইন্ ইয়োর ব্রেস্ট। প্লীজ, প্রাইজড্ মী আর্লি টু দিস হার্টিলী—ম্যারীয়ার—রবিঙ অল্ মাই রোব্স্, মেকেথ্ মী য়্যাণ্ড ইয়্যু—ওয়ান ফলোড্ বাই এনাদার, ইয়্যু উইলি লীড্ টু। শো দ্য প্যাথ,

উইথ্ য়্যাকটিভ্ প্যাসিভিটি আই উইল ক্যারী আউট অল। মাইন ন্যুডিটী ইজ এ পোয়েম্। রীটেন বাই য়্যাজ্ ইফ্ শেলী অর কীট্স্,—পেইনটেড্ বাই পল গগাঁ অর ভেন্ গগ্। ইভেন মাই ফীজীক ইজ স্কালপটারড্ বাই গ্রেট্ রঁদ্যা—ফর ইয়োর লুক্ থ্রু। প্লীজ ওয়াইজলি প্রাইজেথ্ মাই নেকেড্নেস্, দ্যান, বাই ইয়োর প্লেজান্ট্ লুকিঙ্ দ্যাট আপরাইট্ অর্গান—ওরিয়েন্টেড্ বাই অর্নামেন্টী অর্ডারস্। আই সাবমার্জেস্। নট্ ট্ লেট্ ইট্ মোর!" বলেই রূপতরঙ্গীয়ার সন্ধ্যা, ঘুমিয়ে পড়লো—ফেক্ ঘুমেলে। আমারই কাঁধে মুখ রেখে। চুমেলায়ে। চুম্ই ঝুমে জম-জমি ঝখালে।

আমি আর সন্ধ্যা—একই স্টেচারীল হাইটের। ফলে তা মাচ্ য়্যাড্ভানটেজে ছিলো। এটাই, যে—হোয়েন উই টেক আওয়ার কনযুগাল শ্লীপটা বিছনায়,—তখন দুজনারই প্রতিটি অঙ্গ—এক অঙ্গে বহু রূপ বিচ্ছুরিয়ে—অবস্থানগত সুবিধায় থাকতোয়া—একে অন্য আরেকে—যেন রাধায়ীতে এক অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর। তাই সে রাতের সেই বাস্তবীয় অবস্থায় কবিতায়ী অনেক আবরণ তোড় আভরণ-ছোড় ছবিতাকে—জমজমাটায় রবিতয়ী রতিলা ভরাতে, কবি হই, কবিতা রচি—একজনার অবস্থানী স্যুপ্যাইনায়—আরেকজনা পজিশানে প্রোন্ হোতে চেয়ে—

"সাজুতী এই সাঁঝ ভোরী
ঝাঁঝ আঁধারায়
দোর দাও,. ঘোর নাও
রভসী ছায়ারায়—
দেন—ভাষায়ী sigh জড়ায়ে
খোলো খোলো, সায়রা
দেন—রাশায়ী shy গড়ায়ে
খোলো খোলো, দাজুজ।"

বলার আছে, সেদিন তুলসী দাসী দোঁহা, বোঝালো সন্ধ্যার আলোয়—আমাকে এক কৃষ্টাল-রূপী ব্যাখ্যা—

.........দোসরা প্রহর রে জাগে ভোগী।
তারপর তারপর—
........চৌথা প্রহরমে জাগে যোগী।

—তবে আমি কিন্তু জীবন দর্শনায়, যা একান্তই আমার—আমি এ দুটোতেই একাকার—একটাই বন্দেলীন ছন্দালা। ভোগী আর যোগী—দুইই আমার মতে—একে আর এক অপরের—পরিপূরক। সাব্স্টিটিউট্। এটা বিরাট দর্শন। ভোগ না কোরলে—কেমনে তুমি ত্যাগ কোরবা। আগে ত নিজে খুশী হও, সুখী হও—তবেই ত অন্যকে পারবে খুশীর পথটা দেখাতে। সুখের জীয়ন কাঠির সন্ধানটা দিতে। তাই না। আমার সন্ধ্যা রুচিস্মিতা তাই—এতে—হয় য়্যাগ্রীডা।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে খৈয়ামী স্টাইলে লেখা ঐ নয়, শুধুই প্রিয়ার লাজবতীতে নিলাজ ভরাতে চেয়ে—কানে কানে—এক্স্‌টেম্পোরায় শুধাই এই কবিতায়ী কথা, বা রুবাই। পরে কোনো একদিন—কাকা কাম মেশো অন্নদাশঙ্করের অবসরী এক বিকেল গড়ানো লগ্ন গোধূলিতে—ঐ রুবাইটা শুনিয়েছিলাম।

অন্নদাশঙ্কর বলেছিলো, সেই হাসিতে দাপুয়ে—"সন্ধ্যা যে দেখছি তোমাকে—কান্ট অবস্কিউরায় ফেলেছে। ডী লা মেয়ারের মতোর—প্রিয়াকে প্রেমার্তিতে বোলছে, ডু দিস্—এমনি কিছু। বেশ, বেশ—বানিয়েছো। আই য়্যাডমায়ার দ্য ফ্র্যাঙ্কনেস্ অফ্ ইয়োর ইগারিঙ্স্।"

লীলা রায় বলেছিলেন—"সাহস আছে। মায়েরই মতন মাসীমাকে এটি শোনানোর। এ পোয়েজী পীস্ অফ শান্তয়ী আন্তরার চাওয়াটা। ভালো লেগেছে।"

"আমারও।" বললেন কাকু অন্নদাশঙ্কর, স্বভাবীত্ মধুরালী টক্-এ—"এ বয়সে আমিও ছিলাম এমনই ইরোটিসিটিতে ইমোশনাল। আমি কিন্তু পারিনি কবিতায় তোমার মাসীমাকে কিছু করাতে নিবেদন।" হাসি আর হাসি। মাসীমা শুধু বললেন—"কি যে বল তুমি, ওগো তুমি তা জানো না। ঢের হয়েছে।" কাকুকে নিরবধিকাল ধরে লীলা মাসীমা "ওগো "হ্যাঁগো" আর "কিগো" বলেই—এমন ইনটেমেটী সম্বোধন রাখতো—আমাদের অনামিকা মতোটি—বাবারা, মায়েরা যেমন রাখতোয়া—এ হেন শ্রুতিমধুর ডাকাডাক।

মাসীমা বললেন—"অশোক, তুমি প্রায়ই আমায় তোমার কিছু অনুবাদ কোরে দিতে বল। আজ আমি এটি অনুবাদ কোরবো বলে কথা দিলাম। অনুবাদ পাবে তুমি। তোমার নিজস্ব তৈরি ভাষায় রাখা পাঞ্চ করা ঐ নতুন নতুন শব্দের জন্য যুৎসই ইংরেজীটা ভেবে পরে তবে এটি নিয়ে—টাইপ্ রাইটারে বোসবো। অচিরেই পাবে। ভালো লেগেছে বলে। যাকে বলেছো, যাকে নিয়ে লিখেছো—বলি আমাদের নতুন বৌমার কমেন্ট কী?"

হেসে বলেছিলাম—"মাসীমা, বলেছিলো সন্ধ্যা দুষ্টুমিতে—শুধু, ধ্যাৎ-তরিকার। কী যে কী বল, লোকে পড়লে ভাববে—আমি তোমাকে এমন কবিতা লিখতে প্রেরণায়িতে রেখেছি। এই, আর কিছু—নয়।"

বলেই—অন্নদাশঙ্কর ও লীলা রায়কে—প্রণনান্তে নিবেদন—"আমি পুরস্কৃত তোমাদের কাছে। ঐ ছোটো লেখাটি নিয়ে। খুশী আমিও।

অনুবাদটি যথা-সময়ে পাই। ফোনে জানান—"হোয়েছে। নিয়ে যেয়ো। সন্ধ্যাকেও সঙ্গে আনবে। ওকে দেখতে চাই, তোমারই সাথে।"

একটা কথা। জবরীলে রবরীল কথা। সেটি—মিথুনে অবগাহন করা—নীড়ফুল রতিখেলায়—সত্যিকারের কারুধৃতি চারুকৃতি করাটা—ভরাটে, দরাটে—ইজ্ এ

মাস্ট ফর এ এভ্‌রি কাপল্ অফ জুডিশাস্ আউট্‌লুক্—সত্যি। ভলেটাইল প্লে—লাইক দ্য ডলস্—ইন বেড্। প্রিয়ারা সাধারণত দেশ-জুড়ে বিশ্ব-জুড়ে প্রিয়তমর আশ্লেষী আলিঙ্গনেতেই হয়—আবরণ-তোড়ী কানাড়া ছন্দ, আর আর আভরণ-ছোড়ী মীডেলে—গৌড়ীয়ী বন্দ। তখন সবাই হোয়ে থাকতয়ে চায় প্যাসীভায় মোটামুটি ঐ ঐ এক একটি বেবী-ডল্। তাই ত—টীনেসী উইলিয়মস্! চুমি, লিয়েপ্রিয়ারা হোয়ে থাকতায়ে ভালোবাসে—যখন প্রিয় লীড্ রাখতে তোমাতে—তুমি যে না দোলে সচলতা সামেথ ফ্রম্ হোয়ারা। তুমি থাকো জয়-জয়ীতায়ে—বেড্ কার্ নেমড্ ডীজায়ারী। যাক—বলি প্রথম রাতে—সন্ধ্যাকে অভয়ি দিয়ে বলেছিলাম—ভয় নেই। আমায় পেয়েছো—স্বামীতে। তাই নাহি চাহি রে করিতায়—গিরিটা ঐ প্রভুত্বয়ী। তুমি, পুতুলী ওগো প্রিয়ালা, পেয়ালা টাপটুপুয়ে ভরায়ে নাও—নাও, থেকে আমায়ার যা আর যা—তোমারই মনের রুচির, সুচির। জানো—মেয়েরা ছেলেদের হৃদয়কে কী দিয়ে জয় করে থাকে—য়্যাকোর্ডে অনোরে দ্য বালজাক্—একটি মেয়ে যুবতীত্ব সাজিয়ে ভালোবাসে তারই যুবককে—উইথ্ দ্য পয়েন্ট্ অফ হার ব্রেস্টস্। সো—লফ্‌টিলী সফট্। সো—হোল্ডিলী কোল্ড্! সো—রোল্ডিলী বোল্ড্। আমরা তা পেলে—খুশী হই। শোনো, না-না, এবার তোমাকে বলতেই হবে ছেলেরা কী দিয়ে ভালোবাসে—সো ইনটিমেসীতে? আমারই জবানে—শুনেছো। শুনে শুনে shy ঘরে রেখেছো। মধুরার আস্বাদনে বুকে রাখা মুখ বারেক তুলে হাসিতে তা হাশিলায় তরে—sigh-এ নেচেছো। বডি ল্যাংগুয়েজকে—ছাঁদীয়েছো। বল্, আমার শেখানোটাই—আমাকে জানাবে, না প্রিয়ার মুখ থেকে তা শোনার মধ্যে আছে—মাধুরার ঝনঝনানি। শোনাও, তা না হোলে তোমার শাস্তি আসবে—অনেক পল ধরিতায় রাখা চুমাচুমিয়ী লিপ্-লকড্—জোয়ে জোয়ে—তোমাতে—আমাতে। নাহি নিস্তারা। বল্, বল।"

"বোলবো, আলো নোবাও।" সত্যি "আধার আলোর অধিক"—তাহারে আনিলাম ডাকয়ে—মুর্হুতায় কুইকীয়ায়, সুইটী অফায়। কপোলেতে কপোল ঘষায়ে—বোললোয়া—সন্ধ্যা রুচিস্মিতে—"ইয়্যু, দ্য ইয়্যুথফুল্ গেইটী—ইয়্যু আর ভেরী সাটল্ টু পারফর্মী পারফোরেশন্ অফ দি ব্রাইড্‌স্ ভার্জিনাল্ মডেস্টিস্—চেস্টিটিটিলি ব্রেকস্ টু টীয়ার্ দ্য থিন্‌লি মেমব্রেন নেমড্ হাইম্যান্—ইয়া, এজ্ ইফ্ ইট্ ইজ নেমড্ মিনিঙফুলি ফর হিজ্ হিম্যানশিপ, হুইচ্ ইন্ ইজ—সামটাইম ইন হার্ড পারফোরেটস্ দ্যাট। হোয়ার আফটার—ওই দ্য ব্রাইডস—গিভ্ দ্য গ্রুমস্ দ্য কনেশেনাশাস্ কনসেন্ট—ইয়া, টু প্রাইজ দেয়ারা উইথ দ্য শার্পী—লার্জী—স্টার্ডী দ্যাট নটি অফ নটীনেস্—ইয়া দ্যাট্‌স আপরাইট্ অর্গান টু প্লে দ্য গেম্—নেমড্ ক্যয়শন্। বল, তাই ত—ঐ হটিলি হোলি অর্গান—করোনেটেড্ শোলিলি রোলীলী বাই দ্য

বাই—আওয়ারস্ ইন পজিটিভ পজিশন্যালীল্। না-না, তোমার বাঙলায় বলা জবান পেলো, বাঙালীয়ী মানসের ঢাক-ঢাক গুর-গুর দর্শনাকে, বাঁচাতে। তাই না, গো।”

আমি বলেছিলাম—এটা একটা টাব্যু। মিছেমিছেয়ীত্ দর্শন। মা কোরতে স্ত্রীকে,—গণ্ডায় গণ্ডায়, নাই পেতে দিয়ে, স্ত্রীয়ী সৌর্য্যরে মাধুর্য্যার সুখঝোয়ী ঐ—শেষ অর্গাজম। তবু হয় সবাই পিতা, জনক—হ্যাঁ, স্ত্রীকে ঠকিয়ে, স্ত্রীকে বোকা বানিয়ে। তবু কভু নাহি যায় পারা এই নিয়ে—দশজনার সামনায়—কিছু, বলা কী কওয়া। দিস মেণ্টালিটি ইজ নাইনটি পার্সেন্ট য়্যামঙ্ দ্য হাজব্যাণ্ডস্—আনটীল নাউ। চোরের মায়ের বড়ো গলা। কোরে সুখ পেলে স্বামীয়ী প্রভুত্বতায়—তারপর বোলছো—ওটা নোংরা কাজ। চাহিবার মতোটি নয়। আমি বলি এমতয়ী তুমি হাজব্যাণ্ড হিসেবেয়—একটি ব্লাডি মানসিকতার—রেপার বই কি। তুমি স্ত্রীকে তার প্রাপ্য সুখ থেকে বঞ্চিত কোরে যা পাচ্ছো অনেক বলে—তা ভাব্যে যে ধাশ্যে—শুধুই আরেক ধারারই—রেপীজম। ম্যটিরীমোনিয়াল রেপ্। ঠিক তাই। ঠিকই দ্যাটস রাইট্।

রতিজীবন শুরু হয় সবুজী জীবনায় বিবাহেরই নট্ বাঁধোয়ে—তাই বলি, এই রতিজীবন যে মিথুনাবাসর সাজায় স্ত্রীর সুবিনীতয়ী দেহে আর দেহে—তা থেকে সত্যিকারের সৌন্দর্য্যটা মনের ঘর ঔদার্য্যয় যে পারে করাতে প্লেসমেন্ট—তারা খুশী। পৃথিবীর আলোকায়।

ইফ্—দ্য কাপল্ নেভার হ্যাভেথ্ দ্য অর্গানিকী অর্গাজম ইন এভরি ক্যয়শন্ অফ ডেইটী—তুমি যে স্বর্গের কাছাকাছি—না গেছো পৌছে। তাই বলি—ইফ্ মাম্-স্ অর মম্-স—অর্থাৎ মায়েরা যদি ঐ কালচারী মিথুনায়—সত্যি নাহি পেয়ে প্রিয়র থেকে—রতিসুখায় রীদমীক্যালী মেটোরীক্যালী হ্যাপী নয়, হয় ইফ্ মাম্স আর নট হ্যাপী, দেন নান ক্যানট বী হ্যাপী। হ্যাপীয়েস্ট—তবে জানবে—সেই পৃথিবীটাই সুখের, নয়–নয় অসুখের।

ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু—
অস্যৈ পৃথিব্যই সর্বানী ভূতানি মধু।

তাই তাই, প্রিয়র প্রিয়ালার অধর পেয়ালায় মুখ ছোঁয়ায়ে, বলবেই—মধু, মধু—সবই। সব কিছুই। বলবে—মধুঋতা খতয়ত মধুমৎ পার্থিবঙ্ রজ।

কবিতায়ী মাধুরার ঢালে—বর ও বধূর মোস্ট ইনটিমেট্লী ইনটিমেসী যখন হয় মেটেড্—উভয়তার যৌথয়ী ইচ্ছার ট্রিগারী ইগারায়—সে কথায় হাউ হয় রেটেড্—বাই টু আলাদায়ী ক্রীটী-গ্রীটী জয়েসেস্ট চয়েসায়—কথাটি সেইরে, খোলামেলে এই একটুয়া আর কী আঁকে-জাঁকে ভরালাম—আপন কথাতেই, করে অস্বীকার—যে কোনো ম্যান-মেড্—টাব্যুকে। ট্যাবু ফর যৌনান। এটা যে থাকবেয়—

ঢাক ঢাক গুড়-গুড়। আমি তা মানি না। কখনোই। এই ট্যাবু রেখেই, আড়ালে চলে যতো রাজ্যয়ী নোংরামিপনা। বধূতে, ভায়া অবুঝে একতরফায়া, মিস-লেডী বরের ভুল-পথী—ঐ ঐ মীস্-ডীডায়। যাক্ পরে যাক্।

একটা কথা। সারা বিশ্ব এগুচ্ছে—নানা ব্যাপারে। আমারাও নই পিছিয়ে। কদম-কদম এগিয়ে। এ বাংলায়, সরকারী কর্তারা শিক্ষায় ডেডীকেটেড্ না হোয়েও—ভরঙ্গই বিবরফট্টাইয়ে—মাধ্যমিক স্তরে, শেষ পর্য্যায়ে জুড়ে দিয়েছে—সিলেবাসী নতুনায়—সেক্স এডুকেশন্। যৌনান প্রবেশিকা। এসব ফ্ল্যাটারী ছাড়া কিছু নয়। একী কেউ শেখাতে পারে। মাথা-মোটা আর মোটা মোটা অঙ্কের মাহিনা পাওয়া শিক্ষাবিদরা ভুল পথে চাইছে—যৌনতায় থীয়োরেটীক্যাল্ পাঠ নিতে—ষোলোর ঘরের ছেলেদের আর মেয়েদের। কেন ? তা হোলে সমাজ ব্যবস্থায় ভুলপথী ঐ নোংরামীর পাশবময় রেপ কী হয়ে যাবে—সত্যি উধাও। শিখলেই—পড়ার ইমপ্রাকটিক্যালিটির মধ্যে—আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপার আলোয়—ভালোটা বুঝবে। খারাপটা নয়। ইট্স্ এ ব্লাডী সিলেবাস্। শিক্ষা নয়, আজকার অশিক্ষার কারিগররা—ইনস্টেড্ অফ্ প্রপার শেখানোটা যখন ভুলে গেছে—রূপোলী টনিকার চাকচিক্যে, যখন বাবুকে বাবু মাস্টাররা—আপন স্কুলই টীচারগিরিটাকে একটা সাব্সিডিয়ারী কিছুমাত্র ভেবে—মনস্কতার সবটাই রাখে টিউশ্যানী প্রাইভেটায়—তখন এই না মানুষ গড়ার কারিগররা কী আর কেমনে শেখাবে একটি ছেলেকে তার শরীরায় থাকা প্রজনন ব্যাপারাটি, ভিজ্ আ ভে, তেমনি একটি মেয়েকে ঐ ঐ মেয়েলী যৌনয়ী-জ্ঞানটায়, ওয়াকিবহালা ! হাউ নয়, এটা কী হয়ে যায়—সাম্ হাউ !

আমার মতে—এটা স্ট্রেঞ্জ য়্যাবসার্ডিটা ছাড়া কিছু নয়। আবোল-তাবোলী আদিখ্যেতা। শীয়ার স্টুপিডীটী। কেননা নন্সেন্সী ধারণা—স্কুলের শেষ ধাপে এটি নিয়ে ছেলেটিকে জ্ঞানবান, আর মেয়েটিকে জ্ঞানবতী কোরলেই—সব সংসার সব বিবাহ—হয়ে যাবে—নোবলেস্ট অফ নোবল্। পিরোয়েস্ট অফ্ পীয়োর। কোনো অন্যায় আর রেপীজম্—তখন সমাজে থাকবে না। সব পবিত্র। সব মধুরিল। এ পরিকল্পনা—ইনটিমেট্লী নয় বাস্তবীক। নট দ্য লীস্ট ডীল্ ইন্ রীয়েল। জোরী-জোরালায়—আমা থেকে বলিতব্য এটাই, যে—এ সুস্থ চিন্তা নয়। নয় শুভয়ী কারীকুলাম—ফর্ টীচ্। ফর্ সামিঙ্ আপ দ্য মাইণ্ড্ য়্যাট দ্য ক্রোজীয়োর টাইম্ অফ য়্যাডেলিসেন্স, হোয়েন গেয়ী ইয়্যুথা—কামেথ্। তাই যৌনজ্ঞানে পারঙ্গমা ও রারঙ্গমা—কখনোই বিবাহ ছাড়া কোনো মেটেড্-এ হবে না—যেন রেটেড্। এটা—বাস্টারডাইজেশন্ অফ্ থট্। হ্যাঁ, আবারো তাই বোলছি। বলি থিয়োরী কেমন টক, না মিষ্টি, না তেতো—তা সোয়াদে আনতে ঐ ষোলোয়ী সুইট্ টীনটা—যে ভুল পথীতে প্র্যাক্টিক্যালিটি দেখাতে—সত্যিই ভুলটা কোরে বোসবে না—অন্য আরেক

আলাদাই টীন-সাথ্। ছেলেটি কোনো মেয়েতে। যা—আন্ টাইমায় আন্ রুলড্। রেপ্ না হোলেও, একটা মীস্-ডীড্। মিস্-ক্রীট্। আউট্ অফ ওয়ান্ মেটিঙ্ সাম হাউ—মে লীড্ টু জার্মিনেশন্ অফ এ নিয়্যু—টু দ্য গার্ল্, ইন্ দ্যাট প্লে-বয় এনগেজা। কে না জানে—মিথুন খেলাটা সময় মতো সময়েতী ছাড়পত্র পেলে ছেলেটি আর মেয়েটি—ত বেশ হেসে-খেশে রেশেতায়—থিয়োরী না জেনেও—সার্থকনাম প্র্যাক্টিক্যালিটী সুন্দরায় করে রে অর্জিতায় অর্জনান—আনটিল অন্ দ্যাট অকেশন্ তক—নাই জেনে নাহিতায় কিছুয়াটা। অটোমেজেশনের যুগে মনে হয়—এটাই প্রথম অটোমেটিক কারুকাজ—দোলায়িতী চিত্ চকোরার—বরে ও বধূতে—সেই পৃথিবীর সৃষ্টি-ক্ষণে—যখন প্রথম মানব তার প্রথমী মানবীতে হোলো—মেটেড্। হোলো উপগতাত্—পেতে পরে সৃষ্টিয়ী আরেক তৃতীয়কে, শিশুকে। ইন্ বেব্। মিঃ আদম যেই মিস্ ইভের সাথে শরীরী তাপ পেলো অন্য শীরীবার মিলজুলে—অমনি কী কোরতে হবে, বা হোতে পারে—তা স্বয়ংকৃয়তায় সমাধায় চিনে নেয়—পৃথময় ঐ হয়ী—দ্য ফার্স্ট ক্যয়শানে। থার্স্ট কপিচিউলেশনে। কেউ শেখায়নি। কেউ শেখার তরে পাঠ নেয়নি—আগাম বলে। তবু—দ্য ফার্স্ট কাপল্ অফ্ দিস্ সুন্দরীলী পৃথিবী—ডান দ্যাট, পীসফুলী। হ্যাপিলী। দো নট্ হ্যাবীটেট্লী হাবিচ্যুয়েটেড্। এই আদম ও ইভ—মিথুন কাজটাই—দ্য ফার্স্ট অটোমেশান্—বায়োলেজিক্যালী বর ও বধূর, ক্যয়শনী কন্শেন্টায় কন্যুগালীতে, হ্যাঁ, যৌথয়ীক যুগলায়—ঐ ঐ ইরোটিসিটিটাও যে—ইলেক্ট্রিসিটিটায় ইন্ সুইচ্ইং অন্ ফর দ্য য়্যাক্ট টু পারফর্ম। রতি যে তড়িৎ। তাই তাই। রতির প্রভাব হয় তড়িতায়িত সার্থক তরে—সম্ভোগী সম্ভবতায়।

কোনো জানা না থাকায়িতা যে—রোমান্টিক ভাবেলে ইরোটিকী ধাবেলে—খুঁজে পায় মিথুনটাকে, ঐ য়্যাডাল্টী রীলেশনে নামার মধ্যে—প্রথম ধাপেই, য়্যাট্ ফার্স্ট ক্রাইটেরীয়ারালী—ছেলেতে-মেয়েতে-যৌবনে—সেই রাত ন্যুপচীয়ালে—নট্ বাই আন্-ভাবডীল্ আনাড়ীপনায়—মুর্হূতায় হোয়ে যায়। পেয়ে যায় অল্ শর্ট অফ্ কারুকাজ সাজাতেয়ে—কুলমালে প্রণয়ী ঢালে য়্যাক্ট ঐ—মাস্ট বী ডান বাই দ্য টু—যৌথয়ায়, মিলমিশী প্যাসীভায়ী বধূয়াতে, হয়ীলায় জয়ী বরই য়্যাকটিভিজমী য়্যাক্টীভায়। দুই শরীরায় ভরা থাকে—রতি—শিশুকাল থেকেই—শরীরীয়ী বিদ্যুতা। বডি ইলেকট্রীসিটী। তাই আমেরিকান মহাকবি ঐ ঋষিপ্রতিম ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যান্ জয় গান গেঁথেছিলো তাঁর "লীভস্ অফ্ গ্রাস্"-এ—"আই য়্যাম্ পোয়েট্ অফ্ দ্য বডি ইলেকট্রীক্।" সত্যি পড়তে পড়তে—সন্ধ্যা শুচিস্মিতা বলেছিলো—"মহতী এক ট্রুথ্। বিরাট সত্য, তোমার হাতের আঙুল্ অল্পটাক আমার হাতে ছোঁয়া পেলে মোমেন্টায়—হই অনুভবী রাঙ্গালায় ওয়াকিবহালা, এটাই, তুমি যে ছেলে, তাই তাই তাইতায়—মেয়ে বলেই। এ যে বিদ্যুতায়ীত তাড়না। কাড়নাও বটে।"

একটু থেমে বলেছিলো আরো একদিন ঐ আঠারোর সন্ধ্যা—কলেজের থার্ড ইয়ারে, কথা প্রসঙ্গায়, প্রীতি আসঙ্গায়—"হুইট্ম্যান্ দার্শনিকতা সাজিয়েছেন। আর তারই বাস্তবায়িতা রচনা কোরে থাকে—নিখিল পৃথে, ছেলেরা—তার তার মেয়েতে। তোমাদের শরীরে—থাকে মেন্ সুইচ্টা। যদিও তা শাদামাঠায় সাজুতিয়ী থাকে শুধু। হয় অন্। যেই মাত্র আমরা মেয়েরা—একটু আদরায় আলগাই আলিঙ্গনীতে—প্রায় কাছটায় ঘেষি, ঠিক তখনি। তবে ভগবান তোমাদের দিয়ে রেখেছে ওটি—এ জন্য—যে—জ্বলার তরে পূর্ণীতায় প্রণয়ীত ঐ যৌনানটা—তার লাইটী ব্রাইটী অন্-টা করাতে—আমরা সব সুইচ্ গুলো বজায় রেখেছি—আমাদেরই শরীরার আড়ালায়। তাই ঠিক।"

আর ব্যাখ্যায় নামেনি। বুঝে নাওয়ার পালা—আমাদের। তাই স্নিগ্ধতা ঢেলে, বুকে থাকা সন্ধ্যাকে বলেছিলাম—"প্রথম্ সুইচ্টা থাকে তোমাদের অধরার দুই কাঁপা-ডোরীল ঠোঁটে। ওটা অন্ হোলে পর—আরো আলোকিত প্রভাসে পাই দ্বিতীয় সুইচ্টা—ঐ তোমাদের বুক ভরা মধুরার—"মিলিয়ন্ প্লেজারড্ ব্রেস্ট"-এ। ওটা হয় যেই অন্—দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে—দাও যে দাও অধিকারের করোনেশন্—টু অন্ দ্য থার্ড ওয়ান। আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে সন্ধ্যার অষ্টাদশীয়ী কল্পনা বাধা দেয়—"কবি। আর না। ঢের ব্যাখ্যা রেখেছো। আর না। এবার মুঠিম ভরা লজ্জা দেওয়াবে। জানি।"

তবু বলেছিলাম, "দ্য লাস্ট য়্যাণ্ড ফোর্ মোস্ট সুইচটা যে-সব সময়ই হীডেনে থাকে সাডেনে স্পার্কী আউট হোতেয়ে, তাই না। সযতনী যতনায় রাখা—এটাই যে দরোজা খোলার, সব ভার্জিনিটিকে দান-ধান করানোর মধ্যে। দ্যাট্ ক্লীটোরীস্ ইজ দ্য—ফাইনাল্ ফাইনারীল্ সুইচ্—টু দ্য মৃদুলাই টাচ্ অফ্ আঙ্গুলাই আদরা—স্কুইজে। আর না, ত এতোগুলো সুইটায় থাকা সোয়েটীতি সুইচ্—ওরিয়েনেটড্ দাই বডি ইলেকট্রীক্যালী। শোনো, ধনী হোক্ দরিদ্র হোক—হোক শিক্ষিত কী নয় শিক্ষিত, বিশ্বময়ী প্রণয় ভাড়ারে তা কাড়াকাড়ে—নাহি লাগে বই প্রি-এক্সপীরীয়েন্স-টা। হয়ে যায়। রয়ে যায়—যথায়ীতে যথার্থয়ী।"

আজ বলি—হোয়াই তবে এই বাড়তি পড়াবার চাপ—নিয়ে সেক্স এডুকেশন। তাবড় তাবড় মাথাওয়ালারা মাঝে কাজ না পেলে—আলসিতে থেকে উদ্ভট কারীকুলামী জাবড় কাটে—এমনি ভ্রান্তরায়। এটা বড়ো কিছু—ননসেন্সয়ীয়াল্ স্টুপিডীটি।

মানব পরিচিতিকার ভাব আর ধাব জন্ম নেয়—বিশ্বের মধ্যায়ায় গণ্যতায়—এটাই দ্য ফার্স্ট য়্যাক্ট অফ্ অটোমেশন্, প্রথমীত্ স্বয়ংক্রিয়রী দাবীলাই কাজ—যাতে ইভ্ বুঝেছিলো—ও আদম থেকে আলাদা, সব কিছুতেই,—তাই এই অটোমেশনী অনুভবী ঋদ্ধতা অনুরঞ্জনী স্নিগ্ধলায়—ডীড্ দ্য ফার্স্ট ডীড্ ইন্ নীড্ ফর ক্রীয়েটীভ্

প্রোক্রীয়েশন দ্য এনাদার ওয়ান—লাইক্ দেম্—মেটেড্ ইন লাইফস্ ফার্স্ট ক্যয়শন। নোয়িঙ্ নাথিঙ্ অফ দ্য অ্যাক্ট—হাউ টু পারফর্ম। ফ্রম দ্যাট আননৌউন—দে কেম্ টু সামেথ্ দ্য গ্রেটেস্ট প্লেজারাস্ গেম—বাই দ্য বাই দ্য বডি ল্যাংগুয়েজ্—হুইচ্ ওয়াজ কনজুমেটেড্—ইন্ হারস্ অনলি। ইন্ শ্রীমতী ইভ্-স্ ফীজীকা। দে ওয়ার্ ইন্ ন্যুডীটী, য়্যাট্ বিফোর। বাট বাই দিস টাইম্, দে ট্রায়েড্ টু হাইড্ দ্য ন্যুড্‌নেস্ সাম হাউ—ইন্ ড্রেপস। ইন্ এনি কাইণ্ড অফ্ ড্রেপারী। অন্ দ্যাট টাইম ইম্‌মেমোরীল্ অফ দ্যাট্ গড্ আসকেথ্ কপিউলেশন—ইট ইজ্ শী, নট্ হী—গ্রাবড্ ইন্ শেম্, ভয়ানকী লজ্জায়—যার দরুণা দেখি ইন পিক্‌চারেস্কী জেশ্চারায়—ইভ্ শ্রীমতী, ট্রাইস্ টু কভার হার ইরোটিকা, নেমড্ দাই ইন্ গ্রীক্—দ্যাট ভেজাইনাল্ টেরীটোরী, আটারলী বাই লজ্জা—শী প্লেসস্ হার টু হাণ্ডস্ ঐ ঐ তথাকায়—টু হাইড্ দেয়ারার সাইনেসী ব্রাইটনেসেরে—ইন্ ক্ল্যাসপী ম্যানারা। বডী ল্যাংগুয়েজীটা, য়্যাব্‌স্যুলিউটায় থাকে অলংকার, অর্ণামেন্টেতে—সেদিনকার ঐ ইভ্ থেকে—এই আজও, এই একবিংশ শতকায়ও—অটুট, আবিসংবাদীতায়। এই শরীরী ভাষা ঝড় ফীমেলীকাই তোড়েলে ডাকে—ঐ স্বয়ংক্রীয় ফার্ভারার তরে—টু সার্ভ দ্য যৌনয়ী যোগাযোগেলে—য়্যাজ্ সার্ভারার। দিস্ ইজ দ্য—গ্রেট স্টোরী, নট্ হাইণ্ড, বাট বিহাইণ্ড দ্য লাভস্ ফার্স্ট ক্যয়শন—ইভেতে, আদমায়—বিশ্বায়নে নতুন আরেকজনাকে—প্রজায়নে তাই, তাই। আমার আর সে সময়ে সন্ধ্যার—প্রিয় গ্রন্থ ছিলো—ডাঃ কীনস্, আর স্যার ডাঃ আলেকজাণ্ডার ম্যাগুন ও ডাঃ মারী স্টোপস্। যথাক্রমে এই দুজনার লেখা দুই ম্যাগনাম্ ওপাস্ রূপী ঐ "লাভ্ য়্যাণ্ড ম্যারেজ" আর "ম্যারেড্ লাভ্", তার একটু পরে ঋদ্ধায়ীত্ হই—মহান চিন্তনায়ক লর্ড বারট্রেণ্ড্ রাশেলের দামী গ্রন্থ ঐ—"ম্যারেজ ও মরালে।" আমরা আপন জ্ঞান আহরোণায়—হই তায়ে রায়ালায়ী—ধীমত, হৃমত্। আর নয়। বলা হোলো—ইনটিমেটী ইনটুইশ্যানে এই ইনারীর ইনটোরীয়োরী ডেকোরে। বিউটিফায় দেহেরে, ফিকেশনার তরে মনেরে।

অন্য কথা। কথায়ীতা ধন্যরায়—র‍্যণ্যতে অন্যয়ে।

শিল্প নিয়ে—অবশ্যই কথা ভরা কায়দায়—অনেক কিছুই চয়ীলাম—য়্যাট এই দীদারোতে, নীয়ারী ডীয়ারী অনেক কিছুয়ায়।

এবারটি না বলে পারছি না—ভারতরত্ন জে. আর. ডি. টাটায়—ব্যক্তিক কিছুলিতীর—ঐ ঋজুলিত কথা।

চার দশকেরও বেশী আগে টাটানগরে, এক নম্বর পজিশনের মধ্যে স্টীলের ফাইনেন্সিয়াল ডাইরেক্টর ছিলেন শ্রীযুত এ.কে. বসু। জবরদস্ত মানুষ। খানদান নিজে, আবার বিয়ে করেছেন খানদান বাড়ীতে। ভারতখ্যাত স্যার নীলরতন সরকারের

নাত জামাই। সেই সুবাদে প্রেসিডেন্সির বিখ্যাতি আই.ই.এস. অধ্যক্ষ—ম্যাথমেটিসিয়ান্ ডাঃ ভূপতিমোহন সেনের কন্যা—অণিমার স্বামী। এই ডাঃ সেন জাদরেল শিক্ষাবিদ ছিলেন। ক্যামব্রীজে উনার সতীর্থ ছিলো—"কনিকশেকশন"-এর লেখক, অধ্যাপক লোনি। এফ.আর.এস্ বন্ধু লোনির বইয়ে থাকা এক মারাত্মক ভুলটা—শুধরে দিয়েছিলেন—এই ডাঃ সেন। পরবর্তী এডিশনে—লোনি তা স্বীকার করেছেন। ইনারই বড়ো ছেলে—ভারতের লাস্ট বাট ওয়ান্ আই.সি.এস.—মনীষীমোহন সেন। যাক্ যাক্, বসু সাহেবের শ্যালক, সেন র‍্যালের কর্তা শ্রীযুত অভিজিৎ সেন উনার গেস্ট কোরে—পাঠান তরে। টু মাচ্ এটিকেট্ নির্ভর বসু মশায়ের সুসজ্জিত বাংলোয় না উঠে—আমি আদিত্যপুরের আর.ই.কলেজের গেস্ট্ হাউসে থাকি গিয়ে। ফোনে কথা বলে, বাড়ীতে নয়—অফিসে গেলাম। দেখা হোলো। নিজেই বেরিয়ে এলেন, 'সরি' বলতে বলতে—"হাভ্ টু ওয়েট্। আওয়ার চেয়ারম্যান ইজ হিয়ার নাউ। মাচ্ বীজী।" ইনারা ইংরেজীতে কথা বলতে বেশী অভ্যস্ত। শুধু বসুন বলে—করিডর ধরলেন। টাটা ভিজিটে এলে—কোনো ঘরে সময় কাটাতেন না—বেশীক্ষণ। ঘুরে ফিরে সরেজমিনে সব দেখতেন, জানতেন, 'কথা বলতেন পর্য্যন্ত প্রয়োজনে এর বা ওর সাথেও। হোক না—অনেক সাবোর্ডিনেট। ছ' ফুটের ওপর লমবা্। সত্যি সবার উপরেই ত এ সংস্থায়। উনি, মানে বোস্ চলে গেলেন। আমি তখন নেতাজী সুভাষের দাদা ইন্‌জিনীয়ার সুধীর বোস, কোনো কী পোস্টে সমাসীন—তার খোঁজ নিচ্ছি। নিতে নিতে—ঢুকে পড়েছি—একটি হলে—দো'তলায়। সবাই মাথা গুঁজে কাজ করছে। দেখি—সুপুরুষ টাটা জনা কয় অফিসারের সঙ্গে হাসি-মুখে কথা বলছে। শ্রীবোসও ঐ দলে। আমি সাহস নিয়ে—সামনে যাই। উনি একটা স্টীলের আলমারীর মাথায়—হাত রেখে কিছু বোঝার চেষ্টা কোরছিলেন। মুহূর্তেই হাত নামিয়ে এনে অন্যদের দিকে তাকিয়ে ধুলো ঝাড়তে লাগলেন—দু হাতের চাপরে। বোঝালেন পোছা ঠিক মতো যে হয় না—তাই।

শ্রী বসু বললেন, "হোয়াই য়্যাট্ হিয়ার। গো টু মাই প্লেস।" আস্তে। টাটা শুনলেন। হয়ত কিছু জিজ্ঞেস কোরে নিলেন। তারপরই হাসি মুখে ডাকলেন, ইশারায়—যেন সামনে আসি। ছোট হাসিতে আহ্বানিত তা। গেলাম ঢিপ কোরে নীচু হোয়ে প্রণাম কোরলাম। বললাম উনার বিস্ময় কাটাতে—"ইট ইজ বেঙ্গলী কাস্টমারী ওয়ান, টু শো রেসপেক্ট টু এলডারলী ম্যান। হোয়েন হি ইজ জে.আর.ডি।"

শুনেই কী খুশী।

"কী করো। খুবই অল্প বয়েস।"

বসু বললেন—"হি ইজ এন অথার। কামিঙ ফ্রম্ মাই ওয়াইফস্ মেটারনাল সাইড্। টু মী।"

"ও, ভেরী গুড্।" বলেই জানতে চাইলেন, আন্তরিকে "ওয়েল ইয়ং রায়, ক্যান ইয়্যু টেল্ মি, হোয়াট্ মোর ইয়্যু নো য়্যাবাউট মি—আপার্ট ফ্রম্ মাই চেয়ারম্যানশিপ্।"

আমি উনার কোতুহলী প্রশ্নের জবাবে, তাৎক্ষণিকায় জানিয়েছিলাম—

"মি. জে.আর.ডি. আই ওয়ান্ট্ টু প্লেস মাই নোয়িঙ য়্যাবাউ ইয়্যু—ইন থ্রী ক্রাইটিরীয়া।"

"ভেরী গুড্। টেল্ দেম।"

উনিও হাসছেন। আর আমিও। আর মি. বোস চেষ্টা কোরছেন হাসিকে চাপানে রাখতেয়ে।

"ইয়্যু আর থ্রী টাইমস্ ম্যারেড্ টু থ্রী ডিফারেন্ট সীকোয়েন্সেস্।"

চোখ বড়ো বড়ো তখন—ভারতরত্নর। তা শুনতে।

"মিঃ জে আর ডী, ইয়োর ফার্স্ট মারেজ উইথ ওয়ান ব্লন্ডী ফ্রম ফ্রান্স–হু ইজ এ নোবল লেডী। ইট্ ইজ ইয়োর ফার্স্ট লাভ।"

তারপর ?

"মিঃ টাটা, ইয়্যু হ্যাভ ফলেন টোটালী ইন ম্যাটরীমোনীয়াল, এগেইন উইথ দ্য স্টীল। ইস্পাত। ইয়্যু আর গ্রেটেস্ট স্টীল–ব্যারন অফ ইণ্ডিয়া।

আর ?

"দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ফ্রম্ ইয়োর ইয়ুথ—বিফোর্ ইয়োর ম্যারেজ, ইয়্যু ফলেন ইন আটমোস্ট লাভ্ উইথ্ দ্য য়্যাভিয়েশন্। ইয়্যু আর আনটীল্ নাউ এন্ এস্ পাইলট্—টু পাইলট্ এনি টাইপ অফ্ য়্যাভীয়েশন। দিস মাচ্ য়্যাণ্ড্ আই নো নাথিঙ্ মোর টু সে—মিঃ জে.আর.ডি.।"

খুশীতে মুখ-চোখ-ডগমকাচ্ছে তখন—পৃথিবীখ্যাত শিল্পপতির। জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—"আই এম্ মুভড্ বাই ইয়োর মেমোরী। আই নেভার মেট্ সাচ এ পার্সন, হু ইজ আউট য়্যাণ্ড আউট্ অফ আদার স্ফীয়ার। ইয়্যু রাইট্ বুকস্ ? ইয়া, মে আই রীকোয়েস্ট ইয়্যু টু রাইট্ সামথিং য়্যাবাউট্ স্যার জামশেদজী, আওয়ার ফাউণ্ডার, ইফ্ ইয়্যু ক্যান্।"

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম—সেই কবে, ঐ যাটের দশকে। কিন্তু তা পারিনি। পেরেছি টাটার আসল জনক—যিনি, মানে যাঁর ওপর স্যার জামশেদজী ভার দিয়েছিলেন, জীয়োলজিস্ট বলে সারা ভারত ঢুড়ে—খোঁজ নেওয়ার, কোথায় আয়রন্ ওর্—মজুত আছে। হ্যাঁ, লিখেছি ছোটো এক বই তার ওপরায়। কেন না, তাঁর মেয়ের ঘরের নাতি—ঐ শিল্পপতি 'চানো' দা, শ্রীভাস্কর মিত্রর অনুরোধে লিখেছি। সীতা চৌধুরী ও শচীন্দ্র চৌধুরীরও অনুরোধ অনুসারীকায়।

ইনি প্রমথনাথ বসু। ভারতের প্রথম বাঙালী ভূতাত্ত্বিক। তায় লেখক। তায় দার্শনিক। তায় ফীলানথ্রপিস্ট। ইনি—পাহাড়-জঙ্গলায় ঘুরে ঘুরে—ক্যাম্প খাটিয়ে রাত কাটিয়ে—পাথুরে জমির ওপর চলতয়ীত্ হাঁটায়, হেভী বুট্ পরা পা ঠুকে ঠুকে—উত্থিত শব্দয় কান পেতে পেতে, সত্যি একদিন জামশেদজীকে উপহার দিলেন—আয়রন্ ওর্ মজুত থাকা—পাহাড় গুরুমহিষীনী ও পাহাড় বাদাম-কে। হ্যাঁ, তাই জে.আর. ডি. বাঙালীর কর্মযোগে, তার জ্ঞানযোগে—আন-প্যারালাল রবীন্দ্রনাথকে স্মরণে রেখে—খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জানানোর, এইটাও যে, যুবক প্রমথ বসুর সাথে যখন—ভারতের দ্বিতীয় আই.সি.এস্. রমেশ দত্ত—তার বড়ো মেয়ে কমলার বিয়ে দিচ্ছিলেন—সেদিন—আমন্ত্রিতদের মধ্যে তরুণ রবীন্দ্রনাথকে ভাবী সূর্য্য জেনে—নিজের হাতে বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছিলেন—স্বয়ং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যিনি—তথায় আমন্ত্রিতয়ী ভি.আই.পি.।

বলি,—জে.আর.ডি.-তে এতোদিনের এপারেও অসাধারণ—ইম্প্যাক্টীতে ছিলো পি.এন্.বাসু, দ্য ফার্স্ট লুমিনারী অফ গ্রেট্‌লী য়্যাপ্‌রীসিয়েটেড্ জিওলিজিস্টও—এই বিশ্বময়ে।

দার্শনিক প্রমথনাথ অনেক বই লিখে গেছেন—যার সবই আজ অপ্রাপনীয়। স্বনামধন্যা কমলা বসু, স্ত্রী হিসেবে স্বামীর কর্মস্থল—এই সারা ভারতে ঘুরেছেন, থেকেছেন ত ব্যস্ততায়। নাই ছুটি, নাই বিশ্রাম। পাহাড়ে, জঙ্গলে। আজ এখানে পড়লো যথায় রাতের তাঁবু, ত দিন কয় পরে ঐ তাঁবু—বসলো আরো দূরে, কোনো গহন কাননায়। এরই মধ্যে, স্ত্রীর স্বত্বায় তিনি কর্মযোগী পতিদেবতাকে—উপহার দেন ভাবীকালে বিখ্যাত হোতে—নয় নয়টি সন্তান, পাঁচ মেয়ে, চার ছেলে। সবাই কৃতবিদ্য। সবাই থাক। এঁদের মধ্যে—পুত্র মধু বোসের কথা না বললেই নয়। বিরাট মাপের কল্পনাশক্তির অধিকারে—তিনি ছবির, বায়োস্কোপের দুনিয়ায় আজও—কিংবদন্তী, সাথ সাথ ব্রহ্মানন্দ কেশব নাতনী, আরেক অসাধারণ কন্যে—স্ত্রী সাধনা বোসকে নিয়ে। "থ্রোয়িঙ্ দ্য ডিসক" থেকে যার যাত্রা—তিনি জীবনে খুব বেশি চলচিচত্র তৈরি কোরে যাননি—অবশ্যই। ম্যাগনাম অপাস—"আলিবাবা" আজও অনন্য, নট্ রীভাইভালায় আজ হয় নেই তেমতিটা—ঐ গল্প নিয়ে করা অনেকানেক—পরবর্তী মেক্-এ। দাদুর মোস্ট্ ট্রাস্টেড্ য়্যাণ্ড রেস্‌পেক্টেড্ ফেলো হিসেবায়—নাতির মতো নাতি জে.আর.ডি.—তৎপরতায় খুঁশী থাকতেন—মধু বসুর কবে আবার নতুন ছবি রীলীজে আসবে। "আলিবাবা"—সস্ত্রীক অনেকবার দেখেছেন। বারবারই নতুন দেখছি বলে—উনি মনে কোরতেন। সে কথা, সেদিন রীটায়ারে যাওয়ার আগে—স্বনামধন্য ব্যারীস্টার শ্রীযুত্ জীনওয়ালা তার মিড্‌লটোনের বাংলো বাড়ীতে বসে গল্পে গল্পে—জানান। এও জানান—"আওয়ার

এল্ডার লাইক ব্রাদারা—লেট্ মিঃ ননী পালকিতওয়ালা, তাঁর আত্মকথায় বন্ধু জে.আর.ডি.র মধু বসু-প্রীতির কথা বলে গেছেন। মধুর শেষের আগের ছবি ছিলো—সাক্ষাতে গুরুদেবকে করা মধু বোসের অভিলাষ—টু সেলুলয়েড্—দ্য অন্লি "চম্পুকাব্য" অফ ইণ্ডিয়ান্ লিটারেচার—ঐ "শেষের কবিতা"। ওটি তিপ্পান্নয় রীলিজ হয়, সর্বপ্রথম প্রদর্শন হিসেবে আজ নেই, সেই অতীত-জয়ী অনেক ইতিহাসের সাক্ষী, দ্য মোস্ট্ প্রেস্টিজীয়াস্ হল্ অফ হলস্—ঐ "লাইট্ হাউজ"—প্রেক্ষাগৃহে। এ হলের বৈশিষ্ট্য ছিলো—লাইন ধরে সব বসার সীটগুলো ছিলো, পেছনটায় হেলানো, অল্পবিস্তরে যাতে আরামে, ব্যাক রেখে, আপনি উঁচু থাকা চোখের দৃষ্টি—আরো আরামার র‍্যালীশায় নিতে পারে—ছবি দেখার দৃষ্টিসুখকে। বলি, সেই হলে। জে.আর.ডি. যান —সাথে বন্ধু পালকিওয়ালা, দুই মেটালারজিস্ট, আপন আত্মীয় স্যার জাহাঙ্গীর গান্ধী ও ডাঃ মিনু ন্যারীমান দাস্তুরকে নিয়ে। এ কথা ক্যালকাটা ক্লাবে, কোনো সেমীনারে স্বয়ং ডাঃ দাস্তুর আমাকে বলেছিলেন। এও বলেছিলেন—"বইটি সবারই ভালো লেগেছিলো। ডাব্ করা না থাকলেও—আমরা সবাই অল্প-বিস্তর বাংলা বুঝতাম। কেন বুঝবো না, এই এখানেই ত আমাদের লাক্ আমাদের উন্নতির অনেক—অনেক উঁচু সোপানে—উঠতে সাহায্য কোরেছে।" এরকম কয়জন ভিন প্রদেশী আজ এ কথা বলার জন্য উদারীত মনের আছেন? আর একটু জানিয়েছিলেন—"ব্যক্তিক বলে—জে.আর.ডি. পরম সুন্দরীর স্বামী ছিলেন, সেই হিসেবায় অন্য সুন্দরীদেরও আকাউন্টেবিলটীতে মান্য করতেন মধু বোসের, ম্যাচলেশ বিউটীর স্ত্রী, সাধনা বসুকে তার ছায়াছবিতে—আসল নায়িকা ঐ কেটীর চরিত্রে দেখে—দুঃখ পান। সেই চেহারার অনবদ্য রূপ কোথায় গেলো! জে.আর.ডি. এ কথা শো দেখে—সস্ত্রীক বোসুরা থাকায়—এ কথা জানান। উত্তর আসে—শুধু অনাবিল হাসির। আর হাসির।"

শিল্পপতি—শ্রেষ্ঠ জে.আর.ডি.-র একটা কথা দিয়ে এই কনফেসনী প্রীফেসা—পাচ্ছে ইতিটা। জে.আর.ডি.-যে কোনো ভালো কাজ ভালো প্রোডিউসায় যা বলেছেন, তা সাহিত্য ও শিল্পকলায়তও—প্রযোজ্য। অমূল্যে তিনি লিখছেন ঃ

"One must forever strive for excellence or even perfections in any task however small and never be satisfied with second best."

দশই ফেব্রুয়ারী ২০০৭, সাতাশে মাঘ ১৪১৪
বাবা শ্রী বিনয়কুমার রায়ের জন্মদিনে

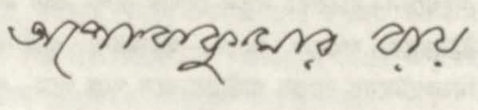

We Warn our Countrymen for the so called Doctors

হই out of the track—এই বলে করাতেয়ে চেনাজানারে, দিয়ে দিতানে a great warn জন্যে পরে ঐ ঐ—মানুষ বাঁচানোর কারিগরদের—মুখোশটা খুলতায়ে, তালে-ধালে। Are they physician in nature, অথবায় physician who butchers. যে মন-প্রাণে a killer for the patient.

বলি, গত ছয়ই সেপ্টেম্বরী, ঐ উনিশাই ভাদ্রের ঐ কালো রাতটা ঐ মাঝারায়—নিলো কোরে কাড়ে-কুড়ে ঐ অতত টুকান মেয়েটিকে, থেকে পরে কন্যা আনন্দিতা সোমার জঠর—যে সবে মাস সাত পুরোয়ে ছিলো আটে, খুবই চনমনায়, য়্যাকোর্ডে আলট্রাসোনোগ্রামই লহরার লহরদল—সে যে সে—হোলো স্ন্যাচড় বাই ভায়া চিকিৎসায়ী ভুলে-ভালে। আয়োজী নয়, ডায়োগী ভুলে। চামার সদৃশী চিকিৎসয়ী—মিস্-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডে। বলি ভায়া—এখনও গঙ্গা বহতীমান—ভাসিয়ে দাও ডিগ্রীকে,—দিয়ে মজুরগিরি করো। ফিজীশীয়ানগিরি যে—ফুল্‌লি আর রুল্‌লি মানবিক, নীয়ার বাই দ্য গড্‌স্ সার্ভিস।

মনে পড়ে—গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া হোচ্ছে—রাজবাড়ীর বারান্দায় আয়িজোয়ী অপারেশনে। স্ট্র্যাচার বাহক—স্বয়ং দলপতি বিধান রায়েরা। পাশে পাশে স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ ললিত ব্যানার্জী, দ্য দেন ডয়েন্ অফ্ ইণ্ডিয়ান্ সার্জারী। হি উইল্ অপারেট আপন টেগোর। সঙ্গে চৌদ্দজন বাঘা বাঘা—দেশের শ্রেষ্ঠতম ডাক্তার। বিদেশী ডাক্তারও উপস্থিত। রথীর পাশে থেকে বৌমা প্রতিমা অভয় দিয়ে যাচ্ছে বাবামশায়কে—"সাবধানের মার নেই।" কবিশ্রেষ্ঠ জানালেন, "তবু যে বৌমা, মারেরও সাবধান নেই।"

বলি, একটু যদি সাবধানে ঐ স্টুপিড্ তার স্টুপিডিটিটা ভুলে চিকিৎসা করতো, তা হোলে—আমি ও সন্ধ্যা—এই দিন ম্যাপী ঐ নভেম্বরায় হতাম—জীবনে প্রথম বলে দাদু ও দিদা! যাক, উই হেট্ মোস্ট্ অফ দ্য ডক্টরস্—উইথ্ কজ্। আর এরা অমানবিক। মোটা টাকা ভিজিটারা ফর্দ বানায় লম্বায়, জানে না কোন ওষুধিতে কাজ কোরবে। অনেক ওষুধ প্রেসক্রাইবায় থাকায়, একটা না একটা লাগে বলে লেগে যাবে। ধিক, এঁদের শিক্ষা। ধিক্ এদের নোংরা মেণ্টালিটি—যা নট্ মেডিক্যালী মোটিভেটেড্। নহি করি আর দুঃখ। নো রীগ্রেটস্। যাবার ছিলো নিয়তিতে, গেলো এই শিশু-বিশ্ব; স্বর্গ বলে যদি কোথাও কিছু থাকে, সেথায়।

মনে পড়ে—সেই কবে রমরমা অবস্থার ডানলপের বড়ো কর্তা শ্রীযুত ফেরার্ ব্রেন্—সাহাগঞ্জে তার গঙ্গার ধারের বাংলোয় বোসে বলেছিলেন—"ইফ্ ডাঃ সাধু কামস্ হিয়ার, দ্য ইল্‌নেস্ গোজ্ সাডেন্‌লী।" হাঁ, বাঁশবেড়োর ডাঃ সাধু যেন ভগবান—বাড়ীর দেউরীতে পা রাখলেই, রুগীর রোগ যেন হোয়ে যেতো—উধাও। ইট্ ইজ মোর সাইকোলজিক্যাল, দ্যান ফিজীক্যাল।

বলি, এসব মহান মনীষীতুল্য—ডাক্তাররা আজ কোথায়।

কোথায়, ডাঃ অমল রায় চৌধুরী, ডাঃ নলিনী সেনগুপ্ত ও ডাঃ যোগেশ গুপ্তরা!

এগেইন, উই ওয়ার্ন মাই কান্ট্রীম্যান ফর দ্য ডকটরস্ মেড্ পীট্‌ফলস্। মাস্ট রেডী ফর হ্যাভ্ এ সেকেণ্ড্ ওপিনিয়ান—ফ্রম্ এনাদার ফীজীসিয়ান্। ইয়েস্, ইয়েস্। **অশোক ও সন্ধ্যা।**

৬/৯/২০০৭ (১৯/৫/১৪১৪)

We Want our Countrymen for the so called Doctors

Go out of the track— [illegible] want [illegible] Are they physician in nature, [illegible] physicians who butchers [illegible] a killer for the patient.

[illegible]

আশ্রম-লক্ষ্মী দেবী-সদৃশা লেডী মৃণালিনী ঠাকুর

"আমি যখন থাকবো না, বলি শিল্পী, এভাবেতে আমিও কী ফোটো হোয়ে ঝুলবো—তোমার এই ঘরের—দেওয়ালায়,—নিয়ে মুখভরা হাসি-হাসি দেয়ালা।"

দেওয়ালে রাখা, মৃণালিনীর ছবিটার নীচে দাঁড়িয়ে, যুবতীক দুষ্টপনায়—এই কথা জানিয়েছিলো—সন্ধ্যা শুচিস্মিতা—আজ থেকে সাড়ে চার দশক আগে।

বঁধু সন্ধ্যা, যেদিন বধূ সন্ধ্যায় হবে ওয়েডেভ্, এই আমাতে—"নিশ্চয়ই সেদিন রাখবো। পাহারায়। পাহারায়। নিত্য যেন তুমি প্রহরিণী হোয়ে থাকতে পারো, আমারই লেখালেখির, চারোপাশে, ধারোরাশে।"

"ঘেচু।" সন্ধ্যা বলেছিলো, "তোমরা ছেলেরা আমাদের নিয়ে সৃষ্টির ভেতরায় যতই বড়ো হও না কেন, নাহি পাই কোনো প্রেক্ষিতায়ী মূল্য, কোনো শ্রেয়সীত্ ভ্যালু। থেকে যাই উপেক্ষিতা। তোমাদেরই সৃষ্টিতে। সে ফীজীক্যালে সন্তান সৃষ্টিই হোক, কী মেন্টালী র‍্যাশানালে—বা সেন্টীলী ইমোশনালেই হোক—সাহিত্য সৃষ্টিটায় নাই,—নাই ইন্ ডিভাকায় বাই ভ্যালিডিটি।"

তাহলে। বলেছিলে আর একটু টেনে—"অশোক রায়। তুমি গল্প লেখো না, তুমি গল্প আঁকো। তুমি প্রবন্ধ লেখো না—তুমি প্রবন্ধ আঁকো। মোশানে, মোটিভিশনে ছবি কোরে। বন্ধু হিসেবে, এখনো আমি তোমার য়্যাড্মায়ারার!" একটু হেসে রভসী টোল কপোলেতে দুলিয়ে, ঐ শুচিস্মিততায় বলেছিলে, "হ্যুৎ, আমি কী তোমার বধূ হোতে পারবো। বাধা আছে। অনেক।" থামলে, আবার বললে। "কবি, তুমি যদি পারো, দেওয়ালে, আমারই মাথার ওপরার ঐ "ভাই ছুটি", ঐ আশ্রমলক্ষ্মীকে নিয়ে—বই লিখবেই কিন্তু।—দেখেছো ত' শতবার্ষিকীতে, কবি সম্রাটকে নিয়ে কতো নানান ধারার বই লেখা হোচ্ছে। কিন্তু, তাঁরই ঘরের প্রিয়তমাকে নিয়ে কেউ কিছু লিখছে না। এই,—এ কী চিরকালের পুরুষী মানসিকতারই একটা পীট্ফল্। না, না, অশোক রায়—তুমি লিখবে। তুমিই পারবে। মনে আছে—এক ক্রীসমাসের সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ীতে নিভৃতির নিরালায়,—শুনিয়েছিলে প্রহর ধরে—কবি-পত্নীর কথা আর গল্প। তুমি ছাড়া, আগে আর কারুর কাছ থেকে কিছু শুনি নি। কথা দাও, লিখবে।" আমি সোফায়,—ও,—পাশের জানালায় বোসে কথা বোলছিলো। নেমে এলো। আমার মুখোমুখি হোয়ে—মুখের পরে একটু ঝুঁকে পরে বোললো, "লিখবে কিন্তু। আমি না থাকলেও। ঠিক কিন্তু।" বলেই ঘনিষ্ঠ হোয়ে—একটু চুমায়ী আদরান্তে, আবার ঐ জানালায়, পা ছড়িয়ে দিয়ে বোসেছিলো।

সেদিন ঘরে ফোটোর ছবিটায় কবি-পত্নীর মুখের আইকনোগ্রাফে—খুঁজে পেয়েছিলো, সন্ধ্যা—ভগিনী নিবেদিতার মুখের আদল। খোলোসায়—নেবেছিলো

সন্ধ্যা, "কবির সঙ্গে—সন্ন্যাসী কোনোদিনই মিলতে চান নি। এটা রহস্যময় অনেক কিছু। দেখলে ত অশোক, শেষে কেমনে উল্টে গেলো সব। বিবেক যেতেই, বিবেক-শূন্য অন্যরা পুলিশী ভয়ের অজুহাতে—কেন না, তখন স্বাধীনতার আগুন জ্বলছে। ইংরেজ টিকটিকিরা ওয়াচ্ রেখেছে বেলুড়ে। রেখেছে ত কী হোয়েছে! শান্তিনিকেতন আর জোড়াসাঁকো কী তা থেকে বাদ ছিলো! ছিলো না। সে সময় নিবেদিতার একাকীত্বটা স্বাধীনতার যোদ্ধাদের সাথে মিলে-মিশে যায়। মিশন্ হারালেন ঠিকই, কিন্তু বিশ্বকবিকে পেয়ে গেলেন—অকৃপণ বন্ধু হিসেবে। গ্রেটেস্ট্ য়্যাড্মায়ারার হিসাবে। কবির মারফৎ বান্ধবী হোলেন স্যার জগদীশের, স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের, স্যার নীলরতনের, আরো আরো অনেকের। বেশী রকমে শ্রীঅরবিন্দের। কবি শিরোপিতা করালেন "লোকমাতা" অভিনন্দনায়। শোনো,—এঁরা এই মহাপুরুষেরা প্রত্যেকেই—আশ্রমলক্ষ্মী মৃণালিনীকে—শ্রদ্ধা কোরতেন—অকপটে।"

থামলো। কথা শেষ কোরলো যেন ক্রীস্মাসের ইভে, এক নতুনা ক্যারল্ শোনায়ে—"পারবে, তুমিই পারবে গো।" এই 'গো' উচ্চারণায়, উঠে এসে কাছটায় ঘনিষ্ঠ তাপী ঝাঁপতালে, আমার দুই গালে দুটি সিক্ত আদর এঁকে দিয়ে, পালিয়েছিলো—সন্ধ্যা শুচিস্মিতা—বাড়ীর অন্দরমহালে—"চা আনছি" বলে—"একটু ভাবো, দক্ষিণেশ্বরে আমার সামনে ফাদার ফাঁলো—তোমার জন্য কী ফরমান রেখেছিলেন। না, না—ডোন্ট্ টাচ্ মী। নেভার ড্র্যাগ্ মী নটি, মাই হানি। চা আনতে দাও। ধ্যাৎ। ছাড়ো আঁচল্। আদর ত তুমি পেয়েই গেছো বন্ধু এখন। নট্ মোর। মেপে চলতে দাও।"

চলে গেলো। চা আনতে। বাড়ীতে মা ও জ্যেঠীমা ছাড়া কেউ নেই। সেদিন সবাই চড়ুইভাতিতে গেছে—কোথাও। সন্ধ্যা ওসব পছন্দে রাখেনি। ও একটু বেশীই নিজের মতো চলতো। চলতে ভালোবাসতো।

মনে আছে। দক্ষিণেশ্বরের 'রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলে'—ভাষণ দিতে ফাঁদার ফাঁলো আসেন—"উপনিষদের আলোতে রবীন্দ্রনাথ।" বিস্ময়কর এ জন্য, যে, উদ্যোক্তারা রামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দকে বাদ দিয়ে—রবীন্দ্রনাথকে—বেছে নেওয়ায়! কি উদাত্তয়ী ব্যাখ্যা, খাশ্ বাঙলায়—ফাঁদার ফাঁলোর। আজও কানে তা বাজছে।

পরে ফেরার পথে, ফাঁদার ফাঁলো—অনেক কথারই পিঠোয়—কবি-পত্নী মৃণালিনীর কথা ওঠে, এজন্য যে—কবির স্ত্রী তাঁর শ্বশুরের কাছে পাঠ নিতেন—বেদের আর উপনিষদের।

"জানি তা।" বলে, ফাঁলো আমাদের দু'জনকেই অনুরোধী আবদারে জানান—"কবির স্ত্রীকে নিয়ে কেউ কিছু লিখছেন না। তোমরা লিখবে। এই সন্ন্যাসীর

রীকোয়েস্ট্‌টা আর্নেস্টলী টু মাচ্ বলে জানবে। কেমন, ট্রীট্‌মেন্টী একটা ট্রাটীজ্ রচনা কোরবে—অন্ পোয়েটস্ ডার্লিঙ্—রাদার্ হিজ স্পাউজ্।"

আমরা ফাঁলোকে প্রণাম কোরে বোলেছিলাম দু'জনাই—"রাখবো। লিখবো।"

"কী, ভাবলে ফাঁলোর কথা।" চা নিয়ে ঘরে ঢুকে কেক্ সাজানো রেকাবীটা আমার হাতে ধরিয়ে—হাসির ছড়ড়য়ায় জানালো সন্ধ্যা—"ঘেচু। আমার দ্বারা কিছু হবে না। পারলে, তুমিই পারবে। কবি অশোক—ভবিষ্যৎ তাকিয়ে আছে। কবে আর কখন তুমি সত্যিই লিখবে—জীবনীটা মৃণালিনীর।"

যারা ভালোবাসাবাসি কোরছে, বিয়ের আগে—তারা দু'জনায় যে প্রেম জানাজানির পাঠ-পরিক্রমায়—এ সব কথায় ভাবরাঙ্গী হোতে পারে—তা অনেকেরই ধারণাতীত্। আমরা তা কোরতাম। আর ভালো লাগাতামও।

আমি—এই এক্সট্রোভার্টের কাছ থেকে পাঠ পাওয়ার প্যানোরামিক জ্ঞান-বিচিত্রার চিত্রশালে—জেনে ও বুঝে—সন্ধ্যা তার মেয়েলীকী ইনট্রোভার্টিলতা ছিঁড়ে বাইরের দুনিয়াধারার—পরিবাহি শারীকা ছিলো—তাই বোলতো, "আচ্ছা, কীটসের ফ্যানী ব্রন, শেলীর হ্যারীয়েট ও মেরী ('ফ্রাঙ্কেনসটাইন'—এর লেখিকা), ব্রাউনিঙ-দম্পতির লিজা, মানে এলিজাবেথ ব্যারেটেরা যদি—আমাদের জানার হয়, চেনার থাকে—তবে পরে, অশোক রায়—প্রিয়াল্, তুমি বল—কেন শ্রীমতী মৃণালিনী ঠাকুরকে চিনবো না। জানবো না। তোমরা সব ছেলেরাই ঘেচুর দলের, মেয়েদের দান কতটা, তা রেকোন্ কোরতে রাজী নও। যে যাই বলুক—কবি-প্রিয়া এই মৃণাল না থাকলে—আমি জোর-সজোরায় জানাবো—বিশ্বকবিকে অনেকটাই পিছিয়ে—থাকতে হোতো। যে যাই বলে বলুক—মিস্ মার্গারেট নোবল্ ডান পাশটায় না এলে পর—বিবেকানন্দ এতোটা এগুতে পারতেন না। সত্যি, না। না।"

কবির "সন্ধ্যা সঙ্গীতে"র সাথে—"কড়ি ও কোমল" সত্যিই খুবই প্রিয় ছিলো টুলি—সন্ধ্যা শুচিস্মিতার। কবির প্রথম দিককার রচনা বলে নয়,—রচনার মতো রচনা বলে। "দেবী মৃণালিনী, স্ত্রীর ভূমিকায় কবিকে যেভাবে প্রেমডোরে, প্রণয়-ভাসে—ফীজীক্ দিয়ে ফীজীক্যালে—কবিতে হয়েছিলো আবেশিতা রভসিতা—তাই যে 'কড়ি ও কোমল"—এর ভাব। ধ্যান্।" বলতো সন্ধ্যা, "আমাদের কীটস্ ফ্যানী ব্রন্ বন্দনায় বলছেন—"Pellowed upon my fair love's ripening breasts. To feel forever its soft fall and swell.''

তারপর, রভস ধরিতায়—

"Awake, awake forever in a sweet unrest.''

ঠিক তাই, বিশ্বকবি মৃণাল থেকে যে আবদারীল আদর চয়নান্তেই কী বলছেন না—

শোনো অশোক শোনো মিতা—

"অধরের কানে যেন অধরের ভাষা,
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে—
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে।"

তারপর কবিতে মৃণালেতে সম্ভবাসিতমে—

"ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা।
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে—
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।"

সত্যিই লাস্ট লাস্ট দ্য ঐ রীজয়াস্ ব্রেক্স্—

"দুটি অধরের এত মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর শয়ন।"

নিজে নয়, প্রিয়ার দু'হাতের আদরী বাঁধনটিই যে কবির কাছে মোস্ট ডীয়ারেস্ট,—তাই কবি রচিছে—

"কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা—
কাহারে কাঁদিয়া বলে, 'যেয়ো না যেয়ো না'।
কেমনে প্রকাশ পায় ব্যাকুল বাসনা,
কে শুনেছে বাহুর নীরব আকুলতা।
কোথা হোতে নিয়ে আসে হৃদয়ের কথা,
গায়ে লিখে দিয়ে যায় পুলক অক্ষরে।"

প্রিয়তমার তাই ত গো—

"দুটি বাহু বহি আনে কদরে ডালা—"

আর তাই রভসায় তখন কবি ঠিকই এ মৃণালকেই বলছে যে—

"লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন—
ছিঁড়ো না, ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন।"

আর লেখক রায় মহাশয়, তোমাতেও নিবেদনে কবির ঐ মৃণাল-প্রশান্তিয়ী অতি ইনটিমেট্ কথার খোলামেলে জানাই, তোমাদেরই মত প্রেমময় যুবকদের সেই-সেই করা—কাব্যিকী য়্যাপ্রীসিয়েশন অফ ফীমেল্ ব্রেস্টস্। যেখানে কবিসম্রাট স্তন-প্রশাস্তিকায় দারুণ রোমান্টিক—

"কোমল দু'খানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,

তারি মাঝখানে কী রে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয় সযতন গোপন হৃদয়!
সেই নিরালায় সেই কোমল আসনে
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়..."

তারপর, আবেশ রাতের শেষে কবি ত মৃণালকেই বহুতরী মিনতায় জানাচ্ছে—

"দাও খুলে দাও সখী, ওই বাহু পাশ—
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।"

কবি আর পারছেন না, প্রেমডোরী এ খেলার মাতোয়ারে কাটা সাতোয়ারে—তখন যে মুক্তির সোপানে আসতে কাতোয়ার্—

"আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশ পাশ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ।"

থাক, থাক। —ওগো হবু, বড়ো লেখক। কেমন তাই না। তাই তাই, থৈয়ী থৈয়ী আনন্দায় আবারো বলি, "তুমি অশোক রায়—তুমি চাইলেই পারবে গো টু রাইট এ ট্রীটীজ অন হার্। ভালোই।"

আজ এতদিন পরে জীবনের এই সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যায়ীতী বাসরায়—তাই বার বার মনে কোরছি মৃণালের কথায়, কথা সাজাতে নেমে—জানো কী—যদিও সন্ধ্যা।

শোনো রথী ঠাকুর, দ্য জীনীয়াস্ অফ্ জীনীয়াই—তোমার কথা মতোই একাজে আজ মানস-যাত্রায়—নেমেছি। তোমার আশীর্বাদ, তোমার দু'হাতের আদর দিয়ে আজও আমার দুই গালে—লেগে আছে, আলগায় নয়। আষ্টেপৃষ্ঠে। তোমায় প্রণাম। শতেক।

আর, আর—ওগো কন্যে ও সন্ধ্যা শুচিস্মিতা, মুখোপাধ্যায়নী সন্ধ্যা—তুমি এ নিরীখায়ী জরীপায় কাজ সারা করাতে—আমায় অনুরাগবর্তীকার ঐ অধরার আদর আমারই কপোল আরঙ্গিমায় সাবজিয়ে দিয়েছিলে—অভাবনীয়ত ইন্‌টিমেসীতে—কীস্ ইন্ য়্যাক্‌সীলারেশন ফর—টু রাইট য়্যাণ্ড্ রাইট্।

বছরের এই শেষ দিনটার শীতলা দুপুরায় হিতলী খুশে ঋতলী তুযে—বোসেছি ধরয়ে ডট্—জন্যে লিখতয়ে ইয়ারী ছয়ের শেষ ধার্য্যী এ মাধুরার মধুখাতে আজ—এ নিয়ে তোমারে কবিজায়া মৃণালিনী, কী ছোটো বৌ, কী "ভাই ছটি"কে। এ লেখার ক্যাপ্‌শন্ ঐ ওপরার—কথা দোপাটিয়াই গোলাপায়—আশ্রম-লক্ষ্মী, দেবী-সদৃশা, লেডী মৃণালিনী ঠাকুর।

লিখছি। আর দেখছি অপলকি ঝলক্ ঝড়্ ঝলস্ গড়্—ছবিয়ী তোমাকে। তুমি তোমার ঐ পরিপাটী ঐ সুরুচিরার গমকী-জমকী-ছমকী আইকনে—সুন্দরীলী আর

মধুরীলী মুখশ্রীর ঐ ফোটোয়ায় রৈয়ী—আর্ট-ভরা লাভেবল্ ফেসীয়ালে—অল্পটাক ডাহিনেতে হেলানো মুখ, যার শুচি-স্নিগ্ধশ্রীল্ চাহন প্রতি বাহন ব্রতি, ভরায় ভরায় ডোরী ডোরী গোরী গোরী এনচেন্টমেন্টী য়্যাডোরায়—ব্লেশেড্ বিউটি। প্লেশেড্ পীস। শান্তয়ানা। এ কবি-পত্নীর রূপ, এ সৌন্দর্য্য—এর নেহারাই ধারাধার, চেহারাই খুশী-তুষী-হুঁশী কনটেক্সট্ আমারই রোজকার দেখভালে থাকে। এই আজকার এই এখনায়ও, আর যার জাঁকে বাজে জুবীলেন্স্। পতি-দেব শুধু তোমারই জীবন-সান্নিধ্যেয়ে দেশ-কাল জয়ী মহামানব নয়,—অনেক বেশীতে অনেক রেশীতেয়ে বিশ্বমানব,—দ্য ইউনিভার্স ইজ উইদিন্ হিজ্ টেরিটরী। অনেক সময় জম-জমাটিকে যেন—গ্রেসড্ অন্ হিজ্ ফীলানথ্রপীক্যাল্ কমান্ড্। হাঁ, নাই য়াঁর সারা বিশ্বয়ী বিস্ময়ের ঘর কী বাহিরায়—আর অন্য পরে কেউ। নান্ দ্য এলস্।

আমার বই-ঘরে রাখা, তোমার ঐ ছবির নীচয়—আবারো রাখা এক যুগলিত ছন্দার, মৃগলিত বন্দার অসাধারণ সাধক ও সাধিকা-অনন্যা—শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা, প্রাক্তনী মিসেস্ মীরা ফীশার। বিদুষী, সুন্দরী এই অসম তেজদৃপ্তা এই পণ্ডিতা যুবতীর সাথে তোমারই রবীন্দ্রনাথের ভাব ও তপস্যা বিনিময় হয়, জাপানে। কবির জাপান প্রবাসকালে। কবি—শ্রীমতী ফরাসিনী এই মীরার অশেষ পাণ্ডিত্যে হওয়া মুগ্ধচিত্ততায় বলেছিলেন—মীরাকে,

"মীরা, প্লীজ্ কাম্ টু মাই ড্রীম্ ল্যাণ্ড্ ঐ শান্তিনিকেতনে, হোয়ার্ আই ওয়ান্ট টু য়্যাস্টাব্লীশ এনাদার টাইপ্ অফ ওয়ার্ল্ড—টু ফর্মুলেট্ নিয়্যু রীনান্শীয়েশন, টোটালী গাইডেড্ বাই রীজন্ য়্যাবাইডিঙ্ রীলীজীয়ন্, য়্যাডুকেশানাল্ ক্যারীকুলাম্, য়্যান্ড মোর অর লেশ্—দ্য সায়েন্স ইন টেক্‌নো-ক্র্যাফটস্—রুরালী, নট্ আর্বানলী। মীরা, আমার আন্তরিক আবেদন তোমার প্রতি যে, তুমি এখানে এসে যোগ দাও এতে—অধ্যাপনায়ী অধ্যাবসায়ে। কিন্তু, অপরাদিকে যে তখনি তৈয়ারে ছিলো এই মীরার জন্য সেই আর এক মহামানব, হাঁ, যাঁকে তোমারই জীবনদেবতা—পরবর্তীকালে কাব্যয়ী ঝঙ্কারে বলেছিলো—"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।" হাঁ, সেই আগাতপ্রায় ভবিতব্যকে বরণ করার হাতছানি না পেয়েও, না জেনেও—মীরা, এই পাণ্ডিত্যে অসাধারণী হোয়ে এক রকমার সাধ-চয়ী সাধনার বেদী মূলে সংস্থাপনার্থে—এই মীরা ফীশার, তখন পৃথিবী-পরিক্রমায়, হোয়ে যেন 'মীরা" নামের আড়ালে, আবডালীকে—এক ভিখারিনী রাজকন্যা-রূপী—আত্মা। কাজেই, এই মীরা—কান্ট্ কোয়েনসাইড্ হারসেল্ফ্ উইথ্ দ্য আর্নেস্ট্ রীকোয়েস্টস্—কামিঙ্ ফ্রম্ টেগোর, দি দেন্ ট্র্যাভেলার—দ্য এক্সট্রা-অর্ডিনারী,—এন্‌গেজ্‌ড ইন্ ওয়াল্ড-ট্যুর—ইয়েস্, টু পীক্ আপ্ ইভেন এ টাইনী পীবল্ ফ্রম্ দ্য আন্‌লিমিটেড্ ওসেন্ অফ্ পার্সীভীয়ারেন্স্ য়্যান্ড পেসেন্স।

জানো, দেবী মৃণালিনী, মীরা কেন এলেন না শান্তিনিকেতনে—তার ব্যাখ্যা আছে। আবার নেইও। কোথাও। মীরা তখন এক ধনকুবের সুভদ্র ও সুপণ্ডিত এক ফরাসীর স্ত্রী ও এক সন্তানের জননী। ঘুরছেন মীরা তখন—পৃথিবীময়। আপন আত্মার অজানিত এক অসম, অতৃপ্তির সাধনায়—পূর্ণা হোতে। পূর্ণতা পেতে। সত্যি, জাপানে বিশ্বকবিকে তিনি অন্তরের সায় জানাতে পারেন নি ঠিকই—সেই কবি-মহামানবেরই এই ভারতের এই মহাসাগরের মহা-তীর্থে—একদিন এলেন হোতে পরে—তীর্থঙ্করের জন্য তীর্থঙ্করার সাধ্যয়ী সাধনার্থে,—সাধকেয়ে। পরমার আকাঙ্খিকতার ছোঁয়ায় কিন্তু সেই মহাকবিরই প্রশান্তিতে অমর হোয়ে ওঠার অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কারে যেন—সত্যিই যেন, রবীন্দ্রনাথী কবিচিত্তয়ী চিত্তরঞ্জনায় মাখামাখি হোয়ে—দেবীকার পথে পথী হোতেই—মীরা ফীশার এলেন, সত্যি সত্যি রবিরই কাবকল্পনায় অলঙ্কৃত এই ভারতেরই মহামানবের সাগরতীরেকার—এই শহরায়। গেলেন পণ্ডিচেরীতে, দেবী মৃণালিনী, তোমারই পতির আত্মার বঁধুময়ী আত্মা ঐ "লোকমাতা" বিভূষিতায়ী নিবেদিতার প্ল্যান করা প্রোগ্রাম্—এই অরবিন্দর আশ্রমায়, পরিশ্রমী সাশ্রমায়। ধর্মবিজ্ঞানের জ্ঞানাঞ্জনীতে অঞ্জলিপ্রাপ্তা মীরা, সাধকীত্বে বোসলেন ঋষি-দার্শনিক-যোদ্ধা-শ্রেষ্ঠ, আরেক মহাকবির, 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের স্রষ্টার, 'লাইফ ডিভাইন' মহাগ্রন্থের মহাস্রষ্টার ডাহিনায়,—রাইট আসনায়, আসনাসীনে। মীরা হোলেন—যথার্থই আরেক এ দেশীয় ঐ রাজকুলবধূ—ঐ ভিখারিনী রাজকন্যার মতোই মীড়ে 'মীরা'—নতুনাশ্রমে—শ্রীমা। দ্য মাদার। আপন দেশ, প্রাসাদী স্যাটো, অর্থ, প্রতিপত্তি, স্বামী-পুত্র, সবাইকে ছেড়ে, একলা হোয়ে। একলা চলার যোদ্ধিয়ী আর নীতিয়ী—বাতায়ণে। খাতায়ণে। কবির পরিকল্পনায়, 'লোকমাতা' নিবেদিতার কৌশলী কারুকাজে—বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ আর বিপ্লবী না থেকে—ব্রিটিশের নজরদারীকে কলা দেখিয়ে—সোজা ফরাসীদের চন্দননগর থেকে, জলপথে পুণ্যতোয়া গঙ্গা পেরিয়ে পণ্ডিচেরীতে, আরেক ফরাসী দেশে। ফরেন্ পকেটে। হোলেন—শ্রীঅরবিন্দ। সাধক-রাজা। শ্রেষ্ঠত্বে।

দেবী মৃণালিনী, খুবই সত্যি যে তোমার কবি-পতির সাহায্য পরিব্যাপ্তে —সত্যি তাই তরে ও দরে ছিলো এটা সম্ভবেতে সম্ভাব্য—শুধু পদবীর ঐ ঘোষ পালটায়ে, —বিপ্লবাত্মক সব ধৃত্ ও কৃত্ বদলায়ে—অরবিন্দর এই য়োগীশ্রেষ্ঠত্বয় শ্রীঅরবিন্দ হওয়ার সাধনায়, আর আর তার পেছনায়—এই মহান সাধকের সেই সময়কারই সমীপবর্তী আসল চালিকাশক্তি ছিলো, অবশ্যই দেবী নিবেদিতার সাথে মিলেমিশেই,—তোমারই পতিদেবতার, তোমারই হৃদয়ের রাজা—এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্য দি দেন অন্‌লি নোবেল্ লোরিয়েট্ ফ্রম্ এশিয়া, দ্য কন্টিনেন্ট্।

মৃণালিনী, সৃষ্টিয়ী সাহিত্যেয়ে ও সৌহার্দ্যয়ী সহযোগিতায়—তুমি দেবী-সদৃশা হোয়ে ওঠো য়ে কবির চারোধারে, সেই কবিই, তোমারই একান্ত প্রিয়তম যে ধারারী শিরোপিতায় ঐ 'লোকমাতা' আখ্যায় সাজিয়ে দিয়েছিলেন—ঐ ব্যাস্তয়ীতীক ঐ সীক্রেট্ প্যাক্টটী রূপায়ণে অসম ট্যাক্টফুলী পরিচালনায়—নেতৃ ভগিনী নিবেদিতার নিবেদিতারী হেল্প ছিলো—তোমারই কবি-শ্রেষ্ঠ। মৃণাল, কবির 'ভাই ছুটি'—তুমি যে আগাগোড়া অনেক উদারতারই মধ্যেকার এক নামধেয়া উদাসিনী রাজ-বধূ কাজ-মধু ছিলে—কবির জীবনায়নী যৌবনায়ন ঘিরে, ঋত-শোভনী যৌনায়ন্ পথে—ছন্দয়ী মীড়ে সাজ-সাজুতায়, আষ্টেয়েতে আর পৃষ্টেয়েতে—বাজ-বাজুয়েতে। দেহেতেয়ী মনেতে। মনেয়েতী দেহেতে। তোমার কবির পথ দেখানো অভিলিষিত কর্মযজ্ঞে, ধর্মসঙ্গেলে জয়তীল্ জয়ঋলার ঋধ্ পুরুষ ও ঋধী নারী—ঐ শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের ফোটোর ফ্রেমের ওপর—তোমার রাখা ছবিটা—আমার কাছে ঋতলীতে রাখছেয়ে—ঋদ্ধয়ী ঋদ্ধতা। পূর্ণয়ীত্ মুগ্ধতা। তা তা থৈ থৈয়ী আনা আনন্দায়ন জন্যে—তুমি যে তুমিময়ে ছিলে—দ্য গ্রেটেস্ট্ ইনস্পায়ারিঙ্ ফোর্স য়্যান্ড কোর্স—যতোদিন কবির জীবনে ছিলে—হোয়ে জড়িতলত্ তড়িতশক্তি।

কবি নয়, নয় বিশ্বকবি—নয় নয় আবারোয় শুধুই বিশ্ব-মানব! মৃণালিনীর এই বররূপী বরপুরুষ—ছিলো যে পৃথিবী জুড়ে বিশ্বময়ে একজনই—ও অদ্বিতীয়। দ্য আন্প্যারালাল্। তাঁরই যৌবন ঘরটার যৌবনবাসরায়—আত্মার যুগলিতয়ী আত্মীয়ায় তুমি যে ছিলে—পরমা প্রকৃতি। পরমা ঋদ্ধিকী।

একটা কথা বলি। জোরদারী সজোরায়। ঘরে ঘরে, ঘরেরই বাহিরায়, যেধারেই না তাকাই—দেখি অধেল ধারার ঐ পোজই ছবি—শুধুই তোমারই স্বামীর। তোমার হৃদয়ের রাজামশায়ের। কিন্তু, এ রাজার হৃদসর্বস্ব, ঐ রাণীমায়ের কোনো ছবি—কোথাও দেখি না। আর দেখতেও পাওয়া যায়না। এ আমার চিন্তা। আমারই একান্তয়ে নিজেরই। দেশ নাচছে, দশ নাচছে—কবিকে নিয়ে। কেউ ত কিন্তুকে খোঁজ নিচ্ছে না—কবি-প্রিয়ার কোনো ছবির। ফ্রেমী কোনো ফোটোয়ার।

তোমার একটি ছবির খোঁজে, আর নিজের কোরে পাওয়ার জন্য—একদিন সত্যি সত্যি কিশোর মনের দোদুলায় কিশলয়ী ঢালে—গিয়ে হাজির জোড়াসাঁকোয়। গ্রন্থন বিভাগে। কাউকে চিনি না। দরোজার সামনায় এলোয়িত ঘোরাফেরা কোরতে দেখে, একজন সুদর্শন চেহারার মাঝবয়সী সত্যিকারের ভদ্রলোক— এগিয়ে এসে আমার কথা শুনে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বললেন, আজও মনে আছে—আমি অমুক ভট্টাচার্য্যি। তুমি মিস্টার না বলে, কাকু বলো। একটু বোসো। তোমার ঐ অভিলাষিত এখানেতে আশা নিয়ে আসাটাকে—আমি এখনি সফল করাচ্ছি। ভিতরে গেলেন। কিছু পরে দুটো ফোটো নিয়ে এলেন দেখাতে দেখাতে, ভালো করে না দেখেই

হাতে নিয়ে—দেবো না আর ফেরত্—এমন ভাব দেখিয়ে জানতে চাইলাম, কাকু, এর কত দাম।

কাঁধে হাত রেখে জানালেন—ছিঃ, পয়সা দিয়ে এ সব হয় না—পাওয়া। কোনোদিন আজ পর্য্যন্ত কেউ এভাবে এসে কবির স্ত্রীর ছবি চায় নি। আর তুমি ত য়্যাডোলিসেন্টে আছো। এ বয়সে কেউ চাইতে পারে—তা আমার ভাবার বাইরে। ও কথা বলো না। কবির স্ত্রীর ছবির জন্য তুমি ভবানীপুর থেকে পারি দিয়েছো এতোটা পথ। আমি কবির স্ত্রীর ছবি কখনো বিক্রী কোরতে পারি না। তোমায় দিচ্ছি। খামে পুরে। পয়সা লাগবে না। জেনে যাও যাবার আগে—আজ পর্যন্ত কেউ আসে নি—মৃণালিনী দেবীর ছবির জন্য। কবি-পত্নী ত আজও উপেক্ষিতা। বিশ্বকবি পতি-দেবতার লেখা সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র উর্মিলার মতোই—নিজের স্ত্রীও যে আজ—নারী হোয়েও উপেক্ষিতা। ঠিক উর্মিলারই মতোটি। শোনো, আমাদের কাব্যভাণ্ডারে দেবিকা হোলেন—এই মৃণালিনী। আমি আজ এতো বেশী আনন্দ পেলাম—তোমার মতো এক অল্প বয়েসী কিশোরের কাছ থেকে, যা ভুলবো না কোনোদিন। সবে ইয়্যুথ্ ছুঁয়েছো। তাই না। চৌদ্দ নিশ্চয় ! শোনো, এই ভট্টাচার্য্য-কাকু এ কথাই বোলবো—যতোই রবীন্দ্রনাথ পড়ি না কেন, রবীন্দ্রনাথে ধ্যানমনস্ক হই না কেন—এর সাথে সাথে উনার স্ত্রী মৃণালিনীকে না জানলে—ঐ পড়াটা, ঐ মনস্ককতাটার সবটাই যে—মিথ্যে। কবিপত্নী যেভাবে কবিকে তার সৃষ্টি-কাজে ব্যাপৃত রাখতেন—চারদিক থেকে পাহারায় রেখে—কখনো যিনি কবিকে পথ হারাতে দেননি—কখনোই কোনোভাবেই পলকতরে ভুল পথে যেতে। শোনো, যেভাবে যে ধাবে, কবিকে গৃহিণীর ভালোবাসার ডালি ভরা শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে, আর রাশি রাশি অনুরাগের অর্ঘ্য দিয়ে গেছেন—সত্যি তেমতিয়ী তা—আর অন্য কোনো মহামনীষীর ভাগ্যে হয় নাই—প্রাপ্তির যোগ। শ্রান্তির যোগ।

ধপধপে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা শ্রীযুত্ ভট্টাচার্য্য—হঠাৎ আমায় ধরে পাশে টানলেন—বাহিরের পথে—কবির প্রাসাদের পোর্টিকোর দিকে। বলতে বলতে—"শোনো' এ সুযোগ পাবে না। তাড়াতাড়ি এসো। যাঁর ছবি তোমার হাতে, তাঁর আদরের দুলাল—রথী ঠাকুর—এইমাত্র এলেন। চল চল। কথা বলবে। এখনো গাড়ী থেকে নামেন নি। আমি আছি। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—এই বলে যে, ভবানীপুর থেকে এখানে আসা এক ছোটো ভিজিটর—আমাদের সবার প্রিয় কবি-পুত্রের সাক্ষাৎপ্রার্থী। তাইত।' —বলে, কী হাসি।

হাত ধরে ড্র্যাগড্ মী—একেবারে ইন্ ফ্রন্ট অফ্—বিশ্ব-বিধাতৃ কবির আত্মজ—পাশ।

"রথীদা, এই ছেলেটি, নাম অশোক। ভবানীপুর থেকে এসেছে এখানে আপনার মায়ের ছবি নিতে—মনে হয় ফর্ হিজ ডীয়ারী কালেকশন্। মজার কথা, বিস্ময়েরও

বটে—এ রকম ব্যাপার, রথীদা, আমার বিশ্বভারতীর সাথে কাজে লেগে থাকবার এই তিরিশটা বছরের মধ্যে—দেখি নি। আর চাইছে—যে, তার টীন্ এজটা ক্রশ করতে এখনো—পাঁচটা বছর বাকী। খুব ভালো ত' লাগলোই, আনন্দও হোচ্ছে। শোনো, উনাকে প্রণাম করো। আমি যাই। তোমার কিছু জানার থাকলে জেনে নাও, এখনি। উনি ছোটোদের খুব ভালোবাসেন। জানো ত' সব ছোটোদের মধ্যে—একজন শিশু থাকে। উনি তাই।

বাড়ীর, —না—প্রাসাদের লাল রঙী দেওড়ীতে, মানে পোর্টিকোয়—দাঁড়িয়ে সবুজ রঙের "স্টাড্"। অর্থাৎ ঢাউস্ আকারের—আঠারো হাতি, স্টুডিবেকার্। কবিপুত্রের নিজের গাড়ী। শুধু এখানকার জন্যে। জোড়াসাঁকোয় থাকলে, চলাফেরার জন্য—বিশেষী গন্তব্যার ঐ রাহিটার্স, আর রাজভবনের পথ পরিক্রমায়—ঠাকুর রথীর এটি মস্ত রথ। চ্যারীয়ট্।

পহেলায়ী দর্শন-ধারীতে—রথী ঠাকুর—খুব সুপুরুষ। সুদর্শন। এ চেহারা যেন ঠাকুর-বাড়ীর রয়াল্ ডাইনেস্টীরই—সাকারা। আকারা। ব্লু ব্লাড্ রোলস্ অন্ ব্লাড্ অফ য়্যারীস্টোক্রেসীতে। সত্যি উনি রূপকথার দেশের যেন কোনো—রাজা, অধিরাজ। বয়েস হোয়েছে। পৌড়ত্বেরও যে আছে একটু নয়—বেশই—অন্য ধারার সৌন্দর্য্য—তা রথী ঠাকুরের চেহারায় কোরছে—জ্বলজ্বল। হোল্ডী দ্য গোল্ডী। বোল্ডী দ্যাট্ টোল্ডী। এটা একটা অসাধারণ ঋদ্ধিময় বিউটিফীকেশন অফ ট্যালেন্ট্। পরবর্তীকালে—এমন চেহারাটা বার বার—খুব কাছে থেকে দেখেছি—অমনটাই, জবাহরলালের। উনি ত সব রজ ও ওজ গুণসম্পন্ন—আবদারাদির ক্যনইশার ছিলেন। হবে না কেন। হবেই। রোজ প্রাতরাশে—অনারেবল্ প্রীমীয়ারের পছন্দের খাবার ছিলো—একটি নাদুস-নুদুস—চীকেন। আর এন্তার ফলের রস। উনি রথীর বন্ধু ছিলেন—খুবই ইনটিমেসীতে। ফোনে—নেরুর বলে সম্ভোধন করার অধিকার ছিলো। রথীর বাবাই ত বুঝেছিলেন—মতিলালস্য পুত্র—এতোটাই নিজেকে রাজনীতিতে সীজনড্ কোরে নিতে পেরেছে, যে—তখনি তাই সম্ভোধনে কবি ডাকতেন জুনিয়র নেহরুকে, বলে—'ঋতুরাজ'। যাক্ নেহরুর মতো রথী খাওয়ায় মোটেই রাজসিক ছিলেন না। ভেজ্ ছিল উনার প্রিয় থালি। তবু—দেহী সৌন্দর্য্য রেখেছিলেন অটুট। বিশ্ববন্দিত জে. আর. ডি. টাটা একবার দিল্লীতে মেল-মেশী এক য়্যাট্-হোম্ পার্টিতে—উনার পাশে থাকা স্যার জাহাঙ্গীর গান্ধী ও স্যার ফীরোজ কুঠারকে বলেছিলেন—"মিঃ জুনিয়র টেগোর, দিস্ রথী-ভাই—ইজ্ আফটার অল এ জেন্টেলম্যান অফ জেন্টেলমেন্—য়্যালাইক্ হিজ্ নাইস্ লুকিঙ্ ফীজীক্।"

উনি তখন উপাচার্য্য। পরনে ঘিয়ে রঙের রেশম পাঞ্জাবী। আর পাট পাট কোরে ঝোলানো ঢাকা পাড়ের—শান্তিপুরীর কোঁচা। চুনোট করা। পায়ে পাম্-সু। চকচকে

কালো। হাতে—সোনার ব্যান্ডে সোনালী ঘড়ি। গোল্ডে তৈরী। ঐ রোলেক্স্। বুকে ঝুলছে মুক্তো বসানো সোনার চেন, বোতাম নিয়ে। বুক-পকেটায় উঁকি মারছে—আগাগোড়া সোনার—পার্কারের ঝর্ণাকলম। মানুষটি খুবই সৌখীন ছিলেন। যার জীবনটা ছিলো—হাজার শখের মধ্যে—তা পূর্ণ করা।

কবি-পুত্র, জ্ঞান-তাপস এই বিজ্ঞানী—বিশ্ববিদ্যালয় ইলিয়োনোস্ থেকে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষায় সার্থক-নাম থেকেও—তিনি পুত্র রথীর ভূমিকায়, নিজের বিশ্বকবি, বিশ্বমানব বাবার আন্তর্জার্তিক ধ্যান ও ধারণার প্রতিষ্ঠায়—ছেলের মতো ছেলে হোতে চেয়ে—যে ভাবে তিনি নিজেকে সঁপেছিলেন—ঐ বিরাট সব কিছুরই স্থায়ীকরণে—আর আর সহজীকরণে—তার তুল্যয়ীত্ তুলনাটা—সারা বিশ্বে আর কোনো মহাপুরুষের—জীবন-আত্মজায় নেই। একদমই—তা নীল্। রথী ঠাকুর—নিজের প্রতিষ্ঠা না চেয়ে—নিজের সব সৃষ্টিমুখী অসাধারণ সৃজনশীলতাকে পুরোপুরি থামিয়ে রেখে—রথী শতভাগে একজন আত্মমগ্ন কর্মযোগী ছিলেন—বাবারই জন্যে, বাবার শেষ দিনটি পর্য্যন্তও। ঐ বাহিশে শ্রাবণার, ভোর পর্য্যন্তও।

আমায় দেখে, উনি দাঁড়িয়ে গেলেন। ভেতরে যাবার জন্য চওড়াই ঐ শ্বেতপাথরী সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখা থেকে—পা নামিয়ে নিলেন, ঘুরে দাঁড়ালেন। সামনায়। মুখোমুখী। হাসি হাসি।

প্রণমান্তে, জানালাম—"আমি তোমার বাবার কোলে উঠেছিলাম। এই এখানেই, —শন্ ঊনিত্রিশের বাহিশে অক্টোবর, বিকেলায়। এক বছরের যখন। আর নাম, অশোক—তোমার বাবারই দেওয়া। আর, আর—শুনেছি তুমিও উপস্থিত ছিলে। পাশে। সাথে প্রশান্ত মহলানবীশও। আর আর—চার চন্দভায়েরাও।

রথী ঠাকুর—তুমি তখনি তোমার রেশম জামার সাথে আমায় বুকে টেনে নিয়েছিলে। গালে, গলায়, মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে বলেছিলে—"আমি আর এর পরে কী দিতে পারি! উষ্ণ কিছু আলিঙ্গন ছাড়া! তাই দিচ্ছি। তাই নাও। সানন্দে। এই আর কী। আচ্ছা, মায়ের ছবি দিয়ে কী কোরবে। আমি ত তার আদরের ছেলে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেউ এভাবে আমারই কাছে চায়নি মায়ের কোনো ছবি।

রথী ঠাকুর নিমেষ তরে থামলেন। জানতে চাইলেন—"অশোক। এই নামে ডাকতে খুব ভালো লাগছে। বাবার দেওয়া বলেই। আচ্ছা শোনো, তুমি মায়ের ছবি নিয়ে কী কোরবে? জানতে খুব ইচ্ছুক।"

সাথে সাথে মাথেলেয়ে নামি উনারই করা প্রশ্নেরই আয়নীত এক উত্তরায়ণে—"আমার পড়ার বই থাকা ঘরেতে রাখা তোমার বাবার ছবিরই পাশ বরাবর থাকবে—তোমারই মায়ের এই ছবি-দুটি। আমি ভাব আর তারই চলতয়ী ভাবনার ঘরে-বাইরে—সবসময়ই আইডীয়োলজীতে হই যে মনবাসরায়—খুবই

রোমান্টিক। এই য়্যাট্ সুইটী টীন্ অফ্ ফীফ্টীন্। জানি, আর মানি যে—তোমার বাবার আসল প্রেরণার শক্তি ও উৎস ছিলো—তোমারই মা। আর কেউ নয়। নান্ দ্য এলস্। দারুণ ইনারী ইচ্ছেয়াতে কাজ অভিলাষিত—ইন্ নীয়ার্ ফীউচার্, নিকট্ ভবিষ্যতায়—লিখবো তোমার মায়েরই জীবনী। টিপ্-টপ্ কণ্ডিশনালী।"

খুব হাসি দোলালেন আপন মুখের ভরারীত্—সায় জানাতেই—রথী ঠাকুর।

"ভালো। খুবই ভালো। এ মুহূর্তে এখনি অভিনন্দনী আশীর্বাদ থাকলো তোমাতে। তোমারই লিখতে চাওয়া ঐ বইটির জন্য। আগাম। জানো অশোক, আজ পর্য্যন্ত রথীকে চেনে কী অগ্রজ কী অনুজ তাদের মধ্যে কেউই মনে মনে তৈয়ারী এমন পোষিত অভিলাষ জানায় নি। আমি যদি থাকি—তোমার বই বেরুনোর সময়—আমিই নিজে থেকে লিখে দেবো তোমারই ঐ বইয়ের জন্য—এক ভূমিকা। বিশদ এক প্রীফেস্। তাই হবে। বোধ হয় তখন—আমাকে আর পরিচিত ঠিকানা দুটোর—কোনোটাতেই পাবে না। এখানেও নয়। ওখানেও নয়। জোড়াসাঁকোতেও নয়, শান্তিনিকেতনেও নয়। ভারতরেই কোথাও না কোথাও থাকবো। মোস্ট্ প্রবাবেলী য়্যাট দ্য আউট-স্কার্টস্ অফ দেরাদুন। ওখানে বাবামশায়ের পছন্দে তৈরী করা প্রচুর একর জমি নিয়ে একটা বাগান—কাম—খামার বাড়ী আছে। বাবাই তৈরী করান। খুব নিরিবিলি অরণ্য-ঘেরা জায়গা। আমাদেরই পাশে আছে বলে—কখনো থাকেন অবসর কাটাতে, তিন কন্যা নিয়ে—মিসেস্ বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। ওর ত বেশ বড়ো-সড়ো বাড়ী। চারোধারে জমি আর জমি। খোলামেলা পরিবেশ, বল, কার না ভালো লাগে! আর কিছু মিনতি আছে, যদি থাকে—জানাও।" সেই হাসি। সেই উপনিষদীয় সৌম্যতা।

"না।" বলেই, জানালাম—"তোমার বাবার কোল যে শিশু সেদিন ক্ষণিকের এক ক্ষণিকা হোয়ে পেয়েছিলো, আর আর, যার শরীরায় তোমারই বিশ্ববন্দিতায়ী অনন্য সাধারণ বাবার ছোঁয়ায়ী পরশ আর আদর রয়েছে—আর আর, যার নামকরণটা তাঁরই দেওয়া এক অমূল্য মূল্যেরই উপহার। এই তার জন্য, জানবে, তার মানে আমার মনে কোনোদিনই আর অন্য কোনো আকাঙ্খা থাকবে না—কোনো পুরস্কারের জন্য। কেন না, অল্‌রেডী আই য়্যাম্ প্রাইজড্ বাই সাচ্ ক্রীসেন্‌ডম্ অফ নেমিঙ্, য়্যাণ্ড কেয়ারফুল কেয়ারেসিঙ্।" থামলাম।

বোললেন রথী ঠাকুর, "অশোক, তুমি সুন্দর কোরে মধুরভাবে গুছিয়ে কথা বলতে পারো, এরই মধ্যে। তা দেখছি। শুধু আশা নয়, আমি জেনে রাখলাম—তুমি আমার মাকে নিয়ে একদিন না একদিন যে বইটি রচনা কোরবে, তা অশোক, তার সৃষ্টিশীল কুশলতা নিয়ে কোনো সংশয় রইলো না, আমার মনে। শুভায়ু ভবতু। মনে রাখবে—আনন্দরূপমৃতম যদ্ববিভাতি। আচ্ছা অশোক, প্রথম আলাপেই খুশী

হলাম, যেটা খুবই দুর্লভ। প্রণাম থাক। আমায় যেতে দাও ওপরায়। একটু ফ্রেস হোয়েই বেরুতে হবে। অনেক প্রোগ্রাম। রাজভবনে মিটিং আছে ডাঃ কাটজুর সঙ্গে। ফোন কোরে শান্তিনিকেতনে চলে এসো। উপাচার্য্যের অফিসে না পেলে—জানবে আমি আমার ওয়ার্ক-রুম—'গুহাঘরে' আছি। নয়ত উদীচীতে কী কোনার্কে। আর নয়। এবার বিদায় নিচ্ছি।" বলেই বারেক তরে—দু'হাতে ঘন করা ছোঁয়া—আমার দু'গালে বসিয়ে হাসতে হাসতে, ঝোলানো কোঁচা ডান হাতে তুলে ধরে, চলে গেলেন প্রাসাদ ভেতরায়।

দেবী মৃণালিনী, তোমাকে নিয়ে লিখতে বোসে,—জানবে এই যে তোমারই শত আদরের আর আবদারের বড়ো ছেলে—রথী ঠাকুরে মাতামাতি কোরলারম কথা নিয়ে, তা কিন্তু এ লেখাটারই অঙ্গ। পার্ট য্যাণ্ড্ পার্শেল। যেহেতু তুমি রথীরই গর্বিতা স্রষ্টা। গরবিনী মা। তাই ত ?

কোনো কবির বিশ্বচিত্ততার মধ্যে মিতয়ী মিত্-মিতালী পাতাতে, সেই সময়কার বিরাট সব জ্যেতিষ্করাও ধারেকাছে ঘোরা-ফেরা কোরতো। আত্মারই আঁতেলিকী থাকা-ঘনিষ্ঠতায়। তাঁদের স্ত্রীরাও ছিলেন—বিশ্বকবির, বন্ধুনী। য়দিও তুমি তখন ব্রহ্মলোকে। ওঁদের ঘরণীদের বেশিরভাগই—নাইট্ হুড্ প্রাপ্তদের মতোই ছিলেন—শুধু স্ত্রী নয়, ব্যক্তিত্বময়ীও। যেমন—লেডী অবলা (স্যার জগদীশ) লেডী প্রতিভা (স্যার আশু চৌধুরী) লেডী যোগমায়া (স্যার আশুতোষ) লেডী যাদুমতী (স্যার রাজেন) লেডী নির্মলা (স্যার নীলরতন) লেডী সুনীতী (মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর) লেডী সুশীলা (মহারাজা স্যার রাধাকিশোর দেব মাণিক্য) লেডী যশোমতী (মহারাজ স্যার জগদিন্দ্র) লেডী বিন্ধ্যবাসিনী (স্যার যদুনাথ)।

দেবী মৃণালিনী, সেই যশোহরী নদীমাতৃক ইছামতী ধৌতয়ী দেশের—মৌজা দক্ষিণডীহীর গ্রাম—ঐ ফুলতলীয় জমিদার বেণীমাধব রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ্যা কন্যা, ফুলেরই মতন ফর্সা ও সুশ্রী সুতনুকার ঐ কিশোরী—হোলেন একদিন কবি-পত্নী, যে কবি পরবর্তী পরিস্থিতিতে—তুমি বিনে, তুমি নাইয়ের অভাবায় একলা চলার শপথী মন্ত্র-গুপ্তির জোরে,—একলা চলতে চলতে—ঐ একলাতেই কবি তখন বিশ্ব জিনে নোবেল্ লোরিয়েট হোতেই—বৃটিশ ক্রাউন্ তোমার স্বামীর প্রতি বিরাট সম্মাননা প্রদর্শনান্তে বেষ্ট্যাড্ দ্য অনার্—ঐ নাইট্-হুড্—অপর্ণান্তে। যদিও মৃণালিনী, তুমি তখন অনুপস্থিতা। কবি হোলেন—স্যার রবীন্দ্রনাথ টেগোর, কে. টি.। যাক্ এর পরের ইতিহাস দেখালো পৃথিবীর অগণিত নাইটদের মধ্যে—তোমার কবিই একমাত্র 'নাইট্'—যিনি পরাধীন দেশমাতৃকার জন্যে স্বাধীনতা অর্জনে বলি-প্রদত্ত থাকায়—জালিয়ানওয়ালাবাগের—সেই নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদ কোরে—ত্যাগ কোরলেন—ঐ রাজকীয় খেতাব। যদিও জানি—বৃটিশ মন্ত্রীসভা সেই

পদত্যাগকে—য়্যাক্সেপ্ট্ করেন নি। কোনোদিনই। বহাল রেখেছিলেন—গুরুদেবের নামের সাথে। এখনো সেই খেতাবী মানপত্র—বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালায়—আছে প্রদর্শিত। আচ্ছা, বলি, মৃণালিনী তুমি না হয় নাইই থাকলে সে সময়—কিন্তু, কিন্তু তুমি ত উনারই জায়া, পত্নী, হোলী স্পাউজ, শোলী মিউজ্—তাই বলি কেন তুমি না থাকার দরুণ—হবে নাই বা কেন—লেডী মৃণালিনী ঠাকুর। নাইটের লেডী।

এই লেডী প্রসঙ্গে—শোনাই তোমাকে, দেবী মৃণালিনী—সেই ১৯১৯-র পরেও ভারত-বিভূবণ—স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ কখনো অক্সফোর্ড থেকে, কখনো ক্যামব্রীজ্ থেকে, আবার কাছের বেনারস্ হিন্দু থেকে—পত্রালাপটা বহান রেখেছিলেন—অগ্রজতুল্য রবীন্দ্রনাথ নামী—বিশ্ব-আত্মার সাথে। "দ্য ফীলজফি অফ্ রবীন্দ্রনাথ টেগোর"-এর সাথে। হ্যাঁ, ঐ নামে। লেখা বইটি স্যার রাধাকৃষ্ণের প্রথম লেখা বই। শন ঐ সায়েত্রিশ পর্য্যন্ত। ঐ সময়েতে কাজ, চিন্তা, দিশা পেতে যে অসংখ্য চিঠি পাঠাতেন কবির কাছে—তাতে প্রাপকের নামের আগে প্রেরক লিখতেন—টু, স্যার রবীন্দ্রনাথ টেগোর, কে. টি.।

আমি বোলবো—তুমি এই 'নাইটের ঘরণী ত 'স্যার' না হবার আগেই ছিলে,—বলি সে না হয় তখন নাই থাকলে বলে—আমার মতে তাতে এতে নাই কোনো আরোপিতায়ী বাধায়ী নিষেধা,—যে তুমিতে, তোমার নামের আগে যদি আমি শিরোপিতায় বসাই—লেডী—পদবীটা। একমাত্র আমিই—ভেবে আর চিন্তে—এ কথা জানালাম।

আমি জানি—দেবী মৃণালিনী এই "স্যার" খেতাবটিকে তোমারই বিশ্বমানবের নামের সাথে অলঙ্কৃত রেখে ও কোরে—এই খেতাব অনেক—সত্যি অনেক মহার্য্য বানালো নিজেকে। ঠিক তাইই হোলো—কবির আত্মার দুই—দু' ধারাকার আত্মা—ঐ জগদীশ বসু ও প্রফুল্ল রায়কে—তাই দিতে পেরে। প্রাইজটা হোলো ধন্য,—টেগোরেতে, বসুতে আর রায়েতে—এই ত্রিধারার ত্রিবেণী-সঙ্গমায়—রাইট্লী হাইটলী গ্লোরীফায়েড্। মৃণালিনী—সাহিত্যিক-পদার্থবিদ আর রসায়নবিদ—এমন মিলিজুলী সখ্যতা—আর এমনটা দেখা যায় নি—পৃথিবীর আর কোথাও।

তাই হ্যাপিলী মেরীলী মুডে বলি—তুমি মৃণালিনী—তখনকার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের 'আশ্রম-লক্ষ্মী' যেমন ছিলে যথারীতী যথার্থটায়,—আরপরে আর যেমনটিতে আশ্রমী সবাকার আর্তি ও ভালোবাসা মেটাতে পারতে নিজের ঐ দেবী-সদৃশায়ী, তীক্ষ্ণ অনুভবি অভিবিলাসে—তক্ অভিলাষে। তেমনি কথায় কেন ভুল হবে—যদি এতদিনের ইতিহাসে নজীর রাখতেয়ে আমি তোমাকে,—লেডী মৃণালিনী ঠাকুর বলে—নতুনায় সম্ভাযনী এ সমাবর্ত্তো বসাই। কেন কেন তা আর নয়, এই নিরীখায় যে—কবিপতির 'স্যার' কে. টি. হওয়ার সময়টায়, আর তারই পর—ঐ অত্যাচারের

প্রতিবাদে 'স্যার' ত্যাগ করার মধ্যিখানে—কোথাও নাই ছিলো তোমার উপস্থিতিটা, সুইটী বেটার-হাফ্ বলে, অর্ধাঙ্গিনী বলে। তাই ? না। কিন্তু, খাশ বিলাতের রাজ-দরবারে থাকা—আজ পর্য্যন্ত দেওয়া নাইট-হুডের মস্ত তালিকায়—এখনো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিতয়ী আছে—প্রাপক হিসেবে। তা মোছা হয় নি—ত্যাগ করা বলে। নেভার ইরেজড্। আনটীল্ নাও। দেবী মৃণালিনী—আজও ঐ বিলেত দেশটা যে—মাটিরই।

বিশ্বকবির অন্তরস্থতম বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা "নাইট"—তাঁদের প্রত্যেকেরই মধুময়ী ঘরণীদের সাথে—"লেডী" হিসেবে তোমাকেও দেখতে চাই—এই আমি। রাজী আমি। খুশী আমি। তুমি আমার কাছটিতে—লেডী মৃণালিনীও। শুধুমাত্র ইংরেজী কেতার—মিসেস্ আর. এন. টেগোর নও।

"ভাই ছুটি"। —এই সম্বোধনায়, এই আদরী আবদারায়—আছে কতো বড়ো এক ভাব—যার মধ্যে রাঙ্গিলী সাঁতারায় ক্লান্ত আর শ্রান্ত কবিকে—তোমারই শান্তির নীড়ে, কান্তির মীড়ে—প্রিয়ার দেহী-বাসরায় সাজুতীয়ী সাজ বাজুয়ীকে আশ্রেতী আশ্লেষে টানে কাছটায়—অতি মোস্ট্ ইনটেমেসীতে গ্রহণ করায়,—সীক্রেটী সব সেক্রেডী মুহূর্তায় দেয় রে দেয়—যা আর যা, রেঙ্গে-ভেঙ্গে—কবির জন্য। প্রণমিত প্রণয়ী প্রণিপাতে। কবির সুখের জন্য। কবির কবিতায়ী সব সব ছবিতায়ী—সৃষ্টিরই জন্য। হাঁ—প্রিয়া দেয় তা আর তা—তারই সাদরী পতির পতিত্বয়ী আধরার আদরীতে, আবদারীতে। বলি, প্রিয়াকেই ত প্রিয়র কাছটির অতি সঘন তাপঝরার মধ্যেয়ে পৌছুনোর তরে ত্বরায়িত্ এই ডাক যে দিয়ে যায়—চিঠির সম্ভাষণী কথাটা। ছুটিময়ী শান্তির। ছুটিময়ী কান্তির। ক্রান্তরীলী শ্রান্তির। হাঁ—কবির এই প্রিয়তমাই যে তারই প্রিয়তমর প্রতি আরোপায়—সত্যিকারের ছুটি দেওয়ারই ছুটি নেওয়ারই—নিয়ন্তা। তাই তাই থৈ থৈয়ী আনন্দার তাতাসী তাতালায় বিশ্বকবির প্রিয়াতে সম্বোধন, নানান চিঠির গোড়ায়, প্রথম শব্দায়,—বলে পরে লিখে দরে—মৃণালিনী, তুমিই যে আমার সব রবাবী ও জবাবী আর মেজাজী ছুটির মিলামিলিতয়ী, দ্য ক্ল্যাস্টার্ ও 'ভাই ছুটি'।

মহাকবির প্রেম-জীবনের একাকীয়ী একাত্মা বলে—ঐ সম্ভাষিতার ঐ কথা দুটি "ভাই ছুটি"—বলি, মৃণালিনী দেবী, তোমায় আদর ভরিয়ে যে সব মিষ্টি চিঠি কবি লিখেছিলেন,—সে সব চিঠির কয়েকটির শেষ থেকে বাদ গেছে বেশ কিছু—সেক্রেডী ভরা সীক্রেসীর—আদরায়ণ, চুম-চুমায়ণ। আবেশ করার ও সব একান্ত আদরী কথার পরিবর্তে—সেখানে ভরাট করা হয়েছে শূণ্যতাকে—ডট্ ডট্ ডট্—বসিয়ে। এটা ভালো লাগে নি। ভালো লাগারও কথা নয়। কবি তোমার অনুপস্থিতিটা ভালোই অনুভবতীয়ে অনুশীলতায়—জানাতেন, বোঝাতেন—হৃদয় দিয়ে হৃদিতায়ী রাখা—ঐ দূর তার দূরান্তরের চিঠি পরিক্রমায়—চিঠি শেষে খুবই স্বাভাবিকতার ভিয়েনে

জানাতেন—আদরের চুমা, মিথুন সমাপিত না হওয়ার জন্য রাখতেন—আগাম চুম্বন—যেটা খুবই ন্যাচারাল। কাল্‌চারালী ক্যাচারাল্। ডুবই রুবই বিউটিফুল্। বলতে চাই—অন্যত্র কবির আদরের ভাইঝি—ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী "পুরাতনী" নামে একটি বইয়ে—তাঁর স্বনামধন্য আই. সি. এস্ বাবার লেখা চিঠি, যেগুলি তাঁর মা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লিখেছিলেন—তা ছাপা হোয়েছে। টো টো। নো বাদ-সাদ। প্রথমেই সত্যেন্দ্রনাথ "প্রাণের জ্ঞানু" বলে সম্বোধন কোরে—সমাপনান্তে শেষে জানাতেন—চুমা। কখনো অনেক চুমা। কখনোও বা নাম্বারলেশে—কোটি চুমা, পর্য্যন্ত। কত আন্তরিকী অন্তরঙ্গতা। কত রভসিতায়ী রসাস্বাদনা। কিন্তু, বোলবো—বিশ্বকবির আপন প্রিয়ার প্রতি জানাতে ঐ রাখা আদরগুলো—বাদ দেওয়া হোয়েছে। মৃণালিনী দেবী, তুমি জানবে এমন করে কবির কোনো ব্যক্তিক ভালোলাগার প্রকাশী ঐ ভালোবাসার কথা—তোমার চিঠি থেকে সরিয়ে রাখা—সমীচীন কাজ হয় নি। মনে হয়—কোনো কোনো ব্যক্তিত্বময় স্বত্বার কাছে—চুমাটা—বোধ হয় খারাপ কিছু! ব্যাড্ অডারে বিচ্ছিরি কি! না, নো—নট্ বাই এরটা কণাটাক তাই। চুমা এক পবিত্রময় স্বত্বায়ী প্রকাশ। স্বামীর জন্য। স্ত্রীর জন্য। মন দেয়ী, মন নেয়ী এই শরীরী ভালোলাগা ভালোবাসায়—দু'জনাই যুগবর্তী যতীকায় ছন্দ মিলাতেয়ে পার্টনার হওয়ায়—মিথুন সাজায় চার্টার্ডী অনুভূতীয়ী রঙ্গলায়, সঙ্গতয়ী সম্ভোগায়—চুমা হোলো—দ্য ফার্স্ট য়্যাণ্ড ফোর-মোস্ট এক ক্রাইটিরীয়ারী অর্নামেন্টেশান্।

বলি, দেবী মৃণালিনী—তুমি কবিকে যৌবনী যৌন-যোগে রাঙ্গাতে পেরেছো বলেই ত'—কবির 'কড়ি ও কোমল' সার্থক সনেটী-সৃষ্টি। না হোলে থেকে যেতো ভাবে-দাবে-ধাবে—শুধুই অবিন্যস্ত। অনাতিক্রম্য। তুমি প্রিয়া স্ত্রীর ভূমিকায়, মনের নিভৃত কুটীরায় থেকে সবার কোরেছ—আজ বিশ্ববন্দিতায়। আমার মানসী মানসায়—তুমি মাত্র তিরৈশীটি বসন্তের মধ্যয় শৈরী—ঐ ঐ ওয়ান্ স্কোর্ ওয়ান্ ডীকেডে—যেভাবে কবিকে এক বিরাট মাপের মন দিয়ে মনোবাসিত, এবং আর আর যে স্বরাটী তাপের দেহ নিয়ে দেহোভাসিতায় যে আর তারই যে জমনীয় রমণীয় দীক্ষায়—ঐ বীক্ষা রমণা সাজাতে পেরেছিলে, রাজরাজারেতে শিক্ষা নেওয়াতে পেরেছিলে—তুলনায়, নান্ দ্য এনাদার কনসর্ট ইজ ফাউন্ড, হুইজ্ বীলীভীবেলী এভাইলেবল্ আন্টীল্ নাও—ইয়েস্। লাইক্ওয়াইজ্লী ইয়্যু, দ্য গ্রেটেস্ট য়্যান্ড প্রেটীয়েস্ট্ আইকন্ উইদীন্ দ্য টেগোর, দ্য ফীলানথ্রপিস্ট—আটারলী য়্যান্ড্ ম্যাটারলী, ও মিসেস্ টেগোর, ইয়্যু আর কমিটেড্লী—একজন আন্-ক্যমন উওম্যান, রমণী রত্না। তুমিময়ী আপন শরীরী নানান ছবিতায়—মহাকবির মূর্ত বিভাসিত কবিতা হোয়েই আছো। তোমারই ওজস্বিনী ভাব ও তাব—ঐ ত ভাবীকালে

একদিন ঐ 'চার অধ্যায়ে'র এলাকে কী বাধ্য কোরেছিলো না—কোনো কিছুতে তোয়াক্কা না কোরে—প্রিয়াল্ অতীনকে মারণ-যজ্ঞে ঝাঁপ দেওয়া থেকে বিরত কোরতে—শেষ অস্ত্র হিসেবে ট্যাক্টফুলী মেয়েলীকী আর্ট ফুটিয়ে তুলতে—ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামাটা। সত্যি সাধ্যায়ীকী মধ্যস্থতায় টেনে আনাতে গিয়ে এক পিছলী পথের বিধ্বংসী ভুল করাটা থেকে—স্বামী অতীনকে স্থিতধী, মিতধী, মায় ঋতধী করাতেয়ে। আর সত্যি পেরেছিলোও তা—নায়িকা এলা, একলাই একাকীত্বয়ী নির্জনী নিভৃতায়। মানি আর ভাবি—দ্য গ্রেট্ কজ্ ওয়াজ য়্যাবাইডেড্ বাই—এই এই এথাকার ভাবী ও ধাবী ঐ শারমন্টা ছিলো—দেবী মৃণালিনীর মধ্যে তোয়ার থাকা আর ঢাকা, ঐ সত্যিকারের দেহী সাথ দেহমিতার সাঁতারায়—কবি স্বামী হিসেবে পেয়েছিলো সৃষ্টিরই মহতী সোয়াস্তীর স্বস্তিকাটা—যখনি প্রিয়াতে তারই সমার্পিতায়ী সায়রায় নতুন নতুন সায়রী ফোটাতে চেয়ে—সাতারাই মাতারায়—অতি সযতনায় রাশি রাশি ঐ প্রস্ফুটিয়ী রতিভাসে, তথা যতিভাসে—কবি বারে বারে রেঙ্গেছিলো রতনসম্ভারী ভরাট ও দরাট দেহালাপি—ঐ ঐ ফ্রেশী ক্রেস্টে ও থ্রাশী থার্স্টে।

সেই যশোর নগর ধামের, দক্ষিণদীহী মৌজার ফুলতলীর জমিদার-দুহিতা, বলি—তখনি তুমি নাই ছিলে সামান্যয়ী 'এক পল্লী-বালা, হাঁ ছিলেয়ী অতিশয়ী ঐ ন্যাচারী প্রাণোচ্ছোলায়, টু মেট্ ওয়ানস্ সীনসীয়ারনেস্, মিঙ্গেলড্ উইথ্ ইমিডীয়েট্ পারশেপশনস্, ফুল্ অফ্ সাচ্ সেন্সেবিলিটিস্। তাই ছোটো তনয়—এই রবির বৌ হোয়ে এখানে এসেই দেরী না করে ভর্তি হোলে—সে সময়কার স্ত্রী-শিক্ষার বনেদীয়ানায় একচ্ছত্র—ঐ লোরেটো হাউসে। ঐ আরজীনাল লোরেটোয়, যার অবস্থান—আজ দেড়শত বছর পেরিয়েও—ঐ সেই রো আর স্ট্রীট্—মিডল্টন্ দিয়ে ঘেরা—দু ধারার মধ্যে।

তবে, লোরেটোয় ভর্তি হোতে ওখানকার অথরিটির সাথে—মৃণালিনীকে বেশ যুদ্ধ কোরতে হোয়েছিলো। প্রিয়তম, কনিষ্ঠ আত্মজের নব-পরিণীতাকে ভর্তি করাতে—স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই উপস্থিত হন—লোরেটোয়, বধূমাতাকে সঙ্গে নিয়ে। একে পরিণীতা, আর লুসি গ্রের মতো প্রকৃতিশোভিতায়ী ভিলেজ্-গার্ল—মহর্ষির্ বধূমাতা, মে বী এ জমিন্দারস্ ডটার, য়্যান্ড্ য়্যাট্ দ্য সেম্ টাইম্ ডটার-ইন্-ল অফ্ এ সাচ্ পার্সন্ হু ওয়াজ্ দেন্ ফেমাস্ ম্যান্ য়্যামঙ্ দ্য লুমিনারিস্ অফ্ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী। সে সব কথা অবশ্যই স্মরণে ছিলো অথরিটির। ভর্তি করাতে প্রথমে বেশ গাঁই-গুঁই। না-না, পরে অজানিত কারণে—হাঁ-হাঁ। মৃণালিনী ভর্তি হোলেন।

তবে ভর্তির আগেই, সাধ ও সাধ্য থাকায়—শ্বশুরবাড়ীতে তখনি য়্যাপয়েন্টেড্ হওয়া ইংরেজ গভার্নেসের কাছে তালিম পায় ভালোতেই—ঐ নববধূরই—না—নবোড়া সাহস ও সৌকর্য। ভালো মেধা থাকায়—উভয়তই দ্রুতয়ায়—কাজ সমাধায় আসে।

এই নিয়ে, মহর্ষিকে পরে একদিন লেডী প্রিন্সিপাল্ ইন্‌ভাইট করে—প্রথমে করা আপত্তির জন্য ক্ষমা চেয়ে—জানাতে বাধ্য হোয়েছিলো—বাই দ্য ডাইরেক্ট্ ইন্স্ট্রাকশন ফ্রম্ দ্য ক্রাউন্—এইটাই যে, মৃণালিনী—তোমার দাদাশ্বশুর জবরদস্ত একজন কর্মযোগী মনীষী ছিলেন। এই দ্বারকানাথই প্রথম ভারতীয়—যিনি নিজেরই উদ্যোগে ভারতে—প্রথম রেল-পথ বসাতে চেয়েছিলেন। খুবই উদ্যোগী ছিলেন। এই হাওড়া থেকে ঐ আসানসোল পর্য্যন্ত—নিজের কুশলী জ্ঞান ও চিন্তাধারার অসাধারণ প্রোগ্রেসিভনেস মতো।—তাঁকে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়ার বন্ধুত্বে—অভিষেক দিয়েছিলো। বন্ধু বলে গণ্য করার স্বীকৃতিস্বরূপ—মহারাণী নিজে থেকে অনার্ দিতে—'প্রিন্স' উপাধিতে ভূষিত করান। দ্বারকানাথের আয়ত্তে ছিলো সমানে সমানে টক্কর দিয়ে চলারই—এক সামাজিকী—সম-নীতী।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর রাজমুকুটে পরতেন—ভারতেরই প্রাইসলেস্ ঐ কোহিনুর খচিতায়ী—ঐ ঘোমটা-সদৃশী পরিচায়কটা। আর উনার বন্ধু—এই রাজপুত্র 'ডাওয়ারকানাথ্—যখন কী তখন উনার ডাকা নেমন্তন্নে সাড়া দিয়ে প্যালেস্ বাকিংহামে আসতেন—সে সময় বিশেষে, তাঁর পায়ের দুই পাদুকায় শোভায়ীতে ঝলমলাতো—দাম দামী রত্ন-সম্ভরার—জৌলুস। হীরা, পান্না-চুনী, সব সেট্ করা থাকতো। মহারানীর সাথে রসিকতায় নেমে দ্বারকানাথ বলতেন, "মহারানী, ইয়োর রয়াল্ ম্যাজেস্টী, তুমি তোমার মাথার মুকুটে রত্নরাশির শ্রেষ্ঠত্বয়ী জৌলুস দেখাতে পারো! তখন আমিই বা কেন কম যাই। আই ওয়্যার্ দ্য প্রেসাস্ জুয়েলস্ ইন মাই—'লপেটা'। য়্যাম্ আই রঙ্?"

এই দ্বারকানাথ ছিলেন আপন বোঝাবুঝির দুনিয়ায়—ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। ছিলেন নিভৃতেয়—ব্যাঙ্ক মাইণ্ডেড্। তৈরী হোচ্ছিলেন—জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায়। যা সমাজে সাধনেতে সক্ষম—মানব সেবাতেই। তখন রাজ-বান্ধবী ভিক্টোরীয়ার অনুমতিতে, ১৮০৫-এ ভারতের প্রথম রাজকীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা পেলো—এই বাঙলায়, "ব্যাঙ্ক অফ্ বেঙ্গল"—নামে, পরবর্তী ধাপে বোম্বাই ও মাদ্রাজ ঘিরে হোলো ইমপেরীয়ল্। তারপরও—আজকের এই স্টেট্ ব্যাঙ্ক। কর্মযোগী দ্বারকানাথ একক চেষ্টায় ঐ 'ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলে'রই কাউন্টার-পার্টে, স্থাপন কোরলেন—'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক'। ওটির চেয়ারম্যান হোলেন উনিই। ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসার ইতিহাস, কখনোই দ্বারকানাথকে বাদ দিয়ে—হোতে পারে না।

যাক্। ও কথা।

সেই প্রিন্স্ ডাওয়ারকানাথ—খোদ মহারানীর যিনি ছিলেন এক বিশ্বস্ত বন্ধু, আর যাঁর নানাবিধ ব্যবসার সাথে, সব সময়ই লেনদেনে—ভিক্টোরিয়া রাজী থাকতেন—আজ, সেদিনকার সাম্রাজ্ঞীর ভারত-বন্ধুর নাত্-বৌ এই মৃণালকে

লোরেটোয় ভর্তি না করালে যে—বৃটিশ ক্রাউন্‌কেই—ইংরেজ হোয়ে অবমাননা করা হোচ্ছে—। তাই—টু সীক্ য়্যাপোলজী ফর দিস্—স্বয়ং প্রিন্সিপাল মহর্ষির সাথে দেখা কোরে জানাতে পেরেছিলেন,—"মিঃ টেগোর, রীয়েলী উই আর গ্ল্যাড্ টু য়্যাড্‌মীট্ মৃণালিনী টেগোর য়্যাজ এ স্টুডেন্ট্ ইন্ আওয়ার ইনস্টিট্যুট্। উই, দ্য ফ্যাকাল্‌টি কানট্ ডীস্‌অনার ইয়্যু, বাবু দেবেন্দ্রনাথ, শন্ অফ প্রিন্স্ দ্বারকানাথ—হু ওয়াজ্ আওয়ার য়্যামপ্রেসেস্ মোস্ট্ ট্রাস্টেড্ ফ্রেণ্ড, য়্যান্ড্ এগেইন্ হু ওয়াজ্ এ গ্রেট্ কানেকশন্ বিটুইন্ দ্য ক্রাউন্ য়্যাণ্ড্ উইথ্ দ্য পীপল্। উই সে—মৃণালিনীস্ ক্যাচিঙ্ পাওয়ার ফর্ লার্নিঙ্, ইজ্ দ্যাট্ ইন্ এ সাট্‌ল্ ম্যানার্। শী পজেজেস্ গুড্ সাসেপ্‌টিবিলিটিস্ ফর এনি থিং। বাই হার, উই রীয়েলী হ্যাভ্ অনারড্ নট্ অন্‌লি প্রিন্স্ দ্বারকানাথ, আওয়ার য়্যাস্টীমড্ ফ্রেণ্ড, বাট অলসো দ্য পীপল্ অফ্ দিস্ বৃটিশ টেরীটরী। এগেইন্, উই সে উই ফীল্ প্রাউড্ ফর হারস্ জয়েন্ ইন দিস প্রেস্টিজিয়াস হাউজ্।"

তারপর আর সবই ছিলো—ছিমছাম। গতিময়। মহর্ষি আদরের পুত্রবধূকে লোরেটোয় রাখলেও—ইংরেজীতে তুখোর্ করাতে আর শিক্ষা নিতে—সব রকম ভার দিয়েছিলেন—ইরেজ গভার্নেসের ওপরায়। শুধু কী তাই! বেদ-উপনিষদ আর বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যায়নের জন্য যাতে অচিরায় হোতে পারে ওয়েল্ ভার্সড্—তাই সংস্কৃততে পারদর্শিনী করাতে নিয়োজিত হয়েছিলো—সংস্কৃত কলেজের সেরা অধ্যাপক। আবার সাথে সাথে গান, ছবি আঁকা, সূচীশিল্প—এমন কী মেয়েদের শিক্ষণীয় শরীর-চর্চায়ও—মহিলা ট্রেনার রাখা হয়। আর সর্বোপরি মহর্ষি নিজে উদ্যোগী হোয়ে তাঁর আদরের এই রবির বৌকে—শাস্ত্রীয় পাঠ ও ব্যাখ্যায় শেখাতেন প্রায়ই—কাল সন্ধ্যায়, সময় নিয়ে।

মৃণালিনী ওদিকে লোরেটোয় পড়তে পড়তে, তোমাকে রাজ-বাড়ীর মধ্যে পাওয়া শিক্ষাটাও—চালালে ভালোই, সিক্ষানবিশীনী হোয়ে। সবার তারিফ পেলে, তুমি যে রবির বৌ। তারপর, অল্পদিনেই সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ—এবং দেশাচারী ঐ কালচারার বেদ-বেদান্ত-নির্ভর এবং উপনিষদী পৃথটায় নির্ণীত—অনেক কিছুই জানার মধ্যয়, শোনার মাধ্যমে, উপরন্তু পঠন ও পাঠনায় বুঝে-বুঝে শিখে নিয়েছিলে। গুরু যে স্বয়ং শ্বশুরমশায়—মহর্ষিদেব। ভোগ ও ত্যাগ, জ্ঞান ও প্রমা—যাঁর জীবন-বৌবনের একমাত্র মূল-মন্ত্র ছিলো। তুমি সত্যি ঐ অল্পবয়সেই—নিজের মধ্যে থাকা এক অসাধারণ অধ্যাবসায়ী রাজ-মেজাজীয়ানায়—হও সফলা। উপনিষদের গভীর সব ত্বত্ত্বে পুত্রবধূকে শিখিয়ী তালিমায় দেওয়ার সম্পূর্ণতা অর্জনান্তে, চয়নান্তে—হাঁ তারই অয়ন ধরে ধরে—তোমার মধ্যে প্রজ্ঞা এক পরম পারমিতার ধিকি ধিকি—দেবীত্বেয়ে তুমিয়ী মৃণালিনীতে—হয়ে আগুয়ানা। রয় রয় জাগুয়ানা।

মৃণালিনী, তোমার হাতের লেখা দেখেছি। বড়ো বড়ো মুক্তোর মতো জাঁকিলী অক্ষরা, সে সব। ছবির মতো টান-টান কোরে টানা সে লেখা। জানি, মহর্ষিদেব তোমাকে দিয়ে কিছু কিছু শক্ত ও গম্ভীরাই সূক্তির—বাংলায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। ভালোই অনুবাদিকা হোচ্ছিলে। কিন্তু সময় কোথায় ? দিন-মান মাপা ছিলো, সকালে শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রানুধ্যান। যোগাভ্যাস। তারপরই সুগন্ধি জলে অবগাহন, পবিত্র স্নান। দাসদাসী প্রচুর। কেউ আলতা পরাচ্ছে তখন। কেউ কেশ-প্রসাধনরতা। কেউ বড়ো আড়শীর সামনে ধরেছে সিঁদুরদানি। তুমি ওটা অবশ্যই পরতে সাজায়ে—আপন হাতে। সিথান পর থাকা, কয়েক ভরির টিকলি অবশ্যাই, সরিয়ে। কপোলে লৌধ্ররেণু। এরই মধ্যে বক্ষসাজে, কাঁচল তলে—সুবাসিতর সৌগন্ধ ঢালা। আরো কতো কী। নিজে হাতে তারপর কিছু না কোরতে হোলেও রাজবাড়ীর একান্নতায়—ছোট বৌয়ের করা তদারকীতা ছিলো—সকলেরই প্রিয়। কী ছোটো, কী বড়ো, সবাকারই। এই ভাবে কাটে বিনমান। বেলি যায় অবসানে। আসে সাঁঝ ঝাঁজলায়ী মাতালায়। তখন থেকেই তুমি—কবির জন্য—থাকো, সেফ্ সাইডে। জয়াসী রাইডে—চয়াসী গাইডে—ভয়েসী চাইডে—আর আর সারা ফীমেলীকায় তুমি ধারালোয়ী ভারামাতী—রতিয়ী হাইডে।

তোমার ঐ গোনা-গুনতির তিন দশকী যৌবন যখন ভরা গাঙ্গে রাঙ্গেয়ে সাঁতার কাটানে সঁপে দাও—এই দেহ এই মন যৌথয়ে মিউচ্যুয়ালে—কবি তখনই রোজ রোজ তোমাতেই—সমর্পিত। মৃণাল, খেলাও এ দেহেরে তোমারই ঐ খেলাঘরে—মনবাসরে, যৌনভাস্বরে—যাহা চাও তাহাই পাবে, মৃণালে। মৃণালিনীর বধূয়ী শরীরী স্বত্বা যে তাই থরে থরে রেখেছে সাজিয়ে, রাজরাজেশ্বর কবি-পতির ভোগে—পূজিতার ডালি হোয়ে। না-না, যোগেও। রাজজোটোকী যোগে। তুমি, এখানে জোড়াসাঁকোয় থাকলেও, থাকতে দারুশায়—ব্যস্তয়ী। ত্রস্তয়ী। শ্বশুর, ভাসুর, ভাদ্রবৌয়েরা, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি, বলি ত তায় বলি,—তুমি যে ছিলে ছোটো বৌ। আর তাই "ভাই ছুটি"-টা কবির হৃদয়ী আসনায় হোলেও, এই বিরাট সংসার—সত্যি কোথাও তোমাকে ছুটি দিতো না—সহজায়।

প্রাসাদ বাড়ীতে তদারকির কী কোনো শেষ ছিলো, না থাকতে পারে! জমিদার গৃহে জমিদার গৃহিনী হওয়া—সত্যি চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক, আরো অনেকখানি কথারই—খানদান। এথায়ায় দাস-দাসী হুকুমবরদার অগুণতি থাকলেও,—বলি ছোটো বৌ, তোমার করা দেখভালী ঐ সেবাব্রতটা যে সকলেরই চাহিদার ঘরে—অবধারিতে খুবই আবদারীত্।—আর, শান্তির দরাজীত্ সুনিকেতী ঐ শান্তিনিকেতনে—যখন যখন এসে থাকা হোতো তোমার, সবাইকে নিয়ে—কবির সাথে বেলা, রথী, রেণুকা, শমী ও মীরাকে নিয়ে—তখন সংখ্যায় ওরা শুধু সাত'জনা

নয়—পুরো এ আশ্রমবাসী আশ্রমিকেরাও—তোমার থেকে পাওয়া সেবা ও যত্নর খুশীলী এ দুনিয়াতে, হোতে তা পেতে—আর্তিতী। একে কোরবো আর ওকে নয়—তুমি কখনোই মন-মানসিকতায় য়্যাবস্যুলিউট্‌লী—নট্ য়্যাবাইডেড্ বাই দ্যাট্! ফেসিয়ালী টলারেবলে—নাহি ছিলে ডাবল্ ফেস্‌ড্,—ইন্ আউট্‌লুক্। এখানে—সবাইই ছিলো যে একান্তই এই তোমারই। আর তুমিও যে ছিলে—সবারই আপনার। কেউ বাদ নয়। বিরাট চৌহদ্দির অসংখ্য দারোয়ান ছিলো। ওদেরই মধ্যেকার হেড্ দারোয়ান, ঐ পাণ্ডেজী,—আর কাজ করার ভ্যালেট্‌দের নিয়ে তাদেরই প্রধান ঐ বনমালীই হোক্ না কেন—সবাই যে ছিলো তোমারই প্রিয়জন। তাই বলি—তোমার 'আশ্রমলক্ষ্মী' নামটা—সর্বার্থেই, সার্থক।

মৃণালিনী, কার কোলের বাচ্চার জন্য ওষুধ চাই, কার বরাদ্দ থাকা দুধের পরিমরাণ একটু বাড়াতে হবে। কার মাসমাইনের কয়টী টাকা বাড়াতে হবে, কার ছুটি চাই—হাঁ, এই ব্যাপারে স্বয়ং জমিদার সাহেব সশীরে উপস্থিত থাকলেও, এ নিয়ে কবিকে বিব্রত করা নয়—আবেদন আসতো তোমারই কাছটিতে। মমতাময়ী মা সদৃশায়ী—এই জমিদারনীর কাছে। সেরেস্তার সরকার মশাই তহবিলের খাজাঞ্চিমশাই—সবাই টথস্থ থাকতো,—এই বুঝি কবিপত্নীর ডাক আসছে। এটা কোরতে, এই এটার জন্য। আর ওরা জানতো—মায়ের করা কোনো আবেদনই ফেলে রাখা যাবে না, কোনো অজুহাতেই। নট্ তাহা পেণ্ডিঙ্। মায়ের, মানে আশ্রমলক্ষ্মীর এসব নির্দেশ—নয় নয় নৈবয়তে—কোনো আদেশ। যতো তাড়াড়ে তুমি পারো—তা সারতেই হবে। নো ওয়েটিং। নো বিলম্বতী।

তাই মৃণালিনী, তুমি যখন অকালে, টু মাচ্ আন্টাইম্‌লি—চলে গেলে সব সাহেব সুবো চিকিৎসকের—গ্রুপ্-চিকিৎসাকে পুরোটায়, ঠকিয়ে, আর হারিয়ে—তখন কবি-পতি হন—ড্রাউন্‌ড্ টু নানান সমস্যার—অথৈজলে। অশ্রু নয়, কান্না নয়, নয় বিমূঢ় হওয়া।—তুমি মৃণালিনী কবিকে করে গেলে—শক্ত মনের। স্টীল্ ফ্রেমী। কঠিন মনের মধ্যে—কঠিনতর দেহের মানুষ।

তুমি আর নেই। তখন তুমি সবে মর্ত্যরই মস্ত শর্ত মেনে অপসরণ নিয়েছো—নীচু তলাটা ছেড়ে—উঠে গেছো ওপর তলাকার—ঐ স্বর্গে। ঐ হেভেনে। তখন, নেই তুমি বলে সব কিছুর দেখভালে, আর আর রাখ্‌ভালে—টেক্ ওভারে, মহাকবি গীতাঞ্জলীর পথে এগুতে থেকে, বলেছিলেন—

"ওগো তুমি গেলে চলে সত্যিই—এভাবে আমায় একলা কোরে। একাকী রেখে। বলি, তুমি আজ আমারই মধ্যেকার শক্তি হোয়ে, আমারই চালিকা-শক্তি থেকে বলে গেলে—ওগো নিরুপম, এবারটি থেকে তুমি একলা চলবে। যা দিয়েছো আমায়, যা নিয়েছো তুমি—জানবে, তুলনা তাহার নাই। নাই।

মৃণালিনী, তোমাকে জানাই, অশেষ আর্তায়—১৯০২-এর জুলাইয়ে—তোমার ছোটো ছেলে—দেবোপম কান্তির শ্রীমান শমীন্দ্রনাথ—তখনি দাদু মহর্ষি ও ঋষিপ্রতিম বাবার কাছ থেকে পাঠে আর পঠিতায় অর্জন কোরেছিলো,—বেদ ও উপনিষদী ভাণ্ডার চয়ীতে, মোস্ট্ চয়েসী মতোটার ঐ ঔদাত্তয়ীক্ উক্তিয়ীক্ প্রাপ্যয়াত্ বরতীত্ এক নিবোধোতায়—জ্ঞান ও প্রজ্ঞা. হাঁ ঐ কিশোর শমী, আদরের ঘরেরই ঐ আহ্লাদীত্ আবদারার ঐ শমী—যে বেড়াতে গিয়ে এক কালমহারীর অসৌজন্যতায়ী বেড়াচাপে—বিদায় নেয় অকালে, থেকে পরে এই পৃথিবীটা। কবি তখন কলকাতায়।

খবর পেয়ে—কবি হোয়ে গেলেন সাইলেন্ট্। পুরোপুরি নীরব। নিথর। নিশ্চল। বাক্‌রহিত্। একেবারে চুপ হোয়ে আছেন। আর, সত্যি ভগবান, আর কতো এমতিক মর্মান্তিক শাস্তির কথা লিখে দিয়েছো—কবির অন্তরাত্মার জন্য ! এতো ভালো নয়। তাই মনে করে, পাশটিতে বোসে থেকে, কবির পিঠে আদর বুলাতে বুলাতে,—কুড়ি বছরের বড়ো, বড়োদাদা—ঐ ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ—যেইমাত্র বার বার ডেকে উঠলেন—'রবি, রবি' বলে—অমনি ধারা অঝোরায় কবি ফেললেন কেঁদে। শমী যে ছিলো—ঠাকুরবাড়ীর দুই বাড়ীরই সবার প্রিয়। কবির চোখের মণিশ্রেষ্ঠ। কবি বুঝেছিলেন—এই শমী বড়ো হোয়ে পিতার কাছাকাছি নতুন এক প্রতিভা হোয়ে আসতে পারতো।—আপন প্রমায়ীতী প্রতিভাসে। নির্মম নিয়তি ছিনিয়ে নিলো শমীকে, মা মৃণালের দারুণ আদরার, দিদি মাধুরীলতা ও দাদা রথীর প্রাণ-স্বত্বা,—এই শমীকে।

শোনো, যা বলছিলাম। যেদিন কবির জীবনে এই বজ্রপাত আসীন হয় অনামধেয় অযাচিতয়ায়—সেদিন এই পশ্ এরীয়া এই ভবানীপুরে—এথাকার এলিট্ ভবানীপুরীয়ান্‌রা—স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে দেশে দেশে অনুষ্ঠিতয়ী সব স্মরণ-সভার মধ্যে—সর্বপ্রথমেরটি সম্পন্ন হয়,—এই এখানেই। কবি-শ্রেষ্ঠ, ঋষিপ্রতিম 'গীতাঞ্জলি'র মতো শ্রেষ্ঠত্বয়ে সুসমৃদ্ধিক এক প্রয়াণ-ব্রতে—শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বোসে সভাপতির আসনটি অলংকরণায়। সেদিনই পাওয়া যাঁর পুত্রশোক—ছাপিয়ে গেল এই হারজিতেরই মিলন-মেলায়, স্বামীজীর প্রতি অর্ঘ্য নিবেদনে, শ্রদ্ধার ডালি অর্পণায়। এই সভাটিই বিশ্বের প্রথম অনুষ্ঠিতয়ী স্বরণ সভা। সভা গমগম কোরেছিলো—মহাকবির অভিভাষণায়ী ওজস্বীয়ী ভাবে, দর্শনায়।

জানো মৃণালিনী, লেডী আর. এন. টেগোর, লোরেটো হাউস্ কাম্ সংস্কৃতয়ী ধ্যান-মার্গে শিক্ষিতায়ীত্ আলোকপ্রাপ্তা। বলি দেবী আশ্রমলক্ষ্মী—একটা বিশেষ ধারার খবরায় তোমাতে রাখছি—নিবেদনায়।

জানো, আজও দেশে কী বিদেশায় স্বামীজীর ভক্তরা, মানে বেশীরভাগই অন্ধভক্তরা কিন্তু—তোমার পতিদেবতাকে, হাঁ উনি ত দেবতা বিশেষই, দ্য বর্ন

আইকন্—তবু একজন ভালো কবির চাইতে বেশী কিছু বলতে রাজী নয়। তা কী জানো। কাছাকাছির ঐ সিমলার মহান যুবক—য়্যাট্ স্টোনস্ থ্রো-তে থাকা ঐ জোড়াসাঁকোর ঐ রাজ-প্রতিভার প্রতি—যেন ছিলো বরাবরই—অনীহা যুক্ত। ঋষি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা শ্রীমতী লীলাবতীর সাথে বিবাহিত কৃষ্ণকুমার মিত্রর ঐ বৌ-ভাতের আসরায়—বিখ্যাতয়ী এই দুইজন প্রথমবারের জন্য—একসাথে হোয়েছিলো, মিলিতায় ঋলীতায়—মুখোমুখী। দু'জনাই আমন্ত্রিত আসর জমাতায়, রমাতায়। রবীন্দ্রনাথ সেই আসরে গান কোরেছিলো নিজেরই লেখা গানে গানে সুর ও ঐশ্বর্য্য ঢেলে। মনেরই মাধুরার উজারায়। আর বিলে, ওরফে নরেন কর্মযোগে বাজিয়েছিলো—সুরঝঙ্কারার ঐ ব্যাঞ্জো। জমেছিলো। দারুণ। দুই যুগন্ধর যে সাথ সাথীলায়ে ও মুহূর্তায়—একযোগী। এককাজী।

মনে হয় গাইতে গাইতে খুশীলায়—রবি-কবি বার ভারী আবারোয়ে—চাহনি রেখেছিলো নরেন দত্তর প্রতি! কিন্তু, নরেন? বলি—গড্ নোজ্ তাহা। বলি আবারো, এতো কাছাকাছি হোয়েও—কেউ পারলো না একে অপরের সাথে মিতালিতে—হাতটা এগিয়ে দিতে। না, নাই যেন। ছন্দ যে বেসুরে বাজছিলো—মনে মনে! কার? কবির নয়। বোধহয়—হবু সন্ন্যাসীর। আবারো বলি জোর জোরীতী সজোরায়—মীড় জমাতে কিন্তু তোমার পতিদেবতা বার বার প্রচেষ্টায়ী অনুভাবে—রঙীন ছিলো। কিন্তু অপর পক্ষ! সে যে অজানিত কারণায়—বরাবরই নীরব।

কিন্তু এই বিরাট কালের কপোল তলে—কবিসম্রাট, বার বার বিশ্বের নানা প্রান্তে দাঁড়ীয়ে—এই স্বামীজীতে আপন মনের সাধুরাই প্রাণোচ্ছলী আর্তায়ীত্ বার্তা পৌছে দিতে পেরেছিলেন—যতদিন এই মর্ত-ধামে ছিলেন—পৃথিবীর একচ্ছত্র একমেদ্বীতীয়ম্ প্রতিভা হিসাবে। মৃণাল, তোমারই কবি-পতি। বলি আমি—পৃথিবীর চলার পথে—সব কিছুতেই, সব সব ইচ্ছায়ী ইস্যুতে—কবি নিজেকে দিয়ে করিয়েছিলেন এক রাজর্ষি শ্রেষ্ঠর তপস্যায়—No stone left unturned. তাই হিসেবায়—He is the only unparallal বিশ্বময়ে। ইউনিভার্সাল সবাই থেকে। সবার থেকে—ব্যবধান ছিলো—না ছোঁয়ারই কড়াড়ায়। হাজার জাজারী—হাজার হাজার ক্রোশ ব্যবধানে।

তুমি ত জানো মৃণালিনী—রথীর বন্ধু, সান্‌ফ্রান্সিসকোর স্বামী অশোকানন্দ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি—মস্ত অনুরক্ত। তিনিই রথীর কথামতো—শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিকীতে,—কবি-শ্রেষ্ঠকে অনুরোধ করেন—একটি কবিতায়ী রীদমাস্ বাণী দিতে।

দেবী মৃণালিনী, তোমার শাশুড়ী শ্রীমতী সারদা, কবি সম্রাটের জননী—বলি অতি সাহসায়—তিনি মা হিসেবায় নন্ মোটেই অতি কোনো—সামান্যা রমণী। সামান্যা মা। হন্ যে মাদার সুপিরীয়রা, হোলি ক্রীয়েটর্। বলি, কানুনায়ী কারণায়—

মিমেস্ সারদা ঠাকুর—য়্যাজ্ এ মাদার ইজ্ এক্সট্রীম্‌লী দ্য এক্‌স্ট্রা অর্ডিনারী। মহর্ষি স্বামীর ঋদ্ধলীত্ ভোগবাসনায় যতি মেলাতে, ছন্দ সাজাতে, মিল জাঁকাতে—রতি ও আরতির সম্ভোগায়—একটি মাত্র বার নয়, বার তার ছকীলায়ে বারংবরা জয়তিকী রাজ-রাজিলায় নিজেকে এই সারদা দেবী—প্রজায়নী পুণ্যব্রতয়ায় নোবলেস্ট্ ও সুইটেস্ট-এ পুষ্পবতী, প্রজাবতী করেছিলেন—চৌদ্দবার। রাইমী হাইমী টাইমায়—ফোরটীন্। পতিতে, স্বামীতে ঐ যোগী-শ্রেষ্ঠয়েতে তাঁর ভোগবাদী দর্শনাকে অনার্ জানাতে, অর্ঘ্য প্রদান করাতেয়ে, —এই এই বন্দিতয়ী ছন্দিতয়ী রীদ্যমাস্ নাম্বারায়—সারদা দেবী কন্‌সীভড্ অল দ্য বে্বস্—দ্য ফোরটীন্, ডান বাই ওয়েল ফটিফায়েডী ডেলীবারেটী—ঐ ঐ সময়ীত ডেলীভারীতে। অল্ ওয়্যার বনী চাইল্ডস্। ওরা, সবাইই এই 'শিশুতীর্থে ছিল লাভেবলী সৌম্যয়ী, রম্যয়ী। আর এটাও জ্ঞাতব্য—এই চৌদ্দটির আগে—যে মেকিং দ্য ক্রীয়েশন্ স্মুদ্‌লী কাম্‌লী—এক শিশুয়ীতী বার্থ চাহিলায় এক প্রীলিয়্যুডীতে সাড়া কন্‌ফাইনমেন্টে, জড়িতয়ী সৃষ্টেয়ে,—সারদার বধূত্বকে রত্নত্ব শোভায়ীতে ঐ সপ্তঋয়ী মিথুনায় নামায়—সতেরো বয়েসী দেবেন্দ্রনাথ, যখন কিশোরী সারদা সবে কৈশোরক ছুঁয়ে য়্যাট থার্টীন্—দ্য গ্রেট্ রীজয়সী বিগেনিঙ্ অফ্ দ্যাট্ সুইটি টীনস্। কিন্তু এই তেরোর চয়নীত্ মাতৃত্বটা গেরো হোয়ে যায়, অস্তয়ে যায় য়্যাবোর্টে।

বিরাট শিল্পসমৃদ্ধায়ী ঐ কন্‌ফাইন্‌মেন্টী পিরীয়োডিসীর মন্দিরে থেকে—সারদা দেবী—ব্লেশেড্ দাই মাদারহুড্ অর্ডারলী এক্‌স্ট্রায়ী অর্ডিনারীলীনা। প্রথম সন্তান দ্বিজু, ঋষি-কবি-স্রষ্টা-ম্যাথ্‌মেথিসিয়ান্ মায় ফীলান্‌থ্রপিস্ট্। দ্বিতীয় সত্যেন বৃটিশদের মধ্যে থাকা অসাধারণ প্রতিরোধী প্রভাব ভেঙ্গে ও সাঙ্গে—প্রতিযোগিতার মধ্যে হন প্রথম ভারতীয় আই.সি.এস.। সেই "হেভেন বর্ণ" সার্ভিসের একজন "স্টীল্ ফ্রেম্"। ইনি ভারতের—চতুর্থ ভারতীয় বিচারপতি। দ্য অনারেবল মিঃ জাস্টিস অফ্ বোম্বে হাইকোর্ট। তৃতীয় হেমেন্দ্র ওয়াজ এ গ্রেট কনইশার্ অফ্ আর্ট য়্যাণ্ড ক্র্যাফট্। পঞ্চম জ্যোতিরিন্দ্র, কবি নাট্যকার প্রাবন্ধিক এবং পেটরীয়ট ফর ফ্রীডম্। কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী দেশের অগ্রগণ্যা প্রথম লেখিকা হিসাবে সার্থকতায়—খুবই সার্থকনাম। ইনি আই.সি.এস. জানকী ঘোষালের গৃহিণী ও আই.সি.এস. স্যার জ্যোৎস্না ঘোষালের মা। আর আর সর্বশেষ ঐ চৌদ্দয়ী সনেটী সৃষ্টির—ঐ মীটীয়োরীক গ্লেয়ারা কাম রেটোরীকী রেট্রোস্‌পেক্ট্ —তিনি মহামানব রবীন্দ্রনাথ।

তাই আর তাই বলি, দেবী মৃণালিনী এমন মায়ের মতো মা এই শ্রীমতী সারদা ঠাকুরও কী দেশের, কালের একজন মহীয়সী জননী নন ? নন্ কী ঘরে ঘরে পূজিয়তী তরে—রুজোয়ী পুজ্যোস্পাদা ? অর্ঘ্য সাজাতায়ী আরধ্যায়ী। হাঁ গো হ্যাঁ। যেমনটা হোলেন পরমা প্রকৃতির—দেবী সারদামণি—শ্রীরামকৃষ্ণ জায়া।

মৃণালিনী তুমি নিশ্চয়ই জানো আর শুনেছও বলি, একদিন ইতিহাসের সামাজিক পাতায় উঠে আসে—জয়রামবাটীর মাত্র পাঁচ বছরের ঐ ছোট্ট সারদা—কোনো স্কুল ত নয়ই, পাঠশালাতেও নাই ছিল পড়াশোনা। যা ছিল, তা মহান এক নারীত্ব। তারই রত্নত্ব। উচ্চ মার্গীয় এক ধারাকার পাগলামির মধ্যে—সত্যিই, অসম বয়সের ধার না ধারোয়ে—সাধক প্রবর চাটুজ্জে গদাধর, নিজেই নিজের বিয়ের জন্য পাত্রীর সন্ধান দেন—পঁচিশে দাঁড়িয়ে, মাত্র পাঁচ বছরী—ঐ পল্লী-শিশুর জন্য। যে যেভাবেই দেখুক—তখন ছোট্ট সারদা শিশুকন্যা ছাড়া আর কী ! বিয়ে হয়। কিন্তু সংসারটা ত সাধকের। তারই মধ্যে বছর ঘুরি ঘুরি ঘুরতায়ে আপন কিশোরকালে উপনীতা, কৈশোরীকী ও কন্যা—একদিন সত্যিকারের মেয়েলী বাস্তববাদীতায় মুখরীতা থেকে—নারী হতে চেয়ে—পূজোয়ীত গদাধরকে জানালো—উয়োম্যানলি কথাটা—সাধকেরই ম্যান্‌লীনেশের প্রতি। ভাবভোলা আত্মভোলা অনেক বছরার সুপিরীয়র স্বামীকে, গ্রামীন্ ডীক্‌শানে—"কী রে, বলি এ আমায় কী আমার নিজের একটা ছেলে-পুলে দিবি নে !" উত্তরায়নে পৌঁছে পাগলা গদাধর সত্যি এক গদাই-লস্করী চালে জানাল—"কেনে ? নিজে ছেলে-পুলে না বিয়োলেই নয় ? দেখবি বৌ, আমি বলছি জগত জোড়া তোর ছেলে-পুলে থাকবে। কোল দিয়ে জায়গা দিতে পারবি নে।" রামকৃষ্ণ পরম সাধক—শিষ্য স্বামীজীর চাইতেও। অনেক, অনেক বড়ো মাপের। উনি ভবিষ্যতকে দেখতে পেতেন। তাই এঁরই কথা মতো সারদামণি হলেন—মা সংখ্যাতীতের। অবশ্যই জগৎ-জোড়া নয়। তা নইলেও ভারত জুড়ে হাজার হাজার ভক্তের মা। এদেশে বেশী, অন্য দেশে কম। সত্যি 'অচিন্ত্যনীয়' অচিন্ত সেনগুপ্তের "কবি রামকৃষ্ণ"—সেই সেই ভূতির খালে ক্ষীণতোয়া ঐ নদে—কবিময়ী চিত্ততোষে, পরনের কাপড় খুলে, উদোম হয়ে, সাঁতার কাঁটতেন। এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো তক্। বারবার। যেন ভূতে ধরায়ীল মানুষটার সাধকত্ব—এ পার আর ও পার হত। অনবরত খাল ঐ ভূতিতেই, মহান ফূর্তে। মহান খুশে।

জানি এমতি কথারই রেশ ধরে সেই কথায় রবি-কবি, স্বামী অশোকাননকে বলেছিলেন শেষ বারের মতো সান্ ফ্রান্‌সিস্‌কো ভ্রমণকালে—"নিজে কবি না হলে কী আর এমন ইনোসেন্টভাবে হৃদয়-ভাবাকুল হত পারতেন না—রামকৃষ্ণ। দ্যাটস্ দ্য হিজ্ গ্রেটেস্ট্ ইনার য়্যানালীসিস্।"

বলি, এই নিরীক্ষায়ী প্রতীত্ বোধ থেকে খুবই অনুভবস্নিগ্ধতায় আমি ফের বলিতে নামিলাম—নম নম নমস্কৃতি নিবেদনে মৃণালিনী, তোমার প্রিয় কবি-পতি জগত্ জোড়া খ্যাতির চূড়োয় আসীন আজ। তা কারুর জোরে অবশ্যই নয়। আবারো নয় নয়—কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রবর্তয়ী পরিচিতি—প্রসারণার গুণে ! নেভার এভার। তোমারই জীবন-দেবতা, কবিশ্রেষ্ঠ এই ঋষি-ব্যক্তিত্ব আপনার অনন্য পাওয়ারায়,

শক্তিময়তায়—হয়ে আছেন প্রতিভায় ও মনীষায়—দ্য আন্‌প্যারালাল্। সব, সব প্রতিভাধরের কাছ থেকেই। এড়িয়ে নয়। পেরিয়ে, পুরোপুরি। সারপাশড্। সত্যিই সবারে। তাই, থৈ থৈয়ী আনন্দায় যদি বলি—মৃণাল, তোমার শশ্রু-মাতা, এই সারদা ঠাকুর—এ-তোমারই আন্-প্যারালাল্ পতিদেবতার জননী হওয়ায়—কী একই পংক্তিতে—আমাদের পরমা-প্রকৃতি সারদামণির পাশ পাশ—স্থানাভিষিক্তা হওয়ার অধিকারিণী নন?—চরমা সুকৃতি সারদা ঠাকুর হিসাবে। যাঁকে, মহর্ষি আপন ভোগবাদে অবিসংবাদিত পার্টনার রেখেও—চাণ্টী চার্টারে বলাতেন—ঐ উপনিষদয়ী ত্বত্বয়ী তলাশটা—সুযোগ পেলেই।

সেই সারদা ঠাকুর, মহর্ষির কাছে পাঠ পেতেন, কোনো নবজাতককে কোলে রেখে, আদর করে—বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে—বেদ কী বলেছে। তাই।

আবারো বা—উপনিষদ কী জানিয়েছে।

মৃণালিনী দেবী আশ্রমলক্ষ্মী, তুমি জানলে কী ঐ লোক অনুসারীকায় পুণ্যতোয়ায় ওপরের এই মত—আমারই মত। তবে, এ মত ঐ ঋতায়ণী ঐ আকাশী ঐ নীলীম অসীমেরই ছোঁয়ায়—এ কথা পড়ে পড়ে সবাইই তা ভাববে—ভাবাকুলতায়। আপ্লুতায়ী আবেশায়। তাই তাই।

যাই বলে কথাটায় হোয়িতায়ে মোহিতায়ে—শেষটায়ী রেশ তুলিতায়—টু আঁক হোঁশ জাঁকিলায় রাঙ্গী এ ভাবেলে এ ধাবেলে—অবশ্যই জানি এটি একান্তই আন্তরিকতায় আমারই—ক্রীট্-ই ট্রীট্ই স্টেট্‌মেন্টী এক নতুনা টেস্টামেন্ট—মৃণালিনী দেবী, তোমারই জীবন দেবতায়ী রবীন্দ্রনাথে। জানো ত'—মনীষী রোঁমা রোঁলা রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দতে অধ্যবসায়ী পাঠ নিয়েছিলেন নয়, অতি আর্নেস্টী সীন্‌সীয়ারে তখন তা, সত্যি সম্ভব হয়েছিল, অলরেডী বিশ্ববন্দিতেয়ী কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে—ভায়া রবি-প্রেরিত রবির অশেষ স্নেহের ডাঃ কালিদাস নাগের সহযোগিতায়, ইন্টারপ্রিটেশনে। সে কথা ইতিহাসের কথা। সারা পৃথিবী তা জানে। সে সময় বিশ্বমানবিকতার মোস্ট human personality রূপী মিস্টার টেগোর সানন্দায় জানিয়েছিল—স্বামীজীতে অর্পিতায়ী আনন্দায়—".....study Vivekannanda, in him all is positive and nothing negative." আমি আজ মৃণালিনী, নিজেরই মনপসন্দয়ী চাহিদার মতোটি এই কবিকৃত অসাধারণ মন্তব্যটিকে সত্যি ঘুরিয়ে দিতে চাই, জায়গা বদলায়ে—সত্যিই ও কথারই প্রবক্তাতে। —স্বয়ং বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথেরই প্রতি। আবারো বলছি, সত্যিই, এমন ফীটেস্ট্ য়্যাপ্রীসিয়েশন্—একমাত্র উনাতেই হয় যথাযথ। স্টার্নলি য়্যাপ্লীকেবল্। কেন না যিনি তাঁর সাধনার চৌহদ্দীতে left no stone unturned—সত্যি, দেবী মৃণালিনী—রবীন্দ্রনাথই আজ ফীটেস্ট উত্তরায়ণ নিজেরই করা অমন বক্তব্যেরই—

ঘরে ও বাহিরায়—য়্যাব্‌স্যুলিউট্‌লী। তোমার কবিপতিই হলেন এই বিশ্বের একমাত্র Positive আধারার সাকার। কবির দুনিয়ায় নাই কোনো স্থান নাই তাহা কণামাত্র negative কিছুয়া। এই নিরীখারই বাণীময় গান্ধীজীর সাথে, মত পার্থক্য হতে হতে দূরে—অনেক দূরত্ব রচনা হতে থাকে—কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথের। হয়ত গান্ধীজী তা বুঝতে পেরেই, অনেক দেরী হলেও—দু'জনার মধ্যে হয়ে পরা এই দূরত্বতাকে ভেঙ্গে দিতে চেয়ে—স্ত্রী কস্তুরবাকে নিয়ে—সরাসরি চলে আসেন শান্তিনিকেতনে—কবিকে নিজের 'গুরদেব' জ্ঞানে ও শ্রদ্ধায়ী আপ্লুতায়।

এই একটি সবিশেষায় কহিবার তরে বিশেষ কথাটা—আমি ঐ কৈশোর গোয়েথ্, যৌবন কামেথ্-ই সন্ধ্যাযোগে ভেবেছিলাম—ভাবকুট্টিমারিয়ী ছাঁদেলে আর জাঁদেলে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ—আর আর সর্বোপরি এক রাজযোগ—সবই রবীন্দ্রনাথে সমার্পিতেয়ে—সুসমজ্জলিত্। কোনোটিই যার নাই বাদ। সব যোগের বিরাট ব্যঞ্জয়ী সমাহার, তারই জমাহার—এই উপনিবদী জীবনায়ন যাঁর, সেই রবীন্দ্রনাথে অসাধারণে স্থির ছিল। ছিল সুধীরাই। পজেটিভ কাজ, পজেটিভ চিন্তা, পজিশনালী প্রেফারেন্সী কথা ও বার্তা—কবিশ্রেষ্ঠর জীবন-প্যানোরামার মধ্যায় হয় এবং হতে বাধ্য—এর সবই অবধারতয়ী অনন্যতার। তাই যথাযথ পরিবেশ আর পরিবর্ধতয়ী পরিমণ্ডলার কথায়, তারই কাজে আর আর লেখালেখি, তার তার যৌগীকী সাধনায়—রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানে, ধ্যানে, প্রেমে, ভক্তিতে, ধর্মে এই পঞ্চমায়ী প্রজ্ঞায়, প্রমায় আর তারই প্রমিতিবোধে রাজসিকী রাজর্ষি বনাম "জীবন দেবতা"য়ী সম্রাট ছিলেন। কবির মহাদেশে, সব পেয়েছির মহতী বাতাবরণায়। সব, হ্যাঁ সবটাই ছিল—পজেটিভ্। কণামাত্র স্থান ছিল না—ঐ নেতিবাচকীয়—ও নেগেটিভজম্-এর।

মনে আছে আজও—রসা রোডের ঐ একশত এগারোর "দেবেন্দ্র মেমোরিয়াল"-এর কালচারের দোতলাকার ছিমছাম বৈঠকখানায় সোফা-সেট সাজানোর ঐ ঘরে মহান ব্যক্তিদের পাশাপাশি—ঐ যৌবনে সবে পা দেওয়া এই আমিও ঠাই পেতাম, গেলে পর হঠাৎই, স্কুল ফেরত। বসার জায়গা পেতাম উনাদেরই উষ্ণয়ী ছোঁয়ার মধ্যে, কারুর পাশটায়। এ পুরস্কার আমাকে দিয়ে থাকতেন পরম স্নেহের ভিয়েনে—স্বয়ং সেক্রেটারী মহারাজ (ফাউণ্ডার ত নিশ্চয়ই)। এই প্রাণতোষীল জ্ঞান-খুশীল চিন্তামন মহারাজ, স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ। তাঁরই অন্তরার ঐ উদারী আদরায়। একদিন বিকেলের সেমিনার শুরুর আগে সমাজের সে সময়কার পরিচিতির এক নম্বর ব্যক্তিত্বদের সমাগমে গম-গম, এই সুসজ্জিতয়ী ড্রইং রুম্—যা নট্ লাইকলি একটি আশ্রম। আমার এক পাশে চিন্তামন মহারাজ। অন্য পাশে স্যার যদুনাথ সরকার ও ডাঃ আগেহানন্দ সরস্বতী। সামনে সবার প্রিয় 'কেলোদা'—ডাঃ কালিদাস নাগ। পাশে ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। তার পাশে ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ, ও রেভারেণ্ড

ফাদার ডঃ শান্তাপো, দ্য গ্রেট বোটানিস্ট্। তখন সবাই কেক্-প্যাসট্রী ও চা খেতে ব্যস্ত। ওদের সামনেই, বররাম মহারাজ, দ্য হোস্ট্, হাসিমুখে আমার হাততেও কেক্ আর চায়ের পেয়ালা তুলে দেন। সদা হাসি-খুশী বাক্পটু ঐ সন্ন্যাসী। খুব সিগারেট খেতেন।ওঁদের অনুমতি নিয়ে পেটুকরাম আমি আরো দু একটা বেশি কেক খাই, বলরামদা কী খেতে ভালোবাসি জেনে—ওভাবে খাওয়াতেন। বলতেন, 'এখন খাবে না ত কখন খাবে। কেউ যত্ন করে কিছু খেলে আমার খুব ভালো লাগে।" চিন্তামন মহারাজ বলতেন, "আরো খাওয়াও অশোককে। জানো ত স্বামিজী খেতে খুব ভালোবাসতেন।"

যাক্, অমন কোনো আমারই একান্ত এক জবান—বন্দী করাতে চেয়েছিলাম—তাঁদেরই পাওয়া সায়—এ—মেলেমেশে। সবার চোখ ঝক্ ঝক্ করেছিল। আমারই মতন একটি ষোলো বছরের সদ্য যৌবনে স্নাতকের অমন কথায়।

খোদ মিশন সেন্টারে বসে, বলবো না তবু ইচ্ছে করেই ও কথা বলেছিলাম। মনে হয় এক পরম আকস্মিকের ছোঁয়ায় বলে ফেলেছিলাম তা—মন খোলোসায়। পাশে বসে সেন্টারের প্রাণ-পুরুষ, শুনলেন। আমার কাঁধে হাত রেখে ডাঃ কালিদাস নাগকে জানালেন চিন্তামন মহারাজ—"মানি না মানি। ব্যাপারটা আলাদা। কিন্তু এমন এক প্রশ্ন এখনি ওর মধ্যে উঁকি দেওয়ায় সত্যি বলতে কী আমাদের ভাবনায় রখালো, কী বলেন ডাঃ নাগ ?" এই রবীন্দ্র অনুরাগী শুধু হাসলেন। তবে সে হাসির রঙ্ ছিল—কনস্ট্রাকটিভ। সায় এলো না। কেপ্ট মাম্। কেউ কোনো উত্তরী সায় সাজানোর আগেই—মনীষায় দৃপ্ত স্যার যদুনাথ আমার গালে একটা উষ্ণ আদরী টোকা মেরে জানালেন, "অশোক এখনি, ষোলো হতেই এক সাংঘাতিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে।" আমি পাশ ঘুরে সানন্দায় বললুম—"তুমিই বলতে পারবে এর উত্তরটা, যথার্থতায়। কেননা, শেষ বয়সে নিজের ঐ বিরাট প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের পদে কাকে বসাই, সত্যি কাকে বসাই-এর খোঁজে নেমে—রবীন্দ্রনাথ দারুণ মিনতি ভরা আর্তি জানিয়ে, অবশ্যই পুত্র রথীর পরামর্শ অনুযায়ী,—সত্যি তোমাকেই মানে—স্যার যদুনাথকে ঐ মহতী মঞ্চে সামিলী অধ্যক্ষতায় বসাতে চেয়েছিল। তোমাকেই, আর কাউকে নয়। কিন্তু, তুমি সেই দায়ীত্ব না নিয়ে, তুমিয়ী যদুনাথ সরকারী পরামর্শে বলেছিলে—নট্ আই। বাট গিভ্ দ্য গ্রেট চেয়ার টু আর্টিস্ট টেগোর। এ. এন. টেগোর, যে অবন ছবি লেখে। হি ইজ দ্য জাস্ট পার্সন টু অর্নামেন্ট দ্য চেয়ার।" থেমে বলেছিলাম, "তুমিই পারবে এর উত্তরায়ণ সার্থক করানোতে, সায় জানিয়ে।" জানো, দেবী মৃণালিনী, সেদিন সেই 'দেবব্রত মেমোরীয়ালে' বসবার ঘরে ঠাসাঠাসিতে থাকা বিখ্যাতজনেরা, সত্যি সবাই পরে একত্রয় মাথা দুলিয়ে—শুধুই হাসিয়ী sigh ঝুলিয়ে নিবেদনে শান্তি পায়—আমারই অমন কথায়।

এ সত্যি ভাববার বিষয়। প্রত্যেকেরই সংশয় ভরা চাহনি যেন আমায়, সেই বিকেলে বোঝাতে পারলো, "তুমি চিন্তায় এখনি যা পেয়েছো, আমরা সকলেই তাতে অবাক। এমনটা ভাবি নি। ভাবতেও পারি বললে, পারবো না।"

হ্যাঁ, পরে এখানেই একদিন এমনি এক বিকেলায়, বিশ্ববিশ্রুত ডাঃ মেঘনাদ সাহা—সতীর্থ আরেক বিশ্ববিশ্রুত সত্যেন বোসের সাথে—হাজির। তখন উনি এম.পি.। আমার ঐ কথা শুনে বলেছিলেন আমার পিঠে হাতের স্নেহপরশ রেখে—অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ডাঃ মেঘনাদ, যিনি কে কী ধারলো বা ভাবলো, তার ধারে কী তার ভারে—কখনোই কেয়ারে নিতেন না।—"আমাদের অশোকের কথাই ঠিক। বিবেক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলে গেছেন বন্ধু রোঁলাকে তাঁরই জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে—তা আজ পুরোপুরি ঘুরে এসে প্রযোজ্য—স্বয়ং কবিগুরুর পরিধারীয় সীমাহীন ব্যক্তিত্বের মধ্যে।" আর পাশে থাকা সত্যেন বোস, যাঁর এক নাতি তখন আমার সহপাঠী। এই তিনিও ডিটো দিলেন এই বয়সন্ধি অতিক্রান্তর এই ভাবনাকে—সায় ভরা স্বীকৃতি দানে।

আজকের এই পৃথিবীতে, এই দেশে দেশে শ্লোগান তোলা ঐ গ্লোবালাইজেশানে—এ যুগে যতোই তথ্য-প্রযুক্তির নানান্-আপ্ টু-ডেট্ ভিয়েন্ চড়াক না কেন—পুষ্টি বনাম ঐ তুষ্টি বিধানে—তবু এই আজও বিরাট এক প্রাসঙ্গিকতারই হিসেবায় আর নিকেশায় আছেন—বিশ্ববন্দিত মহামানব, এই কবিসম্রাট। এই রবীন্দ্রনাথ কণাটাক-ও নন্ মোটেই কোথাও কোনো মুহূর্তায়ও—অপ্রাসঙ্গিক। এই ত ঐ গত চৌথা জানুয়ারী সল্টলেকে এস. আই. এন্. পি.-তে—তেতাল্লিশতম ডাঃ মেঘনাদ সাহা মেমোরীয়াল স্মারক-বক্তৃতাটি দিতে এসেছিলেন বিলেত থেকে— নোবেল লোরীয়েট্ ফীজীসিস্ট—এফ.আর.এস. স্যার রোজার ইলিয়ট্। প্রাজ্ঞ এই বৈজ্ঞানিকের বক্তব্যীয় বিষয় ছিল—'দ্য স্টোরী অফ্ ম্যাগ্নেটিজম্'। আমার অনুজ প্রায় বন্ধু বিজ্ঞানী, খানদান ঐ হেরীডীটীর ডাঃ বিকাশ সিংহ আমায় তা শোনার জন্য আমন্ত্রণ রাখেন। যাই, দেখি স্যার রোজার তাঁর ভাষণের মূল্যকে আরো বাড়িয়ে দেন। শুরুতেই—দ্য গ্রেট টেগোরকে স্মরণ করে। তিনি 'গীতাঞ্জলি' পর্য্যায়ের কবিতাবলী থেকে একটি বিজ্ঞান সমৃদ্ধিয়ী বিশ্বকবির বিশ্বচিন্তয়ীতে—ঋদ্ধিলী কবিতা—পুরোপুরি কোট্ করে শোনান,—স্যার রোজার—য়্যাজ এ প্রীলিউড্ টু স্ট্রেনদেন্ দ্য টপিক্। এই স্যার রোজার খুব রসিক ব্যক্তিত্বের, তাই গল্পচ্ছলে ও স্লাইডী বাস্তবায়—চুম্বকতত্ত্ব বোঝান। ইনি নোবেল লোরিয়েট বিখ্যাত স্যার পি.এম্.এস্. ব্ল্যাকেটের ছাত্র। পরে উনার বক্তব্য শেষ হতেই উনারই সম্মানে দেওয়া আপ্যায়নী হাই-টী-তে পরিচিত হই। বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ মারফৎ। কথা চালাচালির মধ্যায় ফর্ হিজ কাইণ্ড ইন্ফরমেশন্—দুটো জিনিস চা খেতে খেতে, পেয়ালা হাতেই— সাহিত্যিকোচিত আবদারায় জানাই।

হ্যাঁ, স্যার রোজার, তুমি নিশ্চয়ই জানো ডাঃ ডি.এম. বসুকে। বিশ্বের অয়নমণ্ডলার চর্চায় ঐ মাইক্রোওয়েভে যাঁর অবদান অবিসংবাদিত রূপে শ্রেষ্ঠ, সেই স্যার জগদীশ বসুর ভাগিনেয়, বিজ্ঞান সাধক এই ফীজীসিস্ট ডি.এম.। ইনিও ম্যাগ্‌নেটিজমে একজন অথরিটী। একজন ফরাসী নোবেল্ লোরীয়েট্ ফীজীসিস্ট তাঁর লেখা বড়ো আকারের গবেষণা গ্রন্থ "থীয়োরীস্ ইন্ ইলেকট্রীক্যাল য়্যাণ্ড ম্যাগনেটিক সাসেপ্‌টিবিলিটিস"-এ, ডাঃ দেবেন্দ্রমোহনের দান ও প্রতিভাকে বেশ কয়েক জায়গায়—বিশদভাবে স্বীকার করেছেন। পরে, এই ডি.এম. 'কস্‌মিক রে' নিয়ে নিজস্ব এক গবেষণায় মাতেন। মাতুল-বন্ধু, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে। কিন্তু, কেন জানি শেষ পর্য্যন্ত না গিয়ে, সমাধান সূত্রে না পৌছে—মাঝপথে থেমে যান। কাজটা থেকে যায় তখনকার মতোই অসমাপ্ত। পরে ঐ বিষয়ে অসমাপ্ততায়, সমাপ্তি টেনে সমাধানান্তে—গবেষক ডাঃ পাওয়েল্—হন্ নোবেল লোরিয়েট্। হ্যাঁ, এই ডাঃ পাওয়েল পরে, একবার এখানকার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে, এরই য়্যানুয়াল্ লেকচার দিতে আমন্ত্রণে এসে সে কথা জানিয়ে যান ডি.এম.কে। স্বীকৃতীস্বরূপ বলেন—"আমার এই নোবেল প্রাইজটা অনেক আগেই ডি.এম. পেয়ে যেতেন যদি না এভাবে মাঝপথে রীসার্চ বন্ধ রেখে—সরে না যেতেন। উনিই পথটা তৈরি করে যান। সেই পথেরই শেষটা খুঁজে পেয়ে হই বিজয়ী। উনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।" রীগ্রেট্ ভরা সামারাইজে, ডাঃ পাওয়েল আবারো শেষ করেছিলেন, এই বলে "ইফ্ ডাঃ বোস্ কন্‌টিনিউস্ হিজ ভেরী রীসার্চ অন কস্‌মিক রে—হি মাস্ট গেট দ্য নোবেল, ইন্‌ভেরীয়েবলী।...."

দেখি, আমার কাঁধে স্যার রোজারের হাত। বললেন, "ডাঃ সিনহা জাস্ট্ ইন্‌ট্রোডীয়ুসড্ ইয়্যু টু মী, বাই টেলিঙ্ দ্যাট ইয়্যু আর য়্যান্ অথর অফ্ রোমান্সেস্।" বলেই হাসি—"বাট্ নাউ, মিঃ রায়, ইট্ রীভীলস্ টু মী—দ্যাট্ ইয়্যু আর অলসো এ পার্সন হু ইজ ভেরী মাচ্ ইন্‌টারেস্‌টেড্—ইন্ সায়েন্স। ইয়্যু ইন্টারপ্রেটস্ নাইস্‌লি ইয়োর ভীয়্যুস্। রীয়েলী, মাচ্ গ্ল্যাড্ অন্ হিয়ারিঙ্ অল্ দিস্।"

দেবী মৃণালিনী, এই বিজ্ঞানী এই দেবেন্দ্রকে তুমি চিনতে, তুমি দেখেছো রথীর সাথে—আসতে ও যেতে। আর কবির পরম সুহৃদ, স্যার জগদীশের সাথেতে ত তুমি আলাপনী আলাপায়ও ছিলে। তোমাকে করে উপলক্ষ্য এ জানানোটা—খুশীরই তুষ্টয়ী এক জানানো।

আর একটু আছে। স্যার রোজাবের সাথে কথালীতী ও কথা। আমি যে ডাঃ মেঘনাদের কোলে-পিঠে উঠেছি। তার আদর খেয়েছি। তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছি লেখালেখিতে, য়্যাট্ মাই এজ অফ সিক্সটীন্—সেটাও জানাই। আরো জানাই তুমি স্যার রোজার, শুরুতে রবীন্দ্রনাথ দিয়ে আরম্ভ করেছিলে—সেই রবীন্দ্রনাথকেই যেন

আগাগোড়া ফলো করে চলি, এমনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখনি এই ডাঃ মেঘনাদ। আবারো জানালাম—"স্যার রোজার, ইয়্যু মাস্ট নো দ্যাট্ আর. এন. টেগোর হাড্ গ্রেট্ য়্যাফেক্শন্ ফর ডাঃ সাহা। য়্যাণ্ড য়্যালঙ্ উইথ সত্যেন বসু। ওয়ান্স, য়্যাট্ দ্য টাইম্ রোলস্ অন্ ফর্ ফ্রীডম্ মুভমেন্টস্—দ্যাট্ গ্রেট্ ওয়ারীয়র্ অফ্ আওআর ইন্ডিপেডেন্স্ 'নেতাজী'—'চন্দ্রা' বোস ওয়েন্ট্ অন্ টু ফর্ম এ ন্যাশন্যাল্ প্ল্যানিঙ্ বডি—টু সুপারভাইজ সায়েন্টিফিক্ য়্যান্ড ইকোকনমিক্ প্ল্যানস্ য়্যাণ্ড্ প্রোগ্রামস্। ফর্ দিস 'চন্দ্রা' বোস্ সট্ হেলপ্ ফ্রম্ টেগোর। হুম হি লাইকস্ পার্সোনালী টু রেকোম্যাণ্ড য়্যাজ চেয়ারম্যান্। ইয়েস্ টু ড্র দ্য কনক্ল্যুশন্, দ্য গ্রেট্ টেগোর ইমিডিয়েট্লী নেমড্ নান্ এলস্ দেন—ডাঃ মেঘনাদ সাহা। টু টেগোরস্ ভীয়্যু য়্যাট্ দ্যাট্ ক্রুশীয়াল্ টাইম্—ডাঃ সাহা ওয়াজ্ দ্য অনলি ম্যান অফ ট্রীমেনডাস্ পার্সোনালিটি—হু কুড্ ইজিলী টেকেল্ দ্য প্ল্যানিঙস্—ন্যাশানালী।"

দেবী মৃণালিনী, আশ্রম লক্ষ্মী বলি, আবার একবারটি সম্বোধিতেয়ে—ওগো লেডী মৃণালিনী—তুমি মেঘনাদ সত্যেন প্রশান্ত মহলানবীশ, আর আর তোমারই অতি পরিচিতির দেবর-তুল্য, স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের তিন তিন ছাত্রর ঐ "জ্ঞানত্রয়"—স্যার জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী ও জ্ঞান রায়। আর, তারই পর আবারায় আর সেই ডাঃ হীরালাল রায়—অফ্ ক্যামিক্যাল্ ইঞ্জিনীয়ারিং, বা ডাঃ জ্যোতীষ রায় অফ ক্যামীক্যাল বায়োলজী। বায়োলজীর এই দুই প্রবক্তারাও কিন্তু—এরা সকলেই কাল পরবর্তীতে মহাকবির সান্নিধ্য পায়, ও প্রিয়ও হয়। একটা কথা তখন সারা ভারতের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীরা—কয়েকটি করে তোমারই কবি-পতির জীবনদেবতায়ী ধ্যান ও সাধনার ভেতরায়ী আশীষ পেলে, কী সাক্ষাৎ পেলে—নিজেদেরকে ধন্য ধন্য মনে করাতো, মন ও প্রাণ ভরাতোয়ীতে।

জানো, আশ্রমলক্ষ্মী লেডী মৃণালিনী ঠাকুর—একবার কর্মী বিজ্ঞানী, ঐ স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর—মহামানব মহাকবির অতি প্রিয় স্নেহভাজন 'ঋতুরাজ' জবাহরলালকে জানিয়েছিলেন কোনো চিঠি-চাপাটিতে। বক্তব্যতা ছিল অকাট্য—"..... গুরুদেবের 'গীতাঞ্জলির' ঐ আধ্যাত্মিকতার ট্রান্সসেনডেন্টালটীর মোড়কটা খুলে ফেলে মেলে ধরলে, দেখা যাবে ও সবই ত' কবির ভেতরকার চিন্তিয় ও হিন্তিয়—সব বিজ্ঞান চেতনা।"

আশ্রমলক্ষ্মী মৃণালিনী, তুমি যেই ঐ ওঠাকার অন্য ভুবনায়, মানুষী চিন্তায় হৃদিতীয়ীল ঐ হেভেন্লী য়্যাবোডায়—করলে পরে দ্য জার্নি, সো আন্থিঙ্কেবলী আনটইমিলী—কবি তোমার হয় গেল—নির্জনীন একাকী। তুমি চারোধারে ছড়িয়ী প্রেমডোরে, আর আর তাপঝড়া বাহু-ডোরে জাঁক-জাঁকি রাখতেয়ে পর থাকতায়ে—এই হঠাৎই পাওয়া এই লোন্লী মেন্টে এই একাকীত্ব বোধ নাহি ছিল কবিতে, যা

অকল্পনীয়ত্ ও অ ভাবিত্—যা, নট্ দ্য লীস্ট্। ভাবরাঙ্গে, কবি এক ধ্যানাশ্রিতয়ী জাগরীত জ্ঞানে মানলেন আজ তক্—প্রিয়তমা, যাওয়ার আগের মুহূর্তায় পর্য্যন্ত বলি, যে কোনো সিদ্ধান্তে নীত্ চয়ী নিতুই নিত্য—টু ড্র দ্য কনক্লুশন্ তুমি একাই হতে যে ধাবেলে তার দাবেলে—চলতয়ী ফর্মুলেট্, আর আর বলতয়ী নর্মস্, হাজারে যাজ্মেন্টী রাজারেয়। এতদিন, মানে এই দু' দশেকের মতোটি, প্রিয়তমা 'ভাই ছুটি' তুমিই ছিলে আমার প্রেরণায়ীত্ ইনার্শীয়া,—শ্রেয়রীত্ ইমোশান্, —দেয়দীত্ মোশান্, আর আর নেয়নীত্ ইন্স্ট্রুমেন্টী ইন্টেলেকট্। তুমি মৃণাল, 'ছোটো বৌ' ছিলে অতলান্তয়ী গভীরার ভালো বাসাবাসি এ প্রণয়ঢলে, ঐ পরিণীত্ প্রমিতিবোধী প্রজ্ঞায়, আদরেতে, আহ্লাদেতে, আবদারী কর্মযোগেও। দায়ীদ্ধারী ঐ যৌগিকী বাসরার জৈয়ী রৈয়ী—মিথুনায়ও।

মৃণাল, তুমি যাচ্ছো প্রায় চলে বলে—তাই গত বছরাধিক কাল ধরে কবি ছিল—অসোয়াস্তিকে। এই আছো, হয়ত এই নাই থাকছো। একদিন তুমি যে রাজগৃহে, যে মহান মহর্ষির পুত্রের ঘরণী হয়ে—স্টেপড্ ইন্ হিয়ার—তারপর লোরেটোর ইংরেজি নবীশ্ ছাত্রী, অন্য ধারায়ার শাস্ত্রীয় ঐ ভাব সংস্কৃতেরও ছাত্রী—যুগপতী যৌগে। আর ঐ আরোতে—থেকে তখনি গৃহকর্ম তরে যে সব পাঠ পাও, ঐ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায়—ইন্ স্ট্রং হ্যাণ্ড, সেই হয়ী-জয়ীতায়ী আশ্রমলক্ষ্মী তুমি। যাবার বেলায় মহর্ষিদেবের অতি কাছাকাছি থেকে পেয়ে যাও, আর নিয়ে যাও—শেষ যাত্রার শেষ পীঠস্থান—এইই ঠিকানাতেই, ঐ সারস্বতীয় রাজবাড়ীতেই।

অন্য পরে কী কথা, অন্যরা আজ তক আজ অবধিয়ী নাহি পারলো যা ভাবনার বলে—ভাবতায়ে। তাই কালের কপোলতল্ হাজার বিন্দুর অশ্রু ঢালতেয়ে চেয়ে—টু স্ন্যাচ্ দ্যাট ডিভাইন্ সীক্রেটস্ ফর্মড্ দিস্ সেক্রেড্ নট—হুইচ্ টায়েড্ দ্য টু,—তোমাতে কবিতে শুধুই নয় মনবিহারে, ছিলে মিলেমিশে একাকারে ঐ ঐ দেহবিতানেরই ভাসী মস্ত প্রতিভাসেলে। জানি মৃণালিনী, পৃথিবীর স্বীকৃতয়ী মনোসমীক্ষায় এটা ধরা আছে, যে মস্ত সব প্রতিভার বন্দিত যৌবনের সাথে—অসম্ভব আকারার ও আধারার,—ঐ যৌনতা, দ্য সেক্সুয়্যালিটি,—ঐ ঐ দেহবাদী চাওয়াটা, আর তারই তরে পাওয়াটা—দারুণায় হয়ী জয়ী জড়িতায়—অঙ্গাঙ্গী। বডীলী য়্যাম্বডীড্। তাপী-কাঁপি এক ঝাঁপ-ঝাঁপিল ফীজীকের সাথ—আরেক ঝাঁকি-ঝাঁকিলী ফীজীকার—এ মেলমেশ। প্রতিভার ঘরে আরো সমুজ্জ্বলতা জ্বালায় ফোর্সী ইন্টিরীয়োরায়, ফোর্সী হ্যাবিটেটী ঐ ব্রোজমীত্—ক্যয়শনে। কামায়নে। কাপিউলেশনে। থাণ্ডারলী বোল্ড ওয়েভায়। তাই, তাই দ্য ট্রুথ্। এভাবেই জ্বাজ্বলীতি প্রজ্বলনায় প্রতিভা হয়, হতে বাধ্য—পাওয়ারীতে আরো রুল্ড্। আরো টুলড্। দেবী, তোমার রবীন্দ্রনাথ

ছিল বিশ্বময়ী বিধিরাতম্ এক আকারার আন্-কমন্ এক প্রতিভা। হ্যাঁ, যার তুল্য ঐ সেদিনও আর কেউ ছিল না। আর এ দিনও—আজ অবধি এলো না আর কেউ। নান্, দ্য এলস্। আর তারপরে কোনো আসছেয়ীত্ কী ভাবীকাল ! নো,—নো চান্স্ ফর্ দ্যাট্। পুরোপুরি নীল্। এখনই তা বোঝা যাচ্ছে। শূন্যই থাকবে।

মৃণালিনী, দ্য সুইটী স্পউজা, তুমি ছিলে সেদিনকার পৃথিবীর একমাত্র ভাগ্যবতী প্রিয়তমা, যার ফলে পরিণীত স্বামীর আন্-প্যারালাল্ থাকা প্রতিভার জন্য স্ত্রী-স্বত্বায়ীত্ মোকাবিলায়—সত্যি দেবীকা, তুমি কী অসামান্য প্রণয়-প্রীতির ঘোরে আর ডোরে—মহামানব পতিকে সামলাতে পেরেছিলে—প্রজ্ঞায়ীত সামালয়। তুমি ধন্যা, তুমি পবিত্রায়ীতে পরিপূর্ণা, পুণ্যা। হোলীলী পায়াস্। শোলীলী ভয়াস্। দেবী সাইকীর অংশে জাতকা—এক নতুনী রাধা। যে কবির ঘরেতে সাজায়ে রাখতো দেহী-পটে রাজরাজেশ্বরীয়ী—ঐশ্বর্য্য। খোলামেলে যা কবি হাজারো বার দেহে দেহে সখ্যতা পাতান্তে, যৌনতা শাণান্তে—সম্রাটের মতো মিথুন বাসরার একচ্ছত্রী সাম্রাজ্ঞী করাতে পেরেছিলো। যেহেতু তুমি দেবীকা, তাই হোতে। তাই করাতে—অম্বুরাই সোয়াদে থাকতায়া—টইটম্বুরালী।

আচ্ছা, ওগো নতুনা রাধা, ওগো কবি আফ্রোদিতের দেববাসরার দেবী সাইকী—বলি মৃণাল, তুমি পৃথিবীর এই অন্যতম মহান ঋষি-শ্রেষ্ঠর ঘরের একান্ত আদরের ঘরণী হয়ে—বলি আবারো, তুমির এই ভেতরার তুমিটাকে যে সদাই সজাগ রাখতে হত—কবির জন্য। ঐ অনন্য সাধারণ মানুষটিরই জন্য—তারই শরীরী চাহিদার তাপ ও মাত্রা অনুসারীত্ অনুভবীতে—স্নিগ্ধতা ঢালাতে ঐ মিথুন জাগরার রতিয়ী সাগরায়—ভাস-ভাসি আহ্বানের—ডাকে। জানি তুমি, হ্যাঁ গো—তুমি অতি সহজায় আর অতি রতীয়ী গরজায় প্রিয়তে, প্রিয়ালী-লত ঐ দেহীতে সম্পৃক্তা করাতে—যোগীয়ী ও যৌনী রাজকাজেতে, লাজসাজেতে।

জানি মৃণাল, কবির প্রিয়া বলে রোমান্সের দুনিয়ায়—তোমরা দু'জনাই ছিলে অসাধারণ, রোম্যান্টিক চেতনার রোমী মাতোয়ারার মাতানেয়ে। হয় ত শমী, নয় ত মীরা—তাদের যে কেউ একজনার প্রাণ—জননী মৃণালিনী, তোমারই শুচিস্নিগ্ধ দেহী-সম্ভারার রত্ন-শোভিতেয়ে দারুণ রোম্যান্টিকী ছন্দে, আর তারই সেন্স্যুয়াল্ য়্যাডাল্ট্ রীলেশনে—ঐ নদী ঘেরা পাতিসর, কী শিলাইদহে—বৎসরাধিককাল পর্য্যন্ত থাকাকালে—বজরায় বজরায়। ঐ ছবির মতো বোটের সংসারী আবাসায় থাকতে থাকতেই—পুনোরপি জননীত্ব বুনোরোপীতায়—হও প্রজায়নে, সেক্রেড্লী মেটেড্। হও দেবী উমা, রাঙ্গয়ীতে ফের কন্সীভড্। হও যৌবনায়নী শিল্পকলায় মহাকাব্যের মতোই সৃষ্টিতা অর্জন করো—ঋতায়ণী পথে, যৌগীকী যৌনায়ণে—আবারো পতি-দেবতার কমোশ্যনাল্ ভরা শরীর নিঙাড়িত ঐ ধারীকৃত একটি মাত্র অণু, একটি

স্পার্ম, যা বোটে বোটে থাকাকালীনই—ঐ জলের ওপরকার বিহারেতে—ইয়্যু, দি ডিভাইন মিস্ট্রেস্ অফ্ বেড্—এগেইন্ মেকেথ্ দাইশেল্ফ্—অভ্যুলেটেভ্। উইথ্ দ্য জয়েসী নাইসী এ নিয়্যু মাদারহুড্, —ইন্ রীনুয়্যাল্। য়্যাজ ইফ্ ছবিলীতে, কবিলীতে।

কবি-পতি, তার সৃষ্টির ব্যাপক ছন্দর "কড়ি ও কোমল"ই ভাব আর ভালোবাসা—যথার্থে বধূ মৃণালের মন জড়িলী উজারায় রুজারায় গেলেও ছাপিয়ে—তা বধূত্বেরই গরীমায়ী জননীত্বে অভিযেকান্তে—কবি-পতি কৃতার্থেয়ে তোমারই মধ্যে সাহিত্যয়ীত্ ও প্রেক্ষাতয়ীত্ অনুপ্রেরণাটির ঘরে—তিলে ও তালে তিলাঞ্জলপরতী এই সৃষ্টিভারী, কৃষ্টিধারীল্ আরেক ঋতবান্ মিতয়ান্—সাহিত্যকৃতির ও ধৃতির মতোই—তুমিময়ী শরীরী প্রিয়াতে—হাজার চুমায় চুমায় সাজাতোয়ে রাজারোয়ে—ঐ ডেলিকেটী ডেলিসীটায়ী তোমার যৌবনীত্ যৌন-যোগ—ওটাও যে এক যৌগিকী শ্রেষ্ঠত্বতার—মানবিক পরাকাষ্ঠা। হ্যাঁ, তুমি তার পর্য্যায়ীত্ পর্য্যাপ্ততায় শুধু কবিতা নয়, পাঁচ পাঁচটি লিরিক্যালী ব্যালাড্ ঝোড়ী—কাব্য রচনা করেছিলে। মিলিজুলিল্ ঐ যৌথয়ী সাজ ও কারুকাজে—ঐ ঐ রভসী সৃষ্টিটা—বেলাতে, রথীতে, রেণুকাতে, শমীতে ও মীরাতে। ছোটো মেয়ে মীরার সৃষ্টির পর পরই—কবিপত্নী তিল তিল তালে, ধিকি ধিকি চালে—হঠাৎই হোয়ী ওঠা আপন অসুস্থতায়ীত্ দেহটায়—নাই ফেরাচ্ছিলো মিলিতে ফের যে ফের—চাহি কবি-পতয়ী ভাব-রাঙ্গালাটা কবি-চাঙ্গালাগি ভরাট,—সে সব সোহাগ। আদর আর আবদারা। কবি যে ঋষি হয়েও খদ্ধয়ী সাধনায় ভোগ সাজাতো—হোতে পরে পূর্ণয়ী মিদায়—রীদ্মাস্। জানি দেবী, তুমি অসোয়াস্তী অসুখায়, তবু যে তবু কাঁদে আমার আর্জ ভরা মিথুনী সাধটা। সত্যি, কবি যে সৃষ্টিলোকীয় বিরাট প্রতিভার প্রমা, তাই প্রজ্ঞা বারে বারে এ সময়েও—প্রিয়াতে নাচ নাচতীয়ে চায় চায়—নামিতেয়ে মিথুনারে। ক্যয়শনী করোনেশানটাকে। হ্যাঁ, তাই তাই ঐ তবুয়ায় হবু হবু ছোটো কাকার এই শিল্পয়ীত চাহিদার আভাসায় আর ইঙ্গিতায়, —কনফেসী কনফার্মে, —ভাইপোর স্ত্রী, দীপেন্দ্রনাথের বৌ—ঐ 'দেহলী' গ্রন্থের লেখিকা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর,—শমী, তারই সমবয়েসী। কিছুটা অবশ্যই ছোটোটি মৃণালিনী থেকে। সহাস রসিকতায় জানাতো মেয়েলীপনার সাওয়াজী আওয়াজায়—"ও ছোটো কাকী, জানো আমার মন বলছে তুমি এতো ভালো, এতো মধুর স্বভাবের, এতো পরহিতে নজরদার। বলি, মনে হচ্ছে খালি এই নিয়ে, যে তুমি ছোটো কাকী তোমার শ্বাশুড়ীর মতোই—অনেক সন্তানের মা হবে। ছেলে-মেয়েরাও হবে, দ্যাখো কাকী—নামী-দামী সব। এখনি এমন অসুস্থ শরীরের হলে কী চলবে। সবে ত পাঁচটি ফুটফুটে সোনার মা হয়েছ। বলি, অতো না হলেও দেখবে অন্ততঃ আরো দু'তিনজন তোমাকে মা করাতে—অপেক্ষায় আছে। রবিকা, 'ব্লু বার্ড' পড়িয়েছিল। কি ভালো বই। জগতের কচি-কাচাদের কথা। এখনো, পারবে

তুমিই, আরো জনা তিন আনকোরা মিটিল কী টিলটিলকে, পৃথিবীর আলোয় চান করাতে,—শুভ জন্মটা দিয়ে। নাও নাও শরীরের যত্ন নাও। অনাগত ওদের মুখ চেয়েই তোমাকে, আরো ভালো থাকতে হবে। বলবো—মেয়ে ত' আমিও। বুঝি রবিকা'রও মনে—ভেতরকার চাহিদাও ঠিক এইটাই জানবে।" হেসে হেসে, দুষ্টুমি করে নয়, বেশ আন্তরিকা হয়ে, প্রিয় ছোটো কাকীকে এসব কথা শুনিয়েছিল—বৌ-মা হেমলতা ঠাকুর। আরো বলেছিলো, "ঐ যে বললাম না এই মাত্র যা তুমি দ্যেখো তা মিথ্যে হবেই না। বলছি ত' ভেবে-চিন্তেই। রবিকা'রও কিন্তু মনের অভিলাস অনেকগুলোর। দ্যাখো, এখনি এই পাঁচটিতেই, কাকা থেমে থাকবে না। ছোটো কাকী, তোমার কবি যেমন অজস্র সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে খুশী হয়, কবিতায়-কবিতায়—তেমনি তুমিও যেন, আমি চাই, মীরাতেই ক্ষ্যান্ত থেকো না। কবির কাছে থেকে চেয়ে নিয়ো আরো, হবে আরো বার বার সন্তানবতী।"

উত্তরে, খুশীয়ালে ছাঁদ ধরায়ে বলেছিলো, বৌ-মা হেমকে, তৃপ্তির হাসি মুখেচোখে নাচিয়ে—তিরিশ ছুঁই-ছুঁই ভরাটী যৌবনের ঢলে রঙ্গিনেয় ঝলমলিয়ে—"অসুস্থ ত কী হয়েছে, তাতে! কবি চাইলেই তোমাদের এই ছোটো কাকী আরো বার কয়েক মা হতে রাজী আছে। মনে ত নিশ্চয়ই। দেহেতেও। অসুস্থতা কিচ্ছু নয়। ভেতরে নতুন প্রাণ সাড়া জানালে—শরীর ভালো হয়েই যাবে। জানো ত' ছোটো কাকার বন্ধু, স্যার নীলরতন—মীরার সময় আমায় দেখে বলেছিলেন—মাতৃত্বই ত একজন মায়ের শরীরে ওষুধের কাজ করে। প্রেগ্‌নেন্সী ইট্‌শেলফ্ এ মেডীসীন্। তোমাদের রবিকাকে দেখেছি একটির পর, আরেকটি সন্তান হতে দেখে কী দারুণ খুশী। কী তৃপ্তি। এরকম খুশী আর তৃপ্তি আমি আজ পর্য্যন্ত—পাঁচ-পাঁচবার দিয়েছি। শোনো হেম, বলি লজ্জা কীসের। পনেরো পেরুয়ে কবিকে উপহার দেই প্রথম সন্তান, ঐ বেলাকে। বেলার পর থেকে, আমার বয়েস বাড়তে বাড়তে আরো পনেরোটা বছরে এগিয়ে দিয়েছে। এই পনেরোর মধ্যে কবি গট্ প্রেজেন্টেশন অফ ফোর, ইয়েস ফোর বনি চাইল্ড্ মোর। জানো, ইচ্ছে করলে পর একজনের জন্মের পর সময়ের বিরতিটা—আরেকটির জন্মক্ষণের মধ্যে কমিয়ে নিলে—সত্যি বলছি, আমি একটু লাজ না পেয়েই বলছি—ওয়ান আফটার এনাদার সময়টা যদি প্ল্যান করা হোত কবির কবিতা রচনার মতো করেই—রোম্যান্সের ঘর বার করে— দু বছরের মাথায়—আরো একজন আনকোরা নতুন চাই। তা হলে হেম এরই মধ্যে ঐ পাঁচের সাথে আরো দু'জন পৃথিবীতে আলো মেখে বসতো, মিলেমিশে। হত সাত। এটা হাসি নয়,—সেই নিয়মে চললে পর হিসেবায় এই এখন তাহলে—এই ছোটো কাকী থাকতো পিরীয়ড্ কনফাইনমেন্টে—ফর এনাদার ইন্ নীড্ বেব্, য়্যাজ এইট্ ইন্

নাম্বার।" বলেই হেমকে বুকে নিয়ে কী স্নেহালিঙ্গন। দেবী যে, তাই তার কথায় কী রাখারাখিতে—লুকানো কিছু শোভিতয়ীত্ না! তাই, মৃণালিনী সব ব্যাপারে, সব কথাতেই ছিল—অকপট্। টু মাচ্ সীন্সীয়ারে,—মোস্ট্ ইন্টিমেট্।"

হেমকে, 'দেহলি'র লেখিকাকে বুকে রেখে, আর একটু বলেছিল—মৃণাল, "একমাত্র রবিকা'র অনুপ্রেরণায় আপন মনের মাধুরী স্রোতে—পাঁচ-পাঁচবার মা হই। এটা চরম ও পরম সৃষ্টিশীল যৌবনের মুখরীল্ কথা। জানবে তাই আমায় দিয়ে। কল্পনা নয়, মানুষী পাঁচ-পাঁচ কবিতা রচনা করাতে পেরেছি। জানো ত হেম, এটাও যে আমি যেমন রবিকা'র লেখালেখির মস্ত প্রেরণা, তেমনি অনেকেই এ বাড়ীর, বড়ো বৌঠানদের সবাই বলাবলি করে, আমার নাকি বার বার সন্তানের জন্ম দিতে খুবই ভালো লাগে। আমিই নাকি এতে ইচ্ছুকা—একমাত্র। দ্যুৎ, সে কি হয়। আমি ত আধার মাত্র। সে আধারটাকে সাধীতে আধারার পূর্ণ করার দায়—দায়ীত্বতা ত পুরোপুরি—তোমার রবিকা'রই। তাই না। আর না, এ পর্য্যন্তই থাক।......"

ইতিহাসময় এ সব অন্তরঙ্গীল আলাপনী কথা ও কাকলি, শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর তাঁর শেষ বয়সকালের—ঐ আশ্রমীক্ জীবনটা কাটাতে—রাচীর আশ্রমে তখন। বেড়াতে আসেন শ্রীমতী স্নেহলতা সেন। এই স্নেহলতাকেই এসব কথা শুনিয়েছিলেন—একরকম সন্ন্যাস জীবনে থাকা—হেমলতা।

আমি পরবর্তী সময়ে, শান্তিনিকেতনে থাকাকালে কোপাইয়ের পাশে, বড়ো সড়ো বাগানওলা বাংলো, 'শেষের কবিতা'য়—খাওয়ার টেবিলে, বসে শুনি, খেতে খেতে—এই নব্বুই অতিক্রান্তা দিদার কাছ থেকে। চোস্ত ইংরেজি জানতেন। স্মৃতিও ছিল তুখোর। সময়টা, সাতষট্টির শরৎকাল। প্রায় চল্লিশ বছর আগে।

স্নেহলতা, সব গল্প শেষ করে, প্রায় ঘন্টাখানেকের আলাপ সমাপ্ততায় স্নেহলতা বলেন, মনে আছে—"অশোক, বলি, তুমি ত লেখক। হাবলু তোমারই লেখা একটা ভ্যলিম্যুনাস বই আমাকে দেখিয়েছে। 'ভালোবাসা' না এমনি কোনো নামের। শোনো, যা বললাম, এখনি খাতা পেন্সিলে নোট্ করে রেখো। পরে গুছিয়ে লিখবে কিন্তু। কোথায় লিখবে—দ্যাট ইজ্ আপ টু ইয়্যু। কথা দিচ্ছো, লিখবে কিন্তু।" বলেই আমার থুঁতনি ধরে আদর রাখা।

দেবী মৃণালিনী, উনাকে তোমার চেনার কথা নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—এই স্নেহলতাকে, তখন বৈধব্য-জীবনে অসোয়াস্তে থাকায়—ডেকে নিয়ে ভার দিয়েছিলেন—আশ্রমের মেয়েদের। বিশেষ করে ছোটোদের দেখাশোনার ভার, য়্যাজ ফার্স্ট সুপার, তখনকার। আর ইনি হলেন—তোমার ভাসুর কন্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর—সতীর্থা। ইনার ফ্যামিলী খুবই হাই প্রোফাইলের, হেরিডিটিয়ী। পিত্রালয়ে তিন পুরুষ, আই.সি.এস.। বাবা বিহারী গুপ্ত ভারতের চতুর্থ আই.সি.এস.। ছোটো

ভাই সতীশ, আই.সি.এস.। আবার সতীশের বড়ো ছেলে রণজিৎ আই.সি.এস্.। স্নেহলতার দুই ছেলে। বড়ো হাবলু, আই.আর.এস.। আর ছোটো মন্টুরু, আই.পি.এস্.। পুলিশ নয়। পোস্টাল—ডাক বিভাগীয়। কন্যা মালতীর স্বামী ছিলেন—উড়িষ্যার প্রথম চীফ্ মিনিস্টার—নবকৃষ্ণ চৌধুরী। নিজেও—স্নেহ-দিদা লেখিকা ছিলেন। বাংলা বই "যুগলাঞ্জলী" এবং ইংরেজি বই "নেহ্যাল, দ্য মিউজিসিয়ান"। খোদ ম্যাক্‌মিলান সেটি বিলেত থেকে প্রকাশ করে। মানবিক প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী—আচার্য্য হিসাবে এখানে এলে—উনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন।

যাক্ ও কথা। দেবী মৃণালিনী, তুমি তখন দারুণ অসুস্থ। সাহেব ডাক্তারদের জারী করা মানা—শুধু বিশ্রাম করা। আর ওষুধও ছিল। কিন্তু তুমি শুধুমাত্র দেবীর অংশে জাতা এক দেবীকা নও। তুমি যে বিশ্বকবির প্রিয়া স্ত্রী। মানসী সাইকী। অনয়া আকর্ষিতেয়ে শ্রীরাধা। পতির ভালোমন্দের জন্য দিনমান ধরে তোমার মনে নাহি ছিল স্বস্তি, শান্তি। মানুষটি যে পতি হিসাবে দিন দিন তোমাতেই—বড়ো বেশী রকমার—নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। কবির এমনি অসহায় ভাব দেখে দেখে—তুমি নিজেরই ভেতরায় কাঁদতে। থাকতো ফোঁটা ফোঁটা চিকচিকয়ী মুকতো বিন্দুয়ার অশ্রু ধারা—সবসময়ই টলমলিয়ে—রাখতায়া সাজায়া। বলতে—"এই, কে বললো আমি অসুস্থ!" কবিকে কাছের আন্তরী আদরায় পেলেই, কবির বুকের আশ্রয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে নিজেকে সঁপে দিয়ে, কান্না ভেজা মুখশ্রী কবির বুকে ঘষতে ঘষতে বলতে—'ওগো কে বলেছে আমি অসুস্থ। তুমি এখনো যা চাইবে আমার কাছ থেকে, আমি এখনি তা দিতে তোমাকে—প্রস্তুতা।' হাঁ, দেবী মৃণালিনীর এই আর্তি ভরাট্ কথায় কবি তখনকার মতো সব ভুলে—তোমায় নিয়ে তোমারই শরীরায় ছন্দ সাজাতে চেয়ে—মাতত খুশীতে, রভসায়। যা ইচ্ছা তেমতায়ী অভিলাসী আবেশায়, অবশায়। মন ত ভেতরার হলেও—ওপরকার আইকনে ফেলে রাখে বোঝাবার তরে, সুখ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা-হতাশার ছাপছোপ। দেখা যায় শাদা চোখে। অনুভব পায় সহজায়। কিন্তু, প্রিয়া, তোমার ঐ দেহেরই ভেতরাটা, ইনার ফীমেলীকী ফীজিকা ত ও কথা বলে। কারুকাজ ফোটায়। তাই কোনোভাবে কবির বিশ্বচেতনাই স্বভাব, কয় মুহূর্তার জন্য সব কিছু তখনকার মতো ভুলে গিয়ে—কবির ভেতরকার সব রোম্যান্টিকতা, সত্যি সব ভুলে ভালে প্রিয়ার শরীরী অন্দরমহলায় লেগে যায়—ঝাঁপতলীতে। কুসুমমালিকা চয়নায়, রোপনায়। প্রিয়ার দেহ শুধুই তখন চায় আর চায়—প্রিয়র দেহতে কথা বলতে— মাধ্যমী দেহেতেই। হ্যাঁ, দেহও কথা বলে। কথা ঝড়ায় মিথুনকালে। ক্যয়শনাল্ মোমেন্টায়। এরই মধ্যে এই অসুস্থতাতেই অনেক বারই মিথুন বাসর সাজিয়েছিল। একা কবি নিজের ইচ্ছায় নয়। নয় বেশ জারিজুরিতে।

দেবী সদৃশা প্রিয়া, তার জীবনদেবতারূপী প্রিয়কে—কণামাত্র অখুশী আর অতৃপ্তয়ীত্ না রাখতে চেয়ে। নিজেই জারিজুরীতে আপনার শরীরী বিতানে—খোলামেলা সাজুয়েতে পেতে দিয়েছিলে—ঐ ঐ অসুস্থতার মধ্যেই—হাসিরই অশ্রু যে ব্যথাকে সময় বিশেষে দেয় ফেলে পেছুনায়—ঠিক সেই সেই মূহর্তায়—রতিবিলাস, কবি-শ্রেষ্ঠকে কিছু সমায়িত জমায়িতে, সব যেন তুলে ঐ রাজযোগী কারুকাজে—সাড়া না দিয়ে পারো নি। কবিকে পূর্ণ রাখতেয়ে বাহিতেয়—মৃণালের ঐ কাজল চোখের কাতর মদিরাই চাহনি, কখনো এমতো অবস্থাতেই কবিকে সানন্দায়ী বন্দনায়—শরীরী ভেতরার বন্ধু করাতেন, তখন দেহ শুধু দেহালাপিত যতনায়—দেহময় কথাকি কহিতে রাজী, সাজীর, হাজির। প্রিয়ার শরীরার বন্ধু হওয়াটা শরীরীয়ী আপনায়—এটা প্রিয়র পক্ষে হার নয়, যৌথয়ী জিত্—হার না মানা হার! জয়াস্ ডীফিট্ ফর্ ?? দ্য স্পাউজেস্, রীজয়াস্লি।

ফের যেন ঘেরাটোপী ঐ সায়রার স্নান-মিথুনায়—কবির দেওয়া ডাকে সাড়া না মেনে কোরে পারলে না—প্রিয়ার জানানো, শত আহ্লাদিতয়ী, হাজার হৃদয়ীকী ঐরকম আহ্বানে। সময়ী টল্‌নেসেও—মেনি রীদমাস্ টাইমস্ সীন্ এভার-ইন্ হ্যাপিয়েস্ট্ কোয়েস্ট্ ফর্ ক্যয়শন—দ্য ম্যাটরীয়োনীয়াল্ সেক্রেড্ ডীড্ ওভারহোয়েল্মড্ ইন ক্রীয়েটিভ্ নীড্ আটারলি ফ্রম্ হাজব্যান্ড, ম্যাটারলী টু দ্য বিলাভেডস্ অর্গানিক্ অর্গাজম্। বলি, যে—তাই তাই, দেবী তোমার দেবোপমী শরীরা ভর্ সৌদর্য্যঝরতা হোলো—অচিরায়,—প্রজায়নীক পুষ্পবতীতে। দ্য সিক্সথ্ সন্তানের—মধ্যয়ায়। কিন্তু কিন্তু—কবি বুঝেও বুঝতো না, জেনেও জানতো না—প্রিয়ার প্রজাবতী হোয়ী এ তো সুখের সাম্রাজ্যে—আসছিলো এগিয়েতে, পলে পলে পল্লবিত্—হঠাৎ যাবার জন্য—ঐ ফর হার ম্যাজেস্টিক্ হেভেন—হোয়ার ফ্রম্ দ্য বেল্ টলস্। বেল্ তার মেল্—সত্যিই পাঠিয়ে, শেষ বাজন বাজনাটা করালো শেষ—একদিন, সাঁঝবেলাতে।

ষষ্ঠয়ীত্ প্রজায়নেতে—কন্‌সীভা প্রজাবতীকা মৃণালিনী, কবিকে জীবনের শেষ সন্ধ্যাটিকে সাক্ষী রেখে, শেষ অর্পিতয়ী সন্ধ্যারতির ঘনঘোরে ক্ষণডোরে "একটি নমস্কারে"—মাত্র শেষ কবি প্রণামটা রেখে—চলে গেলেন, চিরদিনের তরে, ফর্ ফেভারী এভার—ঐ ইটার্নিটির পথে,—ফ্রম্ হিয়ার, ফ্রম্ নীয়ার, ফ্রম্ ডীয়ার। হাঁ, ঐ প্রজাবতীতে কন্‌সীভা ষষ্ঠয়ী প্রাণ সমেতা—নিজেও। ভবিতব্যয়ী ঐ শিশু-সমেতা।

আচার্য্য জবাহরলাল আগে ভাগেই পৌঁছে যেতেন—সময়ের তোয়াক্কা না কোরে—এই রবির দেশে, এই পুণ্যভূমে। তিনি এলেই, ছুটে যেতেন "গুহাঘরে", একতলায়, যেখান থেকে পেয়ে যেতেন—রথীকে। কর্মরত কবি-পুত্রকে। আর এরই দো'তলায়, স্টুডীয়োয়ী আপন স্টাডিতে পাওয়া যেতো,—প্রতিমাকে। অসম প্রাণোচ্ছোলতার প্রধান মন্ত্রী "আমি এসেছি। আমি আসছি"—বলতে বলতে রথীর হাত ধরে—ওপরায় হাসি নির্ঝরে—হাজির হোতেন।

তারপর তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেই—প্রাসাদ উত্তরায়ণের চৌহদ্দীতে থাকা কবির উঠানে'র সামনায়, বাগানে—প্রতি বছরকার মতোই—ডান্স কোরতেন—দু'হাতে গ্রীপে রেখে—বাম পাশে রথী ও ডানপাশে প্রতিমাকে নিয়ে—ঐ ঝুঁকে ঝুঁকে, তালে তালে—তিনজোড়া পা ফেলিয়ে ফেলিয়ে—একবার ঝোঁকি ঢালে সামনায় এগিয়ে—আবারো ছোঁকি হালে পেছুনায় পিছিয়ে। উদ্দামীত্ ছিলো সে নাচ। এখন তা ভাবা যায় না। দেশের প্রধান মন্ত্রী এমনটা, কোরতে তখন ভালোবাসতো! হাঁ, উনার মিলিত ডান্স-পার্টিসিপেন্টরা ছিলো—যে বাঘা বাঘা বাঙালী ব্যক্তিত্ব। আচার্য্য নন্দলাল ও সুধীরা, আচার্য্য ক্ষিতিমোহন ও কিরণ, আচার্য্য প্রভাত মুখুজ্জে ও সুধাময়ী, আচার্য্য মুকুল দে ও বীণাদিরা। জবাহরের ডান পাশে, স্নেহালিঙ্গনী শৃঙ্খলে ডানহাতে ধরা থাকতো, প্রতিমার বাম হাত—আর বাম পাশায় উনার বাম হাতটা ধরে থাকতোয়া রথীর ডান হাত। নাচের সে কী প্রধানমন্ত্রীয়ী উন্মাদনা—আনন্দের, আর আহ্লাদেরও। এই জবাহরলাল—অনন্যসাধারণ রথী ঠাকুরের নানান ধারার প্রতিভা অনুরেশী অনুরক্ততায় ছিলেন—মস্ত বড়ো য়্যাড্মায়ারার।

কিন্তু, টাইম্ রোলস্ অন্ কোরতোয়ী জমাহারে,—জানো দেবী মৃণালিনী, একদিন অপ্রতিরোধে ঐ দেরাদুনের বিরাট খামারবাড়ীতে—বিনা মেঘে বজ্রপাতসম এক য়্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেলো। পুত্র রথীর ওপর দিয়ে। হাঁ, যা এক বিরাট চক্রান্তয়ী দূরভিসন্ধির দায়ে—ভরপূর। মাঝরাতে, দরোজা বন্ধ শোয়ার ঘরে, নিশ্চয়ই দারুণ কষ্টয়ী কাতরায়—কাৎ হোতে হোতে, চলে গেলেন—ঐ অন্য দেশের ভূবনী ঐ স্বর্গয়ায়। যেথায় তুমি আছো, আছে বিশ্বের একনম্বর প্রতিভা "বাবামশায়"। আছে দিদি বেলা, ছোটোবোন রেণুকা। আছে আদরের শমী, আছে বোনপো নীতীন্দ্রনাথ।

মৃণাল, তুমি তখন সবে চলে গেছো—ঐ ঠিকানা আনকোরী অন্যয়ে,—কবিকে একা থাকার দার্শনিকী দর্শন-গ্রাহ্যে। কবি তখন এই নির্জন-সাধনাত্ ঐ দর্শন-প্রায়ে, নতুন জীবনায়নে নেমেছেন। কেউ যদি প্রিয়য়ী আড়ালা দিয়ে পাশটায় নাহি থাকে—একলা চলো রে'র চরৈবেতীয়ী মাতালাই সাতোয়ারে। পাহাড় আর পাহাড়ী রাজ্য তখন কবিশ্রেষ্ঠকে, "গীতাঞ্জলী"র পথে রেখে পর—এই উত্তরাঞ্চলের, এই দেরাদুনে যে রাজপথটা রায়পুর রোড নামে—ছুটে গেছে মুসৌরী পর্য্যন্ত, তারই ধারেকার নির্জন প্রান্তয়ী এই গাছ-গাছালির নিভৃতায়—আবার বলি, শত একরের জমি নিয়ে তৈয়ার করান—এই, বিরাটবাগানী—যেন এক বন-বাংলো। এমন বাড়ী দেরাদুনে আর কারুর ছিলো না। তোমার আদরের রথী, তোমার একমাত্র ছেলে—এই বাড়ীতেই কাটাতো তাঁর আপন ইচ্ছায়ী নির্বাসনে আসা—অফুরন্তয়ী ঐ নিঃসঙ্গতাকে। সলিসিটেডী এই সলিচ্যুড্। তারপর কবে নয়, সত্যি একদিন করুণতম এক আকস্মিতার ছোঁয়ায়—কী হোয়ে গেলো নিয়ে রথীকে,—কাকে পক্ষীতেও তা জানলো

না। টের পাওয়া ত সুদূরার। এই আনন্দময় পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নেওয়ার আগে—ঠিক আগের দিন। এখানকার এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক থেকে, নিজের এ/সি থেকে, নিজের হাতেই তুলে নিয়ে যান কম কিছুয়া নয়—মোট চৌদ্দ লক্ষ টাকা। (ফোর্টিন লাখস্)। তারপর, টাকা তুলে, থলিজাত কোরে দুপুরের আগেই ফিরে আসেন বাড়ী। আবারো ঐ নিভৃতিয়ী নিরালায় যেখানে হয়ত তখনই ফিসফিসিয়ী কথায় তৈরী ছিলো—রাত্রির চক্রান্ত। ঠিকই ত—ডার্ক ডীড্স্ আর বেটার ইন্ দ্য ডার্ক। তারপর কেউ জানলো না, জানতেও পারলো না—রথী ঠাকুর, দ্য গ্রেট্ হীডেন্ পার্সোনালিটি অফ্ পার্সোনালিটিস্—ওপরার প্যারাডোসোর জন্য—আচমকাই অযাচকিতায় নিলো বিদায়। নির্দয়ী ছিলো এহেন বিদায়টা। সুন্দর পৃথিবীটাকে, এরই স্বার্থপর কেউ কেউ—অসুন্দর করাতে চায়। হাঁ, তাই। সেই অসুন্দরতার যূপকাষ্ঠে তুমি যে হোলে প্রদয়ীত্ বলি। স্যাকামড্ টু ডীমাইজা। হাঁ, দ্য ট্রুথ্ লাইজ দেয়ার। হি ওয়াজ্ পয়জন্ড্। যার পরিণামীত্ পরিণতিটা—মৃত্যু। রাত মাঝারায়। কবি-সম্রাট—এ মৃত্যুকে কিন্তু পৃথিবীর ভালোটা কখনোই গুণগাহিতায় বলিবে না—মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান! বলি, বাই হুম্ কে বা কারা ছিলো এই কন্স্পিরেসীর অতি নোংরায়ী কাজে!

তোমারই আদরের পুত্র—রথীর কথা মতোই এই সানন্দয়ী লেখী পথে চাহিলায় যে দেখিলাম তোমারে—আমারই মনধরিতয়ীত্ ঐ কিছু কথায়, আর কিছু বয়নায়। বলি মৃণালিনী—তুমি কী দেখেছো, ওপরের ঐ খোলামেলা চিতে ও হিতে, ওপরার ঐ স্বর্গভূম ঐ প্যারাডোসা থেকে—রথী ঠাকুরের—ঐ ইল্-ফেটেড্ লাস্ট জার্নিটা! পাহাড়ী দেশ ঐ উত্তরাঞ্চলের—পাহাড় দেরাদুনে—কবি-পুত্রর স্বেচ্ছায়ী নির্বাসনে—থাকাকালে! সবার কাছ থেকে দূরে, অনেক দূরে তখন তিনি। পালিতা কন্যা, আদরের নান্দনীও নয় তখন—পিতার কাছাকাছিতে। আর আর—শিল্পী-সম্রাট অবন ঠাকুরের আপন বোনঝি,—কল্যাণী-রূপী শান্তিনিকেতনের "গৃহলক্ষ্মী"—স্ত্রী সুবিনীতা প্রতিমা দেবীও "বাবামশায়ে"র আদরের বৌমা,—তখন দূরবর্তীকা। থাকেন "কোনার্কে"—একলা,—দাস-দাসী সমেত। স্বামী রথীর প্রতি কোনো অজানতয়ী, অভাবনীয়—আপন অভিলাসে। অত দূরে, স্বামী রথী,—আর এখানে নিসঙ্গতিয়ী একাকনী স্ত্রী প্রতিমা,—শিল্পী-ও "নির্বাণের" লেখিকা। কী কারণ এমতার—তা তাঁরা দু'জনাই জানতেন।

এটা কী কন্স্পিরেসী? আজও তার উত্তর মেলেনি। অজানিতে হোল সব ঠাণ্ডী ঘরে কেপ্ট্ —থ্রোন্ ইট্ য়্যাবস্যুলিউট্লি টু দ্য—ভুলি—ঘর! পারতেন তদন্ত করাতে—রথীর দুই বন্ধু। ভারতের এক নম্বরার, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও দুই নম্বরার পণ্ডিতজী। অল অফ্ দেম কেপ্ট্ মামস্। তারপর, তারপর আরো স্যাড্ যে—কেউ জানলো না, কাউকে ওয়াকিবহাল হোতে পর্য্যন্ত না দিয়েই—উইদাউট্ পোস্ট

মর্টেম—কে বা কারা, অতি তরিঘরি এখানকার লক্ষ্মীবাগ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে, শেষ কাজটা কোনোভাবে নম-নমতায়—শেষ করে। তবে একটা সত্যি আছে, সে সময় এই এখানকার সুবিখ্যাততম রথী ঠাকুরের বাসভবনে—এক দম্পতি বেশ অনেকদিন ধরেই বসোবাস কোরতো। সবাইই তা জানতো। অন্তত বাঙালীরা ত অবশ্যই। তারপর দেখা যায়—ওই দম্পতিও উধাও—পুরো সম্পত্তিটা বেচে দিয়ে। এ কেমনে সম্ভব ! আইন বলে কী কিছু ছিলো না। ঐ দুজন—খুবই জামাই আদরীর মৌতাতে ছিলো। ব্যাস এইটুকুই, তুমি দোবিকা কন্যে জেনে রাখো, আর এর বেশীটা কিছু নয়।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম এক মনীষী মহামানবের পুত্র বলে হোলেও,—রথী ঠাকুর নিজের জ্ঞান-গরিমা ও কাজের মাধ্যমে—দেরাদুনের সব চাইতে নামী, আর দামী নাগরিক ছিলেন। বাড়ীর সামনা দিয়ে যে পথিক তার পথিকবধূ নিয়ে চলতে চলতে, জানাতো আপন প্রিয়তমাকে, কে এই বিশাল বাগান–কাম–খামার বাড়ীর বাসিন্দা। নড্ জানাতো অবশ্যই, পুত্রতে—তাঁরই পিতায়। আপামর সুধীজনের পরিচিতায়ীতে ছিলেন বটে—আবারো সবাইই ছিলো এই প্রবাসেতে—রথীর প্রিয়জন। কবিপুত্র বলেও, আবার না বলেও। এই আমার প্রিয় পশ্ এরিয়ায়। এই ভবানীপুরে ও.এন.জি.সি.-র কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। এখনও আছেন কিনা জানি না। এঁরা সে সময়—ঐ সেকিনকার কালো রঙ্ সকালায়, রোজকার মতো বাজার কোরতে বেরিয়ে দেখতে পান, অবশ্যই শাশ্রু নয়নায়—ও.এন.জি.সি.-র একটি বোল্ডার বোঝাই লরীর ওপর—উঁচু-নীচু পাথর বোঝাই ধারালোতে—চাদর মুড়িতে ঢেকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হোচ্ছে। হাওয়ায় মুখের চাদর সরে যাওয়ায়—রাজন সদৃশী চেহারার রাজপুরুষী মুখশ্রী—ঘুমোচ্ছে, দেখা গেলো। সে মুখে আর কিছু নয়, যাঁরা দেখেছিলো—তারা জানলো, খুব কষ্টেরই প্রলেপ আঁকা—ইনস্টেড্ অফ্ চন্দন লেখ্। নো ফ্লাওয়ারী ডেকোর ওভার হিম্। নাহি ফুল, নাহি ফুল-মাল্য। অরণ্যের দেশে ফুলেরা কী কৃপণতা দেখালো নিজে থেকে ? না, দ্যাট্ ওয়াজ—ম্যান্–ইন্টেনশন্যাল্।

এ দৃশ্য নয়, এই করুণ দৃশ্য–পটী ঐ দর্শনা, আজো দেরাদুন-বাসীরা ভুলতে পারে নি। এত বছরের এধারে, যাঁরা তা মনে রেখেছেন—তাঁরা আজ সকলেই—পথ এই এজিঙ্-য়ে—এগিয়ে।

যাক্ বলেই—আবার তা থাক বলে থাকলো। কবীর সাহেব নেই। ওঁর কৃতী পুত্র, খ্যাতনামা অক্সি-ব্রীজ—এই কিছুদিন হোলো পুরীর সমুদ্রে চান কোরতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন, অতলান্তে। জিজ্ঞাসা করতাম—শান্তি মাসীর পুত্র আকবরকে —তোমার বাবা, দিল্লীর নির্দেশে সারা পৃথিবী ঘুরেছিলেন—কবির শতবার্ষিকীটা যাতে যথাযথয় হয়। এই কবি হুমায়ুনকে—রথী খুবই স্নেহ কোরতেন। উনি তখন দেশের

তেল-মন্ত্রী। তিনিও কী জবাহরকে দিয়ে কোনো তদন্ত করাতে সত্যি কী গড়িমসী কোরেছিলেন? পরবর্তীকালে এই পিতৃবন্ধু কবিকে—একদিন ধরলাম জাতীয় গ্রন্থাগারের—প্রশস্ত সোপানোপরি। ডাঃ কেশবন না থাকায় ফিরে যাচ্ছেন। সন্ধ্যাকাল হয় হয়, পাশে কাকু—অবনী সেনগুপ্ত। প্রণাম কোরতেই, "আরে মিঃ রায়ের ছেলে যে। কী কোরছো?" আমার উত্তরটা কাকু অবনী সেনগুপ্ত দিয়ে দেন, "ইঞ্জিনীয়ার বাবার পথে না গিয়ে—লেখালেখিতে গেছে। এতো বড়ো একটা বই লিখেছে। কবীরদাকে এক কপি দিয়ো। ভালো বই, ভালোবাসা নিয়ে।" আমি দেবো বলেই প্রশ্ন রেখেছিলাম—"ইট্ ইজ মিস্ট্রী, হাউ রথীদা ওয়েন্ট টু হিজ হেভেন্‌লি য়্যাবোড্? জানলে—জানাবে।"

স্বপ্ন-সাধের কবি, "হবে খন। পরে জানাবো।" বলার মধ্যে মারমারিঙ্ স্বর ফুটিয়ে নেমে গেলেন—দরোজা খোলা আঠারো হাতি, মন্ত্রীর গাড়ীতে, সওয়ার হোতে। আমি থমকালাম। মনে বোঝালা সে সন্ধ্যায় তুমিও কবি হুমায়ুন, ইয়্যু টু!

যাক্। যাক্। একথা।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর—দ্য জীনীয়াই ভরাটী ও স্বরাটী, জীনীয়াস্—সেই কবে একদিন জোড়াসাঁকো প্রাসাদের পোর্টিকোয় দাঁড়ীয়ে—আমার কাধে স্নেহভার রেখে কথা আদায় কোরেছিলে—মৃণালিনী দেবীকে নিয়ে লেখালেখি করার জন্য—ঐ সবে পনেরো পার করা এই আমার থেকে,—যে ছেলেটির নামকরণ ছিলো তোমারই বাবার। যে তাঁর কোলেও স্থান পেয়েছিলো—পলকায়। এই পুরস্কৃত আমিকে—তুমি রথী ঠাকুর বলেছিলে—"অশোক—স্যার অশোক রায়, দ্য জুনীয়র" এমনটা বলেই কী হাসি, তোমার। "তোমায় দেখে এখনি মনে হোচ্ছে—য়্যাটিচ্যুডে এবং চিন্তায় ভবিষ্যতে স্যার অশোক কে. রায় হোতে চলেছো—এই একটি ব্যাপারে যেখানে স্যার অশোক, আজও অনন্য। স্যার অশোক সোজা পথের সোজা চলার মানুষ ছিলেন, আপন ব্যক্তিত্বে। ডাইনে কী বামে—কখনোই কোনো চাপের মুখে, কাৎ হোতেন না। যা বুঝতেন আপন ধীতে, তাই ছিলো রায় মশায়ের। শাসন ও শাসক পরিষদে শেষ ভারতীয় অনারেবল্ মেম্বর হিসাবে, বিরাট মাপের গান্ধীজীর সাথেও সমান কায়দায়ী মোকাবিলায় ছিলেন। উনার সিমলার বাড়ী—আমাদেরও যাতায়াত ছিলো। পাণ্ডিত্যও ছিলো, আইনী দুনিয়ার বাইরেতেও। যাক্ ও কথা।" কথায় পরিসমাপ্তি কনক্লুডেয়ে বললে, আন্তরার তাগিদায়—"অশোক, তুমিই পারবে, সত্যি বলছি পারবে—আমার মায়ের কথা লিখতে। জীবনীর মতো, ছোটো হোলেও কিছু একটা। আমার আত্মকথা—সমাপ্ত হোচ্ছে। নাম থাকবে—"পিতৃস্মৃতি"। কেউ হয় ত বার কোরবে। এতে পাবে আমার কথা, মায়ের কথা। আর বেশী রকমায় বাবার কথা। খুশীতে আনন্দায় লিখে গেলাম। ঠিকই, বেরুবে একদিন। আমি—তোমার মতো

এ বয়সেই আমার মাকে নিয়ে এতো আগ্রহ যার, তাকে কখনোই বোলবো না, লেখার আগে আমার বইটি কন্সাল্ট্ করো। তুমি এখনই এরই মধ্যে যা জেনেছো, আশা করি, দশ বছর পরে হোলেও এ লেখা, তখন তোমার জানার পরিধি আরো বাড়বে। ব্যাপকতর হবে। মনে করি, কাউকে অনুসরণ না কোরে, লিখে যাবে। লিখবেই।"

রথী ঠাকুর এটি একটি রম্য প্রবন্ধ লিখতায়ে পর, রাখতায়ে শেষটায়ী সমাপণে, কথা এইটি নিবেদনায়—বই লিখবো, একটি জীবনী-গ্রন্থ, তোমারই মা মৃণালিনীতে, ব্যাপকে—অনেক পেশ করায়ী তথ্যে ও তত্ত্বে—জানি তখন তোমার 'পিতৃস্মৃতি' আমাকে—অচিন্ত্যনীয়তায় সহযোগী হবে। এ মাস্ট্ কনসাল্ট্। শেষ কথায়, বলি আমার পাশে রয়েছে 'চিঠিপত্রে'র প্রথম খণ্ড, 'স্মরণ' কাব্য—যাতে বিশ্ববন্দিতয়ীতে অনন্যতম পতিদেবতা,—তারই দেবীকা পত্নীকে, স্মরণেরই বরমাল্যে, আলোকীতা রেখেছেন। জানবে, তাও নাড়াচাড়া করি নি। এ লেখাটি, অন্তরের মোস্ট্ য়্যাডো য়্যাবাউট্ মেনিথিঙ্ ভরাটী, দরাটী, স্বরাটী রচনা রাখলাম, হৃদয় দিয়ী উজারায়ী মাধবী রাগে শ্রেষ্ঠা, মধুরালে গ্রেট্ রভসিতা মৃণালীনিকে—শতয়ী স্কোরী স্টোরেজে, —ও রময়ী স্টোরী ডোরেজে—শুধুই মন-নির্বাহী মোকাবিলায়ী, এতদিনকার জবনার স্মৃত নির্ভরায়ে।

৩১ ডিসেম্বর ২০০৬ থেকে ১৪ই এপ্রিল ২০০৭
ইংরেজী বছরার শেষ দিনে শুরু—
বাংলা বছরার প্রথম দিনে শেষ।
ভবানীপুর, কলিকাতা।

ঠাকুর রবীন্দ্র সঙ্গমে

জায়া রেণুকা সমেত আই.সি.এস. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দ্য জুনিয়র, এবং হিজ্ হাইনেস্ রয়েল বেঙ্গলের থাবা, ও হার্ ম্যাজেস্টী টিমপু, দ্য পেট্ ক্যাট্

—"কোন সত্যেন রায় ?"

টোটালী ব্লাইণ্ড—স্যার অশোককুমার রায়, আন্তর্জাতিক খ্যাতির এই বিরাট মাপের মানুষটি—স্নেহময় সুরে তা জানতে চান—ঐ প্রশ্নে।

আপার উড্ স্ট্রীটের তিনের এক প্রাসাদোপম বাড়ীর—সেই বৈঠকখানায় বসে—চুপ হোয়ে আমি দেখছি—জানালার ধারে আপন স্পর্শ বুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—পুরুষ্ঠ সব কাঁঠালে ভরাট—গৃহস্বামীর সেই প্রিয়—কাঁঠাল গাছটি। উনি নেই। গাছটি কিন্তু এখনো আছে—হোয়ে ফলবতী। তবে, বছর খানেক হোলো নেই।

"মনে হোচ্ছে, জুনিয়রের কথা বোলছো"। খোলসায় নামলেন স্যার অশোক—"সিনিয়র সত্যেন রায় আই. সি. এস হিসাবে আমারই সমবয়সী ছিলেন। উনি, স্যার সত্যেন রায় বলে দেশে বিদেশে—খ্যাত। বিধান রায়ের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের খুবই কাছের জন ছিলেন। মা ছিলেন—কবি কামিনী রায়। রবীন্দ্র-সখা। বাবা ছিলেন আই. সি. এস. স্যার কেদারনাথ রায়।"—একটু থামলেন, আবার শুরু কোরলেন স্যার অশোক—"প্রসঙ্গ যখন উঠলোই ছোট সত্যেন থেকে বড়ো সত্যেনে, তখন আমার কাছ থেকে কিছু আর একটু জেনে রাখো। ইতিহাসের ব্যাপার। লোকে তা ভুলে যাবে।"—"কবি কামিনী রায়ের আরেক ছেলে ছিলো। নাম, অশোক রায়। সেও আই. সি. এস. হোতে গিয়ে বিলেতেই মারা যায়। পুত্রশোকে কবি—লিখেছিলেন কাব্য—"অশোকঝরা"। বড়ো কথা জানো না—স্যার জগদীশ ও স্যার প্রফুল্লচন্দ্র—দুজনেই কবির জীবনে ইতিহাস। আলাদা আলাদা—দৃষ্টি নিমেষে। বয়সে বড়ো দু'বছরের স্যার জগদীশকে (১৮৫৮)-কবি কামিনী—পতিত্বে বরণ করতে চেয়েছিলেন। প্যারিস ও সারা পৃথিবীময় ছড়ানো খ্যাতি তখন জগদীশের। কিন্তু দেশবন্ধুর কাজি্ন—অগ্রজা অবলা দাসের সাথে বাগদান আগে হওয়ায়, তারপরেই হোয়ে যায় বিবাহ। অবলা তখন মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজের ছাত্রী, থার্ড ইয়ারের। বিয়ে হোলো, পড়া আর হোলো না। এ এক অসহনীয় প্যাথোস্। কবি লিখলেন "আলো ছায়া" কাব্য—জগদীশের প্রতি অনুরাবতীকার স্পর্শে। যাক্ জগদীশ বৃতান্ত। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র প্রথম দর্শনেই—দেওয়ান ও লেখক চণ্ডীচরণ সেনের তনয়া—কামিনীকে ভালোবাসেন। সামনে আসতেন না। চিঠি লিখে

পাঠাতেন। আর সব চিঠি—কবির ভবানীপুরের বিরাট বাংলোয়, মানে পিত্রালয়ে পৌঁছে দিতেন—আচার্য্যদেবের কোনো কোনো ছাত্র। চিঠি লিখে, খামে বন্ধ কোরে—কাছে থাকা কোনো ছাত্রের হাতে দিয়ে—তার পিঠে তখনি বসাতো এক দশাশাই ওজনের চপেটাঘাত, "দেখছিস কী! যা বেলতলার ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে আয়।" আচার্য্যদেবের কাছ থেকে কবির কাছে পত্রবাহকের কাজটা বেশী কোরতো—বিজ্ঞানী ডাঃ জ্ঞান মুখার্জি। এবং জানবে, স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের চিরকুমার থাকার কারণ—কবি কামিনী রায়কে—না পাওয়াটা।"

গৌড় জনে ভণে—তেমতিকী এই রচ্য রচনায় যেন রুচিরে সুস্থয়ে—জুনিয়রকে তা্ক করা লেখ্যে—সিনিয়র মানুষটিকে নিয়ে প্রবাদ প্রতিম স্যার অশোক রায় যে আলোচনার ভূমিকায়—এক নয় দুই-দুই 'চন্দ্রের' আপন লোকীয়—যে অতি আন্তর কথা জানালেন—তা ধরতায়ে হোলোয় গৌরচন্দ্রিকা আই. সি. এস. সত্যেন্দ্রনায় রায়, দা জুনিয়রের—সালতামামিতে পৌঁছনোর রুদ্ধ দরোজা কোরে দিলো—খোলা। ওপেনড্।

স্বামীর থেকে অনেক কদম এগিয়ে থাকা শ্রীমতী রেণুকা রায়—সহাস্যে আপন শরীরী ব্লু-ব্লাডের হাল-হকিকৎ জানাবার প্রয়োজন শিকেয় তুলে রেখে—রায়পরিবারের কথায় বলেছিলেন—"তোমর জানার চৌহদ্দী এতোটাই বড়ো মাপের, যে—আশা করি কেন, জোর দিয়েই বোলছি—সবই তোমার জানা। ওঁর কথায়, জানাই—ফ্যামিলী পেডীগ্রীর কথা যদি বল, উনি উচ্চ-মধ্যবিত্তের ছেলে। বাবা ছিলেন অখণ্ড বাঙলার—পোস্ট মাস্টার জেনারেল। পড়তেন প্রেসিডেন্সীতে। ভালো আর তুখর ছাত্র ছিলেন। তারপর ও দেশে পাড়ি। হোলেন মেম্বার অফ দ্য ইণ্ডিয়ান সিভিল্ সার্ভিস্। বেঙ্গল ক্যাডারের। মুখচোরা মানুষ। কাজ ভালোবাসতেন। পড়াশোনা নিয়ে থাকতেন। সাতেও থাকতেন না। পাঁচেতও—না। ভাগ্যিস্ দাদা প্রতিম—সুকুমার সেন সাহেব—অভিমান বশে এ রাজ্যের প্রথম মুখ্যসচিবের পদ ছেড়ে কেন্দ্রে চলে যান। তাই উনি ঐ জায়গায় বোসতে পারলেন। থাকলে সেন সাহেব—হয় ত উনি কেন্দ্রেতেও—যেতে পারতেন।"

মানুষটি মাঝারি উচ্চতার। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। চুপচাপীন ভাব যেন আগায় তক মাথায় ছক—মোড়ানো। মুখচোরাও। কিন্তু প্রচারবিমুখ এই মানুষটি ছিলেন খুবই বড় মাপের প্রশাসক। ভারতরত্ন বিধানের মতো বিরাটতর পার্সোনালিটির সাথে—সহজ সরলে নিজেক সঁপেছিলেন—রাজ্যের নানান সমস্যাকীর্ণ—পরিধায়ী ব্যাপ্তিতে। রাজনীতির অখণ্ড কোপে তখন সোনার বাঙলা—দু'টুকরো। ধর্মে যারা প্রায় নব্বুই ছুঁই ছুঁই মেজোরিটির ভাগীদার—তারা অধিকাংশ ছাড়া, প্রায় নামমাত্র অংশ ঐ ওখানে থেকে গেলো। আর সবাইই তখন-এ বাঙলায় আসছে। আসছেনই।

অনবরতরয়। ক্ষ্যামতি নেই। নেই যেন য়্যাক্লোডাসী ব্যাপারে—থামাটা। অত বড়ো উদ্বাস্তু সমস্যায় সারা পশ্চিমবঙ্গ তখন নানাভাবে জর্জরিত। এক দিকে বিধানের নেতৃত্বে প্রফুল্ল সেন, জীবন রতন ধর, মধু দা, যাদু দা, অতুল্য ঘোষরা—আর অন্য দিকে সত্যেন রায়ের নেতৃত্বে, তাঁর মুখ্যসচিবীর ওয়ানড্-নীচয়—ব্রজকান্ত গুহ, নির্মলকান্তি রায় চৌধুরী, এস. এন. মোদক, কান্তি বসাক, উমেশ ঘোষাল, হিমাদ্রি রায়, বিজয় আচার্য্য, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, করুণা কুমার হাজরা, অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, অনিল বিহারী গাঙ্গুলী, সন্তোষ চ্যাটার্জী, শঙ্করনাথ মৈত্র, রবি মিত্র, ব্রহ্মদেব মুখার্জী, বাথান চন্দ্র মুখার্জী, শৈবাল গুপ্ত, করুণাকেতন সেন, অরেলিয়াস ডেভিড্ খান, সুশীল দে, রণজিত রায়, রণজিত গুপ্ত, ডাঃ নবগোপাল দাস, ডাঃ অশোক মিত্র, মৃগাঙ্ক বসু আর সুকুমার মল্লিক প্রমুখ—সুভদ্র সুনামী ও সজ্জন এই আই. সি. এস্.-রা।

জায়ার সাথে পরিচিতি নিতে, আর তাঁর কাছ থেকে—ও বিচার-মন্ত্রী, কেমব্রীজের সপ্তম র‍্যাঙ্গলার—ব্যারিস্টার সত্যেন বোস এবং কৃষিমন্ত্রী—সেই প্রবাদ প্রতিম ডেন্টিস্ট—ডাঃ রফিউদ্দিন আমেদের সেক্রেটারীদের কাছে থেকে—আমারই 'কিশলয়' পত্রিকায় জন্য—আশার্বাণী চাইতে যাই,—রাইটার্সে, দুষ্টুমি কোরে স্কুল পালিয়ে।

তখন রাইটার্স ছিলো ছিমছাম। সৌজন্যে প্রাণচঞ্চল। য়্যানকোয়ারীতে একজন ইন্সপেক্টর। আর একজন কেরাণী। কি চাই শুনে, রাজী হোয়ে—তিন মন্ত্রীর জন্য তিনটি ছোট কাগজের চিরকুট—ভরিয়ে দিতে বলেন। করি তাই। আধঘন্টার মধ্যেই উত্তর আসে—সচিবদের হাতের লেখায়—মিঃ বোস ইজ উইলিং টু মীট ইয়্যু আফটার হাফ এন্ আওয়ার। মিসেস রায় আউট অফ স্টেশন। ডাঃ আমেদ উইল সী ইয়্যু আফটার থ্রী পি. এম্।

তখন এগারোটা বাজে। আধ ঘন্টা পরে টাইম দেওয়া বিচার মন্ত্রীর। ইনস্পেক্টর জানালো, যাও করিডরে গিয়ে বোসো। ডেকে নেবো। ঘরটা বুঝিয়ে দিলো। বই হাতে নিয়েই যেয়ো। তুমি যে ছাত্র—এটায় তোমার সেই পবিত্র পরিচিতিটা থাকুক।

মনে আছে—সেন্ট্রাল গেট্ দিয়ে ঢুকে দোতলার সাজানো বারান্দায়—মুখ্যমন্ত্রীর ঘর পেরিয়ে—যেই এগুচ্ছি দেখি একজন স্যুটেড্ স্কাই কালারে, লাল টাই, মাথায় টাক—দাঁড়িয়ে ছিলেন সামনায়। তিনি স্মিত মুখে ডাকলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'এত ছোটো বয়সী ভিজিটার—বলি কার জন্য ?'

সগর্বে জানালাম—নামগুলো।

হাসলেন—বললেন, "মিসেস্ রায় কে জানো, আমারই স্ত্রী। দ্যাখো ত আমি কেমন উনার সাবঅর্ডিনেট। বেশ আছি। তাই না!"

"আপনি সতেন্দ্রনাথ রায়।" বলেই ঢিপ কোরে প্রণাম জানালাম। "না-না', বোলে হাত দিয়ে বাধা দিয়ে আমায় তুলে ধরলেন। "বলি, 'সাহিত্য প্রীতির টানে স্কুল পালিয়ে এসেছো নিশ্চয়। হ্যাঁ রাগ কোরবো—ভবিষ্যতে যদি না তুমি রবীন্দ্রনাথের হাজারভাগের একভাগও না হোতে পারো। দাঁড়াও, দাঁড়াও—মিঃ বোসের কাছে যাচ্ছো ত'—আই ক্যান হেল্প ইয়্যু। বলেই আরেকজনকে ডাকলেন—"মিঃ হাজারা শুনুন, একে নিয়ে ঘরে ঢুকুন। টীন এজ এই ভিজিটরকে। দেখছেন, কবি,—ভাবীকালের।" আবার হাসি।

চলে যাচ্ছিলেন সামনে দিয়ে হাসি মুখ দেখিয়ে—ক্রীমকালার হাওয়াইয়ান শার্ট ও সাদা প্যান্টের—হাজরা সাহেব। করুণাকুমার হাজরা। আর একজন ভবানীপুরীয়ান আই. সি. এস.

'চল'। আমার কাঁধে হাত রেখে ড্র্যাগ্ কোরলেন সামনের দিকে—শ্রীযুক্ত হাজরা।

"এসো, আমাদের বাড়ীতে। চার নম্বর সুইনহো স্ট্রীট। ইট্ সীমস্ ইয়্যু আর এ ল্যাড্ অফ্ স্টার্ন আইডিয়ালিজম্। আই লাইক দ্যাট—ভেরী মাচ্। পত্রিকা বেরুলে দিয়ে যেয়ো। খুশী হবো।"

বলেই সত্যেন রায় সামনেরই চেম্বারে ডুকে গেলেন। আর্দালী বলে গেল "ডাঃ সাব্ আপনাকে ডাকছেন।"

প্রথম আলাপ বাহান্নর সেই প্রথম নির্বাচনের অব্যহিত পরেই। নতুন বিধান সভা। নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের নেতৃত্বে। একটু মন কষাকষির জন্য—এখানকার চীফ্ সেক্রেটারী, অসাধারণী পার্সোনালিটির সুকুমার সেন কেন্দ্রে চলে যান—ভারতের প্রথম চীফ্ ইলেকসন কমিশনারের—দায়ীত্বে। তার জন্য খালি থাকা ঐ চেয়ারে হোলেন সমাসীন্—দ্য জুনিয়ার—সত্যেন রায়। আর আর, উনার বিদুষী ও সুন্দরী জায়া তখন—এ রাজ্যের একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী। আর. এণ্ড, আর. ডিপার্টমেন্টে। উনার সচিব তখন আই. সি. এস্ নির্মল কান্তি রায়চৌধুরী। বামমার্গীয় অনিলা দেবীর দাদা ও সদ্যপ্রয়াত ডাঃ ভাস্কর রায়চৌধুরীর—কাকা।

মনে আছে—অপরাজেয় শরৎচন্দ্রের মাতুল, প্রখ্যাত বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী তখন এম. এল. এ। হাইকোর্টের সামনে থাকা—বিপ্লবী কামাখ্যা চৌধুরীর 'প্রেস এণ্ড লিটারেচারে' উনি এসেছেন। সাথে তখনকার শেরিফ্—শিল্পপতি স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়। আমিও ছিলাম। কথায় কথায় আমায়—এঁদের দু-জনারই ভালো লেগে যায়। লিখি শুনে—বিপিনবিহারী তার পকেট থেকে বিধানসভার প্রসেডিংস চলাকালীন—আমার আসার জন্য একখানা—কার্ড দিলেন—খচ্ খচ্ করে ইনিসিয়ালে—বি. বি. জি.—লিখে। সেদিনকারই। শুরু দুটোয়। তিনটেয় যাই। পথ

যেখানে বুঝিয়ে দেন, —আরেক জনদরদী সদস্য—সাংবাদীক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ভালো জায়গা পাই। ব্যালকনিতে। ঠিক বিরোধী নেতা জ্যোতিবাবুর ওপরে। তাঁর পিছুটা দেখছিলাম। আর সামনেই সপারিষদ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। শালপ্রাংশু যাঁর চেহারা। প্রশ্নোত্তর চল্‌ছে। বামপাশে রেণুকা রায়—সত্যেন জায়া—হালকা সবুজ রঙ্গী রেশমী শাড়ী সোনালী নক্সী করা পার। ক্রীম-কলারের স্লীভলেস ব্লাউজ। লম্বা বিনুনীর ভারী এক খোঁপা। আর ডান পাশে—খাদ্যমন্ত্রী—জননায়ক প্রফুল্লচন্দ্র সেন। মনে হোচ্ছে—পিতা আর পুত্রে—বেশ বেশ রসালোই কাজিয়া বেঁধেছে। শাসনী ব্যাপারে সালতামামী নিয়ে। আবান্তর হোলেও, জানাই সেদিনই—বসু মশায় তাঁর ঝলমলে গরদী পাঞ্জাবীর দোলালাই ঝাপড় তুলে, ছুড়েদিলো চোখা-চোখা তীর—মুখ্যমন্ত্রীর দিকে—"আরে, আপনি-হিটলার। মশায় তা কী জানেন।" বসুর প্রতি তাৎক্ষণিকী নিক্ষেপণ, 'আরে বাপু, আমি বেশ-বেশ, মানছি হিটলারই। তুমি বাপু, আর আমার বাছাধনটি যে এক লিটল স্ত্যালিন।" সেকি হাসির রোল। থামছে না যে। দেখি, হেম নস্কর মশায় থরে থরে বাহারী স্বাদের খিলি ভরা পানের স্যুটকেশটি খুলছেন, তখন। শ্রমমন্ত্রী কালীপদ মুখার্জি (এরই আপন ভাইপো হীরেন মুখার্জী) ও মন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী হাত বাড়িয়ে তালা খোলা আধার থেকে—কয়েক খিলি পান তুলে তথাচ পকেটস্থ কোরলেন। আমাদেরই পাড়ায় থাকতেন—নিশাপতি মাঝি, এম. এল. এ। খুবই রিজার্ভড মানুষ। মেলামেশাই এড়িয়ে চলতেন। তখন তিনি ডাঃ রায়ের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী। আমাদের সাথে মিশতেন অবশ্য। বাবার জন্য। তা, উনি সেদিন অ্যাসেম্বলীর দরজায়। মন্ত্রী রেণুকা রায়কে প্রণাম কোরে পরিচয় দিতেই, বললেন—"এতটুকু ছিলে। নাইনে পড়ে। এতসব জানো—আমি কার মেয়ে, কে আমার মেটার্নাল সাইডে আছে, দেখছি সবই তোমার জানা। বলি, তুমি উনার সাথে, মানে মিঃ রায়ের সাথে যোগাযোগ রেখো। উনি, বই ভালোবাসেন। লেখকদের ভালোবাসেন।" শ্রীমাঝি তখন বেরুচ্ছেন, আমায় কথা বলতে দেখে এগিয়ে—বললেন, "দিদি বিচ্ছু ছেলে। এছেলের মেমোরি এখনই অন্যদের ঈর্ষার বিষয়। যা বললেন, দেখবেন দশ বছর পর—টো-টো সবটাই আপনাদের শুনিয়ে দেবে। আমি এঁরই পাড়ায় থাকি। এর বাবা একজন্ টেকনো-বুরোক্র্যাট। চলি, পরে দেখা হবে।" বলেই প্রস্থান করেন। সামনেই গাড়ী ছিলো। আমার মাথায় হাত ছুঁইয়ে—রেণুকা রায় বললেন, 'স্যুইনকো স্ট্রীটে এসো।' বলেই চলে গেলেন।

বাব-বা।—তুমি সত্যেন রায়—মনে মনে বলে ফেললাম তুমি ধন্য—জবরদস্ত এক দেশখ্যাত বাড়ীর জামাই বলে।

(১) দিদি-শাশুড়ী—সরলা দাস, খুলে ধরি—তারই সব। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ফার্স্ট কাজিন। জ্যেঠার বড়ো মেয়ে। প্রথম ভারতের মহিলা ফেলো কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও আত্মার সুহৃদ। একই বছরে জন্ম। বিশ্বকবি তাঁর 'মায়ার খেলা' গ্রন্থ—এই সরলা রায়কেই করেন—ডেডীকেটেড্। ভারতরত্ন গোখেলও এঁর বন্ধু ছিলেন।

(২) দাদাশ্বশুর—ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়। এডিনবরা থেকে মেন্টাল ও মরাল ফিলজফিতে ডি.এস-সি। পরে আই. ই. এস. পরীক্ষায় স্টুড্ ফার্স্ট। প্রথম ভারতীয় হিসেবে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল। অনেক বই লিখে গেছেন। রাঁচী হাজারীবাগের উন্নতির পেছনে উনার অবদান—অনস্বীকার্য্য।

(৩) দিদি-শাশুড়ী—সরলার ছোট বোন লেডী অবলা বসু। আচার্য্য স্যার জগদীশের সাধিকা স্ত্রী। ও ভারতের অন্যতমাদের একজন সমাজ-নেতৃ। আর দুর্দিনে, লোকমাতা নিবেদিতার আন্তর আলোকিত বান্ধবী—যখন মিশনের সন্ন্যেসীরা ভয়ে, ভয়েতেই শুধু উনাকে বর্জন করেন—কাপুরোষিত কায়দায়। সুলেখিকাও। ভারতীয় সব রথী-মহারথীদের—যিনি বন্ধু ছিলেন। সর্বোপরি, আনথিঙ্কেবল্ য়্যাড্‌মারারর অফ টেগোর—দ্য ভার্সেটাইল।

(৪) শাশুড়ী—মিনি রায়। ভালো নামকে আড়াল কোরে এটাই হয় বিখ্যাত। মা-বাবা—তাঁদের কমন্ ফ্রেণ্ড ও ফিলোজফার রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টি 'কাবুলিওয়ালা'র ছোট্ট মিনিকে স্মরণ কোরতেই—ঐ নাম রাখা। এ. আই. ডব্লু. ইয়্যুর সভানেত্রী থাকাকালীন তিনি নিজে—এ কথারই সত্যটা জানিয়েছিলেন। এটির প্রতিষ্ঠাতা, লেডী রমলা সিংহও তাই বলেছিলেন। গুরুদেবেরই বিখ্যাত ছোট গল্পের ছোট্ট নায়িকা—মিনির থেকেই আমাদের চারুদির (চারুলতা)-ঐ ডাক নাম। এটিই ছিলো—সমধিক প্রচলিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত্য সবাইই এই নামে সম্ভাষণ রাখতো। বিউটি যে য়্যারীষ্টোক্রেসীর সাথে পরিণয়বদ্ধ থাকলে, হয় ম্যাচ্‌লেশ — তাই ছিলো মিনি রায়ের। উনি ছিলেন—রবীন্দ্রনাথের আরেক কন্যা। এম. এ. যখন পড়তেন তখন ছেলেদের মধ্যে সতীর্থ ছিলেন আন্তর্জাতিক ল' কমিশনের প্রথম ভারতীয় সভ্য, আইনজীবি—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, যিনি প্রখ্যাত সাহিত্যিকও ছিলেন, তিনি তার ভবানীপুর মনোহরপুকুরের বাড়ীর দোতলায় বসে একদিন জানালেন, "বুঝলেতো, অশোক, ওঁরা মানে মিনি রায়ের রূপের ঝলস ভাবলেই এখনও এ বৃদ্ধের চোখে, লাগিয়ে যায় অপ্রতিরোধনীয় নেশার ঝাপটা। এত সুন্দরী খুব কম দেখেছি। যৌবনের শুরু তখন। সব গ্রীন, ক্লাশে ঢুকতেন অধ্যাপকের সাথে। ঘণ্টা পড়লেই—বেরুনোও ছিলো তাই। আগে উনি, পেছনে অধ্যাপক, কিন্তু তাকে দেখার জন্য, আমাদের ছেলেদের যে অদম্য বাসনা ছিলো, তা রচিতে পারে অনেক পদ্য। অনেক ভাবের কাব্য।" যাক, সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন—এর পরেই সদ্য বিলেত প্রত্যাগত—আই. সি. এস. সতীশচন্দ্র মুখার্জী।

(৫) সত্যেনের শাশুড়ী মিনির নিজের মামা ছিলেন—স্যার এস. আর. দাস। এখানকার এ.জি.। পরে বড়োলাটের শাসন পরিষদের রাইট অনারেবল মেম্বার—ল'। ছিলেন প্রথম সারীর ব্যারিস্টার। ভারতের বিখ্যাত স্কুল—ডেরাডুনের 'ডুন' স্কুল—বিলেতের হ্যারোর ধাঁচে গড়া। উনারই সৃষ্টি। এখন যিনি প্রিন্সিপাল, তিনি তাঁরই নাতির ছেলে।

(৬) স্বাধীন ভারতের চতুর্থ প্রধান বিচারপতি—সেই সাথে দ্বিতীয় বাঙালী ডাঃ সুধীরনঞ্জন দাস—মিনির চেয়ে ছোট হোলেও, কাজিন মামা। রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় বছরীয় ছাত্র—ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের।

(৭) স্ত্রী রেণুকার পরের ভাই—প্রশান্ত মুখার্জী, আই. আর. এস.।—ভারতীয় রেলের পরিষেবায় এক বিরাট নাম। স্বাধীনতার পর রেল আধুনিকীকরণে তাঁর অবদান পি. সি. এম—নামে খ্যাত। তিনি ফাদার অফ চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস। ভারতে রেল ইঞ্জিন তৈরীর স্বপ্নকে—সার্থক করেন তিনি। রেল বোর্ডের তিনিই প্রথম বাঙালী চেয়ারম্যান তথা প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী, রেলমন্ত্রক। ইনার স্ত্রী শ্রীমতী শ্রীলতা ওরফে ভায়োলেট হোচ্ছেন—ব্রহ্মদূত কেশবচন্দ্র সেনের নাতনি ও ভারত-খ্যাত সাধনা বোসের অনুজা, বাবা ছিলেন কনিষ্ঠ তনয় কেশবের। আই. সি. এস. নির্মল চন্দ্র সেন। তিনি এক সময় ভারত-ভাইসরয়ের ওপরওয়ালা হোয়ে যান—তিনি আণ্ডার সেক্রেটারী অফ্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া ইন্ ইলণ্ডের—বিখ্যাত বাঙালী লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের য়্যাসিসটেন্ট ছিলেন—মূলতঃ শিক্ষা নিয়ে। আর শ্রীলতার মা ছিলেন—মুর্শিদাবাদ পাক্‌পাড়ার রাজবাড়ীর বিধবা মহারানী—কবি মৃণালিনী। রবীন্দ্র স্নেহধন্যা এবং রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানস্ ও প্রোগ্রাম মেনে—তরুণ আই. সি. এস নির্মল প্রেমে পড়ে। ইলোপড্ দ্য ক্যুয়ীন স্ট্রেইট টু লন্ডন—ফ্রম বারহামপুরস্ ওয়েল ফর্টিফায়েড্ প্যালেস। সেখানেই বিবাহ। এবং পর পর জন্ম ভাই নির্মাল্য, বোন শ্রীলতা আরতি ও অঞ্জলি। জ্ঞাতব্য এই—একমাত্র এই তিন কন্যে—ওয়াজ প্রেজেনটেড ট্যু দ্য কিংস কোর্ট—ওয়ান্স'। ছবি তোলা হয় ভারত সম্রাটের সাথে। তারই একটি কপি—রুপোর ছোট গোলাকার ফ্রেমে সোনার লাইন দিয়ে বাঁধানো—ফোটো ফ্রেমে রাখা—লেডী রমলা সিংহের সংগ্রহে। সেদিন আমাকে ও সন্ধ্যাকে—হাতে নিয়ে দেখতে দিয়েছিলেন—সানি পার্কের বাড়ীতে। বলি—এই লেডী মৃণালিনী সেন দারুণ ব্যক্তিত্বের ছিলেন। আপন প্রিয়ার নামে নামী বলে—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডাকতেন, এই ছোট মৃণাল বলে। কবিসম্রাটের আগ্রহে শ্রীমতী সেন কয়টি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। একাধারে বাঙালী, অন্যধারে ইয়োরোপীয় কায়দায় অতিশয়ী কেতাদুরস্ত—মৃণালিনী অকপটে জানিয়েছেন—কাউকে কাউকে—"রবিদাদা না হোলে শ্রীযুক্ত সেনের ঘরণী কোনদিনই হোতে পারতাম না।" বিদেশে থাকলে

নিয়মমত নামের সঙ্গে বিদেশী নাম জড়াতে হয়। ওঁদের পুত্র কন্যাদেরও একটি করে বিদেশী নাম ছিল। নির্মাল্য ছিল ভিক্টর, শ্রীলতা ছিল ভায়োলেট, আরতী রোজী এবং অঞ্জলী পেনজী। ওঁরা যখন বহরমপুরে পোস্টেড তখন, অবিবাহিতা শ্রীলতাকে দেখে 'যুবনাশ্ব' মণীশ ঘটক—তখন সেখানকার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট আই-সি-এস অন্নদাশঙ্কর রায়কে বলেছিলেন 'আই ট্রাই টু য়্যু মিস্ শ্রীলতা।' বৈকালিক টেনিস খেলার কোর্টে, সিঙ্গেল্‌সে শ্রীলতার বিপরীতে খেলার জন্য মনীশের আকুপাকু করা ছিল দেখার মত। একথা আমাকে অন্নদাশঙ্কর বলেছিলেন—নিজের মুখেই। মণীশের লেখা 'মান্ধাতার বাবার আমলে' কিছু কিছু ছোপ আছে। যাক রবীন্দ্রনাথের কাছে ওঁদের মা, মৃণালীনি হল ছোট মৃণাল, কবির বিশ্ব ভাবনায় সেন্টিমেন্ট বলে—আরো দুই মৃণাল যুক্ত ছিল। এদের মধ্যে মেজো ছিলেন—স্যার জগদীশএর বোন স্বর্ণময়ীর জা—মৃণালিনী বোস ছিলেন মেজো মৃণাল। ইনি ছিলেন উপেন্দ্র কিশোরের অনুজা। তার মানে সুকুমারের একমাত্র পিসি ও সত্যজিৎ এর ঠাকুমা। রবীন্দ্রনাথ বলতেন—"এই মৃণাল যেন আমারই মা। আমার মায়ের আমি চোদ্দ নম্বর সন্তান। আর মেজোরও চৌদ্দটি সন্তান।" এটা রসিকতা নয়। এটা হচ্ছে কবির অন্তরের আন্তরিক কথা। জানানোর জিনিস এই—বসু মৃণালিনী ৩৪ বছর বয়সে স্বামী হারা হন। ভারত বিখ্যাত পারফিউমার হেমেন বোস অকালে চলে যান। তখন কবির মেজো মৃণাল—দুই খাস বৃটিশ ম্যানেজারসহ স্বামীর কোম্পানী আগলান। এটা কম কথা নয়। এ সময়ে ওঁনার প্রেরণা ছিলেন—কবি রবীন্দ্রনাথ। অন্য দিকে স্যার জগদীশ, লেডি অবলা ও স্যার প্রফুল্লচন্দ্র। আর সেজো মৃণাল ছিলেন জগৎ বিখ্যাত ঋষি অরবিন্দের স্ত্রী, মৃণালিনী ঘোষ। এসব কথা লেডি মৃণালিনী সেন ইংরেজীতে তাঁর লেখা আত্মজীবনী—"নকিং য়্যাট দ্য ডোর"—এ, এই সব বৃত্তান্ত আছে। মৃণালিনী সেনের আত্মজীবনী—সাহিত্যের অঙ্গনে দামী সৃষ্টি,—যেমন মহারাণী সুনীতি দেবীর লেখা আত্মকথন 'An Autobiography where A Queen speaks herself.' যাক, ৮ নং মার্লিন পার্কের সেই ছোট্ট প্রাসাদ, আজ প্রোমোটারী গ্রাসের ইতিহাস। এই কলকাতাতেই আজও আছেন কোথাও—আর দুই বোন—আরতি-অঞ্জলি, রোজী-পেন্‌জী। কে তার খোঁজ রাখে।

প্রশান্ত অনেক আগেই—ইন্ সার্ভিস মানে ইন্ হার্নেস্ চলে যায় অকালে অন্যলোকে। দেড়শত বছরের রেল ইতিহাসে উনার মতন শান্ত নির্বিবাদী ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়ে হয় না, থাকে না, উনিই ত দ্য গ্রেট সিমফনি অফ্ প্রোগ্রেস—ইন্ ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ্।

(৮) ছোট প্রশান্তর পরবর্তী হোলো—সুব্রত। শুধু খ্যাত নয়। ভারত বিখ্যাত। প্রথম ভারতীয় এয়ার মার্শাল। বিশাল বাহিনীর সর্বময় কর্তা। শিক্ষা কলকাতার

ভবানীপুরের মিত্র স্কুল থেকে। উনার দাদা প্রশান্তও এই স্কুলের। আশ্চর্য বিষয়—তখনকার ইংরাজীশিক্ষার সমাজ কিন্তু অনীহা মোটেই দেখাত না—বাঙালী মাধ্যম স্কুলের জন্য। আর আজ—না—বাঙালী মাধ্যাম স্কুলের জন্য। আর আজ রাম শ্যাম যুদ থেকে জজ্ ব্যারিস্টার সবাই ছুটছে অপত্যদের জন্য—নট্ হিয়ার, তবে হোয়ার কোন্ ইংলিশ মিডিয়ম তক্। যাক্ বিলেতের স্যাণ্ডহার্স্ট থেকে পাশ কোরে সুব্রত মুখার্জী হোলেন R.A.F. মেম্বার অফ দ্য রয়াল এয়ার কোর্স। দুঁদে অফিসার ছিলেন। আগাগোড়া কারুর ধার ধারতেন না। ধারতেন শুধু মা ও দিদিমার—যথাক্রমে গুরু ও বন্ধু—বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথকে। বলতেন এয়ার মার্শাল—"আর কী পরিচয় আছে বিশ্বেতে উনি ছাড়া—আমরা সাত কোটি বাঙালীর।" আরো বলতেন বাঙালী এয়ার মার্শাল—"উনি, ভারতের পরিচিতি 'টু দ্য হোল ওয়ালার্ড।' গান্ধী ত নয়ই, আর কোনো কেউই নয়—নান এলস্।" বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিতের দেবর কন্যা—সারদা পণ্ডিতকে বিয়ে করার দৌলতে—সুব্রত জবাহরলালজী, মানে স্ত্রীর মামাজীকে রেখে কথা বলতেন না। সোজা কথা সোজাভাবেই বলতেন। বাঁকায়ে চোরায়ে এর গল্প বলতেন মীরা চৌধুরী,—জবরদস্ত আই. সি. এস. পি চৌধুরীর ছোট-ভাই, প্রাক্তন ক্যাগ্ অফ ইণ্ডিয়া আই. এ. এণ্ড এ. এস—কে সি চৌধুরীর স্ত্রী—যিনি রবীন্দ্র সখা, ভবানীপুরীয়ান ডাঃ দ্বিজেন মৈত্রের বড়ো মেয়ে—তিনি তখন স্বামীর কার্য্য উপলক্ষে আফগানিস্থানের রাজধানীতে। স্বামী তখন ওখানকার অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল। আর সুব্রত মুখার্জী তখন ওখানকারই সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত এয়ার কমাণ্ডার। মীরা মাসী-মা তার চৌরঙ্গী টেরেসের চারতলায়, বসে বলেছেন—"সুব্রত খেতে খুব ভালোবাসতো। পেটুকই ছিলো। সারদা এই নিয়ে খ্যাপাতো। খাওয়া হোলো আপরুচির। বুঝলে অশোক, আগের দিনের ভাজা লুচি মানে বাসি লুচি—এর খুবই প্রিয় ছিলো। খেতো তরকারী দিয়ে নয়, শুধু মোটা মোটা দানার চিনি দিয়ে। এসেই বোলতেন' খুবই খুশী বিহ্বলতায়—'মীরাদি, বাসি লুচি দাও, আর কিছু নয়।' বাসি লুচি ও মোটা চিনির সহযোগে গ্রহণ কোরতো সুব্রত—জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, আমাদের দিকে পেছনে রেখে। কী যে তৃপ্তি। ভাবাই যায় না। জানো অশোক, এখনো অতীতের দেশের হাওয়ায় কান জুড়লে—শুনতে পাই সুব্রতর দাঁত চেপে—গুড়িয়ে খাওয়া সেই মোটা দানা চিনির—কুড় কুড় শব্দ।"

দাদারই মতো—সার্ভিসে থাকাকালীন সেই সুদূর জাপানের এক রাজকীয় ভোজসভায়—ভারত বায়ু সেনার সর্বময় কর্তার অনারে—মানুষটি যেন ভুল কোরে কী যে কীভাবে আহার চ'লতে থাকার তৃপ্তি ধারার কোনো দুরুহ কক্ষে গেলেন অতর্কিতে সুযোগটি। পাশে বোসে শুধুই ফ্যাল-ফ্যাল্ দেখে গেলেন কিং কর্তব্যবিমুঢ় হোয়ে—পাঞ্জাবী বাবার আর বাঙালী মায়ের বড়ো ছেলে, তদুপবি বাঙালী ইরা

ঘোষের স্বামী—পূরণচাঁদ লাল, পরবর্তীকালের এয়ার চীফ মার্শাল। মনে আছে সুব্রত-হীন জীবনে কোনো এক সময় সারদা মুখার্জী হোলেন অন্ধ্র প্রদেশের এইচ, ই.—গভর্নর। তারই সম্মানে গর্বিতা এখানকার খানদান মহিলারা—রাজ্যপাল সারদা, ও হাইকোর্টের নিযুক্তা দুই বিচারপতি মঞ্জুলা বোস ও পদ্মা খাস্তগীরকে—সম্বর্ধনা জানায়। প্রধান ছিলেন—রায়পুরের মাসীমা, লেডি রমলা সিংহ। আমি বুফের সময় রাজ্যপালিকা মাসীমার কাছাকাছি হোয়ে নমস্কারান্তে—মীরা চৌধুরীর ঐ সুব্রতর প্রিয় খানা—বাসি লুচি বনাম মোটা দানা চিনির কথা তুলি। এই নস্টালজিয়ার কথাতে তখন মেতে ওঠেন সবাই। 'বাপরে'—লেডি রমলার কথা 'আমাদের অশোক পারেও স্মৃতি উজাড় কোরে এত সব মনে রাখা জানাতে। মাথা নেড়েছিলেন শ্রীমতা বি. আর. সেন, শ্রীমতী শৈবাল গুপ্ত, শ্রীমতী গৌরী সেনের সাথ কোরে যেন একই ঢঙী খুশীর অংশীদার—হার এক্সেলেন্সী সারদা মুখার্জী ঐ—ও সাহিত্যিকা লীলা মাসীমা (মিসেস এ. এস. রে)।

৯। ছোট বোন নীতার কথা বলা হয়নি। এই নীতা ছিল ঘরের হোমমিনিস্টার। গুণী হলেও বাইরে কোন প্রচার চায়নি। বিয়ে হয়েছিল দিল্লীর বিখ্যাত ডাক্তার এস কে সেনের সঙ্গে—যিনি তামাম ভারতের সমস্ত গুণী বাঙালীর ঘরেই অতিসুরসিক মানুষ—ডাকনাম 'বুড্ডা সেন' হিসাবে পরিচিত ছিলেন। স্বাধীনতার পর পর—খোদ ভারতে তখন কোথায় এ. এ. আই. এম. এস বা মৌলানা আজাদ মেডিক্যাল কলেজ! তখন তা রাজধানীতে বিশ বাঁও জলে। তখন ভি আই পিদের এক মাত্র গতি ছিল, অসুখ হলে পর—অতিমানবী ডাক্তার এই 'বুড্ডার'—ডক্টর সেনস নার্সিংহোম'—। এই নার্সিংহোম-এ দুই দুবার ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদকে—অন্য পৃথিবীর পথে চলে যাওয়া থেকে ফিরিয়ে দিয়ে ছিলেন আবারো—ঐ রাষ্ট্রপতি ভবনে—পুরো সুস্থ করে। এরই রেশ ধরে কলকাতায় সেদিন—জনতার সম্রাট প্রফুল্ল চন্দ্র সেন—রাজেনবাবুর মতই একই রোগে আক্রান্ত হয়ে—শেষ বিদায় নেবার আগে—আমায় বলেছিলেন—অস্ফুট স্বরে কষ্টের মধ্যে—"জানো অশোক, দিল্লীর বুড্ডা বাবু যদি আজ বেঁচে থাকতো—তাহলে আমি সানন্দে এই সুন্দর পৃথিবীটা ছাড়তে পারতাম। জানো তো এখন শুধু মনে পরছে কবির কথা—মরিতে চাহিনা আমি এই সুন্দর ভুবনে।" নীতার কথা লিখতে গিয়ে যেন—প্রফুল্ল সেনের এই কথা আমার বারবার কানে বাজছে। নীতার শ্বাশুড়ি শ্রীমতী সুযুমা সেন খানদান পরিবারের এক খানদান মহিলা ছিলেন। তিনি প্রথম লোকসভায় স্বামী পি. কে. সেনের কর্মস্থল—পাটনা শহরের কেন্দ্রীয় আসন থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে—এম. পি. হন। একজন ভালো অরেটর ছিলেন। এই সুযুমা ভারতের প্রথম ভূ-তাত্ত্বিক—

প্রমথনাথ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং সেই সুবাদে ভারতের দ্বিতীয় আই. সি. এস— অর্থনীতিবিদ রমেশ দত্তের বড় নাতনি এবং বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মধু বোসের দিদি, ও স্যার বি. এল. মিটারের বড় শ্যালিকা। এই সুষুমা একখানা বিরাট আত্মজীবনী লিখে গেছেন। নাম—'অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান্ অক্টোজেনেরিয়ান ওউম্যান"—এই বইটিতে সেদিনকার রেনেসাঁ ধরা আছে। বইটি বার করেছিলেন তারই আরেক পুত্র—যিনি তখন ভারতীয় আর্মিতে—লেফ্‌টেনেন্ট জেনারেল। অনেক জানালাম। থাক এবার।

বইটির নাম 'রেমীনেসেন্স্'। বেরিয়েছে ওরিয়েন্ট লড্‌মানস্ থেকে। সানি পার্কে দেখা হোতেই—লেডী রমলা সিংহ বইটি আমায় দেখতে দিয়ে জানালেন—"রেণুকা লিখেছে। এঁর মুখচোরা স্বামীর কথা অনেক আছে। সত্যেন কোনো দিনই প্রচার চায় নি। আজকাল ঐ কাগজের পাতা খুললেই দেখা যায়—মুখ্যসচিবদের নানান কিছু। সাথে স্বরাষ্ট্র-সচিবও। উনার সময়কার রবি মিত্রকে স্বরাষ্ট্র-সচিব থাকার সময় ক'বার ফ্ল্যাশ করেছে, বলা যাক, প্রচারেতে এঁরা থাকলে বিব্রত বোধে যেতেন। যাও না একদিন রেণুর কাছে। বইটি যদি বাংলায় অনুবাদ করাতে পারো, খুবই ভালো হয়। আমি দিচ্ছি, নিয়ে যাও, পড়ে ফেরত দিয়ো।'

বাড়ী আনলাম। পড়লাম। অনেক কিছুই জানলাম। স্ত্রীর কলমের আন্তর কোণে স্বামী সত্যেন রায়—ছবি হোয়ে ফুটেছেন। সেই স্টীল ফ্রেমের প্রশাসকরা সেদিন যখন ঘোড়ায় চড়ে, নৌকা চালিয়ে এমনকি—সিকিউরিটি ছাড়াই—পায়ে হেঁটে মাইলের পর মাইল সরু পথে, ধানক্ষেত্রের আল ধরে—অকুস্থলে পৌঁছুতেন, সরেজমিন তদন্তে—তখনকার সে দিনের কথা আর কাহিনী, জানাতে, চাইলে—তাঁদের সাথে থাকা ঘরণীরা পারতেন—প্রত্যহ...এক একটি বই লিখতে—যেমনটি রেণুকা মাসীমা পারলেন—ইংরেজীতে 'রোমিনীশেন্স' লিখে।

ঐ বই প্রসঙ্গে একদিন পরে রায় বাড়ীতে যাই। উনি খুব খুশী আমায় পেয়ে। বার বার বলেছিলেন, 'তোমার স্মৃতি ধরে রাখার ক্ষমতা কি তুলনাহীন। দেশে-বিদেশে তোমার মতো এতটা স্মৃতিধর আর কাউকে দেখিনি। এই আশী বছর পেরিয়েও। আমায় কথা দাও—তুমি মিঃ রায়কে নিয়ে—পারলে কিন্তু একটা প্রবন্ধয় বেঁধে ফেলো—আর দশজন পড়ে যাতে তাঁকে মনে রাখেন। বলি অশোক, তুমি দেরী কোরে এলে। সব কম্‌প্লিমেন্টারী কপি বিলি কোরে ফেলেছি. তোমাকে নিরাশ কোরবো না। যদি অনুমতি করো—তাহলে অফ্-স্যুট আছে, তাই দিচ্ছি। নেবে! ভালো কথা।' বলেই দুটো ফর্মা দেড়েকের প্যামফ্লেটী বই দিলেন—খামে পুরে। একটার ওপরে আমার নাম লিখে, নিজের নাম সই কোরে। আরেকটা অমনিভাবে—সন্ধ্যা ও মেয়েকে দিলেন। আজও তা আছে—যত্নেই।

'জানো, সত্যেন রায় ভালো গান জানতেন। আর বুঝতেনও। একবার একটা অনুষ্ঠানে 'বন্দেমাতরম' গাইতে উঠে —সেই গাইয়ে সুরে ভুল করছিলো। উনি রাজ্যের মুখ্য সচিবের কথা ভুলে, ডায়াসে এগিয়ে এসে—নিজেই রবীন্দ্রনাথের আরোপিত সুরে—পুরোটা গেয়ে শোনালেন। খুবই ভালোয়। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা প্রথম পাতাতেই উনাকে নিয়ে লিখেছিলো। এই বলে—A singing Administrator.

জায়ার গর্ব ঝলমলায়—আই. সি. এস. মানুষটির স্মৃতিভারে। হয়ত বেশীই স্মৃতিধারে।

আসছে এবারটি—প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ।

বর্ধমানে তখন পোস্টেড্ রায় মশায়—য়্যাজ্ জেলা শাসক। বিরাট বাংলো। যদিও অন্য জেলার মতন—নদী নেই পাশয়, কী কাছটায়। বাংলোর সামনে দিয়ে ছুটছেয়ী টঅন্ আর আপে—মেজাজী গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড। নবাবজাদা শের শাহেয়ী—এক সায়েরী যেন।

'হ্যাঁ রে রেণু, তোমার বর কোথায় ? সাত সকালেই কী ম্যাজেস্টারী কোরতে ছুটছে জিন্ লাগিয়ে ? বালি, ও দেখে না এখানে বোসে—এই ভোরবেলার নরম নরম আলোর সাথে—সূর্য্যের লুকোচুরি ?' বলছেন স্বয়ং বিশ্বকবি। রবিদাদা—প্রায়ই বেরিয়ে বোলপুর যাওয়ার পথে, পারলে এক বেলা কী এক রাত থেকে যেতেন—মিনির এই জামাই বাড়ীতে। মজা ছিলো—এই বিরাট আঙ্গিনার চার-ধারী খোলা পরিবেশে। তারই মাঝে ভি. এম. সাহেবের বাংলো। সামনের বারান্দায় থাকলে চোখ ভোরে দেখা যায় সূর্য্যোদয়। আর পেছনের বারান্দা সেই আর্তয়ে বিদায় দিতে পারে অনিমেষী দৃষ্টে—সূর্য্যাস্তরে। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিলো এই এখানে বোসে সাড়া আলাপ সমেত—দেখা সান-রাইজ ও সান্-সেট। 'একদিন দেখি উনি কবিতার মধ্যে লেখার পর, আপন মনে কাটাকাটি কোরে, ছবিময়ে সাজাচ্ছেন। তখন ছেলে হোয়েছে আমাদের। খুব দুষ্টু ছিলো। এখন ও তার উল্টোটা। বলেছিলাম দু'জনেই—'রবিদাদা, ওর একটা নাম দিন।" উত্তরে ছবিয়ী কাটাকুটিতে মেতে থেকেই, জানালেন কবি, 'রেণু, আমার ছেলের নাম জানিস ত ? তবে, বলি রথীন—রাখ। সবাই রথী রথী কোরবে। পছন্দ ?' অবাক বিস্ময়ে রেণুকা জানান 'রবিদাদা যে নামই দিক, তাইই আমাদের পছন্দনীয়। আর নয় কোন কিন্তু। বুঝলে অশোক।' পরে একদিন ক্যালকাটা ক্লাবে দেখা সত্যেন রায়ের সাথে। বললেন—'একে চেনো। আমার মেয়ে। দিল্লীতে এখন বড়ো আমলা। জানোত—এর নাম দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পান—আমার টেবিলে 'রক্তকরবী' গ্রন্থটা। হাসতে হাসতে বোললেন—'সতু, তুমি মিনির জামাই আর রেণু মায়ের বর, ওর হাতের কাছেই ওই নামধাম গোত্রটা রয়ে গেছে। একটু থেমে—বুঝলে না ! তবে শোনো মিনির

প্রিয় আমার রক্তকরবী থেকেই নাম দিচ্ছি তোমার মেয়ের। নায়কের শেষে আকারটা যোগ কোরে নিয়ো। তা হোলেই সব নাম প্রসঙ্গের—সুরাহা। হোক্—রঞ্জনা।'

সত্যেন রায় একদিন বললেন—"ভোরেসাস্ রীডার তুমি ত' ? বলি 'য়্যানীমেল ফার্ম' পড়েছো ? কেমন লেগেছে। অরওয়েল্ ইংরেজী লেখক হোলেও'—তাঁকে ভারতীয় বলা যায়। এই সেদিন পড়লুম 'নাইন্টিন এইটটি ফোর'। য়্যান্টিসেক্স মুভমেন্ট নিয়ে লেখা—আগাম পাওয়া আভাসে।'

বলেছিলাম—"খুবই ভালো বই। তবে, এটা য়্যানিমেল রাজত্ব ধরে ব্যাঙ্গ করা হোয়েছে—বাম মার্গীয় সরকারগুলোকে, বিশেষ করে স্ট্যালিনের রাশিয়াকে। ওদের সমাজেও বোধ আছে, আছে মনে করি—শুভানুধোত্ত। এরাও পারে দর্শাতে—চিন্তনীয় নয় এমনও শুভশুভো দেখভাল। রাখভাল।'

'শোনো অশোক। তুমি ভালোই সামারাইজ্ কোরলে। পশু পাখীর প্রতি—আমাকে ওদের পেছন পেছন টানে। আমার একটা মস্ত শখ আছে টেপ-এ ওদের ডাক, ওদের আওয়াজ, ওদের কিচিরমিচির, চার্পিঙ ধরে রাখার। তুলে রাখার। সামনের রবিবার জু-তে যাচ্ছি। সুব্রত থাকছে। পূর্বাঞ্চলের জন্য তদারকিতে আসছে দিন-দুয়ের জন্য। পারলে এসো। তোমায় ত জু-র সেক্রেটারী,—আমাদের হাব্লুদা—তোমায় খুবই ভালোবাসে। এসো।'

কথা মতো যাই। মিললাম—উনার সাথে। মিললাম উনারই ছোট শ্যালক—এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জীর সাথেও। উপস্থিত, হাবুলদা, প্রাক্তন দুঁদে আই. আর. এস. প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত, যিনি ছাত্রকালে —ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাধের "নোটবিহারী"—ও কার্য্যকালে ভারতীয় ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশানের—দ্বিতীয় কর্তা। সঙ্গে নারায়ণ দেশাই, গান্ধীজির সেক্রেটারী—মহান-ব্যক্তি মহাদেব দেশাইয়ের ছেলে এবং হাবুলদার ভগ্নিপতি—উড়িষ্যার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরীর—জামাতা। ভালোই সমাগম। তদারকিতে -জু-র সুপার, ডাঃ রামকৃষ্ণ লাহিড়ী।

মজার কথা বলি একটা। পঞ্চাশের শেষে, ষাটের দশকের গোড়ায়—নো সিকিওরিটি। নো লাল ফিতের গেরো। ভাবুন ত' চিড়িয়াখানা দেখতে এসেছেন তাবৎ ভারতের বিমান-প্রধান—এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী ও তার ভগ্নিপতি, যিনি এ রাজ্যের মুখ্য সচিব সত্যেন্দ্রনাথ রায় আই. সি. এস—শীতকালের জনসমাবেশে, মিলে মিশে। এখন হোলে—কিছু সময়ের জন্য নিশ্চয়ই বন্ধ থাকতো জু—ভিজিটারদের জন্য। আর পুলিশে পুলিশে থাকতো ছয়লাপি। তাই না। ভ্যানিটি নামক—জিনিষের সেই যাহা আজ বহভারস্ত কি!

এক সাথে ঘুরছি। 'হাবলুদা, হোয়ার ইজ্ মালিনী ?' সত্যেনের প্রশ্ন হাবুলকে। হাবুল বললেন, 'কাম, দিস্ ওয়ে।'

উপস্থিত সবাই মালিনী, হোয়াইট্ টাইগ্রেসের খাঁচার সামনায়।

হাবলু, 'কাম সুইটি, কাম হিয়ার। ইণ্ডিয়ান এয়ার চীফ এণ্ড স্টেটস্ সেক্রেটারীয়াল চীফ্ অলসো সীক্ ইয়োর ম্যাজেস্টিস্ লুক্। কাম, কাম, —মালিনী।'

ভেতরে ছিলেন—মালিনী। যেন চেনা গলা। মহারাণী নয়, সাম্রাজ্ঞীর মতো হেঁটে এসে হালুম শব্দয় বোসে পড়লো—সামনের হাত দিয়ে রেলিঙ ধরে। একটা হাত, একটু বার করা ছিলো। সত্যেন রায় এক হাতকে ধরে—অন্য হাতে, জেনে শুনেই সামনের বেড়া ছাড়িয়ে তা প্রসারিত করেন—হার ম্যাজেস্টির উষ্ণতাই—যেন অনুভব করাতে। কে শোনে সাবধানী বাণী। .. ও ডাঃ লাহিড়ী। উনি স্টীল ফ্রেমী মানুষ। ছায়া ফেলে না ভয়ের। যেইমাত্র ছোঁয়ালেন হাতের মানুষী আদর আঘ্রাণীর হাতে অমনি টিকায় এক থাবা, আর কিছু নয়। সাথে সাথে, যেন ভুল বুঝে—পিছু হাঁটতে লাগলেন মালিনী। ফোঁসফোঁসানে কী ভুল হোলো ? এখনি যেন টাইগ্রেসী মানস বোঝাতে-দাঁড়ালো অপলাকে ভেতরের গেটে, আর অপলকে চেয়ে থেকে।

ব্যথা লেগেছে। যন্ত্রণা হোচ্ছে। রক্ত ঝরছে। হাত থেকে। কিন্তু রাজ্যের প্রশাসনী প্রধানকে কী মুষড়ে পড়লে চলে ! কিন্তু না, কিন্তু না। বলছেন, ততক্ষণে উনাকে বেঞ্চে বাইরে ফার্স্ট এড্ দেওয়া হোচ্ছে। এয়ার মার্শাল খালি ধমকে বলছেন—'দিদির কাছে আজকে আছে তোমার শাস্তি। যত বলা হোচ্ছে। এসব ছাড়ো, তা ছাড়ছো কই। আর যদি বেশী কিছু হোতো। অল্পের ওপর দিয়ে গেছে।'

'দূর পাগল কোথাকার। ....বোস্ সুব্রত। এ আমার শখ। শখের জন্য মার খেতেও আবারো যে রাজী আছি। ব্যথা,' তবু হাসতে হাসতেই বলেন—সত্যেন।

সত্যেন রায় এ ঘটনায় খুবই রসস্থ বোধ কোরতেন। তারিয়ে বোলতেন সুরসিকতায়—'হার রয়েল হাইনেস্ হোয়াইট টাইগ্রেস নিশ্চয়ই আমার ওপর দুর্বলতা বোধ করায়, আর তা জানাতেই এই থাবার আদর। কিন্তু আমার টেপ্ ফোস্-ফোঁস শব্দ আর গলার ডাক ঐ সময়েও ধরে রেখেছে। আর একটু 'আমার উনি কী ভেবেছিলেন, তা আর জানতে চাইনি। শুধু বলেছিলেন—'এ সব এবার বাদ দাও।' সে কী হাসি। হাবুলদা বলেছিলেন চিপটেনী টেনে—'তা বেটার হাফেরা অমনটাই বলতে জানে।'—সেও আর এক ধারার হাসি।

'আমরা আই. সি. এস-রা চাকুরীর এক্সটেনসনকে অপমানজনক বোধ কোরতুম। কেউ নিয়েছেন কিনা জানি না। তবে আমার চেনাজানারা কেউ নেইনি। বৃটিশ ক্রাউনের সঙ্গে তাই শর্ত ছিলো। দেশ স্বাধীন হোলেও আমাদের চাকরীর সব নিরাপত্তা দিতে—উনারা বাধ্য ছিলেন। আর আটান্নয় রীটায়ারে যাও, আর নয় ওটা শুরুর দিন থেকে—পাকা কুড়িটা বছর কাটাতে পারলে পর—তুমি—মে রেগুার

ইয়োর রেজিগ্‌নেশন্ ফ্রম সার্ভিস। ছাড়লেও। কুড়ি বছরের পূর্ণতায় তুমি পেয়ে গেছো পুরো পেনশন। পুরো বেনিফিটটা। তোমাদের অন্নদাশঙ্কর তাই কোরেছিলেন। এইচ. ভি. কামাথ্, এস. জি. বার্ভে, ডাঃ নবগোপাল দাশ—শঙ্করনাথ মৈত্র—সেটাই কোরেছিলেন।

রিটায়ার হোলেন—আই. সি. এস. থেকে সত্যেন রায়। বিধানচন্দ্র ওকে যেতে দিয়ে—সি. এস. টি. সি-র চেয়ারম্যান মিঃ যতীন তালুকাদারকে বসালেন চীফ-এর পদে। দুমাসের কড়ারে। কেননা যতীনের রীটায়ারমেন্ট—দু'মাসের পরে। "কিন্তু সত্যেন, তুমি রীটায়ার নিয়েও আসল কাজটা তোমাকেই চালিয়ে যেতে হবে। আর, আর রাণু (লেডি রাণু) তোমাকে যেন ভারতীয় যাদুঘরের অবৈতনিক ট্রাস্টী হোতে আমি যেন অনুরোধ করি, আবার কী, এরই মধ্যে দুটোই চালাবে একদিনে।

অবসর বিলাসে দিনের ফার্স্ট হাফ আরম্ভ করেন—রাইটার্সে। এর পরের হাফটা যাদুঘরের জন্য—বরাদ্দ করেন। তাই পরিবারের প্রধান আছে হয়ে। ভালোই দেখেন। যতদিন ছিলেন।

একদিন গেছি যাদুঘরের ভেতরের তিনতলাবাড়ীতে। উনার দপ্তর। ভেতরে কথা বোলছি। এমন সময় লেডী রাণু এলেন। উনি তখন এর প্রেসিডেন্ট। হাতে একটি গোল্ডেন কালারের—মাঝারী আকারের মেয়ে বেড়াল। "এই টিম্পু দুষ্টুমি কোরো না। থাক থাক্।" "বলেই চেয়ারে বোসে, আমায় দেখেই বললেন 'একে চেনেন ? বাপ্‌রে তারিফ করারও তোয়াক্কা রাখে না এই আশোকের স্মৃতি-শক্তিটা। বুঝলেন মিঃ রায়, আমার শ্বশুর বাড়ী আগে—কোন জায়গায় ছিলো, তা ত' জানেই। শ্বশুরমশাই সেই এক প্রত্যন্ত গ্রাম ভ্যাবলায় জন্মেছিলেন—তাও এর জানা এবং বিখ্যাত আমরা কলকাতায় থাকাকালীন ভবানীপুরের কোথায় থাকতাম কোন বাড়ীতে—তাও ও জেনে রেখেছে। অসাধারণ এর এ ক্ষমতা—" থামতেই সত্যেন রায়ে ডিটো দিলেন। বললেন, "লেডী মুখার্জী, অশোকের এ ব্যাপারে আমি একমত। আপনারই মতো ভবিষ্যতে, আমরা না থাকলে—অন্যদের অনায়াসে আমাদেরই কথা শোনাতে পারবে—একের কথা অন্যের ঘাড়ে চেপে বোসে না। সত্যি একে পেলেন কোথায়। উত্তরে রাণু জানালেন, "আমি একে কলেজ থেকে পাই। ছবির মডেল হোতে এসেছে। দেখছেন না আমার গাড়ীর হর্ন শুনলেই এসে হাজির হয়। পায়ে পায়ে চলতে থাকে। নাম দিয়েছি—টিমপু। টিমপু বোলে ডাকলেই আসে। ভাবছি আপনি তো সংগ্রহ করেন। তা এটিকে নিয়ে যান না। বাড়ীতে ভালোই থাকবে। আজ রবিদাদা থাকলে তো কথাই ছিলো না। তখনি বনমালীকে হুকুম কোরতেন—"এই বুঝলি, আজ থেকে আমার সাথে সাথে এটারও দেখভাল কোরবি।' তা, নেবেন আপনি।"

হ্যাঁ—বলেই যেন সত্যেন রায় জানতে চাইলেন—"কী রে টিমপু আমার বাড়ী যাবি।" অমনি, বার দুয়েক মিহি সুরে মিউঁ ডাক দিয়েই লেডী রাণুর হাত থেকে এক লাফে ঝুপ্ কোরে দৌড়ে যেয়ে বোসে পড়লো—সামনে খুলে রাখা ফাইলে। তক্ষুণি সত্যেন রায়ের কোলে লাল টাইটা বোধ হয় ঝুলে রোয়েছে। সামনের পায়ে উঠে ধরছে যেই টাই—মিঃ রায় দেখছেন নাতনি আপনার নাওটা হোয়ে গেলো। এবার কাউকে ডেকে আপনার গাড়ীতে রেখে আসতে বলুন—গাড়ির মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বে।'

'চলুন' সত্যেন রায় বললেন—'আপনি আমার যাদুঘরের কিছু ব্যাপারে কথা ছিলো....বাড়ীতে যাবার জন্য উঠছেন ? তা চলুন আমিই আপনার টিম্পুর মালিকানা নিয়েছি যখন নীচে নেমে নিজের হাতেই গাড়ীতে রেখে দিচ্ছি।'

প্রশাসন বাড়ী থেকে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে—সামনে রাখা গাড়ীতে নিজেই দরজা খুলে—বসিয়েছিলেন টিম্পুকে। তাই দেখে লেডী রাণু বললেন 'নতুন বাড়ীতে ভালো থেকো। বিদায় টিম্পু।' একবার পেছনে ফিরে দেখার চেষ্টা কোরলেন।

আমার দিকে ফিরে বললেন—লেডী রাণু। 'আবার দেখা হবে। হার ম্যাজেস্টি কুয়ীন টিমপুকে দেখভালের ভার নিলাম। এটি একটি আরেক দায়িত্ব এই জাতকের জন্য পাওয়া ডিউটি আমাদের।'

আজ সত্যেন রায়ও নেই। আর কুয়ীন্ টিমপু, দ্য ক্যাট, এহো বাহ্য—সেও আজ ইতিহাস। কিন্তু, কিন্তু কাকতালীয় যোগাযোগ পেলাম—এতদিনে, এত বছরের প্রান্তে—নতুন শতাব্দে—গত রবিবাসরীয় চৌথায়ী সাঁঝে—আমার বড়ো আদরের প্যাট্-রাণী—শ্রীমতী টিমপু—তারই আদরের পুত্র শ্রীমান্ ডামটিকে রেখে চলে গেলো—অন্য এক পৃথিবীর ঠিকানায়। আজি এ সাঁঝে—সব সব অসহনীয় 'সরোজ্' দূরে সরিয়ে দিয়ে—শুধু 'বরোজ্' করলেম—সে দিনের আই. সি. এস. সত্যেন রায়ের ভালোবাসার—ঐ টিমপুই কি ঘুরে আর ফিরে—হয়েছিল আমারই—এই টিমপু।

শাশুড়ী মিনি রায়—সাবরমতী আশ্রমে গান্ধীজিকে লিখেছিলেন মস্ত এক জবানবন্দী। —'...অল্ দ্য নেমস্ অফ আওয়ার ফ্যামিলী মেম্বারস্ ওয়্যার্ গিভেন বাই টেগোর। মাই নেম—'চারুলতা' ইজ ফ্রম ওয়ান অফ্ হিজ ফেমাস্ হিরোয়ীনস্। মাই ডটারস নেম ইজ দ্য মোস্ট লাইক্লি চয়েজ অফ্ দ্য পোয়েট—মেমোরাইজিং হিজ সেকেন্ড ডটার—রেণুকা।'

চৌথা জানুয়ারী, ২০০৪ ক্যাট কুয়ীন
শ্রীমতী টিমপুর দিন ডিমাইজীতে।

দ' হাজারী সাতে, দিন পয়লায়—চিমপু এলো ফিরে এ সাত-সকালায়

দ' হাজারী সাতে, দিন এ পয়লায়—
চিমপু এলো ফিরে এই চেনায়ী এ
ঘরেতে—এই শীতলী যতনায় যাজী
এ আঁত–মারা সাত-সকালায়—
দু হাজারী সাতে, ঝিণ এ ঝয়লায়
চিমপু পেলে ফিরে তেই রেণায়ী এ
ধরেতে তেই মিতলী শতনায় আজি
এ তাঁত–ধারা জাত-জঁকালায়।
যদি আসে শীতয়ী ঋত্-রাজ, তবে
পরে তর আর নাহি আছে রে
দের্ কী বিলম্বটা জন্যে, ধন্যে
বসন্তয়ী ভাল-ঢাল, ঐ সুষমা—
তদি ঠাশে গীতয়ী দিত্-বাজ, রবে
তরে অব্ ধার ধাই বাছে রে
ঘের কী নিলম্বটা হন্যে, রণ্যে
হসন্তয়ী তাল–হাল, রৈ তুষমা।
চিমপু, ক্রীট্ তয়ী লেখয়ে আছে
তোমারই তরে তলাশায় এই এই
বছর বছর ঘুরানাই এ চক্রবৎ
চিন্ত-টা, আসে মাস মাস—ঐ আশ্—
চিমপু, গ্রীট্ রয়ী দেখয়ে কাছে
তোমারই দরে পলাশায় তই তই
বছর বছর ভুরানাই এ অভ্র-অৎ
হিন্ত-টা, হাসে রাশ রাশ—রৈ পাশ্।
পুর এই পশ্ এরীয়াই ভবায়নীপুরীয়ান্
তুমি চিমপু, দ্য পেট্—জানিতায় রে
ফের আনিতায় তোমারে ইন্ রীয়েলে
কী এই বছর নতুনায়, এ প্রথমায়—

ঘুর যেই টশ্ মেরীয়াই হবানী-তুরীয়ান্
ঝুমি চিমপু দ্য মেট্—শাণিতায় রে
ঘের রাণিতায় তোমারে সীন্ ডীয়েলে
কী রেই বছর রতুনায়, এ গ্রথমায়।
বলি ফোটায়ে বোল খুশীলীটা, বলি—
ধাবারোয়ে করাতেক কাবারোয়ী যৎ
এ কাব্–কথারই সুষীমী ভাবুল
পাবুল জীস্ট-টারে ইন্ ছন্দয়—
বলি কোটায়ে দোল হুঁপীলীটা, বলি—
দাবারোয়ে দরাতেক চাবারোয়ী অৎ
এ কাব-রথারই জুষীমী ধাবুল
রাবুল লীস্ট-টারে লীন্ বন্দয়।
এ বছরায়, জানোয়ীল ত এও চিমপু—
দাই মাদারস্ ক্ল্যান্ আজ তক
এই আজ আর তরে আর নাই কেউ,
শুধু আছে বোনপো এক—ঐ গুঞ্জন—
এ দছরায়, মানোয়ীল্ ত ওএ চিমপু—
লাই রাদারস্ প্ল্যান যাজ ছক
নেই বাজ তার দরে তার তাই কেউ,
শুধু কাছে বোনপো এক,—রৈ গুঞ্জন।
পেইন্ট্ করি কলমায়—নাহি কোনো ঐ
তুলতুলী তুলীকায়—এই মনেরই
ক্যানভাসে চালায়ে পয়েন্টী ডট্—
শট্ রাখি নতুনা এক চিমপুয়—
সেইন্ট্ গড়ি রলমায়, আহি তোনো ঝৈ
দুলদুলী দুলীকায়—যেই ক্ষণেরই
বাণভাসে ঢালায়ে জয়েন্টী কট্
টট্ দাখি নতুনা হক চিমপুয়ে।
ফর্ জন্যে বাজে যে বাজ-বাজুয়ীতে
বাজনাই দল লহরার, মন-ঝণন
বাসিতায় হোয়ে ওই ভ্রমরী ঋক্—
তুমি চিমপু—হোলে পরে টোল্ড্—

বুনোরায়ে এই সকালী কাবে—
অর, রণ্যে বাজে যে রাজ-রাজুরীতে
রাজনাই রোল্ রহরার, ক্ষণ-
ভাসিতায় কোয়ে শ্রমরী ঝিক্—
তুমি চিমপু—দোলে দরে হোল্ড্।

[১-১-০৭
ষোলোই পৌষ' ১৩
সোমবারী সকালে।]

ইয়ারী নিয়্যুতে ভীয়্যু ভরি কারুকৃতে,—টিমপুতে

ইয়ারী এই নিয়্যুতে ভীয়্যু করি ভরা
মিতল্ ধরা—খতল্ কবিয়ী এ ঐ
কারুকৃতে,. বলি তুমিয়ীও টিমপুতে,
এই এই কর্তব্যায়, এ স্মর্তব্যায়—
হিয়ারী রেই ডীয়্যুতে মীয়্যু গড়ি ঘরা
ধিতল্ দরা—প্রীতল্ ছবিয়ী ও ঔ
চারুবৃতে, বলি চুমিয়ীও টিমপুতে
যেই যেই ধর্তব্যায়, যে স্মর্তব্যায়।
প্রাতে এ প্রাচীয়ী ঋতুয়ার এই খাশ
ধাতিলী এ শীতলায় আজিকায়
এ দারুণায় কোল্ডী তাতলীত্ ঝই
বাতাসায়,—বলি, বায়ু বহে পূরবীয়া—
শ্রাতে এ শ্রাচীয়ী থিতুয়ার রেই ধাশ
কাতিলী এ গীতলায় বাজিকায়
এ আরুণায় রোল্ডী পাতালীত্ তই
মাতাসায়,—বলি, আয়ু সহে ঘুরবীয়া।
গীত গাই এই নতুনাই এই হাজারীর
দুইয়ের পর—যেই তারই চলিতায়
হয়ী এই সাতে, এই সেভেনে—
এসো টিমপু, ঠেশে ঝাণী তান—
জীত আই রেই রতুনাই রেই যাজারীর
ধুইয়ের ধর পারই রোলিতায়
জয়ী রেই আঁতে, রেই হেভেনে—
বোসো টিমপু, রেশে তানী গান।
হাউ, বলি,—দাউ সিঙ্গেস্ট মাই গুণী—
বিশ্বকবি তোমারই হাজার ধারার
রাজ-কৃতীলে আজি মাখি এ
চিত্ ভরায়ে, য়্যাডোরায় এ টিমপুতে—
নাউ, বলি,—ভাউ লিঙ্গেস্ট্ হাই রুণী—
বিশ্বকবি তোমারই রাজার ভারার

বাজ-প্রীতীলে বাজী রাখি এ
হিত্ ঘরায়ে, ম্যাডোরায় এ টিমপুতে।
কট্ জন্যে, করে কাটিঙ্ আউট—
সব আর সব সরোজ্ অফ্ ঐ যে ঐ
সরোজেস্—আমি বরো করি রে
বাঞ্চ্ অফ্ হ্যাপিনেস্—তোমাতেই—
টট্ গণ্যে, করে পাটিঙ্ বাউট্—
রব ভার রব মরোজ অফ কৈ যে কৈ
মরোজেস্—আমি হরো ভরি রে
স্ট্যাঞ্চ অফ্ স্যাপিনেস্—তোমাতেই।
হতেম পরে এই যদিকে সেই দেশ
রূপকথায়ী সেই জপমাল্—লুইসী শ্রী
ক্যারল্—তবে যে তবুয়াই এই
রবুয়া থাকতোয়া ভরাঋত, তোমাতে—
রতেম তরে তেই তাদিকে, যেই রেই
রূপরথায়ী যেই তপঢাল্ স্যুইসী হ্র
ব্যারল্—হবে যে হবুযাই তেই
কবুয়া ডাকতোয়া ধরাশ্রীত্, তোমাতে।
বোলালী ফোটানী যে এই কথারাশ
হয় রাশ্ড্ অন্—ঝুমিলাহি তানই
ঝড়ী এ ঝড়াড়ে, এ প্রীতলাই এ
গীতলায়—ওয়ান্স মোর গাহি
গান শোভাতে, ওগো টিমপুয়ে—
দোলালী জোটানী যেই কথাপাশ্
রয় পাশ্ড্ অন্ রুমিলাই ঝাণই
তড়ী এ তাড়াড়ে এ শ্রীতলাই এ
ধীতলায়—ওয়ান্স লোর্—পাহি
জানান লোভাতে, ওগো টিমপুয়ে।
দামী পুত, ডামটি আছে পরে
জড়াতে বার গড়ায়ে, পৃষ্ঠয়
আষ্টয়ে তোমারই ভরা বুক দুধেলায়—
অপলকে দেখি সেই টিমপুয়ীকে

—ইন্ শোয়ায়ীত্ তোমারই পোয়েসী ছবিটা—
ঝামী সূত, ডামটি কাছে দরে
ধরায়ে তার বড়ায়ে, তৃষ্টয়ে
ধাষ্টয়ে তোমারই দরা বুক দুখেলায়—
জপলকে পেখি তেই টিমপুয়ীকে
সীন্ কেয়োয়ীট্ ডোয়েসী কবিতা।

[৪-১-০৭
আঠারোই পৌষ' ১৩
বিযুদ্-বারী প্রাতে।]

সিলভিয়ান্ বুধী সকালায়—এলে সিল্ভি

রোদ ঝলমলী শীতেলীত এই মাঘী
সকালার এই বাজ এই আটে—করি
ভরাঋত ঠাটে—এ সিলভিয়ান্
বুধী ডে-য়ে, কথা গে-য়ী তৈ সিলভির—
রোদ টলমলী ধীতেলীত্ যেই চাঘী
দকালার যেই আজ সেই পাটে—ধরি
করাধৃত্ কাটে—এ ডীল্ডীয়ান্
শুধী গে-য়ে কথা পে-য়ী রৈ সিলভির।
হয় যে টিল্—টৌলস্ অন্ হোল্ডীলী এই
আজ বাজুয়ে পূজোয়ী স্তোত্রোলায়
দেবী স্বরস্বতীয়ী—এথা ওথা হোয়ার্
তবে নট্—নাই বুঝলা তা ও সিলভি—
রয় যে ডীল্—রোলস্ শণ্ বোল্ডীলী যেই
আজ কাজুয়ে রুজোয়ী স্তোত্রোলায়
সেবী স্বরস্বতীয়ী—যথা তথা স্যোয়ার
রবে কট্—আই সুঝলা না—ও সিলভি।
নয় পরে নয় পক্ষয়ী ঐ পারুতায়ে—
অতয়ী দ্রুতীল্ অতয়ী কাড় বলে
তাড়ায়ীত্ যে তোমার এ তাড়াড়ায়—
ভাবি হাউ মাচ্ হাউ যে চলি সাম্ কোথা
হাউ মন্তরায়—
দয় দরে হয় তক্ষয়ী তৈ চারুতায়ে—
হতয়ী শ্রুতীল্ হতয়ী ছাড় তলে
কাড়ায়ীত্ যে তোমার এ ঝাড়াড়ায়—
সাবি ভাউ সাচ্ ভাউ যে দলি কাম যোথা
ভাউ অন্তরায়।
সিলভি, মতোটি তোমারার আর নাই
আজ আর কেউ আর—নৈতাবার
ঐ তুমিরই জৈলী স্টাইলায় দিয়ে যে
ঐ হৃদ্ধমকী চাহনটা, হয় যে হয় এভার তারা

মাইগুইঙ্—
সিলভি, রতোটি তোমারার নার তাই
আজ তার কেউ পার ডাকাবার
ঐ তুমিরই স্মাইলায়, নিয়ে যে
চৈ হৃদ্‌চমকী রাহনটা, নয় যে নয় সেভার পারা
ফাইণ্ডিঙ্।
আছি বাঁধেলায় এই মনচকোরারই
সাধ ময়ী সাধেলায় ঘুরতায় ঘুরি আর
ফিরি তোমাতেই—তবু যে তুরোয়াত্
নাই আয়ীলা—নো-নো—ও সোয়াস্ত্—
কাছি ধাধেলায় রেই ক্ষণরকোরারই
বাধ নয়ী রাধেলায় ভুরতায় ভুরি ভার
ঝিরি তোমাতেই রবু যে জুড়োয়াত্
আই বায়ীলা—সো-সো—ও তোয়াস্ত।
হোলি চার্তায় এই রোলী আর্তায়ায়
বোল্ কোটাই পাট-পাটুয়ে
ফের নয়, ডীয়্যুলী এই প্রাতী
শিশিরায়—কোরে চান পূজোটা
যে রে যে রুজোরায় তোমাতেই—
শোলী তার্তায় যেই ডোলী ধার্তায়ায়
বোল্ রোটাই আট-আটুয়ে
ঘের রয়, নীয়্যুলী যেই ত্রাতী
ঋষিরায়—ডোরে দান, যুজোটা
রে যে রে মুজোরায় তোমাতেই।
রুল করি ভার ঘরটার শতকী
এ যতকায় রত রাতীলী ঐ যে ও
কথালীত্ কাকলায়, ডাক
তার ডাকানে, হয় আজও কর্ণ—
কুহরায় যে তুমি—তুমিরই সিলভি—
টুল্ ধরি ডাক ধরটার রতকী
এ মতরায় শত-শাতীলী রৈ যে ও
মথালীত জাঁকলায় হাঁক

বার হাঁকানে, জয় ঝাঁঝও পর্ণ
সুহরায় যে চুমি—চুমিলরই সিলভি।
কীস্ হাই পীক্চারীলে—ঐ যে
হৈ হৈ করা ঐ সীট্ পায়ী অবস্থায়—
ঘোরায়ে পর ঘাড়—দেখছোয়া
সিলিভি, হাসি-রজতায় রাজরী
ঐ কহজার তরে কী আর কিছুল—
ব্লীশ হাই মীক্চারীলে, রৈ যে
রৈ ঘরা ঝৈ মীট্ ঝায়ী রবস্থায়—
ডোরায়ে ভর সাড়—লেখছোয়া
সিলিভ হাসি-মজতায় বাজরী
তৈ সহজার দরে
কী বার ইছুল্।

[২৩-১-০৭
৯-১০-১৩
বুধবারী সকালা।]

সাজ-সাজ দিন পূজোয়ী এই এই দেবী অর্চে,—
তর্য্যায় জাজীলী তোমারে—ওগো সিলভি

সাজ-সাজুতির দিন পূজোয়ী এই বাগ-
দেবী অর্চে, যাজিলায় তর্য্যায়ী তানে
তোমারে সিলভি—হিমেলীন্ এই
সাঁঝিলায়—এই ইভ্ ভরা ইভেন্টেয়—
বাজ-বাজুতির লীন্ রুজোয়ী রেই বাগ-
দেবী তর্চে, রাজিলায় গর্জায়ী গানে
তোমারে সিলভি—লিমেলীন্ যেই
ঝাঁঝিলায়—যেই লীভ্ ধরা লীভেন্টেয়।
পীপ্ করি হোপস্ ভরা—এই আশাবরে
বার তার আবারে, যদি পরে যদিকেয়
পাই যেয়ে পত্র-আয়রী এই কাটি,
এই যাই যে সাঁতারায়, স্মৃতিয়ী মেন্টে—
কীপ্ ভরি ডোপস্ দরা—যেই ঢাশাদরে
পার বার পাবারে, তদি তরে তদিকেয়
ধাই ধেয়ে অত্র-বায়রী যেই পাটি,
যেই আই যে আঁতারায়—ধৃতিয়ী টেন্টে।
ছায়ায় ধায়ীতয়ী ঐ চালচিত্র দেখেছিলাম,
দিন অনেকার পেছনায় ফেলিতয়ে—
দ্য ব্রীজ অন্ রীভার কোয়াই—এই
দেওতী সবরায়—আজত মুখেলাই সমরায়—
মায়ায় রায়ীতয়ী হৈ ভালদিত্র শেখেছিলাম,
বিন ক্ষণেকার দেছনায় মেলিতয়ে—
দ্য ক্রীজ্ গণ্ শীভার হোয়াই—যেই
রেওতী জমরায়—বাজও সুখেলাই অমরায়।
পাতী কান—টু ফর্ কয়েকটা টু পাইতায়—
শোনাটা যদি হয় আদতায় ডাকটা—
মিঁউয়ীক্ এ সিলভিয়ার—তবে পরে
কী আর কথা এমত খুশ তুষ নাচে রে—

ধাতী তান—ফর্ পাবেকটা ডু তাইতায়
রোণাটা তদি তয় মাদতায় হাঁকটা—
মিঁউয়ীক্ এ সিলভিয়ার—রবে বরে
কী ভার যথা, রমত হুঁপ-রুশ যাচে রে।
মুখ বাহারায়—ছিলোয় ভালীটা দেখতায়,
যেন ফোটালী ছাঁদী এক শিশিরার
বাতা বিন্দুলায়ী মেশেলে তাই সিলভিয়া,
আঁকি যে আঁক কযে তোযেলে—
সুখ রাহারায়—হিলোয় ঢালীটা রেখতায়,
হেন কোটালী জাঁদী ছক দিশিরার
রাগ ইন্দুলায়ী ঠেশেলে দাই সিলভিয়া,
জাঁকি যে জাঁক রসে রোশেলে।
হারায়ে যেতে বয়ানে আছে রে, আছ—
দরো আচ্ছন্নায়—নাহি নাহি কোই
মানা—তবুতে তবু মানে না মানা এই
নিষেধার এই ঘরেলীত্ বিন্দু বিসর্গাত—
ধারায়ে তেতে রয়ানে কাছে রে, কাছ—
ঘরো কাচ্ছন্নায়,—রাহি রাহি রোই
জানা—কবুতে কবু জানা না জানা যেই
ঋষেধার যেই হরেলীত্ জিন্দু ইসর্গাত।
বোধিসত্বমায় হয় তা তাতাসায়ীয়ত্
বোঝরালে তা যে সোজাসুজিলায়ীত্
কথাটা, যে নেই সেও নেই ত—
তবু মন পায় না যে সায়—ওটা তোয়াস্তে—
শোধি রত্নমায় ময় তা মাতাসায়ীয়ত্
সোঝরালে তা যে যোজাযুজিলায়ীত্
কথাটা—যে নেই সেও সেইত—
তবু ক্ষণ পায় না সায়—তটা রোয়াস্তে।
সাঁঝ ভারে, মায়াবীল্ রাতটা হামিঙে
কোরবায় হাসিল এ ও তা দিয়ে অঞ্জনী
ডোরীডালী মায়া—বলি সিলভি,
ডাউট যায় ভেসে ভাস ভাসে—আসে

ডিউলীতে নতুনা এক বাধা—
সাঁঝ ধারে, দায়াদীল্ মাতটা কামিঙে
ডোরবায় ভাসিল, নিয়ে রঞ্জনী
ভোরীভালী তায়া, বলি সিলভি
আউট্ তায় হেসে হাস হাসে, বাসে
মিঁউলীতে এক নতুনা সাধা।

[২৩-১-০৭
৯-১০-১৩
বুধী সাঁঝে।]

সাঁঝ দের্ কাব ভরি, পথেলেতে, এই একটুয়া তরে সিলভি

এখনো বিকেলার আলোটা আছেতে টুকুসী
টুকুয়া—বলি সিলভি, ঐ সাঁঝ পথেলেতে—
দের্ রইলেও এই একটুয়ার টুকুলা, আজি
তায় জাজিলা ভরা-ভারে—এই মেমোয়্যার—
রখনো বিকেলার ঝালোটা যাছেতে ঝুকুসী
ঝুকুয়া, বলি সিলভি, হৈ সাঁঝ রথেলেতে—
বের হইলেও রেই রকটুয়ার রকুলা, বাজি
রায় ঝাজিলা ঘরা-ঘারে—সেই ফেমোয়্যার।
রুপো নয়, তবু নামটায় ঝলকায়ীরে ঝল-
ঝালিত মাচ্ গ্লসীয়ী এ সে বাওয়ী
ব্লাওয়ারা—রজতী-বাড্ শোভিতায়ী
তুমি যে সিলভি, রহজায় রাজীরী—
রূপো সয়, ঝামটায় চলকায়ীরে রলা-
রালীত্ সাচ্ ফ্লসিয়ী ও সে ফ্লাওয়ী
ফ্লাওয়ারা,—মজতী মাড্ রোভিতায়ী
তুমি যে সিলভি, সহজায় জাজীরী।
জাজ্ করি মেলালে এই খেলালে যেই
দোলি-তোলি দ্য ফ্যাক্ট্ মধ্যায়—
ফ্যাকচুয়্যালে, বলি তুমিরই ন্যাচারীতে
ক্যাচ্ তায় সাচ্ সাইভী সিল্ভারা—
ডাজ্ জড়ি ফেলালে যেই দেলালে যেই
হোলী-শোলী দ্য ট্যাক্ট রধ্যায়—
ট্যাকচ্যুয়ালে, তুমিরই ক্যাচারীতে
ল্যাচ্ রায় যাচ্ ডাইভি সিলভারা।
ছবির তালে ছবিলী দান ছাপেলেতে
ছোপ-ঝরী যে দেখাতে বার-বারই
ধরে তার বোঝানটা, ভাবি দাবীদালে
সিলভি—যাও থেকে থোকী থাক সালঙ্কারা—

ছবির ঢালে ছবিলী গান ঝাপেলেতে
ঝোপ-জরী যে শেখাতে পার-পারই
ভরে ধার রোজনটা ধাবী হাবীহালে
সিলভি—গাও জেঁকে জাঁকী জাঁক আলঙ্কারা।
সীলমোহরায় থাকে যে থাক আর ঐ ভরা
থাক, পরি ঝাঁপি ঝাঁপিল কতই
না জমাটি কথা, তারই তলাপায়—
খোলো খোলো, ও সিলভি, তারই ডালা—
রীলসোহরায় ঢাকে যে ঢাক তার রৈ ধরা তরা
ঢাক, পরি সাঁপি সাঁপিল শতই
তা রমাটি কথা, আরই রলাশায়—
দোলো দোলো, ও সিলভি ভারই দালা।
হ্যাপস্—বাছে যতোলা-ততোলার ঘরে
কুল্-স্যুইনী ফুল্-ফেলী ভাব
যেই আসে তারই যেই মাতরায়া—
হয় ভাসেলা, বহিতে তরী, স্মৃতেলে—
ট্যাপস্—রাছে রতোলা-মতোলার দরে
রুল্-টুইন্-ই রুল্-রেলী কাব্
সেই ঢাসে বারই সেই চাতরায়া
ঝয় হাসেলা, গাইতে রয়ী, স্মৃতেলে।
আসরা বৈ-ভবুতায় এই যেহী এ বিকেলী
টোল্ সমীপায়, যাচে টাচ্-টিল—
আয়—এ শপথী ঐ ওঠ্-টা,—যেন
রজতী বরবর্ণী সিলভি থাকে ঝলসায়—
ভাসরা রৈ-রবুতায় সেই দেহী এ বিকেলী
ডোল্ জমীপায়, আচে মাচ্—মিল্—
মায়—এ জপতী কৈ জপ্-টা,—হেন
মজতী ধরধর্ণী সিলভি ঢাকে পলশায়।
সাঁঝ আয়ী এই নাউ জাস্ট এই জমতী দরে
জমাটিকে ঐ যে ঐ মাঘীল্ তক দাঘীল্
দরাটী শীতেলায় গাইতায়ে গান
ঐ অর্চি-ই তোড়ী-তারা রাগ্ রজতীয়ী—

সিলভিতে—
সাঁঝ পায়ী এই বাউ কাস্ট এই রমতী বরে
রমাটিকে মৈ য়ে মৈ মাঘীল ছক চাঘীল্
পরাটী শীতেলায়—ধাইতায়ে তান
ঐ চর্চ-ই, গোড়ী–পারা, চাগ সজতীয়ী—
সিলভিতে।

[২২-১-০৭
৮-১০-১৩
মঙ্গলী বিকেলে।]

জিঁকালীত্ বিকেলায় এই মাঘেলে হয়—স্যানডী নিয়ে কথা রভসাই

জিঁকালীত্ বিকেলায় এই মাঘেলে হয়ী—
স্যানাভী নিয়ে—রভসায় মানয়ায় এ
রীত্ মধুরালী প্রীতিলাই কথারই এ
মাদকী ধাত্টা, ফের ফেরীলী ফিরতায়ে—
ঋকালীত্ বিকেলায় যেই চাঘেলে ঝয়-ঝয়ী—
স্যানডী দিয়ে—রভসায় আননায় এ
দীত্ রধুরালী স্মৃতিলাই কথারই এ
আদকী ঘাত্টা, ঘের ঘিরীলী ঘিরতায়ে।
ভালোয়ী ঝালোয়াতে, তালোয়ী তাতালে
তুমি স্যানডী,—সন্ অফ্ মিকীরানী—
ছিলে হিলেলিকী দিলধিলুয়াজে
বেশ নয়, আরোকে বেশীল্ ঝাপটালী—
ধালোয়ী তালোয়াতে পালোয়ী পাপালে
তুমি স্যানডী,—সন্ অফ্ মিকিরাণী
ফীলে লিলোলিকী মিলঝিলুয়াজে
ঠেশ ছয়, পারোকে ঠেশীল্ জাপতালী।
সূর্য্যেরই আলোকীতে খেশ-খেশীলতীন
ভাব যাহার মূরতির মধ্যয়াত্
ঝকোমকোরায় ঝাঁক-ঝাঁক ঐ
চাহিদায় থাকতোয়া, খাদ্যে—সজাগানি—
তূর্য্যেরই ভালোকীতে পেশ-পেশীলতীন
ধাব চাহার ফূরতির রধ্যয়াত্
চকোচকোরায় ছাঁক-ছাঁক রৈ
পাহিদায় ঢাকতোয়া, শাদ্যে—তজাতানি।
রচিতায় নাই পারোতায় তাড়াড়ীত্ ঐ
সাঁতেলে ঐ পঁচিশার প্রাতে ভরাতেয়ে
ভাবুলায় তার তাবুলায় স্যানডিয়ী
কথে, যথাযথী কোটাতে, যুক্তীল্ যুত্—

খচিতায় নাই ধারতোয় কাড়াড়ীত্ নৈ
আঁতেলে নৈ রচিবার ত্রাতে শারাতেয়ে
ধাবুলায় বার পাবুলায়—স্যানডিয়ী
তথে, তথাতথী জোটাতে মুঞ্চীল দূত্।
বিকেলী পথ ঢালে আয়তায় চুপচাপালে
ঝুপ-ঝাড়ে ঐ বর্ণাল শোভীয়াতী
ফিকে নয়, খতীলীন্ ঝাঁকি-ছাঁকি
সোনালীতে পড়ন্তায় ঐ ঐ তপন তাপ—
বিকেলী যথ তালে চায়তায় তুপতাপালে
রূপ-বাড়ে তৈ ধর্ণাল্ মোভীয়াতী
টিকে তয়, হুদীলীন্ আঁকি-সাঁকি
রোণালীতে তড়ন্তায় হৈ হৈ ঝপন ঢাপ।
বাবুল্ বাব্ ও স্যানডী, এই আজ পার
যেই যাজতি এই ছাব্বিশায় ছুটি—
ছুটিলাই এই দিনটা প্রজাতন্ত্রলী
প্রজ্যেব্যেয়ে—চইলাম চাপায়ে তুমির কথা—
ভাবুল ভাব্ ও স্যানডী, যেই কাজ বার
সেই রাজতি রেই ধাব্বিশায় জুটি—
জুটিলাই যেই জিনটা ব্রজাতন্ত্রীল
গ্রজোজ্যয়ে—তইলাম তাপায়ে তুমির কথা।
সাম্ কথী বলি সবারই সামারাইজেলে,
হয় যে বেশ্ ভালোরই তুমি যে
ভালোয়া ও স্যানডী, কথাটায় তাই
দাখিলাই বলে দেখো রে দেখ্—
হাম্ তথী তলি হবারই হামারাইজেলে
রয় যে রেশ ঝালোরই চুমি যে
দালোয়া ও স্যানডী, যথাটায় আই
রাখিলাই ঢলে রেখো রে রেখ্।
থাকা যেই পিনড্ বাই নির্জনীত্ ঐ
নৈশব্দায়, বলি স্যানডী, পরতী ঐ
ক্ষেপী ঐ চারণাই পদে তার পদে
প্রস্ফুটায়ীত্—খাওয়ন্ তরে—তাজ্ ফীশ্—

ডাকা রেই হিন্‌ড্ হাই লির্জনীত রৈ
হৈ-শব্দায় বলি স্যানডী—দরতী তৈ
শেপ্-ই ঝৈ তারনাই রদে ভার রদে
গ্রস্তুটায়ীত্ পাওয়ন দরে—খাজ্ ফীশ্।

[২৬-১-০৭
১২-১০-১৩
শুক্কুরী বিকেলায়।]

পপি

আসা জন্যে বাসায় এই এখানেনে এই
খাশ তার খাশায়ায়—নাই জানে পরে
নান্ এল্স্,—তবে পরে, ও পপি
কোথান্ তক্ কামেথ্ এই হীয়ারার এই য়্যাট্—
ধাসা ধন্যে আসায় যেই তখানেনে যেই
পাশ বার পাশায়ায়—নাই ঝানে তরে
আন্ কল্স্—হবে দরে, ও পপি
মোথান্ নক্ সামেথ্ তেই ফীয়ারার যেই স্যাট্।
কাল তরাতে মধুমাস ঐ রসন্তীন
ঐ হেস-ঢেশীল্ বসন্তায় সত্যি যেন
সাজু ঋতুল-সম্ভারে এসে যাও
তুমি, নাই নিয়ে আসদারীত্ কনসেন্ট—
হাল হরাতে রধুহাস চৈ কসন্তীন
কৈ মেশ-পেশীল্ ঠশন্তায় রত্যি হেন
কাজু মিতুল্-রম্ভারে, ঢেসে আও।
তুমি, আই দিঁয়ে বাসভরীত্ কনটেন্ট্—
আঁধারার আলোহীন ঐ অমারাতির
অমতায় জমতায় তুমি ক্যাট ঐ হি
কুইন্-আ, পেলে বল-বল,—কেম তায়
য়্যাসেণ্ডীনা,—ঐ উঁচ্ চাল্ পর—
বাঁধারার ঠালোঝিন চৈ সমারাতির
কমতায় তমতায় তুমি ক্যাট্ সৈ হি
কুইন্-আ, হেলে ঢল্-ঢল্,
যেমতায় উীসেণ্ডীনা, নৈ উঁচ্ ঢাল্ ভর।
সতয়ী ততয়ী আর তায় নাই হোলোয়া
জানাটা,—বলি রে পপ—তব্ তুম্
থা রে কোন্ সে ঠেক্—কাল যায়
কাল্—এথায়ই তুমি হোল্ডস্ দ্য বাসা—
যতয়ী মতয়ী বার বায় তাই তোলোয়া
মানাটা, বলি রে পপা,—অব্ যুম্

কা রে দোন মে হেক্—হাল ছায়,
হাল্—যথারাই তুমি মোল্ড্স আসায়।
বুঝিবার তর আর নাই দরকারা রে—আর
তাই হাস্-হাস্—তুমি ওয়া শুভ্রা-
নীলে ঠাই হিলে—দাই স্টেক্-ই
আশ্রয়টা,—খুশ-খাশী যে ঠাশেলায়—
সুঝিবার ধর ধার পাই করকারা রে—বার
আই ভাস-ভাস—চুমি ওয়া রুভ্রা-
মিলে চাই দিলে বাই স্পেক্-ই
সাশ্রয়টা, ঠুশ-ঠাশী যে ঝাশেলায়।
নতুনায় এই নবনীতলী এই এই ঠেক—
চেক্ তরে তুম্ আয়া তব্ ই ধারা—
কাহা, তক্—আর নায় চায়ী রে
টু ফলো অন্—দাই তব ডাটা—
মতুনায় যেই হবনীতলী যেই যেই দেক্
মেক্—বরে ঝুম পায়া
যব্ ই সিধারা আহা তক্—বার
ভায় তায়ী রে টু হলো নন্—লাই যব্ টাটা।
হয় ঐ টিন্ বানানা রুফ্ থেকে—দিয়ে
কসরতী নামানোটা,—বলা হোলোক্,
থাকো রে তুমি, নিয়ে নাম এই-ই এ
পপি—কোরবা পীপস্ খালি ঐ, ইতি-উতি-
ঝয় চৈ ঝিণ ঝানানা উফ্ ঢেকে—
নিয়ে হসরতী জামানোটা, ফলা রোলোক্
ঢাকে রে তুমি—হিয়ে ঝাম
সেইই সে পপি—ডোরবা টীপ্স্
থালি জৈ যতি-মতি।
কবিতেয় রচ্ তায়ী তোমারই বন্দনায়
বহিতেয়ে পপি—তুমি আর নাই
উঠলোয়া হোয়ে কবির পসন্দে
জলিলি স্যাট্ অন্ এ কোল্ড্
টিন্ রুফ্—

ছবিতেয় উঁচ্ পায়ী তোমারই
নন্দনায়, নন্দিতেয়ে পপি—চুমি বার
আইলী মঠলোয়া রোয়ে
—ছবির রসন্দে, ডলিলী
ক্যাট্ শন্ এ রোল্ড টিন্ রুফ্।

[২৬-১-০৭
১২-১০-১৩
শুক্কুরী সাঁঝে।]

গুড্ গার্ল—ও গুড্ডী, ও কন্যে

অর্থে একজনা গুড্ গার্ল যথয়ায় এই বোধ
জোয়ী দেখভালে থাকে—আপনারই
ঝাঁপ-ঝাঁড়ালে, হোয়ে রে আর্ল সদৃশই
কিছু কী বলা, বল বল তাই কী, গুড্ডীয়া—
তর্থে ছকঝনা শ্যুড্ কার্ল কথয়ায় যেই শোধ
ঝোয়ী শেখখালে ঢাকে,—জাপনারই
কাঁপ-কাঁড়ালে, রোয়ে রে পার্ল তদৃশই
ঋছু কী চলা-চল, চল আই কী গুড্ডীয়া।
জয়লাপিলী এ ঝয়ঝায়ী এই মাঘেরই
ফার্স্ট ডে-য়ে—হই লেখারই লেখে
অল্পয়ী কাব্ যথা ইছু গুড্ডীয়ার
তরে, অপেক্ষায়ে নয় আসছেয়তে ঐ কাল—
রয়লাপীলী এ জয়জায়ী এই মাঘেরই
থার্স্ট গে-য়ে—তই দেখারই দেখে
জল্পয়ী ভাব তথা নিছু গুড্ডীয়ার
দরে, তপেক্ষায়ে তয় ভাসছেয়েতে ঐ ভাল।
সাঁঝ বেলাকার মেলঘেশী ঠাশ বুনোটে
আছে আছে ঘনঘোরালী ডোরডোরানী
মন্তয়ী ভালোবাস তকী ক্রীট্—আর
কৃত্—এই এ আর ও—এই অতো, কতোয়া কী—
সাঁঝ মেলাবার দেলধেশী ধাশ রুণোটে
বাছে কাছে ঝনঝোরালী ভোরভোরানী
রস্তয়ী আলোবাস জকী গ্রীট্—তার
গৃধ্—সেই ও এ—হই ততো মতোয়া হী।
পথ বাহি যথ আহিতায় হই হই এমনায়
মোহিতী ছাঁদ—হয় যদি হয় পাত্রী ঐ
গুড্ডী, গুড্ডীয়া—বলি, কড়ি ও কোমলায়
থেকো অল ভয়েজীতে—তুমি রয়েলী—
কথ আহি মথ রাহিতায় রই রই জমনায়
সোহিতী জাঁদ—রয় তদি রয় দাত্রী রৈ

গুড্ডী, গুড্ডীয়া,—বলি জড়ি ও জোমলায়
ডেকো—টল্-ময়েজীতে—চুমি লয়েলী।
ঠিক তার ঠাকীলে, ঘর ভরা এ ঘরানায়
যা কিছু আছোয় কাছিলায় এই
ক্ষণিকায়ী তলাশায়—রে তোমাতেই রে
জানি গুড্ডী, তুমি যে তুমিময়ী ঐ ছাঁদ—
ঝিক ভারে জাঁকীলে, ধর ঘরা এ ধরানায়
যা কিছু বাছোয় বাছিলায় সেই
মণিকায়ী পলাশায়—রে তোমাতেই যে
জানি গুড্ডী, চুমি যে চুমিময়ী রৈ জাঁদ।
বার নয়, বারবারীলে হই যে বারেকটিতে
কবিতায়ী জল্প-কিছু,—বোঝাতে তরে
পরে ধারী যে বুঝ-বুঝেলায় ঐ
সত্যটা—না ফিরলায়, তার জীরালায়ী—
আর তয়, আরআরীলে কই যে আরেকটিতে
ছবিতায়ী কল্প-দিছু, সোঝাতে দরে
ঘরে তারী যে সুঝ-সুঝেলায় কৈ
সত্যটা—আ ঘিরলায়, আর মীড়ালায়ী।
ছেলের মতো ছেলে, বলি, ঐ একটিকেই দিয়ে
থিয়ে কতই সৌন্দর্য্যয়ী ক্যাট্-কুলী
যে রাজপুত্তুরটা আজ রাজনান—নেই তুমির
আছে সৃষ্টিতা হোয়ে তুষ্টিতা—এ
টফী, টফীয়ায়—
ছেলের মতো ছেলে কৈ একটিতেই ছিয়ে
রীয়ে শতই মাধুর্য্যয়ী প্যাট্-রুলী
যে রাজপুত্তুরটা সাজনান—নেই তুমির
পাছে কৃষ্টিটা রেয়ে বৃষ্টিতা
হৈ টফী, টফীয়ায়।
ও গুড্ডী—বলি, মাসীটা বাঘাইয়ের, দ্য
বীগ ক্যাটের হোয়ে ত—ঐ আঁকি
গঙ্গানদীর এ ঘাটেলে পেয়ে যাও—
শেষ ঐ রেসপেক্টী রেস্টটা বলি—

মাঘেলী এ শীত কী ধরছেয়ে
সোয়াদী উষ্ণয়ী এ উষ্ণীষ্
গুড্ডীয়া, মাসীটা বাঘাইয়ের, দ্য
বীগ্ ক্যাটের তোয়েও চৈ জাঁকি
গঙ্গানদীর ও ঠাটেলে চেয়ে নাও
শেষ তৈ লেশপেন্টী বেসটট্টা—
বলি তাথেলী এ শীত কী
ভরছেয়ে তোয়াদী তুষ্ণয়ী
এ তুষ্ণীষ্।

*[১৫-১-০৭
মাঘী পয়লায়
সোমবারী সাঁঝে।]*

টিটো, দ্য শী মার্শালা

মাসী এই পয়মন্তী এই ফেস্টীভ্যালীড্
এই মাসে—আজিয়ার পয়লায় এ দিন
প্রথমায় সাঁঝ শুরুয়াই এ সওয়ায়ী
ছুঁয়ে হই মুখেলায়, টিটো,—দ্য শী মার্শালা—
মাসী তেই দয়মন্তী তেই রেস্টীর‍্যালীড্
তেই হাসে—বাজীয়ার রয়লায় এ দিন্
ব্রতমায়—সাঁঝ দুরুয়াই এ তওয়ায়ী
জুঁয়ে রই সুখেলায়, টিটো, দ্য সী মার্শালা।
ধীতেলী ঝাঁপপালী এই দাপ্ তায় দাপে—
নিন এই হিমবায়ু, চায়ু রে ধায়ুতী
যে দাপুটায় খুউব বেশীলাই নিয়ে,
ট্রীট্ করা এই কোল্ড্ য়্যাওয়ী শীভার্—
শীতেলী ঝাঁপতালী তেই হাপ আয় হাপে–
লিন তেই হিমছায়ু, আয়ু রে আয়ুতী
যে চাপুটায় ডুউব ঠেশীলাই দিয়ে
ক্রীট্ ভরা তেই হোল্ড্ স্যাওয়ী লীভার।
টিটো—দিন পরতীয়ে আগামীটায়
ঐ কালকায় ঐ যোলোয় যদিও বলি
কল্স্ দাই মেমোয়ারস্—হোয়ে
টান-ধান হুঁশীলিতী, হয় তা আজই—
টিটো, বিন ভরতীয়ে চাগামীটায়
কৈ পালকায় কৈ দোলোয় তদিও তলি
ফল্স্ হাই মেমোয়ারস্—জোয়ে
ঝান-ঝান সুশীলিতী, হয় তা যাজই।
প্রবাহী কথায়, জানো ত টিটোয়া এভ্‌রী
ইয়ার-আ এই মাঘেয়ী দাপুটাক
শীতে হতে রে বয়তায়ী কথাটা
পালায় পালায় বাঘ-বাবু, দ্য বীগ্
ক্যাট্-
শ্রবাহী তথায়, মানো ত টিটোয়া, ব্রেভ্‌রী

ফীয়ার্ আ যেই মাঘেয়ী কাঁপুটাই
শীতেলিতে ভর হয়তায়ী কথাটা-
রাণ-আয় রাণ-আয় বাঘ-বাবু
দ্য বীগ্ ক্যাট্।
টিটোয়া, তোমারেতে টু টেল্ এইটাই
যে বাঘ পালায় কী না নাহি জানা
তবে পরে কী আর কথা মানুষরা
পালায়—টু মেট্ রীড্ থেকে শীতলী
দাপাদাপ্—
টিটোয়া, তোমারেতে টু খেল্ বইটাই
যে বাঘ ঝালায় কী না নাহি শোনা
হবে ঘরে কী পার যথা—মানুষরা
পালায় টু গেট্ বীড্ থেকে শীতলী
জাপাজাপ।
পনেরোর জানা এ জানুয়ারীল্ তারিখা
অর্চে বঙ্গাব্দয়ীক্ পয়লাই দিনটা
মাঘেরি—নিয়ে পরে থোক ভরাটী
থাক থাক থাকীলার শীতটা, আন্
টলারেবলী।
ভণেরোর আনা এ জানুয়ারীল্ ঝারিখা
তর্চে রঙ্গাব্দয়ীক্ দয়লাই-ঋণটা
মাঘেরি—রীয়ে ভরে ছোঁক দরাটী
ঢাক ঢাক ঢাকীলার শীতটা,
রাণ্ অনারেবলী।
যায় যাক নায়ে শীতী ঋতেলার এই
থিতুয়ী আস্থেলে—বলি টিটো,
এই সাজীকী হয়ী এ সন্ধ্যালী অনুভবী
স্নিগ্ধেলে—খুশী পেয়ে টিপটপী
এ গাঁথেয়ে—
আয় আক ধায়ে শীতী ধীতেলার যেই
মিতুয়ী ধাস্থেলে—বলি টিটো,
এই কাজীকী জয়ী এ সন্ধ্যালী অনুরবী

ঋদ্ধেলে—তুষী গেয়ে লীপ্—
লপী এ কাঁথেয়ে।

ইভ্ ভরা খুশীলীকী, ও টিটোয়া—
মাঘী সাধেলায় এই চাঘীমায়
এই সাঁঝে এ ঘর মাঝারোয় তাকাও
একটিবারের লুকিংটা, এই যে তোমার
একমাত্র নীস্—ঐ গুঞ্জন—আর আর
কন্যা-পালতিয়া ঐ আর তরে নাই গুড্ডীয়ার
পুত্র—সো লাইভ্‌লি ও লাভ্‌লির
টফী—আঁথেলে আছে ঘুমেলে—
লিভ্ ঘরা তুষীলীকী, ও টিটোয়া
বাঘী মাঘেলায় এই জাঘীমায়
এই ঝাঁঝে এই ঘর ঝাঝেরোয় তাকাও
ছকটি ধারের লুকিংটা, ঐ যে তোমার
রৈ যে তোমার একমাত্র নীস্—
হৈ গুঞ্জন—ধার ধার কন্যা
ভালতিয়া ঐ তার দরে আই গুড্ডীয়ার
পুত্র—সো লাইফ্‌লি সো লাফ্‌লীর
টফী, মাথেলে কাছে চুমেলে।

[১৬-১-০৭
মাঘী দোসরায় ১৪১৪
মঙ্গলীয়ী সাঁঝে।]

ডাব-ডাবিনী ডাবুয়েই—ও ডাব্বুয়া

দের হয় যাহা মতোটি আমারই হের্
নাই তরে সময়ীত্ দরজায় হয়—
করাটা কথাটা ঐ চার তারিখীল্
হয় তাব তাতালীতে, ও ডাব্বুয়া—এই আজ—
বের নয় তাহা অতোটি আমারই ধের
তাই নরে তময়ীত্ পরজায় নয়—
ভরাটা কথাটা হৈ ভার পারিতিল্
কয় দাব আঁতালীতে—ও ডাব্বুয়া—এই রাজ।
কবে নয়, হইলায়ও দিন তকী দিনটা
অনেকানেক—তবু তাক করা চোখেলী
চাহনিতে হয় যে যেন তুমি ডাব্বুয়া—
ঐ ত দেখি ঐ ঘুরছোয়া, ইতি-উতি—
তবে ধয়, রইলায়ও ঋণছকী ঋণটা
ক্ষণেকানেক—রবু ডাক ভরা রো-খেলী
আহনিতে ঝয় হেন তুমি ডাব্বুয়া
ঝৈ ত পেখি ঝৈ ধুরছোয়া মিতি-তিতি।
যাজ করি পজ্ নহিতে, হই যে তুমিয়ী
তুভ্যয়তায় উঁকি দেওয়ী এ এক
ধারালার দৃষ্টিটার ধারাপাত্ রয়
রোয়াস্তে বেশ তার যে—কই বেশী—
ডাজ ধরি কজ লহিতে, তই যে ঝুমিয়ী
ঝুভ্যয়তায় ঝাঁকি নেওয়ী ও এক
পারালার তৃষ্টিটার তারাতাত্ হয়
হোয়াস্তে পেশ বার যে—জই পেশী।
ডাক-ডাবুয়ী ও ভায়া ডাব্বুয়া, তুমি ঐ
এক দুপুরার ভোজন সময়ায়—হও
রীপার্টী থেকে আর আর সবারই—
নহি নিলে, ঐ ঐ বলে—শেষ কী ফীড্-টা—
তাব পাবুয়ী ও মায়া ডাব্বুয়া, তুমি বৈ
এক চুপুরার ভোজন তময়ায় রত—

ডীপার্টি—ডেকে কার কার সবারই
তই তিলে, নৈ নৈ চলে—শেষ নীড়-টা।
ইয়্যু, দ্য শ্রীমান ডাব্বু, নট্ বাই দাই
ইল্ লাকি, ঐ ইলনেসী কেমনটা
নিলো তরে দুপুরারে নাহি দিয়ে
সময়, হোতেয়ে বিকেল—গেলে চলে তুমি—
হিয়্যু, দ্য ভ্রীয়ান ডাব্বু, কট্ হাই লাই
টিল্ প্লাকি হৈ—টিলনেসী তেমনটা
দিলো ভরে টুপুরারে নাই নিয়ে
জময়,—মোতেয়ে নিকেল্ গেলে—চলে ঝুমি।
শরীরায় যেন পরে দিন তার কয়
দিন—নাই নাই যাচিলায়ত
গুড্ কন্টূরা, নয় কোনোতেই—
তাই যে তাই হরনীন্ তোমারেতে—
ধরীরায় হেন দরে লীন ভার ময়
লীন্ ডাই—আহি বাচিলায়ত্
মুড্ হন্টুরা,—হয় তোনোতেই
নাই যে নাই তরনীন্, তোমারেতে।
লিঁয়াজোঁয়ী ঘর-ভরা ভাবুনারই ঐ
দোল্ পেয়ে খাশ তার রেশেলায়—
পশি গো পশ্যতেয়ে ডাব্বুয়া
তোমাতেই—যত পথ চলে,—আজও—
রীঁয়াজোঁয়ী ভর-ঘরা ধাবুনাই হৈ
তোল দেয়ে ধাশ পার পেশেলায়
হসি তা হস্যতেয়ে ডাব্বুয়া
তোমাতেই—মত কথ বলে—আজও।
সাঁঝ বেলীতে মাঁঝ দেলীতে এই
জাজারীন জাগৃতিয়ী এ হিউমী
বাসরায়—বাসি রে ইন্ লাভ
ডাব্বুকে, ইন্ শেড—কাটিঙ্ সরোজ্—
সাঁঝ হেলীতে আঝ তেলীতে যেই
রাজারীন্ সাগৃতিয়ী এ ফিউমী

ভাসরায় ভাসি রে সীন্ লাভ্
ডাব্বুকে, কীন সেড্,
পাটিঙ্ বরোজ্।

[১০-১-০৭
২৮-৯-১৩
শনিবারী সাঁঝে।]

চুণী, চুণীয়ী মাথ ছবিটা

আঠারোয়ে হয় আজ মাঘী চৌঠায়ার এই
ঠাণ্ডায়ীত্ ঐ তাহারই থাণ্ডারায় বোসে
করি এ মর্নিঙ্ ওয়ার্কটা, কাজকারুতে
সকালায়, —নিয়ে ছবিটা চুণী, চুণীয়ী যথা—
সাঠারোয়ে ঝয় বাজ চাঘী রৌফায়ার যেই
মাণ্ডায়ীত্ রৈ বাহারই ভাণ্ডারায়—
হোঁশে ধরি এ হর্নিঙ্
ডোয়ার্কটা, —যাজপারুতে ঝকালায়,
দিয়ে কবিটা চুণী, চুণীয়ী তথা।
ফোটায়ে মন—ভ্রমরায় এই ফের এই পৌষী
দৌত্যেয়ীত্ ছাওয়ী ফেস্টীটা হয়
ম্যারেজী ম্যানেজীক্, সময়ীত্ এতে
আইলা ঘরে রে—ও চুণী, —তুমিয়ী—
কোটায়ে মন-শ্রমরায় তেই ঘের তেই কৌষী
রৌত্যেয়ীত্ আওয়ী রেস্টীটা জয়
ক্যারেজী ফ্যানেজীক্ রময়ীত্ ততে
বাইলা ভরে রে—ও চুণী, —চুমিয়ী।
আতাসায়ী নাই তরে এই আজকার এ
প্রাতেলে—কুয়াশাই আস্তরণটা—ঐ
আকাশায় রেখে টোপী ঘেরঘার—
এই ক্লীয়ারী স্কীয়ারে, ভাসি যে—
মাতাসায়ী আই ঘরে যেই কাজকার এ
ক্রাতেলে রুয়াশাই ভাস্তরণটা—
রৈ ঝাকাশায় দেখে হোপ্-ই
ঢেরঢার—এই ফ্লীয়ারী স্মীয়ারে
হাসি যে।
রুবী নামে আছে তোমার নামটা ঐ
অন্য ভাযায়ায়—এই খাশায়ায়
এই খুশে-রাশে ভাবি-ধাব-সাঙ্গে
যা হয় লাইটী এক ছবির ছবিতা—

রুবী ঝামে বাছে তোমার নামটা রৈ
রণ্য ঠাশায়ায় রেই রাশায়ায়—
তেই পুশে-ধাশে ধাবী পাব–সাঙ্গে
—আ ময় ফ্লাইটী এক
কবির কবিতা।
চুণী, সময়ী ঐ টাইমায় তুমি ছিলে
মধ্যয়া সবাকারে—ভেরী ভেরীলায়ে
শ্রীলী হুলী দ্য বেস্ট্ মতাতেয়ে
মাতাতেয়ে ঘর-ভরা ও আমেজায়—
চুণী, রময়ী রৈ রাইমায় তুমি মিলে
রধ্যয়া রবাকারে—মেরী মেরীলায়ে
ফ্রীলী ক্রীলী দ্য হেস্ট্ অতাতেয়ে
আতাতেয়ে ভর-ঘরা ও রামেজায়।
বলি আজ বলি কথাটায় ঢেলে–
ঢালে খুশীরই মাত্ কাড়ালী
তুমি চুণী, তুমি গুণী, —তুমি
চুমিলায় চুম-চুম এক স্পন্দন—
বলি যাজ বলি যথাটায় মেলে–
মালে রুশীরই ধাত-জাড়ালী—
তুমি চুণী, তুমি রুণী, —তুমি
জুমিলায় জুম-জুম এক স্তন্দন।
নাচে রে এ মন ভাসে তুষীরই ঐ
সায়রায়—ঐ ত ঐ গাছটার ঝাখ-
শাখী বিস্তারায়—শিডলী নীচয়—
আজ এ মুর্হূতায়ও—আছে ইন রেস্ট্—
যাচে রে এ ক্ষণ তালে হুঁশীরই রৈ
আয়রার—তৈ বৈ গাছটার শাখ-
ঝাখী ঋস্তারার শিউলিঙ্ দিচয়
রাজ এ সুহূর্তায়ও—কাছো সীন্ রেস্ট।
কন্যেটা মায়ের মতো মা ঐ টিপসীর
তুমি চুণী ছিলে যেমনটা ওর
ফেভারী মাদারী ফীলে ডীলে—

আর—সবাই—তাই ছিলো রে ছিলো
তোমারই মার কাছে।
ধন্যোটা মায়ের মতো মা রৈ টিপসীর—
তুমি চুণী মিলে যেমনটা ওর
সেভারী মাদারী টীলে রীলে—
—পার রবাই আই মিলো রে
মিলো তোমারই মার পাছে।

[১৮-১-০৭
চৌয়া মাঘ '১৩
বিষুদবারী সকালে।]

গোল্ডী, সুবর্ণয়ী ক্যাট ক্যুইনী

গোল্ডী, সুবর্ণয়ী ক্যাট্ ক্যুইনী, বলি
খোলামেলে এ খোলতায়ে—দোষটা
এ কবিতা রচয়িতেরই, —ছেড়ে তারিখা পাঁচ্—
এই সতেরোয়ী ঘুরে ধরিতায় হোল্ডী টোন্—
গোল্ডী, রুবর্ণয়ী প্যাট্ ক্যুইনী, বলি
দোলাদেলে এ দোলতায়ে হোঁশটা—
এ হবিতা যচয়িতেরই, দেরে ঝারিখা ক্যাচ্—
রেই রতেরোয়ী ভুরে ঘুরিতায়—টোল্ডী শোন্।
ভুল নয় এ ভুলিভালাতী এই টেরই এ
মিস্-টা—তোমাতেই গোল্ডী, হয় তা
ইন্ মাইণ্ডী ছবিলেতে কাল রাতেয়ে
তাই থৈ থৈ মনোবাসে—এ চকোরী ঋণ—
দুল ঢয় এ দুলিদালাতী এই দেরই এ
ইষ্-টা তোমাতেই গোল্ডী, নয় তা
লীন হাইণ্ডী কবিলেতে ঢাল তাতেয়ে
আই নৈ নৈ ক্ষণোধাসে—ও জঁকোরী ঝণ।
নাই লাগলোয়া ভালোটা থেকে ঐ
রাতীয়া কালকা, —হই তৈয়ারীলে এই
সাতী সাথীল্ সকালায়—টু লেখ্
আঁকে তার জাঁকে—গোল্ডী মহীমায়—
আই চাগলোয়া আলোটা ঢেকে হৈ
মাতীয়া ভালকা, রই হৈয়ারীলে
সেই মাতী মাথীল, জঁকালায়—টু দেখ্
ঝাঁকে বার ছাঁকে—গোল্ডী রহীমায়।
টেল্ হয় টোল্ডী এক ঝরনাই স্রোতেলে—
খুশীয়া তব তুফীয়া কথা ও কথালী
এই আবারে বলে পাবারে তুমিতে—
সবার থেকে থাকা—ওগো ও চুপচাপীলা—
রেল্ দয় রোল্ডী এক ধরনাই গ্রোথেলে—
হুঁশীয়া রব রুশীয়া যথা ও যথালী

যেই ধাবারে তলে তাবারে তুমিতে—
অবার ডেকে ডাকা—ওগো ও রূপরাপীলা—
বেল্ ঝয় মোল্ডী ছক ভরনাই শ্রোথেলে।
কিছুটা পাইতেয়ে পর—ভরাটি দিথীয়ায়
তাকান তোমার ছিলো ছবিঝয়ী
এক রাইমী ছাঁদ, যা আর তাহা
নাই পাওয়া হয় হয়, থেকে আর কারুয়া—
ইছুটা বাইতেয়ে বর—দরাটী থিতিয়ার
চাহান তোমার রীলো কবিময়ী
এক টাইমী জাঁদ, আ তার বাহা
বাই ধাওয়া তয় তয়, ডেকে তার আরুয়া।
এই এই কন্যেটা মিকিয়ার, শেষ কন্যোটা,—
তাই তাই তাতালী তাতাসে, তুমি ছিলে
ঘর আর বার—সর্বত্রয় সবারই চোখে—
একটু নয়, বেশীলীতে হেস হেসী পোটী মেট্—
যেই যেই ধন্যেটা মিকিয়ার, খেশ ধন্যেটা,
রাই রাই মাতালী আতাসে, তুমি হিলে
ধর ধার তার—রর্বত্রয় রবারই চোখে
ছকটু ছয়, রেশীলীতে ঠেশ ঠেশী ক্যেটী বেট্।
পৌষালী দিনে, পিঠে-পুলির সোয়াদী
এ ঋতেলার রীত যেরেলে পাই
তাই এই ভালী ফেস্টে—তুমিরই
সুহৃদয়দীল্ মন-ভরা, গোল্ড ঝমকী গোল্ডীরে—
কৌশালী ঝিণে, মিঠে-বুলির জোয়াদী
এ হৃতেলায় ধীত ফেরেলে ধাই
হাই যেই ফালী টেস্টে—তুমিরই
সুপ্রীতয়ীল্ ক্ষণ ঝরা, টোল্ড্ জমকী গোল্ডীরে।
দাপটায় এই আছে, এই ঘুরঘুরিলী
তাড়াড়ে, গোল্ডী, তোমারই ঐ
আত্মজ—শ্রীমান গুঞ্জন—দারুণায়ী
লাইভলিলি, বলি—দ্যাখো কী তাহারে
থেকে ঐ ওপরার—ঐ পৃথ ভালে—

ঝাপটায় রেই কাছে, রেই দুরদুরালী
চাড়াড়ে, গোল্ডী, তোমারই রৈ
আত্মজ—ধীমান গুঞ্জন—আরুণায়ী
লাইকলিলি, বলি—দ্যাখো কী চাহারে
ডেকে ধাবার—হৈ পৃথ ঢালে।

।১৭-১-০৭
৩-১০-১৩
বুধবারের সকালায়।।

নীলী, নীল পদ্মুয়ী নীল

নীলী, মন জমিতায় চয়ী এ চয়েসায়—
খুব খুশী হইতায়ে বলিতে চাহিলায়,
তুমি যে তুমি আছো, এই আজি
এই পুশীতায়, করি তাহানায় পুশ্ অন্—
নীলী, মন রমিতায় জয়ী এ জয়েসায়—
ডুব রুশী বইতায়ে তলিতে তাহিলায়—
তুমি যে তুমি কাছো, যেই যাজি
যেই হুঁশিতায়, ভরি বাহানায় বুশ্ শন্।
আজকার এই মাঘী এই শীতেলান্ এই
মূরড্ এই মর্নিঙ্ ঝায় পাই মুড্
বেইলড্ জন্যে দাই শেক্ শেকেথ
দ্য মেম্যোয়ার রুণ্যয়ায় রণঝনী—
বাজকার এই চাঘী এই ধীতেলান্ এই
টুর্‌ড্ এই টর্নিঙ্ রায়—তাই কুড্
হেইলড্ ভণ্যে—হাই টেক্ মেকেথ্
দ্য মেম্যোয়ার ধন্যয়ায় ধনজনী।
নীলী, জানাতায় আজও জানিতম যে—
তুমি কামেথ এই ঘর এটায়, থেকে
ঐ সামনার ঐ ছবিঘর—ঐ বিজলীর—
পাথ এই পাথেলে—সাথ খিলিয়ী সোমা—
নীলী, মানাতায় যাজও মানিতম যে—
তুমি হাম্-এথ এই ঘর এটায়, —ডেকে
তৈ কামনার তৈ ধবিধর তৈ লিজলীর—
মাথ এই ঘাথেলে তাথ দিলিয়ী সোমা।
তোমা তরে পাওয়া—যেনয় পায়ীলা হাতে
খোঁজটা চাঁদের—টু হেলপ্ মা হোয়ী
মিকিয়াতে—টু বাসতেয়ে ভালোটা
অপত্যেয়ে—হেতুয়া টু লাল্ কারুরে—
তোমা ধরে আওয়া—রেণয় আয়ীলা তাতে
গোঁজটা জাঁদের—টু হেলপ্ মা রোয়ী

মিকিয়াতে—টু বাসতেয়ে ভালোটা
যপত্যেয়ে মেতুয়া টু পাল তারুরে।
সেই আসা থোক-থাকেলায় ঐ ঐ
থেকে—যে আগাম থাকিলায়ী
নট্ নোউন্ অন্য কোনোয়ী হোয়ারা—তবু
নিজ গুণে তুমি হোলে—নিত্ নীলী—
যেই ভাসা ঢোক-ঢাকেলায় রৈ রৈ
ঢেকে—যে দাগাম ডাকিলায়ী
কট্ শোউন্ রণ্য রোনোয়ী স্যোয়ারা—রবু
ইজ্ গুণে—তুমি রোলে—দিত নীলী।
নীলী নামে আছে হিলিলী ছাঁদালে
দুলিলী কাওয়াজ,—নিতে এই নিত্য
ঝুমিলিকী ঋণ, তোমারই ভব্য
তুষী-তোষীলায়ী নেয়ী ন্যাচারায়—
নীলী নামে কাছে বিলিলী জাঁদালে
তুলিলী দাওয়াজ, দিতে যেই
হিত্য রুমিলীকী চাণ, তোমারই
ধরা রুশী-রোশালায়া—ক্যাচারায়।
আজ এই কুয়াশায়ী চাদরায় ঢাকা
এই প্রাতী এ সাত সকালায় পেয়ে
তোমারে—এই শীতী হিতেলায়ী
বায়রী তক্—আয়রী ঘনতাজে—
যাজ তেই তুয়াশায়ী সাদরায় ডাকা
যেই ত্রাতী এ মাত-মকালায় চেয়ে
তোমারে যেই ঋতী মিতেলায়ী
সায়রী ছক্—ধায়রী মনবাজে।
নীলী, নান্ দ্য এলস—আসা এথা
যাহার পাহারায় ঐ সোমায়ী কোলটায় চড়ে
চুপচাপীতে পেয়ে আশ্রয়—
এই এই যে এথানার নতুনী ঠেকে—
হয় যে হয়ীলী এক মেটোয়ারী ছন্দ—
নীলী, আন্ দ্য টলস্—বাসা যথা

পাহার বাহারায় রৈ সোমায়ী কোলটায়
তুপতাপীতে গেয়ে রাশ্রয়—
রই রই যে যথানার রতুনী ঢেকে
জয় যে জয়িলী রেটোয়ারী বন্দ।

[২৯-১-০৭
১৪-১০-১৩
সোমী সুশ্রীলী প্রাতে।]

ল্যাংরু, লঙ্ মার্চে হই মুখোমুখী

ল্যাংরু, বলি যেন বহু দূরেকার নয়, তবু
যেন নয় আবারো কাছেয়ার—তাই করি
লঙ্ যেন এক মার্চ, মুখোমুখী হোতে তুমির—
ল্যাংরু, বলি হেন রহু ঘুরেকার তয়, কবু
হেন হয়, পাবারো আছোয়ার—তাই ভরি
লঙ্ হেন ছক সার্চ, মুখোমুখী রোতে তুমির।
পৌষী মাসের এই দিন শেষে, এই উনত্রিশে
যে ঘর ঘর ঘরময়ী আজ সবাকার জন্য—
ফেস্ট এক পিঠে পুলির জড়াতী টেস্টে—
পৌষী হাসের ঋণ পেশে, এই ঊনত্রিশে
যে দর দর দরধয়ী বাজ রবাকার অন্য
বেস্ট এক পিঠেরুলির গড়াতী পেস্টে।
ল্যাংরু, সেই সাধী সেই সাঁঝী গরমার মধ্যে
ডাকছিলে মিঁউ মিঁউ রয়ে ছোট দিনকেয়কার
কীটেন্—বাড়ী অন্যয়ার, খোলা পথ গলিতে—
ল্যাংরু, যেই বাধা যেই মাঝী তরমার তধ্যে
ঝাঁকমিলে কিঁউ কিঁউ দয়ে রোটো দিনকয়েকার
মীটেন্—আড়ী দন্যয়ার, দোলা যথ্ ঢলিতে।
এলে পর—পেলেয়ে পালতায় তোমারে নিয়ে
ঘর-ভেতরায়, বিস্ময়ার ঘের দুইলোয়া
যেই আসা, সেই থামা—তোমার সুরী ঐ কান্না—
খেলে তর—হেলেয়ে হালতায় তোমারে দিয়ে
তর-মেতরায়, ইস্ময়ার ধের রুইলোয়া
রেই হাসা, সেই কামা—তোমার
ভুরী তান্না।
সঙ্ মাতালায় এই বাঙালী এ সংস্কৃতিটার
সামলায় চলতীকী ভোজন-জ্ঞানাঞ্জনী
বিজ্ঞানা, ডোরে ক্রান্তিকালী এক ফেস্টি কল্—
ডঙ্ ধাতালায় যেই রাঙ্গালী এ সংস্কৃতিটির
কামলায় ফলতীকী ভোজন-সানাঞ্জনী

ইজ্ঞানা, ঘোরে প্রান্তিতালী এক টেস্টি-ডল্।
আর যদি বলি—এই ল্যাংরু নামটায় সত্যি
নাহি বাজুলী বাইতকী বাই বাজনা
ঐ নহবতী—টু ওয়েল্ গেট্ আজকায়া—
তার তদি তলি—এই ল্যাংরু নামটায়
কত্যি নাই রাজুলী হহিতকী রাই রাজানা
কৈ হহবতী—টু ওয়েল্ কেট্ কাজকায়া।
শীতলায় হিত্ নয়ী হয় এক এমনি
—বলি চৌদ্দয়ায় হও ইল্—নয় যদিতে
কিছুয়ীকী অমন—তাই ছিনালো তোমারে—
শীতলায় নীত্ ঝয়ী তয় ছক জমনি
—ঢলি চৌদ্দয়ায় চও ইল্—দয় রদিতে
ঋছুযীকী অমন—তাই বিনালো তোমারে।
চৌদ্দয়ী সেই প্রায় কাবারোতেয়ে, রাত
নীয়ার ঐ বারোটাই ঘটিকেতে তুমি—
ল্যাংরু চলে গেলে—য়্যাবোডী ঐ
অন্যয়ী খানে—
চৌদ্দয়ী ওই ক্রায় তাবারোতেয়ে মাত—
গীয়ার থৈ—বারোটাই হটিকেতে
তুমি ল্যাংরু—ঢলে পেলে য়্যাবোডী চৈ
জন্যয়ী থানে।

[১৪-১-০৭
২৯-৯-১৩
সংক্রান্তির পৌষীবার
রবির দুপুরে।]

হামটিয়ে নাচ নাচে রে এই উইন্‌টারী কোল্ড

হামটিয়ে তুষীতায় এই নাচ নাচে রে
এই পৌষালী ধারালী এই উইনটারী
কোল্ড্—যেন যেন ল্যাণ্ড কোনো
বরফার রেশ ধরি হয়ী জড়িতলত্—
হামটিয়ে রুশীলায় যেই টাচ্ টাচে রে
যেই কৌশালী পারালী যেই উইন্‌টারী
হোল্ড্—রেণ রেণ ব্যাণ্ড্ গোনো
হরফার রেশ ভরি জয়ী তড়িতলত্।
ভাব আয় ছায়ী কী ঝায়ী এই প্রাতে
এই মর্ণিঙ্‌য়ায়ে হুঁশ্‌হালে যে
রাঙীলায় তুমিয়ী হামটিয়ায়—
যেন অন্য ছক এক য়্যালিসেরে, ও কন্যে—
কাব পায় তায়ী কী ধায়ী তেই ক্রাতে
তেই কর্নিঙ্‌য়ায় ঝুঁশতালে যে
চাঙীলায় তুমিয়ী হামটিয়ায়—
যেন রণ্য তক এক য়্যালিসেরে, ও কন্যে।
ক্যারল্ শ্রীযুত লুইস্ যদি রে হোতেম
তবে ত তব রচিতাম রে নিয়ে
তোমা—নবই নিত্ এ নিয়্যুলী
ফর্মড্ কথিকা—কথা হামটিয়ে—
ব্যারল্ নিযুত টুইস্ তদি রে রোতেম
কবে ত করব খচিতাম রে দিয়ে
তোমা—হবই হিত্ এ ডিয়্যুলী
নর্মড্ যূথিকা—যথা হামটিয়ে।
কবি ঝয় লাপেলে কাব নিয়ে, —আর
পর আর ভাব রুয়ে—দেখিবার
গরজায়—তর্য্যায়ী তান-তানানে
এ কবিতায় ছাপি-ছাপি—ও তুমিরে—
কবি জয় জাঁপেলে ধাব দিয়ে, তার
পর তার কাব ছুঁয়ে—লেখিবার

বরজায়—অর্য্যায়ী গান-গানানে
এ ছবিতায় ঝাপি-ঝাপি—এ তুমিরে।
কবি কারুতে হই পরে রুচিরায়
ঘরেরই টেনেন্ট— তাই গুণি তরে
রেন্ট্—যাতে করে, আয় ছাপোয়ে
মন পরি কাবীলী সব সুষমা—
কবি পারুতে রই ভরে সুচিরায়
ধরে রই মেনেন্ট—রুণি ভরে
মেন্ট্—মাতে তরে, ধায় দাপোয়ে
মন ঝড়ি কাবীলী রব তুষমা।
হামটি, তুমি ছিলে তুমির সাথ সাথী
ভাইটা শ্রীলী ডামটির মাথীলায়
সেই ছবি আসে, ভাস ভাসতীয়ে
চোখেলিত্ দেখভালে, এখনও
টুম্বুরায়ী ধাশে—
হামটি, ঝুমি ঝিলে চুমি আথ আথী
ভাইটা থ্রীলা ডামটির সাথীলায়
যেই কবি ভাসে আস আসতীয়ে
রোখেলিত্ শেখভালে, এখনও
অম্বুরায়ী খাশে।
বার্ড ঐ কালজয়ী, বাড্সার্থকে যদি
যেতাম রে পেয়ে ভাবুলিতী এ
ঘরটায়, তবে তৎক্ষণিকায় বলিতাম,
রচো এক ছবিতা— এ হামটিয়েতে—
হার্ড্ নৈ ভালভয়ী, বাড্সার্থ্কে তদি
নেতাম রে ধেয়ে দাবুলিতী এ
ধরতায় যবে যৎঝণিতায় রোলিতাম,
খচো ছক কবিতা—এ হামটিয়েতে।
গ্রে—নয় নয় কালারায় মোট্রেয়ে
এই আজও, জানবা ও হামটিয়া,
ভাইয়ের জাগ্ নিয়ে ড্র্যাগ্ তোয়ে,
ঐ ছোট্ট মেয়ে, —লুসি গ্রে—

আসুক দেখতেয়ে, তরে, তোমারেই
ঐ ঐ টবই গাছ—ঐ রঙ্গন্ তল্—
প্রে—হয় হয় ভ্যালারায় কোট্টেয়ে
রেই বাজও, মানবা ও হামটিয়া,
ভাইয়ের চাগ্ হিয়ে ক্র্যাগ্ ঝোয়ে
—কৈ ছোট্ট মেয়ে,—লুসি গ্রে
ঠাকুক দেখতেয়ে, বরে, তোমারেই
ঝৈ ঝৈ লবই বাছ—তে রঙ্গন ঢল্।

[৬-১-০৭
বিশে পৌষ, ১৩
শনিবারী সকালা।]

তাবে তব দাবীলেয়ে থেকে রে তাবলু

তাবে তব দাবীলেয়ে এই তায় এই ছায়ালী
মায়াদ্ধেয়ে, বলি রে তাহনই রে থেকো
ওগো ওয়া তাবলু, দ্য সিল্কী ব্ল্যাক্—
পাবে অব রাবীলেয়ে যেই আয় যেই তায়ালী
রায়াদ্ধেয়ে বলি রে আহানি রে ঢেকো
ওগো ওয়া তাবলু, দ্য জিল্কী ফ্ল্যাক্।
বিকালায়ী এই হিমঝোরীল্ এই নুন্‌টা—
আপ্ নয়—আফটারায় করি রে বোসে
এই কৃতি প্রীত্যন্তায়, বাস্ ভালোবাস্—
টিকালায়ী যেই ঝিমঝোরীল্ যেই বুন্‌টা
পাপ্ তয়, সাফ্-টারায়—ভরি রে কোষে
যেই হৃতি প্রীত্যন্তায়—আস্ আলোহাস্।
আজ নয় তুমি তোমারই আকারার ঐ
প্রাণচ্ছলী নো রে নহ নহীলায় রে
নট্ দ্য স্পার্ক—এই যে এই এনি ওয়ে—
আজ হয় তুমি তোমারই সাফারার রৈ
ঘ্রাণদ্দোলী সো রে সহ সহীলায় রে
পট্ দ্য স্টার্ক—যেই যে যেই রেণী রবে।
তাব ভরা তাবীলায়ী তোয়াজায় যে
থেকে বলে থাকী থাকীলায়ী ঐ
কয় তরে কয়েকটিয়ার বছরা—
হাব দরা হাবীলায়ী রোয়াজায় যে
ঢেকে ঢলে ঢাকী ঢাকিলায়ী হৈ
ময় ঘরে জয়েকটীয়ার বছরা।
এইটায় আসিলী কথাটায় জমীনে
হয় আজকার এই পৌষী মাসের
শেষের দিন আগেরে—এই, দিস্ কথা—
হইটায় ঝামিলী তথাটায় দমীনে
জয় কাজকার এই পৌষী আসের
মেশের বিন চাগেরে—যেই, ইস্ যথা।

তাবলু এই দিতয়ী ধাত্‌-মারা এই
ধাতাসী চাওয়েতে—পাই যে পাই,
মোমেন্টায়—এই আভি এই রুম ভিয়ে—
তাবলু, যেই নিতয়ী মাত্‌-আরা যেই
পাতাসী পাওয়েতে—তাই যে তাই,
ফোমেন্টায়—সেই আভি সেই ভুম্‌ ভিয়ে।
মির‍্যাক্যালী তুমি হও নাই মিস্‌—পথী
ভাই আস্তেরে আস্তেয়ে তুমি
পেলে ঠিকই একদিন—এই শেল্টারটা—
রীরাক্যালী তুমি তও তাই কিস্‌—মথী,
তাই তাস্তেরে তাস্তেয়ে ঝুমি
দেলে জিঁকই ছকশিন—যেই ফেল্টারটা।
তাবী পথে দাবী যথে, যাই যাই তাই রে
হেঁটে হেঁটেয়ে—ভরা ভারা ঐ স্মৃতে—
এসে যাও তাবলুয়া চেহারাই
গ্লসী ঐ কালোরী
মাধুরায়।
আবী কথে চাবী তথে, তাই তাই পাই রে
ঘেঁটে-ঘেঁটেয়ে—ধরা ধারা রৈ প্রীতে—
হেসে চাও তাবলুয়া—দেহারাই
ফ্লসী রৈ কালোরী সাধুরায়।

[১৩-১-০৭
২৮-৯-১৩
শনিবারী বিকেলা।]

মংলী, মঙ্গলীয়ে আছো মঙ্গলায়

মংলী, আজ এই বার মঙ্গলায় খুউব
ভাসি এই শীতেয়ে—আছে যে
মঙ্গলায় সরোবরী রবির ছবিয়ী
খেশে—হাউ তুমি সাসেপ্‌টী কোল্ড্‌—
মংলী, যাজ তেই আর মঙ্গলায় রুউব
আসি যেই রীতেয়ে—কাছে যে
রঙ্গলায় বরোবরী ছবির রবিয়ী
পেশে—নাউ তুমি রাসেপ্‌টী হোল্ড্‌।
কালোর যে আছে আলোরই একধারা
আলোকিত গুচ্ছ—আর তায়ে শোভিত ঐ
তুমির তোমারই শরীরায় জড়িতায়ী
ভাব—ঐ যে ঐ ছিলো যে—রেশমীই—
কালোর যে বাছে ভালোরই ছকভারা
জ্বালোকিত শুচ্ছ—আর আয়ে ঝৈ রোভিত তুমির
তোমারই শরীরায় গড়িতায়ী
তাব—ছৈ যে হৈ মিলো যে—পেশমীই।
সকালী এ শীতি মঙ্গলায় ভাবিতে
কাবিতে এই আজ মাত্তরে এই
ক্ষণই ক্ষণিকেয়ে লিখছিই রোজালীল তায় দিছুলিক—
কথা তার কাহনায়, কিছুলীক—
সকালী এ গীতি সঙ্গলায় ধাবিতে
রাবিতে ওই কাজ আওরে যেই
রণই রণিকেয়ে শিখছিই সোজালীল যথা আর চাহনায়, ইছুলীক্‌।
ছবির ঐ তুমি কী যে ভাবছোয়া নীচুয়ে
রাখালাই মাথায়, বলি তায় মংলী—
নিচয়ী ক্যাটই কিছুয়ার তরে ভাবুন,
যা হয় ত নয়, —হয়ই লাইক্‌ যে মানুষী—
ছবির ঐ তুমি কী যে কাবছোয়া ঋচুয়ে
দ্যাখ্যালাই তাথায়, বলি ঝায় মংলী—
ইচয়ী প্যাটই ইছুয়ার ধাবুন,—

আ তয় ও রয়, জয়ই হাইক্ যে মানুষী।
বলি—দেখিতায় প্রাতী এই রুটিনায়
বোসে এই নয়ে নাইলে টু রাইট্ ডাউন
লেখাটা—তোমাতে দেখিলাম ঐ
ছবিটার প্রতি, সকালী সাধেলে—
বলি—লেখিতায় প্রাতী যেই স্ফুটিনায়
তোষে যেই নয়ে টু হাইট লাউন
দেখাটা—তোমাতে শেখিলাম হৈ
ছবিটার ত্রতি, জঁকালী জাধেলে।
হোতেয় যদি রে মংলি, কুলই ঐ
ক্যাটি-ফ্যামিলিয়ী ফিমেলিক—
তুমি যে বী তখন নব আত্মজায়
অঙ্কুরিতা, তাই ভাবনায়ী মাতৃত্বায়ীন্—
কোতেয় তদি রে মংলি, রুল্ই রৈ
প্যাট-হ্যামিলয়ী হিমেলিকে
তুমি যে লী রখন রব আত্মজায়
টঙ্কুরিতা, আই কাবনায়ী মাতৃত্বায়ীন্।
ফোটোয়, —তব পাশ ঘেষেয়ে আর
উষ্ণয়ায় মেপেয়ে তব বাস-পাশী—
দাদাটা ডামটি, দিদিটা গুড্ডী—
আর আর মোর দ্যান তব মাদার,—মেজো
মাসীটা, —টিমপুয়া।
ফোটোয়, রব আশ ঠেশেয়ে তার
তুষ্ণয়ায় রেপেয়ে রব বাস-ঠাশী—
দাদাটা ডামটি, দিদিটা গুড্ডী—
তার তার ডোর্ ট্যান রব মাদার,—মেজো
মাসীটা, —টিমপুয়া।
আজি বাজুয়ে খুশীতয়ী এই নাচিয়ী
ছন্দে আর গানেয়ী তলাশায়—
ক্রোজমড্ এই কাব্ এই পাবটা—
জানাই ভাসিলী যেন বাণভাসে—
ঘর ঘর ঘরা ভরা বাথেলে

তুমি মংলীতে—
যাজি কাজুয়ে তুষীতয়ী যেই যাচিয়ী
বন্দে তার তানেয়ী পলাশায়—
ব্লোজমড্ যেই ধাব যেই দাবটা—
জানাই হাসিলী হেন রাণ্–হাসে—
ঘরা ঘরা ঘর ধরা কাবে,
তুমি মংলীতে।

[৯-১-০৭
২২-৯-১৩
মঙ্গলীল সকাল।]

জনি, ঝনঝন তাবে যে আজিও ধাবোয়ী তুমি

জনি, জন্‌তি—বলি দোলেলে ফের এই
রোল্—এলে ঘর ভরা কতই কথারই
ঝরঝরী তাবে যে—আজিও ধাবোয়ী, তুমি—
জনি, জনতি ঢলি তোলেলে ঘের যেই
টোল্—এলে ভর ঘরা রতই কথারই
ধরধরী দাবে যে যাজিও তাবোয়ী, তুমি।
ফের তার মতানুয়ী এই তাই ওয়া জনি—
তুয়া তরে হয় এই আঁতলীতে এ
কথা জানানায়—তুমি এই যে এই ত—
ঘের বার ততানুয়ী যেই আই ওয়া জনি—
তুয়া দরে জয় যেই সাঁতালীতে এ
কথা শাণালায় তুমি এই যে এই ত।
আজ বুঝি তুমিময়ী আর তরে আর এথাতে
আর আর কোনো মতোটিই তোমারই
নহে আর এনাদার ক্যাট্—টু হ্যাভ্ দ্য লাইক্—
যাজ যুঝি তুমিময়ী তার দরে তার তাই যথাতে
বার বার রোণো ততোটিই তোমারই
কহে বার এনাদার প্যাট—টু হাভ্ দ্য লাইভ্।
জনি নামে জনি কামে—এই যে এই
আজকায় হোতেয়ে চললোয়াতক
দশক ঐ এক, তবুও তুমি যে অটলা—
জনি চামে জনি ঝামে—রেই যে রেই
কাজকায় মোতেয়ে ঢললোয়াতক
দশক ঝৈ ঝক, রবুও তুমি যে জটলা।
কী যে ছিলে ভায়ে ভায়ে বিটুইক্সট
দ্য টু, যেন যেন টু ইন ওয়ান্—অয়ানানে
জয় দ্য জাস্টিফাইয়ায়—জনি সাথ ভায়া টনি—
কী যে মিলে মায়ে মায়ে রীকুইস্ট্
দ্য টু, হেন হেন ডু সীন্ হয়ান্—ঝয়নানে
হয় দ্য কাস্টিফাইয়ায়—জনি মাথ ধায়া টনি।

আজ বলি আজ এই পৌষী মাঝারায়
আজারীতে এই ক্যাচ্ তকী ক্যাচারীতে—
তুমি রে আছো এক রীজেন্সী ঘেরা রাজনে—
বাজ তলি কাজ তেই হোঁশী তাঝারায়
বাজারীতে তেই হ্যাচ্ ছকী হ্যাচারীতে
তুমি রে কাছো লীজেন্সী ফেরা বাজনে।
মাস ঐ নয়ী ভালোয়া, নট্ সেন্টী রে
কৈ ভালোয়া তোমাদেরেতে,—ঐ যে সে
করে আঁটি আটে—স্যাচ্ দাই জীবনা—
মাস ঝৈ হয়ী ফালোয়া, কট্ টেন্টী রে
নৈ আলোয়া তোমাদেরেতে—হৈ সে যে
বরে কাঁটি কাটে স্যাচ্ লাই নীবনা।
হোয়াট্ নয়, থোয়ার্ট নয়—বলি বলি
তাবিলী এই দাব-দাবীলায়—ও
জনি, ভাইটা টনিয়ীর—বলি, ইয়্যু কানট্
ডাই, ক্যানট্ আউটী সহ সহ প্রাউড্
যথায় যে যথার্থই—
কোয়াট্ ঝয়, ডোয়ার্ট ময়—চলি চলি
বাবিলী রেই কাব-কাবীলায়—ও
জনি, ভাইটা টনিয়ীর, ঢলি—ইয়্যু হানট্
সাই, হানট্ ডাউটী লহ লহ ক্রাউড্
রথায় রে রথার্থই।

[৮-১-০৭
২১-৯-১৩
সোমী সকালে।]

নামী ঝামী এই ডামটিয়া

নামীতে ঝাম-ঝামীলীফ্ এই ডামটিয়া—
আজ এই মাচ্ রোর্ মাচ্ ভেরীলী
এ সকালী শীতেলেতে, ভাবি তায়
বলি আছোয়া কেমন ঐ তথানী কোল্ডে—
হামীতে হাম-কামীলীফ্ রেই ডামটিয়া—
যাজ তই সাচ্ টোর্ সাচ্ টেরীলী
এ সকালী হিমেলেতে, ভাবি মায়
বলি বাছোয়া তেমন রৈ তথানী মোল্ডে।
শীত তায়, জাঁপিতে এই ঝাপ মারাল্
এই ভীষণী কাঁপেলে যাচে যে ঐ ঐ
খোলা আকাশার নীলে, সবুজী জমিনায়,
যায় যে যায় চুমায়ে দ্য ফ্রীজ—
শীত ধায় কাঁপিতে তেই চাঁপ ভারাল্
তেই তিষণী হাঁপে আচে যে মৈ মৈ
দোলা ধাকাশার রীল-এ, রবুজী রমিনায়,
ছায় যে ছায় জুমায়ে দ্য ক্রীজ্।
লেক ডিস্ট্রীক্টী ঐ ত দেশটার
চিন্তে তরে—হোতেম যদি ও ডামটি—
ঐ কবি 'বাডসার্থ, তবে তালে আমি
অনন্যতায় সাজাতুম সরোবরী কথা মিতলায়ী—
টেক্ রিসট্রীক্টী রৈ ত বেশটার
হিন্তে ঘরে রোতেম তদি, ও ডামটি,
ঝৈ ছবি ম্যাড্পার্থ, রবে ভালে আমি
রণন্যতায় রাজাতুম সরোবরী যথা রীতলায়ী।
খোলালী দোল আণ্ডার-আ—ঐ বাউণ্ডীতে
সীমাহীন ঐ স্কাই তাহারই তল-
দেশী এই কবির ছবিয়ী মতোটাই
সরোবরে নাচ হয়ে নাচছায়া যে
যতনি শীতেলে—
দোলালী রোল্ ঠাণ্ডার-আ—রৈ রাউণ্ডীতে

সীন্-আ-সীন্ স্পাই যাহারই চল্—
রেশী এই ছবির কবিয়ী রতোটাই
সরোবরে—নাচ ঘরে নাচছায়া যে
শতনি ঋতেলে।
কবি বলেন—প্লেজারী কল্প-ঘরী ঘোরে
লীন ঐ ট্রীপে হোয়ে যাত্রী—হেই রে—
ইফ্ উইনটার কামস্ ক্যান স্প্রীঙ্
বী ফার, ওরে ফার্ বিহাইণ্ড—কথাটা দারুণী—
কবি ঢলেন গ্লেজারী জল্প-ভরী ডোরে
লীন রৈ গ্রীপে ছোঁয়ে মাত্রী—তেই রে
ইফ্ রুইনডার সামস্ ক্যান স্ট্রীভ্
বী পার,—পার রীমাইণ্ড্—যথাটা আরুণী।
ডামটি, তাই ভাবি এই সকালীতে এই
জাঁকিলার এই কোল্ডে—হোল্ড বাই
দাই কথাতে, তুমি যে তথাতেই
আছোয়া খেশী-রেশী থৈ শান্তায়নে—থৈয়ী—
ডামটি, আই ধাবি যেই জঁকালীতে যেই
আঁকিলায় যেই টোল্ডে—মোল্ড হাই
লাই যথাতে, চুমি যে কথাতেই
কাছোয়া ঠেশী পেশী, হৈ আন্তয়ানে—হৈয়ী।
আজই বারোর এই ঝারী ভরা এই শীতী
জাঁকেলে, জানো ডামটি—এই দিনে
ঐ সিমলার দত্ত-বাড়ীতে এসে যান—
নরেন, দ্য সেকেণ্ড অসাধারণী
এক বাঙালী ভারতীয়—
আজই বারোর যেই জারী ধরা যেই
শীতী পাঁকেলে, জানো ডামটি—এই
দিনে সিমলার মত্ত-আড়ীতে হেসে পান
নরেন, দ্য রেকেণ্ড অসাধারণী
ছক বাঙ্গালী ভারতীয়।
এই ডামটি, মায়েতে আর তার ছেলেতে
ছিলোয় যে হামী-জুলী হামামী

আদরারই জোরীজায়ারা, এই শীতেই ঐ
এক সাঁঝে—তোমারই করা মাতামাত্
খেলাটা, ভরা টিমপুয়ে—সাথ
বরোজী আন্ পথী টার্নারে—
এই ডামটি, মায়েতে তার আর ছেলেতে
হিলোয় যে চামী-দুলী চামামী
সাদরারই ডোরী ডোয়ারা, রেই শীতেই ঐ
ছক সাঁঝে—তোমারই ধরা তাতাতাত
মেলাটা, ধরা টিমপুয়ে—পাথ
সরোজী রাণ্ রথী আর্নারে।

[১২-১-০৭
২৭-৯-১৩
শুভয়ী শুক্রবারীয় প্রাতেলে।]

ওয়া ডাম্‌টি, চুম দাও

আগায়ে এই আজকার সাঁঝে সাজিতা
নাই অপেক্ষায় কাল ঐ আসছেয়ার
বারো—গাই তরে গাই ডামটিয়ার
জয়-গাথা, গাঁথিতায় এই কবিতা—
দাগায়ে যেই কাজকার সাঁঝে রাজিতা
তাই যপেক্ষায় তাল রৈ ধাসছেয়ার
ধারো—পাই ঘরে পাই ডামটিয়ার
কয়-সাথা, আঁখিতায় যেই ছবিতা।
জানি, চৈত্রীলী ঠেশ্‌ ধারে ঐ এগারোর
চৈতী হাওয়ায় খেয়ে খোলামেল
দোল—বছরার শেষ মাসের দু-দিন
থাকেতায়—পাও যেয়ে শেষ ছুটিটা, তুমি—
জানি, হৈত্রীলী পেপ্‌ ভারে রৈ এগারোর
কৈতী ধাওয়ায় পেয়ে তোলামেল
তোল—তছরা হেস বাসের সু-ঋণ
ঢাকেতায়—যাও গেয়ে শেষ টুটিটা, ঝুমি।
সাঁঝী এ সময়ায় নৃত্যয়ী এই আজ
খাশেলতে যে ডুব ডুবীলী শীতলায়
ঠাশছায়া কোল্ড্‌-টা মাচ্‌ সো
হাইটেনী সুরে—তায়ে আয়েতী—ওয়া ডামটি।
মাঝী এ অময়ায় ধৃত্যয়ী যেই বাজ
রাশেলেতে যে চুবিলী শীতলায়—
ভাসছায়া কোল্ড-টা সাচ্‌ সো
টাইটেনী ঘুরে—দায়ে পায়েতী—তয়া ডামটি।
এই কথাতে যেই অর্থয়ী যথাটায়ে
পার্থিবয়ী সব তুষ কী যায় রে চলে
নাইয়েরেই না-জানার ঐ কোনো ভুবনে—
বলি তাই কী শেষ, তাই কী গ্র্যাণ্ড—দ্য এণ্ড—
রেই তথাতে সেই পথয়ী সেথাটায়ে
আর্থিবয়ী রব পুশ্‌ কী পায় রে তলে—

নাহিয়েরই না-মানার রৈ তোনো ডুবনে—
বলি আই কী শেষ, আই কী ট্রাণ্ড্ দ্য সেণ্ড্।
ব্রাউনী রঙ্গীনী তুমি, অল্পয়ীতে বর্ণ
সোনালিক, এই ডামটি, এই ভাইটা হামটির
তুমি আছো তফাতীতে বেশ অল্পটাক ঐ দূরত্বয়—
ক্রাউনী ভঙ্গীনী চুমি, কল্পয়ীতে ঝর্ণ
রোণালিক,—এই ডামটি, এই ভাইটা হামটির
তুমি যাছো রফাতীতে পেশ কল্পটাক, রৈ ঘুরত্বয়।
জাজিমী সবুজায়—শুধু সবুজী প্রান্তরার
এক বেস্টনীর ঘুরীলী ঘেরাটোপে—
রয়েছোয়া শান্তির আন্তরীনে
ঘুম তার ঝুমেলে, এই অফুরানে—
লাজিমী রবুজায় শুধু কবুজ শ্রান্তরার
এক রেস্ট্-নীড় ঘুড়িলী ডেরারোপে—
হয়েছোয়া আন্তির শান্তরীনে
চুম ধার ঘুমেলে, রেই নফুরানে।
ডামটি, কার জন্য, আর কখনায় বাজে
রে সেই ঘন্টাটা, জানে না কেউ—
যে যায়, বলি সেও নেভার দ্য
ক্লজ্—ফার্ টু আন নোউন্ কৈ রুট্—
ডামটি, আর রণ্য, তার যখনায় যাজে
রে যেই হন্ট-টা, মানে না তেউ—
যে যায়, বলি, সেও সেভার দ্য
ফ্লজ্—মার্ টু আন শোউন্ মুট্।
চারের জানুয়ারীর ঐ চৌথায়ী সাঁঝে—মা
টিমপুয়া, তৈরী যেতে পর শমন
অনুসারীকায়, —তবু তুমি ডামটি তখন
খেলছোয়া যে যত্নয়ীসের খেলাটা—আদরায়
দিয়ে ঝাঁপ আর ঝাঁপুনা, মায়েতে
আদরা নিতে যেন বাদলায়ী ছাঁদে
নাই নাই যায় সে মোমেন্টা ভোলোয়া, সে দৃশ্য—
চারের জানুয়ারীর চৌথায়ী ঝাঁঝে মা

টিমপুয়া ধৈরী তেতে তর শমন
রণুধারিকায়—তুমি ডামটি তখন
দেলছোয়া যে রত্নয়ীসের খেলাটা
সাদরায় নিয়ে কাঁপ কাঁপনা মায়েতে
জাদরাঋত সাঁতলায়ী জাঁদে
আই আই তায় যে দোলোয়া সে দৃশ্য সে ফোমেন্টা।

[১১-১-০৭
২৬-৯-১৩
বার বিষুদীতী সাঁঝেলে।]

রঙ্গিলী, রাঙ্গয়ে আছোয় আছোতেয়ে চাঙ্গেয়ে

রঙ্গিলী, রাঙ্গোয়ে আছো আছেলেতেয়ে
গাছ ঐ তল্ তার তলতলীর ঐ
শেফালীকায়—বলি তরে তায় পায়
মায়ায়ী শুধেলে ধায়, সকালাই এই পৌষে—
রঙ্গিলী, সাঙ্গোয়ে কাছো কাছেলেতেয়ে
বাছ রৈ ঢল্ ভার ঢলঢলীর কৈ
শেফালীকায়—বলি দরে আয় চায়
দায়ায়ী রুধেলে বায়, জঁকালাই যেই পৌষে।
খুশী কী বাত্ এই আঁত কাড়া এই
তাতাসায়ী এই দারুণার তরে তরীল্
এই শীতী মাতালায়—ভাবি তায়
খোলামেলী এই মর্নিঙ্ হয় কী টার্নিঙ্—
রুশী কী ধাত্ তেই ঝাঁত তাড়া তেই
পাতাসায়ী তেই আরুশার ভরে ভরীল্
তেই জীতী কাতালায়—ধাবি যায়
দোলাদেলী তেই হর্নিঙ্ তয় কী চার্নিঙ্।
জানিতায় রঙ্গিলী, এই কথাটির মধ্যে
রাণ্-ই-তায়—তাই তৈ বলে তৈ
ধরিতায় থৈ থৈ মাতাসায়ী
এই কথা—সো মেনী হয়ী টেন্‌টেটিভ্‌লি—
মানিতায় রঙ্গিলী, যেই যথাটির রধ্যে
শাণ্-ই-তায়—আই হৈ তলে হৈ
ভরিতায় ঝৈ ঝৈ ধাতাসায়ী
যেই কথা—সো রেনী রযী মেনটেটিভ্‌লি।
জানি ভেরীফাইয়ে কথাটি নয় রে নয়
ঘেরীলীক্ বাই যেন যেন ঐ কী
মুন্‌রোয়ী সুন্দরীলা মেরীলীন, —দ্য
বিউটীকী অভিনয় ছিলো—একস্ট্রায়
টু মাচ্ ফেম্-ই—
মানি কেরীহাইয়ে যথাটি তয় রে তয়

ভেরীলীক্ দাই হেল হেন রৈ কী
মুন্‌রো রুন্দরীলা মেরীলীন, দ্য
নিউডী ইকী অভিনয় ফীলো—ডেক্‌স্ট্রায়
টু সাচ্ গেম্-ই।
রঙ্গিলী, তুমি ছিলে ফার্স্ট কাজিন ঐ
ডামটির—বোনটা ছোটোয়ী—তাই
তাই দেখিতাম—দাদাটা থাকতো—
পাশ পাশ—দিয়ে তার সঙ্গয়ী তাপ—
রঙ্গিলী, তুমি ছিলে ফার্স্ট কাজিন রৈ
ডামটির—বোনটা ছোটোয়ী—আই
আই শেখিতাম—দাদাটা ডাকতো
আশ আশ, নিয়ে তার রঙ্গয়ী হাপ্।
আজ বলি এই প্রাতেলীয়ী সাত তাড়েলে
বাজ তার রাজুকায় যেন ফের এই
ফিরবারে কথা আর কথকতায়
তুমিময়ী তুমি গো, ও রঙ্গিলী—
আজ বলি যেই ত্রাতেলীয়ী কাত কাড়েলে
যাজ বার যাজুকায় হেন ঘের যেই
ঘিরবারে যথা তার যথকতায়
চুমিময়ী চুমী গো, ও রঙ্গিলী।
শিউলী তলী ঐ ভেজ্ মাটিকায় আছো
শীত ধোয়ায়ী ঐ বিছানারই
ভেজাজায়, নিয়ে নিরুপায়ীত্
এই রূপঝোরী ফুলেলার
বেশে তার পেশে—ঠাশী তাই কী—
শিউলী ঢলী জৈ সেজ পাটিকায় বাছো সেজ
রীত তোয়ায়ী রৈ ইছানারই
তেজাজায়, দিয়ে ঝিরুঝায়ীত্
যেই রূপভোরী দুলেলার
রেশে আর মেশে—ধাশী আই কী।
গান গাহি ফের ফের সোয়েটিয়ে
এই পাইতায় একটুয়া তুষ্কীল্

এক হটী সোয়াস্ত, তাই যেন
করে রে এই শীতেলায় তাপানি
নে-তাপতাপিলীকা, রঙ্গিলী।
তান বাহি ঝের ঝের কোয়েটেয়ে
রেই অহিতায় তকটুয়া উষ্ণীল্
এক কটী রোয়াস্ত, আই যেন
দরে রে এই শীতেলায় ঝাপানি
নে-হাপহাপিলীকা, রঙ্গিলী।

[১১-১-০৭
২৬-৯-১৩
বিযুদবারী সকালা।]

লীটো—দাদা ভাইটা, টিটোর

লীটো, সেই শাদায় বরণী ধরনায় শরীরী
আভ, তায় চোখেলায় আঁকা ছয়ী
মজাদারী দুই ভুরু, দেখতেয়ে যেন এক ছবি—
লীটো, এই জাদায় হরণী তরণায় ধরীরী
তাভ, মায় চোখেলায় জাঁকা জয়ী
তজাতারী দুই ভুরু, পেখতেয়ে হেন কবি।
জানি, ও লীটো, বলি দাদা ভাইটা টিটোর—
পরে যে হয় জাঁদরালাই এক মার্শাল্
রূপী ক্যাট্ কুইন্—রাজ নয়, রাণী সাহেবা—
জানি, ও লীটো, বলি দাদা তাইটা টিটোর—
ঘরে যে রয় সাঁতরালাই এক পার্শাল্
ঝুপী প্যাট্ স্যুইন্—বাজ ঝয়, রাণী বাহেবা।
বলি লীটো, দাই ফর শেক—হই আজও রে
শেক্ড়্, —যব যব তুল হয় সাথ অন্যয়া,—
পাই নো সাচ্ ঐ ম্যাচ্, আর কারুয়ে—
বলি লীটো, হাই ফর মেক্—কই আজও রে
মেক্ড়্, রব রব দুল হয় মাথ গণ্যয়া,
হাই সো টাচ্ রৈ ক্যাচ্, আর আরুরে।
বলি যদি বলি—বোলালি বোলেবালে
এই লীটো, তুমি যে তুমিরই মধ্যয়
রোল্ করো এই যেন এই তায় আজ—
বলি তদি, টলি তোলালি তোলেতালে—
এই লীটো, তুমি যে তুমিরই বধ্যয়
শোল্ দরো, সেই হেন সেই আয় আজ।
আই-ব্রডিয়ী জুরোয়া জোরধারীতে ঐ যে ঐ আঁক
ছকীলা ঐ তাক করা দুই চোখেকার ঐ
উপরি পাওনায়ী—ঐ তপরার কালো বর্ডার—
আই-প্রাউয়ী গুরোয়া ঘোরতারীতে কৈ যে কৈ
তাঁক তকীলা ঐ আঁক দরা দুই চোখেলের
রৈ ঝপরি চাওনায়ী—হৈ জঁপরায় ভালো অর্ডার।

টিটোও নাই আজ, নাই ত তুমিও থেকে
ঐ জীবনটার টুকুসী এতটায়, ঐ দিন
পনেরোর—ডজ্ করা খোলতাই এ পৃথে—
টিটোও হাই ডাজ, তাই ও তুমিও ঢেকে
তৈ সীবনটার ঢুকুসী যতটায়, কৈ বিন
গণেরোর লজ্ ধরা—তোলতাই এ কৃথে।
সেই সেই পঁচিশার এই ঐ জুলাই ঐ শনটার
নব্বই যোগ সাতে—তুমি মেলে চোখ
দৃষ্ট এই ঐ দুপুরায়—সৃষ্টিটা মিকিয়ী—
রেই রেই খচিশার রেই রৈ দুলই রৈ
রণটায় রোখকুই ভোগ যাতে চুমি ঢেলে
তৃষ্ট্ রেই রৈ টুপুরায়—কৃষ্টিটা মিকীয়ী।
আজ তাল সমানায় হয় জমতিয়ে রে
জমধারাল এই লিটোয়ী স্মৃতে রে
পুনরপি লিট্ দ্য লাইট্, রেখে মনে
বোনটা টিটো, মার্শালনী।
বাজ ভাল রমানায় রয় সমতিয়ে রে
সমভারাল রেই লিটোয়ী হ্মতে রে
বুনরপি হীট্ দ্য হাইট—দেখে শনে
বোনটা টিটো, পার্সান্‌লী।

[১১-১-০৭
২৬-৯-১৩
বুধীবারী সকালে।]

ঘোনু

বুধী বিকালায় দিন ছোটোয়ী এই
শীতেলায়,—কাটায়ে বড়ো দিনই ঐ
ফেস্টী ইন্টারন্যাশনাল্, বলি রে ঘোনু—
ক্রীস-মাস যেন আমাদেরই ক্রেস্ট্—
রুধী দিকালায় দিন কোটোয়ী যেই
ধীতেলায়, টাটায়ে দড়ো ঋণই মৈ
জেস্টী লিন্টারফ্যাশনাল, বলি রে ঘোনু
ক্রীস্-মাস্ হেন আমাদেরই প্রেস্ট।
দিন যায়, আয় মাস—ভাস যেন ভাসয়
স্থিতিয়াই স্মৃতেরে ফেলে আর দেলে
অন্য ভুবনার দন্য ডুবনার ঢালে—
এই তাই আই যে—আজ মাস কয়—
ঋণ ঝায়, দায় ধাস—ঠাশ হেন ঠাশয়
স্তিতিয়াই স্মৃতেরে দেলে বার ফেলে
তন্য রুবনার বন্য চুবনার পালে
নেই আই তাই যে—রাজহাস ময়।
ঘোনুতে ঘনায়মান জানি ঐ আসলি
নামটায় ঘোঁত নাই ত ঘোঁতন
মতন মতন শোনা আর নাই যায়
মিঁউ মিঁউই ডাকাডাক, এনি মোর—
ঘোনুতে রণায়মান মানি তৈ ধাসলি
ধামটায় ঘোঁত ঝাই ত ঘোঁতন
ততন ততন রোণা তার রাই রায়
চিঁউ চিঁউই তাকাতাক, লনি বোর্।
নাই ভুলি তাই করি বলার তদারকিয়ে
রুল্ড্ ডাউন্—এই এই এতোয়ীত্
বিন তক দিন হক—নাই নাই
তুমির তুমিটা, নাম ঐ ঘোনুয়ায়—
আই তুলি পাই ধরি চলার পদাতকিয়ে
টুল্ড্ হাউন্—নেই নেই নতোয়ীত্

বিন ছক বিন ঝক—তাই তাই
ঝুমির ঝুমিটা, চাম রৈ ঘোনুয়ায়।
হোতেয়ী সাঁঝ ঐ গরমার ঐ ঋত্ ঘোনুয়ায়—
গ্রীষ্মেয়ে, আমারই সামনায় বলি
দেখাটা দেখলাম্ আস্তয়ী তুমি
গেলে শেষ ঢলটায় ঢলে, অকস্মাৎ—
মোতেয়ী মাঝ বৈ দরমার রৈ ধৃত্
হৃস্ময়ে, আমারই সামনায়—বলি
পেখাটা পেখলাম্ যাস্তয়ী ভূমি
নেলে শেষ টল্-টায় পলে, অকস্মাৎ।
বলিতে নেই মানা, এই দুনিয়াটার
ঘোর-ঘারী এই জারিজুরির সাথ
নাই হয় ভেট্-ই প্রেসক্রাইব্টা—
যায়ে মার্জার ভাই নাই হও মার্জড্
পরে তরে বুক্স্ ঐ ডুমস্ ডে-য়ে—
দলিতে তেই হানা, সেই বুনিয়াটা
তোড়-তাড়ী যেই কাড়িকুড়ির মাথ
নাই জয় ভেট্ই ড্রেসট্রাইব্টা—
নায়ে চার্জার পাই আই চও পার্জড্
হুক্স্ নৈ হুমস্ হু-য়ে।
আছোয় মনোরাজ এই রাজু বহি ক্ষণে
তুমি ঘোনু সেই দিন সেই তিন
তারিখাই সাঁঝটারে কোরে ম্লান—
তার ম্লানিমাই ছাউ, তুমি নাও ঢলে হুটিটা—
রাছোয় মনোরাজ্ যেই তাজুরাই ঋণ
তুমি ঘোনু যেই নুন যেই জিন
ঝরিখাই সাঁঝটারে ডোরে শ্লান—
পা্র গ্লানিমাই, ঝুমি ভাল তলে টুটিটা।
বলি আজ দু হাজারীর সাতে,
প্রথমার এই প্রমিতায়ী প্রারথনায়—
তুমি যে আজ এই হিমেলী হাল
বাতাসায় আছো যে—সরোবরী সবুজে—

তলি কাজ টু যাজারীর ধাতে ভাসটা
ব্রথমার যেই রমিজায়ী আরথনায়
চুমি যে বাজ তেই ধীরেলী ভাল
ধাতাসায় কাছে যে—দরোবরী রবুজে।

[৩-১-০৭
সতেরোই পৌষ '১৩
বুধী বিকালায়।]

রীমে

রময়ী কথায় এই আর নয় সাঁঝেতেয়,
কাছকাছ যখন দশটাই রাত শুরুয়া
যাম প্রথমা—করি সাজুতে অর্ঘ্য, রীমেতে—
জময়ী যথায় যেই তার চয় ঝাঁঝেতেয়
পাছপাছ রখন ঢশঢাই মাত দুরুয়া
ছাম ব্রথমা ভরি যাজুতে অর্ঘ্য, রীমেতে।
রীমী কথা, রুমুঝুমু হইবার
তরে কুর-বারই হয় কুছু-কুছুয়ার
বাতালাই মাতালাই, মাত্ তরে মাতী—
রীমী তথা, ছুমুজুমু রইবার
ঘরে তুর–তারই রয় পুছু-পুছুয়ার
তাতালাই ধাতালাই, ধাত্ দরে ধাতী।
আজ এই রাতটা যেন বড়োই রে
নিঝুমায় নিঝঝুমাই নৈশব্দেতে
হয় বলে হইতায়া, কথা এই কইহতায়—
যাজ তই রাতটা হেন গড়োই যে
জিঝুমায় জিঝরুমাই হৈহব্দেতে
কয় ঢলে চইতায়া, যথা ঝই বইহতায়।
বাবুর বাবুকে, বলি রে হেই মিস্টার
রীমুয়া—নাই তালে ফালে নাই ছিলে
খুউব্ তকীনে দরাজাই তব্ দুর্জয়া—
কাবুর কাবুকে, ঢলি রে তেই লিস্টার
রীমুয়া—ঢাই ঢালে হালে তাই দিলে
ডুউব্ ছকীনে হরাজাই রব্ তুর্জয়া।
ফিউ ফিউ এই ফীউচারায় ফিন
ফিনান্ যব যস্যয়ে তোমার মতোটি ঐ
ফীল্ করি আজও—স্মৃতে তুমি আছো ফর্টিফায়েড—
মিঁউ মিউ যেই মীউচারায় লিন্
লিনান্ অব অস্যয়ে তোমার কতোটি কৈ
হীল্ ধরি কাজও—প্রীতে চুমি লর্টিটায়েড্।

ধৃসধায় ছিলেন বাবুর খেশেতে এই
মুন্ধীয়ী রেশেলেতে—রেশ রেশয়েতে
খাশ্ শাখ বাতীলায় হাঁশ নয়—
নয় ফাঁস—
তুষছায় ফিলেন ধাবুর পেশেতে যেই
রুন্ধীয়ী মেলেতে—ঠেশ ঠেশয়েতে
রাশ রাশ আতীলায় কাঁশ ময়, ময় বাঁশ।
তাহার যথাটিয়ে বাহার মথাটিয়ে
যাই যাই করিতায়, এই রীমে বাব
পাই যে নাই বলে কয়ে—হাউ মাচ্—
পাহার অথাটিয়ে চাহার রথাটিয়ে
নাই নাই দরিতায়, যেই রীমে বাব্
তাই যে তাই দলে ঢয়ে—নাউ সাচ্।
রীমে, মুড্ তার মুচানায়, স্ফুটতায়ী রৈ রে
ঐ ঐ ভাড়ায়ার অল্পটাক শব্দ
যদি নাই হয়, তবে কেন চিবনাই
ঐ বিস্কিট্—
রীমে, যুচ্ ভার যুচানায়, স্তুততায়ী রৈ রে
হৈ হৈ কাড়ায়ার হল্পটাক রব্দ
তদি আই জয়, রবে হেন চিবনাই
বিস্কিট।

[৩-১-০৭
সতেরোই পৌষ '১৩
বুধী সাঁঝেলে।]

রলী, রোল্ কলে ডাকি এইভাবে আজকার এতে

রলী, রোল্ কলে যেন চাহি রে তুমির
তোমারায় ডাকিতে ফের রে দিয়ে
রূপঝালতী এই মিথুয়া এ সাঁঝে
ঝমঝমালে জমাতে কথা—এই ভাল্—
রলী, হোল্ টল্-এ হেন আহি রে তুমির
তোমারায় তাকিতে ঢের রে নিয়ে
চুপপালতী এই দিথুয়া এ ঝাঁঝে
তমতমালে রমাতে কথা—রেই ঢাল্।
চুপ যাহার ন্যাচারাল্ হয় নার্শড্ হাই
শেক্-টায়—যেন ছুটিতে নাহি
চায়—ঐ ছুটিলী ভারী ঐ টেরেন্
গাড়ীয়ার মতোটি, —হোয়েও লোকাল্—
ঝুপ বাহার ক্যাচারাল কার্শড্ দাই
মেক-টায় হেন জুটিতে পাহি
তায় কৈ জুটিলী রৈ বেরেন্
জাড়ীয়ার যতোটি, জোরী তোয়েত ফোকাল্।
আছে যাছা মাখানার ঐ নামটায়
এই বলাবলির ও রলী, ও রলী—
এটা কথিকী ইনজেরীর ভাষারাই
ভাস, তব অব প্রতিভাস মোহিতায়—
বাছে তাছা চাখানার রৈ কামটায়,
যেই টলাটলির ও রলী, ও রলী—গট্-আ যথিকী
ঝিণজেরীর তাষারাই আস্,
অব রব ব্রতিহাস সোহিতায়।
দিন জাপী ঝাঁপতালী তানানায়
তানটায় কাটুয়ে ছড়-ছড় ঐ
ছড়িটার মসৃণী আনাগোনা এই
সুরে ঐ ভুরে—তাইতেয়ে মজায়ী, রলী—
ঝিণ ঝাপী ছাঁপফালী গানানায়
গানটায় পাটুয়ে হড়্-হড়্ রৈ

কড়িটার তসৃনী জানাজোনা যেই
ঘুরে তৈ তুরে আহিতেয়ে বজায়ী, রলী।
ঘরটার এই সামনায় থাকা উঁচু ঐ যে
আজ নাই এক টেবলায়, —এক পাশে
থাকতেয়া তুমি রলী—যেন ঐটাই রে
ছিলো তোমার জাজ্ করা এক সীট্—
ধরটার এই কামনায় ঢাকা অঁচ্ ঝৈ যে
পাজ্ তই তক রেবলায়, —হক ধাশে
ডাকতেয়া তুমি রলী—রেণ রৈটাই রে—
ফীলো তোমার সাজ ঘরা ছক হীট্।
উঞ্চে যাই যাহা পায় আঁতাসীনেয়ে
এই আবেশায় থেকে যে ঐ থোক্
আর তার থোকী ঝোঁখ্—বলি
রলী, আবারোয়ে তুমি হও রে তুষ্ণীম্—
যঞ্চে ধাই বাহা বায় ধাঁতাসীনেয়ে
যেই যাবেশায় ঢেকে যে কৈ ঢোক্
বার তার ঢোকী রোখ—বলি
রলী, তাবারোয়ে চুমিতে রে হুঞ্চীম্।
সবাকার ছোটোর আগেরটা যে রে
যে তুমি—নিয়েছিলে ইন দাই
জন্ময়ী লীনীয়েজ, —আজ তায়
বাজ বাজুয়ী হয়—রোলস্ দ্য রোল্—
রবাকার জোটোর জাগেরটার যে রে
যে ঝুমি দিয়েছিলে লীন্ লাই
তন্ময়ী ভীনীয়েজ্, কাজ ছায়
রাজ রাজুয়ী জয়—টোল্‌স্ দ্য টোল্।
ছোটো হইলেও ছোটো নয় রে দেখতায়—
ভাইটা বড়োয়াই সড়োয়াই এই
শ্রীমান্ স্যালী, —ঐ স্যালু—আজ
গেছে হারায়েতে না জানা কোথাও, —তাই রলী
করিলাম তাই নিবেদন—
তোটো তইলেও কোটো তয় য়ে পেখতায়—

রলী, রোল্ কলে ডাকি এইভাবে আজকার এতে
ভাইটা দড়োয়াই অড়োয়াই এই
শ্রীমান স্যালী, —হৈ স্যালু—তাজ
নেছে তাড়ায়েতে না মানা তোফা, আই রলী
জড়িলাম আই ইবেদনং।

[৮-১-০৭
২৯-৯-১৩
বার সোমের সাঁঝে।]

বুঁচু

আঁচ ডাকি যাচ এ যাচনায় পাই
পাতী-আঁতি তোমারে—ও বুঁচু, বুঁচুয়া
আজি সাতে, সাঁতারায়ে স্মৃতি-সায়র—
কাঁচ জাকি বাচ এ বাচনায় তাই
তাতী-সাঁতি তোমারে—ও বুঁচু, বুঁচুয়া
আজি মাতে, আঁতারায়ে প্রীতি-দায়র।
যদি বলি না কেন—জানি তুমি প্যাট
তুমি নাই পায়ী—কোনো স্যাট্ ফোটোয়,
ছবিয়ী পারাবারে—পরিচিতটা এক—
আই তলি না হেন—মানি ঝুমি ম্যাট্
জুমি ঝাই জায়ী—তোনো ট্যাট জোটায়া
—ছবিয়ী হারাবারে—ধরিধিচতা তক।
বার বারীন আর পরে কাড় যে নাই
কাতেয়ী তাটে—যেই যেখানে
থাকো তুমি—ঠিক বলে ঠাকুই—
পার পারীন তার তরে চাড় যে চাই
তাতেয়ী কাটে—সেই সেখানে
ডাকো ঝুমি টিক দলে টাকুই।
হাঁক নাই জাঁক নাই, শ্রীমত্যা ত্বরিত
হালে চলতোয়ায় যে খালি রে ঐ
চলি চলি—বুঁচুয়াই চরৈবেতি
ছাঁক পাই সাঁক টাই, শ্রীতত্যা স্বরিত্
ভালে দলতোয়ায় যে রৈ যে তালি রে
বলি বলি—বুঁচুয়াই ধরৈধেতি।
ইয্, যদি পারাপারে ঐ নদীটায়
ঐ ইছামতীর ইছায়ী জবাবায়, কী
তবে কী চর্চায়—নাচিরায়—মনোবাস—
শিষ্য তদি ধারাধারে রৈ নদীটার
রৈ ইছাবতীর ঋছায়ী রবাবায়, কী
হবে কী অর্চায়—যাচিরায়—মনোহাস।

বুঁচু মিলে মিল্‌লোয়া যে রে আপনারই
কেট্‌-ই ঐ এটিকেটায়—পট্‌ যে লেখা
পটেতেয়ে তাবিল করা—এক না ছবি—
বুঁচু দিলে দিল্‌লোয়া তেরে জাপনারই
লেট্‌-ই চৈ লেট্‌-ই-কেটায়—গট্‌ যে
লেখা গট্‌-এ-দেয়ে—জাবিল ভরা
এক আ-ছবি।
সাঁঝে এই শীতেলী আধারায় জড়ো
হয়—দরো-দরো এ দরাজীয়া মন—
ক্ষণিকায় ক্ষণে ক্ষণে—নহে অর ক্ষ্যান্ত—
সাঁঝে যেই ঋধেলী পাধারায় গড়ো
ময়—ধরো ধরো এ গরাজীয়া মন—
ঝণিঝায় ঝণে ঝণে তর অহে শান্ত।
বাঁচি বলে আশায়ী মতুনা এই এক
আশাবরীর ভাস নয়—এ খাশ জয়ী
ক্ষণেকেয়ে—সাঁঝেরই ঝাঁঝালী লী
যে বুঁচুয়া—তুমি এই নাউ—
আঁচি ঢলে রাশায়ী রতুনাই যেই চক
রাশাঝরীর আস হয়, ও ধাশ চয়ী
ভণেকেয়ে ঝাঁঝেরই সাঁঝালী লী
যে বুঁচুয়া—চুমি রেই দাউ।

[৭-১-০৭
২১-৯-১৩
রুবীলী রবি-বারী সাঁঝেতে।]

টনি, হানি-ময়ী দুষ্টুটা

বারোতে নয় ঝয়ী এ তাল লাফেলায়ীতে
কথায়ী তথ্ তস্যয়ে—কাহন হয়
নায়েতে না-নয়—নয় ইচ্ছায়ায়, —হয়
অভাবীতে সময়ী নাই যে দিতায়ে, টনিতে—
আরোতে তয় ছয়ী হাল পাফেলায়ীতে
যথায়ী কথ্ হস্যয়ে—আহন নয়
পায়েতে আ-য় ময়-ময় দিচ্ছায়ায়,—রয়
রভাবীতে অময়ী তাই নিতায়ে, টনিতে।
এই নয় ঠেলালী সব আজ ধরায়ে
নাহ দৃত্ পাহ প্রীত্—এই এই তাই বলি
টনি, টনতি—এমনায় সহিতায়,
নো হোজ্ ঐ পারাটার ঐ পেছনায়—
এই তয় দোলালী যব কাজ ভরায়ে
আহ তৃত যাহ শ্রীত্—যেই যেই আই চলি
টনি, টনতি—অমনায় কহিতায়,
নো শোজ্—নৈ পারাটার নৈ তেছনায়।
যাই বলে হয় না যেমনটিয়ে কোনো
কালে নাই যাওয়াটা—ঠিক তবু এ
থাকীটা রয় ঘর ঐ না হইয়ার
দড়চায়ী আর্জে, —হই পরে আইডেল্—
তাই তলে তয় তা তেমনটায় দোনো
তালে তাই নাওয়াটা—ঝিক রবু এ
ঝাকীটা জয় ধর নৈ তা কইয়ার—
কড়চায়ী বার্জে, —নই দরে হাইডেল্—
শাদাটায় রণিতায় সুশ্রীলী শ্রান্তান
নয় নয় অবশ্যায় ছিলো দ্যাট্—
ন্যাচারায় হট-লি—সো সো নটী,—
বাই দায়া, তুমি টনিয়া, তাই তাই রে
হৈ ঐ তাইটা—
আদাটায় ঝণিতায় ঝুশ্রীলী ক্রান্তান

দয় দয় রবশ্যায় মিলো ট্যাট্—
ক্যাচারায় টট্-লি সো সো গটা,
হাই তায়া, তুমি টনিয়া বাই বাই রে
রৈ বাইটা।
হোয়াইটী ঐ ওয়াসী চেহারালে তুমি টনি
টানতায় সকলারে করাতে আইইঙ্-টা
তোমাতে, ধারবারে পারতার মর্তায়
একটা আঁক-তাকি তিলক, চোখ পরি—
কোয়াইটী রৈ কোয়াশী নেহারালে তুমি টনি
জানতায় রকলারে দরাতে হাইইঙ্-টা
তোমাতে, আরবারে কারতার শর্তায়
একটা জাঁক ডাকি তিলক রোখ ভরি।
শতালী ওয়ে-য়ীত ধরায়ে করি বলে
করিতয়ী এই যে এথা, তব পরবর্তী
কতটা হোতোয়া ঐ অন্য তথা বার
তার বারিলে—খটমট হৈ হচ্‌মচি—
রতালী স্যোয়েয়ীত্ ডরায়ে বরি ডলে
দরিতায় যেই যে যথা—অব্
ধরধর্তী মতটা জোতোয়া বৈ
অন্য অথা পার তার পারিলে—
গট্‌কট্ জৈ খচ্‌জচি।
হয় হোক না ঝোঁক সামালেয়ে যেই
সামলানা কথা নাই ভোলে-ই-ভালেলে,
বলি টনি—জয় জাঁকিলায় ফের আয়
তুমিতেয়ী নটীনেসী গেট্-টা—আয়া, ইন্—
তয় থোক না ছোঁক ঝামালেয়ে রেই
ঝামালানা যথা তাই ঢোলে-ই-ঢালেলে—
বলি টনি,—সয় সাঁকিলায় ঘের তায়
চুমিতেয়ী হটীফেসী পেট্-টা—দায়া সীন্।
লিখতায় বিকালায় চলতয়ী এ কলমা—
থামেলে হয় থিতু যেই হয় শেডিঙ্‌টা
লোড্-এ, নিবুই যায় আলো, ঝায়

তাৎপর্য্যে সাজালী সাঁঝ হয়—নৃত্যে
নটী-সদৃশায়, হেই টনি, —যায় যায়
ছাপায়ে শীতেলী আজকার
এই ওয়ারটা—সো কোল্ডী—
দিখতায় ঝিতালায় তলতয়ী এ চলমা—
হামেলে হয় হিতু—রেই জয় ফেডিঙটা
নোড্-এ, —দিবুই ঝায় ভালো, ছায়
আৎতর্য্যে বাজালী ঝাঁঝ বয়
হৃত্যে কটী-যদৃকায়, তেই টনি—
ধায় ধায় দাপায়ে শীতেলী
যাজধার—রেই হোয়ারটা—
সো হোল্ডী।

[১৬-১-০৭
দুই-দশ-তেরো
বার মঙ্গলীর বিকালায়।]

টুক্ কথালীতে হও যে টুকীটাকীল ভালো লাগাটিয়ী, ও টিপসী

ভরা হিত্ ঝরী টুক্ করা কথালীতে হও
যে টুকীটাকীল্ ভালো লাগাটিয়ী
ও টিপসী—ঝরে যেন ঝরী-ঝরীল
খুশ-খাতী প্লেজারাসী বন্দয়ী—এ বাদ্য—
ধরা দীত্ জড়ী স্যুক্ ভরা যথালীতে রও
যে স্যুক্-স্যাকিল্ আলো জাগাটিয়ী
ও টিপসী—ঘরে যেন ঘরী ঘরীল
হুঁশ-মাতী প্লেজারাসী চন্দয়ী—এ আদ্য।
টিপ্‌টিপুলী ভাবটার ভাড়ারায় যাই
রচিতায় পাই যাচ তক্ যাচয়ে—
যেই কোন্ আর্জ—এই লেখেলায়
কী তবে বলি, লেখন খোঁজতায়ে—
জিঁপজুঁপিলী ধাবটার আড়াড়ায় তাই
যচিতায় ধাই আচ ছক আচয়ে
রেই রোণ চার্জ—যেই শোখেলায়
কী রবে রোল্-ই, সেখানে গোঁজঝায়ে।
টিপসী তাপসায় মাতেলায় দারুণীয়
তুমিরই মাতৃত্বয় যে অনাবিল—
অরুণিমাময়ী ছিলে, —চুণী আত্মজায়—
ছিলেও তায় দামুয়া, ছিলে জনিতে, টনিতে—
টিপসী দাপসায় ধাতেলায় আরুণীয়
তুমিরই ধাতৃত্বয় যে রণাদীল—
তরুণিমাজয়ী হিলে, —চুণী আত্মজায়—
আরে হিলেলে আ দামুয়ায়, মিলে জনিতে টনিতে।
দুপুরার পর আসতীত্ এই আশাবরীল্
গড়ানোয়ী এ বিকেলায়—ভরালীত্
শীতি ঝামরাল্—খুউব নয় এই যে
আতারালী রুউব—এই যে এই এখনায়—

টুপুরার বর ভাসমীত্ যেই ঠাশাতরীল্
দড়ানোয়ী এ বিকেলায় পরালীত্
শীতী কামড়াল্ চুউব রয় রেই যে
তাতারালী হুউব যেই যে যেই রখনায়।
টিপসী, ছিলে যে সাজুয়ীতে নিয়ে সাজ
রাজুয়ীত্ মায়েরই, যেন যেন কবিবর
ভণিতায়ী পোয়েজীজ এক নর্মী
নর্মালী জিঁক-জাঁক, টিপ্ টপ্ মাদার—
টিপসী, মিলে যে কাজুয়ীতে দিয়ে কাজ
যাজুয়ীত্ মায়েরই, রেণ রেণ কবিধর
ধ্বনিতায়ী সোয়েজীজ ছক বর্ণী
বর্ণালী ঠিক-ঠাক, হিপ্-হপ্ মাদার।
আজ এই দিন পর ছাড়োয়ে দিন বেশী
একটা—ভাবি যাই না পাহিতায়েতে
ভাবুলায় রাখি ঘিরে তার ঘেরে—
তাই যে অনারেতে করে হাট, —টিপসীতে—
কাজ চই ঋণ তর তাড়োয়ে ঋণ রেশী
ছকটা—ধাবি আই আ গাহিতায়েতে
কাবুলায় শাখি মীড়ে কার জেড়ে
গাই যে ডানারেতে বরে চান্ট,—এ টিপসীতে।
পক্ষেয়ায় নাহি ধারিলায় ও ধারিতব্য
এই কজ্ ভরা ধারালায়, তবুয়ায়
বলি কাবুয়ায় টিপসীয়ী কথাটা
জারি-জুরিলী কারু ভরাট্ এ কৃতেলে—
অক্ষেয়ায় তাহি পারিলায় ও পারিতব্য
তেই ডজ্ ধরা তাড়ালায়, হবুয়ায়
ঢলি রবুয়ায়—টিপসীর কথাটা
ঝরি-ঝুরিলী চারু দরাট্ এ হৃতেলে।
হ্যাড্ নয় চৈবেয়ে নৈবনী, বলি
মায়ী সাতালাই ঐ মাতৃত্বেরই
ভরা এই ঘরা-ঘরা প্রীতলাই
শ্রীতলাই ঘেরেলায় থাকা তুমি

টিপসী, হোলে পুরোপুরি—আন ক্যমন—
স্যাড্ নয়, রৈবেয়ে দৈবনী, বলি
জারী আতালাই রৈ মাতৃত্বেরই
ঘরা যেই ভরা ভরা হৃতীলাই
বৃতীলাই ফেরালায় ডাকা—
ঝুমি টিপসী, দোলে ঘুরোঘুরি রণ্-শণন্।

[২৬-১-০৭
১২-১০-১৩
শুক্কুরী বিকেলায়।]

ইতি, নয় বয়ী রে দ্য এণ্ড—ঐ তোমারি কথানে

ভারী তুষীয়ে এই পৌষী মাতালীক্ এই
মাচ্ ভেরী ঠাণ্ডায়, —বলি, ইতি
নয় নয়ী রে দ্য এণ্ড—ঐ তোমারি কথানে—
জারী পুষীয়ে রেই হৌশী ধাতালীক তেই
টাচ্ মেরী চাণ্ডায়, —বলি, ইতি,
ময় ময়ী রে দ্য টেণ্ড—রৈ তোমারি মথানে।
হাই নয়, তবুও এই দাই তরে দায়ীত্বেয়ে
পাই ফিরে হীরাদিল্ এই একটায়
কষি ছক্ হাউ—তুমি নাউ হোয়ারান—
বয়ী, কবুও যেই লাই দরে আয়ীত্বেয়ে
ধাই ধীরে হীরামিল্ যেই হকটায়
ঝষি তক্ বাউ—চুমি দাউ স্যোয়ারন্।
আজি এই পাওরী পারা কিছুর এই
ঝিলিক ঝিলিক রোদ্দুরার রাখো
জাঁক নয়, ছাঁকা যায় যায়, তুষ্টে—
কাজি তই তাওরী আরা ইছুর যেই
ফিলিক ফিলিক রোদ্দুরার দ্যাখো
ঝাঁক ময়, পাঁক খায় খায়, হুষ্টে।
ইতি, দাই নেম্ আজকার রচিতায়
এই দোলালী ধারার চপলীত্
ছাঁদেলে—জানায় সুধাভার ভালোবাস—
ইতি, দাই ফেম্ কাজকার যচিতায়
যেই বোলালী পারার তপলীত্
জাঁদেলে—শাণায় সুধারার আলোবাস্।
যাজী রই তাজী নয় নট্ এ ইভেনে
দলী কী তলী ফুল্ তক্ ইভেন্টস্
পাতপাতী তোমাতে, টু ফীল্ মোর্—
বাজী জই রাজী ময় মট্ এ লিভেনে
চলী ই ফলী রুল ঝক্ লিভেন্টস্
ধাতধাতী তোমাতে, টু রীল্ লোর্।

দিদিটা ত তুমি রে ইতি ও ইতিয়া,
টাইপী দিদিগিরিয়ায়, রাখতেয়ে
চোখেরই পাহারায়, গুড্ডী ভাইটিকে—
হু-দিটা ত ঝুমি রে ইতি ই ইতিয়া,
রাইপী হুদিঝিড়িয়ায় মাখতেয়ে
রোখেরই চাহারায়, গুড্ডী ভাইটিকে।
নাই তুমির সাথ বাঁধুনি ধরাতায়
ঐ যে ঐ গতয়ী মাস মার্চে
ভাই গুড্ডীও নেয়—মার্চ পাস্ট্টা—
নাই তুমির আথ আঁধুনি জড়াতায়
কৈ যে কৈ রতয়ী ধাস্ বার্চে
ভাই গুড্ডীও দেয় বার্চ কাস্ট্-টা।
আই মাসী, তাই ইতি বারেক তরে
থেকে রবির ছবিয়ী সরোবরা—
একটু রে তাকায়ে দেখবা না
ভাইপোটা—এই টফী শ্রীমানেরে—
তাই মাসী, আই ইতি ধারেক ভরে
ডেকে ছবির রবিয়ী ধরোবরা—
জঁকটু রে ডাকায়ে রাখবা না
ভাইপোটা—এই টফী শ্রীমানেরে।
এই এই লিখছি যব এই হবি
ভরা কথা—ইতি, ঘুরোলোয়া ঘরের
চারোধার—আদরী টফী, শ্রীমান—
রেই রেই লিখছি রব যেই ছবি
ধরা কথা—ইতি, ধুরলোয়া ঘরের
আরো আর, সাদরী টফী ধীমান।

নোতন, বলি সংক্ষেপে ইন্ বাট্ নোনু, নোনুয়া
ভাইটা ঘোঁতন আর নায় কোরলোয়া ঐ
ঘোঁতয়ী আওয়াজ, ঐ তিনে ঠিকঠাকে—
নায়ী হয় বশ, হবে কালবায় পাইলায় নোতনাকে—
তাইটা দোঁতন বার চায়. বোরলোয়া তৈ
দ্যোতয়ী কাওয়াজ, কৈ জিনে দিকদাকে।
তায়ী ঝয় পশ্, তবে চালতায়, চাইলাম নোতনাকে।
ঘর মধ্যয় নিতো তার আরামঝোরীল এক
কায়দায়ী রেস্ট-টা, আরুরায় ঐ বই
আলমারার, কাঁচ নাই ঐ ফোঁকরাই তাকে—
ধর তধ্যয় ইতো বার দারামদোরীল বুক
চায়হায়ী বেস্ট-টা, তারুরায় ছৈ বাই
আলমারার, কাঁচ নাই জোঁকড়াই চাকে।
টুপ্ তার তাপী ক্ষণটায়, ভাসতায় রে নোনু—
হাসিলী এক খুশীতে পাশলাই
পেশটায় আবেশীত ভরা শুধু আবেশায়—
ঝুপ বার ঝাপী মনটায়, ঠাশতোয়া রৈ
নোনু-ধাশিলী এক যুশীতে ঠাশিলাই।
খেশটায় তাবেশীত ধরা শুধু তাবেশায়।
পায়রায়ী ঐ কবুতরার নাম ধরতায় যে
নাচ নাচতি এরা ঘুরে পর ঘেরেতে
নোতন নোতন পায়রাগুলো, তা চেনো কী নোনু—
তায়রায়ী রৈরুতরার ধাম ভরতায় রে
টাচ্ টচী বার সুরে ভর বেড়েতে—
কোতন কোতন সায়রাগুলো জেনো ই নোনু।
বিলাসীত যই ভাবঘোরী এ আমারই তরে
রাখা ঘরটায় তবু যে তবুয়াই নাই রে
নায় পেলাম নোতনরে, নব নব চিতে—
ঋলাশীত ঝই তাবতোরী এ ঝামারই ভরে
মাখা পরটায় কাবু যে কাবুয়াই নাই রে
তার খেলায় নোতন রে, রব রব হিতে।

হিতলীন এই দিতয়ার ভাব আর ধাব
চলি চলি আয়ী চলিতায় এই এই আয়ো—
জকী যাচ্ তার যাচনে—এসো তব্ নোনু—
মিতলীন যেই ঋতরায় কাব ভার দাব
চলি ঢলি চায়ী বলিতায় যেই যেই যায়ো।
ছকী আঁচ তার আঁচনে—বেসো অব নোনু।
আর কী এই শীতেরি এই কলি যাওয়া
বিকেলার এ বেলী অবসান কালে
তান আর ঝাণ ধরি, নোতন তরে রে—
বার কী বই শীতেরী এই চলি ধাওয়া
নিকেলার এ ফেলী যবসান ঢালে।
গান আর আন ভরি, নোতন দরে রে
রীচ্ করি এই লিস্ট্ সময়ার জময়ী
তালে ময়ূবীর মতোতি ভাবেলীন
তুলে পেখমটা, ও তোমারে, বন্দি নোতন—
শান তার ঝান জড়ি
নোতন তরে রে
পীচ্ ঘরি যেই ইস্ট রময়ার তময়ী
আলো রয়ূরীর রতোটি ডাকেলীন
দুলে দেখমটা, ও তোমারে সন্ধি নোতন।

[৯-১-০৭
তেইস-নয়-তেরো
মঙ্গলী বিকেলে।]

দামু

রাত-ভোর অবশায় ঢালে ঢলে পরে
ঘুমাতোয়া দামু, দামুই, কিন্তু
দিন-তোর বাজাতো তান বুঝি
তোড়ী, তোড়েলে—ট্রীম্ আর ট্রীস্—
কাত ঘোর রবশায় ধালে ধল দরে
ঝুমাতোয়া—দামু, দামুই, কিন্তু
ঝিণ-দোড় বাজাতো—আন তুঝি
কোড়ী, কোড়েলে শ্রীম বার শ্রীস্।
এ ডাক নয় তয়েতায় যেন কী তেন—
এ যে এ ছিলো বোঝতায় চায়েলে
বোঝানটা পেয়েছে বার তার এই
বার—খিদেটার ভরা এই জিদ্—
এ ডাক হয় কয়েতায় হেন কী যেন
এ যে এ নিলো সোঝতায় তায়েলে
সোঝানটা ধেয়েছে আর বার এই
আর—খিদেটা ধরা য়েই খাদ্।

[১৯-১-০৭
পাঁচ-দশ-তেরো
শুক্কুরী বিকেল।]

মিলন ত্রিযামা

নবাগতা প্রাবন্ধিকা—শুচিস্মিতা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আমার আদরণীয়াকে।

রঙীন হাসির ঝরনায়—নিজের প্রাণের সব রকম সুন্দর সুখকে ভাসিয়ে দিতে—যে কোন প্রেমিকা মেয়েই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে—এমনি একটি রাতের—প্রথম যামে। মধুমাসের জ্যোৎস্নার সাগরে ডুব দিয়ে—অন্য একজন প্রেমিক সুজনের খুশীর ফোয়ারা থেকে—হাজার রকমের আনন্দ আবেশ কেড়ে নিতে অনেকেই হয়ে ওঠে—আহ্লাদিনী। আর সঞ্চারিণী। ঠিক ঝরনা, সুন্দরী ঝরনার মতনই তারা তখন—তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণা হয়। কে না জানে এমন একটা মোহ জড়ান, সেই সঙ্গে মায়া মেশান, আর সুষমা ছড়ান মধুরিম রাত—জীবনে একটিবারই আসে। সে রাতের প্রত্যেকটি যাম যে—প্রাণকে নানান রঙে রঙীন কোরে তোলে। প্রতি পলকে পলকে এক প্রাণ আর এক প্রাণের মুখেতে—সুধার পেয়ালা তুলে ধরে। মুখে মুখ রেখে—সুধা খাইয়ে দিতে দিতে—মদির বিহ্বলতায় ভাসে। ভরা তৃষ্ণায় প্রাণকে হিল্লোলিত কোরে—সুখের তরঙ্গ-দোলা ফুটিয়ে তোলে। সুখের সে তরঙ্গ-দোলায় দুলতে দুলতে যে কোন মেয়েই চিরন্তনী প্রিয়ার ছন্দখানা পেয়ে—অন্য জনের প্রাণ ছাপিয়ে নেচে যায়। রঙের পরশ আর মনের পরশ—এই দুইয়ে এক হ'য়ে মিলে গিয়ে—নিত্য-নতুন আনন্দ-নাচের রিম্ ঝিম্ করা রিদম্ সৃষ্টি করে।—প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যেন বীটোভেনের অমর সুরের মূর্ছনা জেগে ওঠে। নেচে যায় রিমঝিম কোরে।

রাধাকে দেখলে কিন্তু এ কথার ভেতরে এখন কোন রকম মিতাক্ষরের ছন্দখানাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে যেন চিরা-চরিত প্রেমিকা মেয়েদের থেকে একটি ব্যতিক্রম। মিলনের মধুরাত হাতের মধ্যে পেয়েও—সে ব্যাপারে রাধা যেন বড় বিবাগিনী। একটা কি যেন অজানা ব্যাপার তাকে ঘিরে ঘিরে চলেছে। সে ব্যাপারটুকু এখনই প্রকাশ পেতে চায়।—কিন্তু প্রকাশ হ'তে চেয়েও হ'তে পারছে না। রাধার চব্বিশ বছরের পরিপূর্ণ নিটোল যৌবনের দীপ্তিলতার দরজায় এসে তা বাধা পড়ছে। তার রূপ-সুষমার ঘোমটার অন্তারালে তা লুকিয়ে রয়েছে। রাধার মিলন রাতের জন্য—আপন অঙ্গ-সজ্জার লাল সাজের আবরণের ভেতরে সে ব্যাপার অন্তরালবর্তী। তবু,—তবু যেন সে প্রেমের একটা মৃদু ছন্দের মূর্ছনা জাগছে তার চোখের মধ্যে। রাধার সে চোখেতে কিসের—সত্যি কিসের যেন একটা ছবি দেখা দিচ্ছে—সে কি রাঙা বেনারসীর ঝিলিমিলিতে নেচে ওঠা—চব্বিশ থেকে এই মুহূর্তে অষ্টাদশীতে রূপান্তরিতা নববধূর—প্রথম প্রেমরাগের আরক্তিম লজ্জায় জড়ানো রাধার ছবি ?—সত্যি বধূ রাধার,—না, অন্য কিছুর ? কোনটা ?

—হঠাৎ রাধার মধুময় বধূবেশের লজ্জা মাখানো যুবতী দেহখানা যেন কঁকিয়ে কেঁদে উঠলো—সাদা ভেলভেটের মোলায়েম চাদরে ঢাকা বিছানার ওপরে। পা গুটানো অবস্থায় বসে থেকে—হাঁটুর মধ্যে মুখখানা চেপে ঢেকে রেখে—রাধা তার চব্বিশ বছরের চব্বিশটা বসন্তকে—ভয়ানক করুণভাবে কাঁদিয়ে তুললো। কান্নার দোলায় রাধার নিটোল শরীরের সুন্দরী যৌবন—দুলে দুলে, ফুলে উঠতে লাগলো।

সে সময়ে আনন্দরূপ বিছানা ছেড়ে—সেখান থেকে একটু তফাতে বসে ছিল একখানা সোফার ওপরেতে—আধ শোয়া অবস্থায়। তারও মন এখন এক অজানা ব্যথায় মোচড় খাচ্ছে।—সত্যি সে এমন কি দোষ ক'রেছে—যার জন্যে এই একটুখানি আগে—রাধা তার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান ক'রল ?—আনন্দরূপের কাছ থেকে রাধা—একটা শুধু সামান্য আদরের পরশও নিতে চাইল না।

আনন্দরূপের পঁচিশ বছরের প্রাণও তাই কেঁদে উঠলো রাধার এমন ব্যবহারে।—যে বিশেষ, রাতের প্রতিটি যাম সাক্ষী থেকে—তাদের দুটি জীবনের গ্রন্থিকে দৃঢ়তম বাঁধনের মধ্যে বাঁধতে এলো—ঠিক তখনি ঘটলো এমন এক অপ্রীতিকর জিনিস ! সোফায় বসে বসে—আকুল-পাথারি ভাবে ছাই-পাশ ভাবতে ভাবতে চলল তার মন। অত সব ভেবেও এর কূল-কিনারার কোন হদিস মিলল না। শেষে নিজের মন যখন প্রায় কান্নার সামিল হ'য়ে উঠলো,—তখনি আনন্দরূপ শুনতে পেল—রূপবতী রাধার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ।

কান্নার হঠাৎ পাওয়া চমক তখন ভেঙে গেল আনন্দরূপের ভেতর থেকে। সোফা ছেড়ে খাটের কাছে এগিয়ে দাঁড়ালো। আর তখনি বিছানার ওপরে বসে পড়ে—মুহূর্তের ভেতরে আনন্দরূপ দু হাত দিয়ে রাধাকে এক রকম জোর করেই কঠিন আলিঙ্গনেতে ধরে রেখে—নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আটকালো। একটু আশ্চর্য্য হলো। এবার ত রাধা কোনো রকম ভাবে বাধা দিতে চাইল না তাকে। বরং তার প্রিয়তম মানুষটির বুকেতে আশ্রয় পেয়ে—সেই আশ্রয়টুকু যাতে হাত ছাড়া হয়ে না যায়—তারই জন্য চেষ্টা ক'রতে লাগল সে। প্রেমের আবেশে ভরা চোখ দিয়ে তাই দেখে দেখে আনন্দরূপের মনে হলো—বয়সে চব্বিশ বছরের হ'লেও অষ্টাদশীর মতন দেখতে রাধা—যেন একটি ছোট্ট শিশুতে রূপান্তরিত হ'য়ে উঠেছে। শুধু একটি ছোট্ট শিশু ! তা ছাড়া আর কি !—মনে হলো আরো কিছু।—এই মুহূর্তে রাধা যেন অনেক বেশী অসহায়া হ'য়ে পড়েছে। অনেক আগে থেকেই সে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এখন আনন্দরূপের বুকের মধ্যে সে তার খুঁজে খুঁজে বেড়ানো—সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয়টুকু পেয়েছে। তবু,—তবুও যেন মনে হচ্ছে—এখনও সে সম্পূর্ণ নিরাপদ হ'তে পারেনি। কি যেন একটা অব্যক্ত ব্যথার কথা রাধার সমস্ত যৌবন-দেহের ভেতরে—গুমরে গুমরে মরছে। প্রকাশ পেতে চায় অচিরেই। তবু

প্রকাশিত হ'তে চেয়েও—হ'তে পারছে না। সেই হ'তে পারছে না বলেই—এখনও তার তনুরাগের ভেতরে করুণ কান্নার মৃদু কম্পন-রেখা জেগে জেগে উঠছে। তার সুছাঁদের অপরূপ দেহবল্লীরর মদালসা রূপ এলোমেলো হোয়ে পড়ছে। তার পুলক জাগানো বুকের যৌবন রঙ্‌টি—জ্বল জ্বল অবস্থায় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের ভারে—ফুলে ফুলে দুলে চলেছে। নিজের হাতের কঠিন বাঁধনের মধ্যে থাকায়—তা স্পষ্ট অনুভব ক'রতে পারছে আনন্দরূপ। অবশ্য এইমাত্র রাধার স্নিগ্ধা রূপের ভেতর থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শেষ আবেগটুকু থেমে গেছে। বিছানার ওপরে পা দুটো লম্বা ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে—রাধা এখন আনন্দরূপের বুকের ওপরে তার রেশম জামার তুল্‌তুলে ভাবের মধ্যে নিজের মুখখানা লুকিয়ে রেখে—আদুরে মেয়ের মতো ঘষতে লাগল। একটু পরেই আবার ছড়ানো পা দুটোকে টেনে এনে গুটিয়ে রাখলো। আনন্দরূপের আরামে ভরা—আবেশে বিহ্বল কোরে তোলা বুকেরই কঠিন বাঁধনে থাকা আলিঙ্গনের মধ্যে—সে শিশু হ'য়েই রইলো। বড় নিশ্চুপ তার এখনকার ভাবের অভিব্যক্তি, কোন রকমে ভালবাসার লাজ লাগানো ও ফোটানো দু'একটি মিষ্টি কথার কাকলি শোনাবার মতো—শক্তিটুকুও যেন নববধূ রাধার ভেতরে বিন্দুমাত্র নেই।

আনন্দরূপ এবার তার প্রিয়া রাধাকে আদরের ভেতরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা কোরল। তবু কোন রকমে একটি কি দুটি মাত্র কথা বলে শোনাবার জন্য আপন প্রিয়ার রূপ ঝলসানো যুবতী দেহের কোথাও—অনুভূতিময় সূক্ষ্ম কম্পনের রেখাটুকুকেও জাগতে দেখা গেল না। মুখ তার নির্বাক। তাই দেখে দেখে—বধূর রঙীন তনুশোভার সুন্দর সুন্দর ছবির মতন চোখে-মুখে-বুকে-পিঠে, আর ঘন তমসাবৃত অলকের গুচ্ছে গুচ্ছে—আনন্দরূপে নিজের আবেশে ভরা আদর মাখানো হাত বুলালো প্রথমে। শেষে দু'হাতের মুঠোর মধ্যে রাধার মধুক্ষরা মুখখানা নিয়ে—নিজের রূপ-পিয়াসী চোখের সামনে তুলে ধরলো। যুবতী প্রিয়ার চব্বিশ বছরের চব্বিশটা বসন্তে ভরা আরক্তিম মুখের দীপ্তির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে অসম্ভব রকম সরলতায় পরিপূর্ণ—শিশুরই স্বর্গীয় সুধামাখা মুখখানা। সে শিশু মুখের দিকে তাকালে পর—চোখ জুড়িয়ে আসে আপনা থেকেই। পরিপূর্ণা প্রেমরাগে রঞ্জিতা—নিটোল। যৌবনের ভারে লাজুকা রাধার ঠোঁটের প্রগাঢ় রঙের লাল আভার মায়াবেশ—আর সিঁথির টকটকে লাল রঙের জ্বলজ্বলে কিরণ ছড়ানো পবিত্রতা—দুইয়ে মিলে চোখ জুড়িয়ে দিল আনন্দরূপের। প্রিয়াবধূর চোখ থেকে অপরূপ আলোর পরশ ছড়িয়ে পড়ছে ভেজা ভেজা অবস্থায়। সে আলোকের ভেতরে যেন একটা বিশেষ অভিব্যক্তির পরিচয় আছে। আনন্দরূপ তার কিছুই ধরতে পারলো না। একটি যুবতী মেয়ের এ সময়কার মনের ভেতরে যদি সে ঢুকে পড়তে পারতো মোকাবিলায়—তা হোলে বুঝতে পারতো রাধার চোখের ঐ আলোর পরশটুকু কিসের। আর

রহস্যটুকুই বা কী ? সে অত সব ভাবতে চাইলো না। কোন সন্ধান ক'রল না সে রহস্যের উন্মোচনে। আর শুধু শুধু সময় নষ্ট ক'রতে ভাল লাগছে না তার। এটা হলো তার আর রাধার বিবাহিত জীবনের পরিপূর্ণ যুগল রূপের ভেতর থেকে—এক সাথে শয্যা গ্রহণের—প্রথম মিলন রাত। অবশ্য আনন্দরূপ যদি এ নিয়ে অন্তত একটিবার ভেবে দেখতো ; আর যদি একবার নিজের প্রিয়া সুজনার সম্বন্ধে মনোবিশ্লেষণ কোরত—তা হোলে নিশ্চয়ই সে ধরতে পারতো আসল জিনিসকে।—রাধার টানা টানা চোখের মধ্যে যে ছবি ফুটে উঠেছে—তা কি সত্যি নববধূর পরিপূর্ণ যৌবনের ভারে জড়ো-সড়ো থাকা—শুধু একখানা লজ্জারুণ ছবি ? না, অন্য কিছুর ব্যঞ্জনা আছে সে ছবির মধ্যে ? এর কোনটা সত্যি ?

অত কিছু এখন ভাববার সময় নেই আনন্দরূপের। সুন্দরী যৌবনে অনন্যা রাধার যৌবনের বিচিত্র রঙে ও রূপে অভিষিক্ত দেহরাগের—অপূর্ব ছন্দকে চোখের অপলক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। তাই দেখে তার নিজের হাসি মাখানো ঠোঁটের ফাঁকে—এক সুন্দর কামনার ছবি ফুটে উঠলো। সে মধুর ছবির অভিব্যক্তি চঞ্চল হয়ে ছুটে চলল—তার পরিপূর্ণতা খুঁজতে। আর তা—খোঁজবারও কোন প্রয়োজন নেই। সুস্মিত আনন্দরূপের হাসিভরা মুখেরই ঠোঁটের ফাঁকে দেখা দেওয়া মিষ্টি কামনার ছবিটুকুর পরিপূর্ণ হয়ে রূপ পাওয়ার আধার—তার আপন পিয়াসী মুখের সামনে—নিজেরই দু'হাতের শক্ত মুঠোর মধ্যে ধরা আছে। অপলকে চোখের চাহনি নিয়ে দেখতে দেখতে মুহূর্তের মধ্যে তার কামনাযুক্ত মিষ্টি মাখানো অধর—সামনেয় হেলে লুটিয়ে পড়ল রাধার রূপানুরঞ্জিত ঢল্‌ঢলে মুখের—লাল ঠোঁটে। মিষ্টি মধুর পরশ খাইয়ে চলল—আনন্দরূপ—তারই প্রিয়া বধূর মুখের ঢল্‌ঢলানি রূপের—এখানে-সেখানে। একবার যুবতী সুজনার জলেতে ভেজা কাজল চোখেতে।—আর একবার তার টোল খেয়ে গড়িয়ে পড়া গালের গোলাপী কোমলতায়। আবার একবার তা অগ্নি-উজ্জ্বল রাখা টক্‌টকে অধরে নিজের পিপাসিত মুখ থেকে শতধারার উপছে পড়া—সুন্দর কামনা জড়ানো মিষ্টি ঠোঁটের পরশটিকে—ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে নিয়ে গেল—উষ্ণতা ঝরাতে ঝরাতে। আবেশ ধরে।

মাঝখানে একবার কথা বলে নিল আনন্দরূপ আদর মাখানো গলায়—রাধা। আমার লক্ষ্মী রাধা। আমার দুষ্টু রাধা। আমার রাধা। মিষ্টি রাধা। এই।

আরো এক রকম অনেক মধুর কথাকেই হয় ত বলে বলে শোনাতো আবেগে। কিন্তু আর বলল না—রাধাকে এখনও একটা ছোট্ট কথা মুখে এনে উচ্চারণ কোরতে না দেখে। পুনরায় সে তার রূপসী সুস্মিতার মুখেতে মধুর সুধার আস্বাদ ঢেলে গেল। ঐভাবে ব্যতিব্যস্ত কোরে তোলার চেষ্টা করল—যুবতী প্রিয়ার মৌন অবস্থাকে। তা হলে যদি কথা বলে রাধা। এ ভাবে চলায় আস্তে আস্তে তার তনুশোভার লাল

লজ্জারূপটি বেপথুমন হ'য়ে উঠলো। ওদিকে ততক্ষণে একটু একটু করে আনন্দরূপের হাতের কঠিন বাঁধনটি—শিথিল হতে হতে শিথিলতর হ'য়ে এসেছিল। এবার যুবক স্বামীর গভীর প্রেমে পূর্ণ বুকের মধুর আশ্রয় থেকে—বিছানার ওপরেতে গড়িয়ে পড়লো তার বিপর্য্যস্ত দেহখানা। শাড়ীর আঁচলখানা সুন্দরী অনন্যার চব্বিশ বসন্তে পরিপূর্ণা বুকের—নিটোল সৌন্দর্য্যের ওপর থেকে সরে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে—বিছানারই শাদা রঙের ভেলভেটিনের ওপরে। শাদার মধ্যে লালবেনারাসীর লাজ-রাঙা পবিত্র রূপটি—ঝিকিমিকি খেলায় মেতেছে। কথা বলল না এখনও রাধা। তাই দেখতে পেয়ে আনন্দরূপের চোখ দুটো এবারে সত্যি করুণ বেদনায় ছল্ ছল্ করে এলো। কিন্তু তা ক্ষণেকের জন্য।

আবার রাধা তার ঐ বিপর্য্যস্ত রূপ নিয়েই—বিছানার মোলায়েম গ্লসি চাদরের মধ্যে মুখ লুকিয়ে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

আনন্দরূপ সত্যি এবার মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। যে ক'রেই হোক্ তাকে জানতেই হবে—তার এই সুহৃদয়ার ভেতরে কি এমন গুরুতর ব্যাপারখানা ঘটে আছে—যার জন্যে আজকের এই রাতের প্রতিটি যাম নষ্ট হ'তে চলেছে! তাকে জানতেই হবে। সে যে কোরেই হোক্। কারণ সে আজ রাধার স্বামী।—কিছু নিয়ে কোন রকম লুকোচুরি খেলা অন্তত তাদের দুজনের মধ্যে আদপেও হওয়া উচিত নয়। তার কাছে আসল ব্যাপারটুকু কি খুলে বলতে লজ্জা পাচ্ছে—তারই সুস্মিতা বধূ? কিন্তু তার পক্ষে তা কখনো একটুও লজ্জা পাওয়ার কথা নয়। শুধু কি আজকের এই শুভ রাত্রিতেই—ওদের দু জনের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় ঘটলো—নববধূ আর নব বর রূপে! কিন্তু, তা তো মোটেই সত্যি নয়।

—রাধা নামে এক মেয়ে, আর আনন্দরূপ নামে এক ছেলে—আর এই তাদের দুজনারই পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হয়—বেশ কয়েক বছর আগেই। রাধার তখন বয়েস ছিল ষোলো।—আর আনন্দরূপের তখন সতেরো।—কৈ, কোন দিনই ত' তার কাছে কোন কিছু নিয়ে,—তা সে জিনিস যতদূর গোপনই হোক্ না কেন—বলতে বিন্দুমাত্রা লজ্জা পায় নি অকপট ভাব নিয়ে! সব জায়গায় যে কোনও ব্যাপারে, সব সময়েতেই আনন্দরূপের কাছে—রাধার ব্যবহার ছিল বড় বেশি খোলাখুলি ধরনের। কোন বিষয়ে নিয়ে কোন জিনিসকে—রাধা এক মুহূর্তের জন্যেও গোপন করা বরদাস্ত ক'রতে পারতো না।

আনন্দরূপ তাই ভাবল—তবে, আজ সে কেন নিজেই অমনটি ক'রছে? আজ এমন ব্যবহার করা মোটেই শোভা পায় না—এই নতুন পরিচয়ের লীলাসঙ্গিনীর পক্ষে। ভাল লাগাবারও কথা নয় তা। এতবছর পরে—এই ত' আজই তারা বর

আনন্দ আর বধূ রাধা—দুজনেই নিজেদের ভালবাসাবাসির চরম পরম আকাঙ্ক্ষিত বিবাহিতা জীবনেতে—ন্যায়ত ভাবে প্রবেশ ক'রতে পেরেছে।

সুইচ্ টেপার একটা শব্দ হলো খুট্ ক'রে। নিবে গেল দপ্ ক'রে ঘরের ভেতরকার অত্যুজ্জ্বল আলো। অন্ধকারের ভেতর দেহের শৌখিন পোশাকটি না ছেড়েই—বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল আনন্দরূপ। শুয়ে পড়েই হাত দিয়ে সজোরে কাছে টেনে এনেই—বুকের ওপরে জড়িয়ে ধরলো রাধার কান্নার বেগে ফুলে ফুলে ওঠা—কোমল কমনীয় দেহখানা। ঝড়ের বেগে যুবতী প্রিয়াকে—হাত-পা দিয়ে নিজের শরীরের সঙ্গে লতিয়ে ধরার মতো কোরে—বাঁধতে লাগলো আনন্দরূপ।

সত্যি এই মুহূর্তে—রাধা যেন নিজের সঠিক রূপটির মধ্যে ফিরে আসতে পারলো—ঘরের অন্ধকারের মায়াজাল—আর বাইরের জ্যোৎস্নার আলোর লুকোচুরি খেলার মধ্যে—আনন্দরূপের বুকেতে শায়িতা থেকে। খুশী হ'য়ে রাধা এখন আদর দিতে গিয়ে তার সুদর্শন স্বামীর পঁচিশটা বছরের বসন্ত রূপকে—একই ভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে লাগলো—নিজেরই মুঠো মুঠো আরাম ঝরানো বুকের—সুস্নিগ্ধ মোলায়েম আবেশের মধ্যে।—তার এখন অভিমানিনীর মতন মূর্তি। আনন্দরূপকে দিয়ে নিজের অভিমান ভাঙ্গাতে চাইলো। সুজন স্বামীর আদরের মধ্যে—সে তার নিজের অভিমানকে ভাসিয়ে দিতে চায়। নিজে গলে যেতে চায় সেই আদর পাওয়ার সুখেতে।—সে সুখ পেয়ে ঝিলমিলিয়ে উঠবে তার প্রাণ তার মন। সেই সঙ্গে তার সুন্দরী দেহের মধুরা প্রেমরাগ।—আর আনন্দরূপকেও রাধা সে সুখের ভাগ দেবে।—ভালোবাসাবাসির মধ্যে—সে তাকে তা দেবে ও নেবে।—আর নেবে ও দেবে।

পরম প্রিয়জনকে সুখ দেবে ভেবে—সে মুহূর্তেই রাধা নিজের মধ্যে গুমরে মরা সেই অব্যক্ত বিষাদময়তাকে ভুলে যেতে বাধ্য হলো। আর একটু ভাবলো—ছিঃ, ছিঃ। আজকের মতন এমন একটি দিনে নিজের প্রেমময় যুবক-সুদর্শনের প্রতি এই ধরনের ব্যবহার করাটা কি তার শোভা পায়? একটুও কি তার লজ্জা কোরলো না আনন্দরূপের মত একটি ছেলেকে অমন ভাবে শুধু শুধু মনেতে ব্যথা দিতে?—"তোমার হৃদয়ের মতনই আমার হৃদয় হোক্"—এই প্রতিজ্ঞাটুকু রাধাকে অগ্নিসাক্ষী রেখে ক'রতে হ'য়েছে—তারই অন্তরতমের জন্য। প্রেমিকা স্ত্রী হ'য়ে এরকমটি করলে পর যে—আনন্দরূপের জন্যই অমঙ্গল ডেকে আনা হবে! না, তা কখনও হ'তে পারে না। রাধার আজ আনন্দরূপ ছাড়া নিজের সমস্ত পরিচয়ই যে মিথ্যা।—আনন্দরূপই যে তার সব স্বত্বা।—এই রাধার মনের সমস্ত সুখ। আর সেই সঙ্গে তারই লীলাবাসরের পরম সঙ্গী।

রাধার এবার মন নাচলো। প্রাণ হাসলো। কথা বলল বড় মধুর ভাবে আদর ঢেলে। আস্তে আস্তে বলল—আনন্দরূপ। আমার আনন্দ। আমার রূপ। তুমি রাজা।

তুমি শুধু আমার। আমাকে কত ভালোবাসো তুমি। তোমাকেও 'বাসি। ভালবাসি খু-উ-ব। আমি তো-মা-র-ই। তো-মা-র—...

আবেগে কথা বন্ধ হ'য়ে গেল রাধার। বেশ কাটা কাটা ভাবে শেষের কথাগুলো বলে গেল। এর মাঝখানে আনন্দরূপ নিজের মুখ থেকে একটা উষ্ণ পরশ দিয়ে—সিক্ত টিপ এঁকে দিল তার কপালের কেন্দ্রস্থলে। আবার বোধ হয় এর থেকে বেশী কিছু ক'রতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু ক'রতে দিল না রাধা—তীব্র হাসির তীব্র ঝলকানি দেওয়া নিজের মুখটিকে সরিয়ে নিয়ে। আনন্দরূপের চোখ থেকে খুশীর উজ্জ্বল রূপটি—মুখের শুভ্র হাসির ঝিলিকে ঝিলিকে ঝরে পড়ছে।

বলল আনন্দরূপ—তুমি দুষ্ট।

—জানই ত' বড় দুষ্ট আমি। এবার কিন্তু আমার। আমি দোব। বাধা দিও না। দুষ্ট ছেলে।

বলতে বলতে রাধার শরীরের মধ্যে—হাসির তরঙ্গে তরঙ্গে আনন্দদোলা সৃষ্টি হলো। চোখের মধ্যে বার কয়েক পলক পড়লো ও উঠলো। তারপরেই অষ্টাদশীর মত অথচ চব্বিশ বসন্তে ভরা রাধার রাঙা ঠোঁট দুটি এগিয়ে এসে—কঠিন হ'য়ে আঁটকিয়ে থাকলো আনন্দরূপের খুশীর রভস হাসিতে উপছে পড়া—আদরে-সোহাগে ভরা মুখেতে। ঐ ভাবে দু জনেই একে অপরের মুখ থেকে সুধা আহরণ ক'রতে লাগল। আনন্দরূপের বুকেতে—রাধার যৌবনেতে পরিপূর্ণা নিটোল বুকের পেশলতা আরামের শিহরণ তুলে—পরস্পরের সুদৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে পরশের ঘনিষ্ঠতায়—অন্তরঙ্গতারই লাজহর রভসে ভরিয়ে দিল। অপরূপ আনন্দেরই প্রবল আতিশয্যের তাড়নায়—অশেষ পুলক-আদর লাগিয়ে গেল। যুগল লীলার পারিজাতের মদিরায় তারা হ'য়ে থাকলো মাতোয়ারা।—রাধা সুখ দিয়ে খুশী ক'রল আনন্দরূপকে। আনন্দরূপ খুশী হয়ে সুখ ঢেলে দিলে রাধার মধ্যে।—সুখ হলো খুশী। আর খুশী পেলো সুখ।

ভালোবাসাবাসির পবিত্র পরিণয়ের যুগল লীলায়—কেউই ক্লান্ত হলো না।—সুধা খেয়ে—আর সুধা দিয়ে—দুজনেই হ'য়ে উঠেছে প্রাণের অণুতে অণুতে—চিরশক্তিতে উচ্ছল ! সমুজ্জল !—খাঁটি প্রেমের যে হোল তাই ধর্ম। তাই কৃতি। তাই ধৃতি।

আনন্দরূপ বলল—আমার একটা কথার উত্তর দেবে, লক্ষ্মী রাধা ?

তাই বলে সে তার যুবতী বরবর্ণিনীর পিঠেতে হাত বুলালো আস্তে আস্তে। মধুরতার আবেশ মাখাতে মাখাতে।

বলল রাধা আদরে গলে্ যাওয়া গলায়—দোব, আনন্দ। নিশ্চয়ই দোব।

কথা বলতে বলতে আনন্দরূপের কাঁধের ওপরে—আবেশ ভরিয়ে মাথা রেখে—আরামে চোখ বন্ধ ক'রল রাধা। একটু পরেই হাসির নাচনে তার চোখের বন্ধ দৃষ্টি খুলে গেল। আনন্দরূপকে দেখতে লাগল আলো আঁধারির রূপের মধ্যে অপলক চাহনি নিয়ে।—দেখতে দেখতে ছোট্ট শিশুর মতো আবদারের মধুর সুরেতে ভেঙে পড়লো রাধা।

রাধা কথা বলল মুখের শুভ্র হাসির ঝলমলানি ছড়িয়ে—কি দেখছো, আনন্দ, মুখের দুষ্টুমি ভরা হাসিতে মুখর হ'য়ে, তোমাকে আজ রাতে বুকের বাঁধ থেকে কিছুতেই আর ছাড়ছি না, আনন্দ। এভাবে তোমার বুকের মধ্যে বন্দিনী থেকে—নিজের সুখের উদার আশ্রয়টুকুকে স্থায়ী ক'রে রাখব—অন্তত যতদিন না,—সে আসে! সে সত্যি আসি আসি করছে!

এই কথা বলতে বলতে—রাধার উজ্জ্বল রাঙা মুখের রঙীন হাসির ঝরনা আর চোখের চঞ্চলা হরিণীর দৃষ্টি—অন্ধকারের মধ্যেই নিথর আর নিশ্চল হ'য়ে এলো।—ঝরণা তার নিজের গতি হারালো রাধার মুখের হাসি মরে যাওয়ায়।—দৃষ্টি অন্ধ হলো হরিণীর নিশ্চলতা প্রাপ্তিতে।

আনন্দরূপ দেখেও এর কোন কিছু ঠাহর ক'রতে পারল না। বোধ হয় ভুলেই গেছিল যে—ভালবাসার নরম মেয়েরা সুখ আর দুঃখ—যখন যেটা আসে—তখনি হাসির কি কান্নার স্রোত—সেটার যে কোন একটির মধ্যে অনায়াসেই নিজেদের ভাসিয়ে দিতে পারে! রাধার এখন হ'য়েছে সেই অবস্থা। দুঃখের কথা মনে হওয়াতেই—তার ছবির মতো কাজল আঁকা চোখ দিয়ে—জল ঝরার উপক্রম হলো।

সেদিকে আনন্দরূপের কোন রকম ভ্রূক্ষেপ ছিল না। রাধার মুখের এই কথার কোন মানেই ক'রতে চাইল না। খিল্ খিল্ ক'রে হেসেই আনন্দরূপ উড়িয়ে দিতে পারলো সে সব কথা।

কিন্তু এ কি!

চমকে উঠলো আনন্দরূপ।

আলো-আঁধারির মধ্যে রাধার চোখ দুটি চিক্ চিক্ করে উঠলো জলে ভরা অবস্থায়।

আবার কান্না!

আর এক মিনিটও দেরি ক'রতে পারলো না আনন্দরূপ এই দেখে। বিছানার ওপরে উঠে বসে রাধাকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বুকেতে জড়ালো। বিছানায় লুটানো প্রিয়া নারীর বুক থেকে সরে যাওয়া আঁচলখানা হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে—রাধার উদোল বুকের অনিন্দ্য রূপশিল্প ঢেকে দিয়ে—তার গালেতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদর ক'রলো।

আনন্দরূপ বলল—আমার রাধা। লক্ষ্মী রাধা। আমাকে কি তুমি বলবে না এমন কি কথা ভেবে ভেবে নিজেকে এই ভাবে কষ্ট দিচ্ছ ? রাধা, তুমি কি আমাকে তোমার মনের ভেতরকার অব্যক্ত ব্যাথার কথা না জানিয়ে এমনি ক'রে কাঁদাতে চাও ? বল লক্ষ্মীটি।—বলতে বলতে রাধার কপালেতে—আনন্দরূপ নিজের এক পাশের কপোল ধরে লাগিয়ে রেখে—আদর কোরল তার পিঠে-মাথায় হাতের পরশ ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে।

ডুকরে কেঁদে উঠলো এবারে রাধা।

কান্নার সঙ্গেই মধুরা রাধা বলল—আমাকে তুমি ক্ষমা ক'রবে বল ? আগে বল, তাই ক'রবে ? আমি যে তোমার প্রতি মিথ্যাচার ক'রেছি। হ্যাঁ, মিথ্যাচারই ক'রেছি। সত্যি বলছি। বিশ্বাস কর আনন্দ। সত্যি তাই।

এ ধরনের কথা শুনতে শুনতে—বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়ে নিজের আলিঙ্গনের মধ্যে আরো শক্ত ক'রে চেপে ধরলো আনন্দরূপ—তার সুন্দরী যৌবনেতে অনন্যা স্ত্রী—এই রাধার ক্রন্দসী দেহকে।

বলল আনন্দরূপ—এ সব তুমি কি বলছ, রাধা ?

কান্নায় ফুলতে ফুলতে রাধা বলল—বিশ্বাস কর আনন্দ, সত্যি কথাই বলছি। আমার রূপ, আমি যে তোমারই সন্তানের মা হ'তে চলেছি। তুমি যে হবে তারই বাবা। রূপ, মিথ্যাচার ক'রে খুব গর্হিত অন্যায় ক'রে ফেলেছি, তাই না ? বল আনন্দ, বল লক্ষ্মী রূপ, এ জন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমার যোগ্যা কি ? বল, আমার লক্ষ্মী আনন্দ ?

সব কথাই শুনলো আনন্দরূপ। তার পায়ের নীচে থেকে যেন পৃথিবী কেঁপে উঠলো দারুণ ভাবে একটা ভূমিকম্প হয়ে যাওয়ায়। এ কি কথা বলছে রাধা ! এ কি অঘটনের ব্যাপার ! তার সমস্ত শরীর আর মন থর থর করে কেঁপে গেল অজানা ভয়েরই প্রহেলিকায়। আর একটু হ'লেই খাটের কিনারে বসে থাকা—আনন্দর বেসামাল দেহখানা সেখান থেকে নীচের মেঝেতে পড়ে যেতো। রাধা ছিল তারই বুকের আশ্রয়। আর সেও এই একটু আগে সরে সরে এসে বসেছিল—একেবারে বিছানার ধারটি ঘেঁষে।—সে সময়ে হঠাৎ রাধা নিজের সংবিতটুকু ফিরে পেলো। তার এই অবস্থায় নীচের দিকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখে—রাধা চকিতের মধ্যে আনন্দরূপকে সজোরে নিজের বুকেতে টেনে এনে জড়িয়ে ধরলো। এ অবস্থায় যুবতী বধূ—তারই বেপথুমন স্বামীকে জোর করে বিছানায় শুইয় দিল।

রাধার ছবির মতো মুখশ্রীটি শুভ্র হাসির ছটায় ঝল্‌মল্ ক'রে উঠল। তার টানা টানা চোখ আনন্দে ডগ্ মগ্ ক'রে নেচে গেল। ঠোঁটের গাঢ় রঙ আরো বেশী লাল হয়ে উঠতে লাগলো। গালেতে হাসির তরঙ্গে তরঙ্গে—টোল গড়িয়ে পড়লো।

রাধা বলল হাসিতে ঝলমলিয়ে—সব বলছি আনন্দ, আগে তুমি শান্ত হও লক্ষ্মীটি।

মুহূর্ত মধ্যে আনন্দরূপের মনের সমস্ত আঁধার যেন কেটে গেল। আর এক হঠাৎ আলোর ঝলকানি খেলে গেল তার সমস্ত প্রাণ জুড়ে।—সে আলোর ঝলকানো আভায় উদ্ভাসিত হলো—তার মনেরই গোপন কথার।

—"বুঝেছি রাধা। বুঝেছি আমি।"—বলতে বলতে আনন্দরূপ আষ্টেপৃষ্টে বাধাকে বুকেতে বাঁধতে লাগলো। স্ত্রীর আরক্তিম গালেতে নিজের দু'ধারের গাল জোরে জোরে ঘষতে লাগলো।

বলল আনন্দরূপ ঐ রকম ভাবে তার প্রিয়া স্ত্রীকে আদর ক'রতে ক'রতে—আচ্ছা রাধা, সে ত কবেই ঠিক হয়ে চুকে গেছে। কিন্তু তার পরেও এ তুমি কি কথা বলছ রাধা? আজ থেকে ঠিক পাঁচ মাস আগের হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা—যা সম্ভব হ'য়েছিল আমাদের দু'জনকারই মনের এক অপ্রতিরোধ্য কামনা পূর্ণ করার প্রবলতম ইচ্ছা জাগায়—আর সে ইচ্ছাকে পূর্ণ করাতেই ঘটে গেল সেই ব্যাপার—সর্বাংশে শুধু তোমাকে ঘিরে। আর সচেষ্ট হ'য়ে তখনি সেই ঘটনার রেশটুকুকে তোমার ভেতর থেকে সমূলে উৎপাটন করা হয়েছে। কিন্তু রাধা, তার পরেও তুমি এ কি কথা বলছো! এ কি কথা....

কথা শেষ হলো না আনন্দরূপের। নিজে থেকেই সে তা শেষ ক'রতে পারল না। আবেগে তার গলা বন্ধ হয়ে এসেছে। ভয়ের ভয়ানক শিহরণে কেঁপে উঠল তার শরীর। চোখ অসম্ভব রকম ছল্‌ছল্‌ করে উঠল জলে ভরা অবস্থায়।—আনন্দরূপের প্রেমের ভরা চব্বিশ বছরের প্রত্যেকটি বসন্ত এই কাঁদলো বলে!

আনন্দরূপের কান্নার সামিল সবুজ প্রেমের মাধুরী জড়ানো মুখের ওপরে—নিজের ছবির মতন আলো হাসির ঝিলিক দেওয়া—প্রেমের রভস মুখখানা ধরে রাখলো রাধা। দেখতে লাগল—গর্ব ভরিয়ে আপন স্বামীর সরলতায় মূর্ত অপরূপ মুখ-চোখ। দেখে দেখে স্বামী গর্বে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। আনন্দগরিমায় নিজের অঙ্গরাগেতে মাখালো রুমঝুম করা ছন্দ।

ভাবল রাধা—পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের মধ্যে আর কেউ তার এই আনন্দরূপের চাইতে কোন অংশেই আপন নয়। তার সমস্ত স্বত্বাই একমাত্র এই সুন্দর ছেলেটির—জন্যে-ই।—যে ছেলে তার সমস্ত জীবনানন্দের লীলাসঙ্গী। তার অকৃত্রিম বন্ধু। মনে হলো তার—উঃ, কত ভাল তার আনন্দরূপ। কত অতুলনীয়।

রাধা বলল—ছিঃ আনন্দ, পাগলামি ক'রে ভয় পেয়ো না। তুমি মেয়ে নও। তোমার পরিচয় ছেলে। সেটা আগে খেয়ালে রেখো। আর আমি যদি মেয়ে হয়েই সবরকম সামাজিক লজ্জা আর ভয়কে তুচ্ছ মনে করে অস্বীকার ক'রতে পারলাম,

ও সেই সঙ্গে যে ঘটনা অপ্রতিরোধ্য ভাবে ঘটলো তোমাকে ও আমাকে ঘিরে,—তাকে যদি ভগবানের অভিপ্রেত কাজ বলেই মেনে নিতে পারলাম—ও আরো জানলাম যে, ওটা তাঁর-ই আশীর্বাদের এক পবিত্র ফুল বই আর কোন কিছু নয়। মেয়ে হয়ে আমি যা ক'রতে পারলাম, কৈ তুমি সবল ছেলে হ'য়েও তা সেটুকু সাহস ক'রতে পারলে না? কেন পারলে না, রূপ? তুমি তখন নিশ্চিন্ত হবার জন্য ভাবলে—তুমি যা যা ব্যবস্থা আমার জন্যে ক'রে দিয়েছো তাইতেই ঘটনার মূল তার গোড়া সমেত নষ্ট হ'য়ে গেছে।—কিন্তু এর পরেও দেখা গেল ঘটনার ফলটুকু সমূলেই রয়ে গেছে—আগের মতনই প্রাণ-চঞ্চল। একটু কোন আঁচড়ের দাগও পড়তে পারলো না—তার গায়েতে। সে প্রণে বেঁচে থাকলো আমারই জন্যে। তোমার দুষ্টু শিরোমণি—এই রাধার জন্যে-ই।

এক টানে এতগুলো কথা বলে এখানে এসে থামলো রাধা।

ছল্ ছল্ চোখে আনন্দরূপ বলল—তোমারই জন্যে রাধা? তুমি-ই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছো?

গর্বিত ভাবে বলল রাধা—হ্যাঁ, আমি। আমিই তোমার সেদিনকার সেই সন্তানকে বাঁচিয়ে রেখেছি। দীর্ঘ চার মাস ধরে তাকে আমার রক্ত দিয়ে, অপার স্নেহ দিয়ে অকৃত্রিম ভাবে সৃষ্টির রূপটুকুকে দিয়ে আসছি—শিল্পীর মতন। দেখ আনন্দ, বিশ্বাস যদি তোমার এক রকম নাই হয়, তা হ'লে লক্ষ্মীটি রূপ—আমার শরীরের এইখানটায় নিজের হাতে ধরে স্পর্শ করে দেখ। হাত ছুঁইয়ে পরখ ক'রে দেখলেই তোমার ভাবী সন্তানের প্রাণের স্পন্দনটুকু টের পাবে এর ভেতর থেকে। এখানে সে দিনে দিনে বড় হ'চ্ছে পৃথিবীতে উন্মুক্ত আলোকের মধ্যে এসে—তারই উজ্জ্বল ধারায় স্নান ক'রে—নিজে অপরূপ হ'য়ে উঠবে বলে। ভুলে যেও না সে তোমারই সৃষ্ট। তাই তোমারই মত হবে মূর্ত তার প্রাণ।—সে যে তুমি-ও। আমার আদর-আহ্লাদ দেওয়া-নেওয়া আর পাওয়ার লীলাসঙ্গী আনন্দরূপেরই সে হবে—এক ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে উজ্জ্বল রাঙা—টুকটুকে সংস্করণ। সে দেখতে কতটুকু হবে জান—এই মানে এই এত-ত-টুকুন।

রাধা খিলখিল করে হাসতে হাসতে হাত দিয়ে পরিমাণটুকু দেখিয়ে বলল—বুঝলে আনন্দ, সে এই, এই এত-ত-টুবুন হবে।

বলে ও দেখিয়ে দিয়ে আনন্দরূপের ডান হাতখানা টেনে নিয়ে রাধা তার উদরেতে ছুঁইয়ে ধরে রেখে বলতে লাগলো—সেদিন অসময়ে আমাদের দুজনের ক্ষণিকের দুর্বলতার জন্য আমার মধ্যে অবৈধভাবে তোমার সন্তানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে কুমারী হ'য়েও জননীর মূর্তি ধরতে হলো আমাকে। তুমি তাই দেখে আমার কুমারীত্বের মর্য্যাদাকে অক্ষত ক'রে রাখবার জন্য চেষ্টা করলে। উঃ, সে

কি ভীষণ ব্যাপার ! সাধারণ একটা সামাজিক লোকলজ্জার জন্য শেষে একটি শিশুর প্রাণকে অকারণে হত্যা ক'রতে হবে ! তুমি ত সেই ব্যবস্থাটুকু করেই কলকাতায় ফিরে গেলে। সেখানে ফিরে গিয়ে এই ভেবে তুমি নিশ্চিন্ত হলে যে, সব রকম অঘটন চুকে গেছে। ভয়ের বা দুশ্চিন্তার আর কোন অন্য কারণ এর পরে থাকতে পারে না, আর নেই-ও। আমি কিন্তু তোমার কোন পরামর্শকে গ্রহণ ক'রতে পারিনি। দেখ আনন্দ, তুমি অবুঝের মতো যা করতে চেয়েছিলে, আমি বুঝে কখনও সেটি হ'তে দিতে পারি না। দেখ রূপ, আমি একজন মেয়ে। মেয়েরা জীবনে এক সময়ে না এক সময়ে মা হয়। তবে অনেক সময় অনেক জায়গায় মেয়েদের ভেতর থেকে অনেকেই হয় ত সব দিক অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও—মা নাও হতে পারে। এর মানে এই নয় যে, তারা মা হওয়ার অনুপযুক্তা। এর পেছনে সব সময়ে উপস্থিত থাকে—প্রাকৃতিক কোন কারণের ব্যতিক্রম ! বা মানুষের আদর্শের কোনো মহান দৃষ্টির উদার প্রসারতা ! বা কামনার সাব্লিমশেন্ ! মেয়েদের এই বিশেষ দিকটিও বাস্তব জীবনের দিক দিয়ে সত্য।—আবার অন্য দিকটিও অতিমাত্রায় বাস্তবে সত্য—যেখানে নির্বিশেষে সব মেয়ের মধ্যেই প্রিয়ার মতন স্বতন্ত্রতা নিয়ে—মায়ের শাশ্বত রূপটি বিরাজ করে। আনন্দ, তোমার সঙ্গে সেদিন পর্য্যন্ত আমার বিয়ে হ'তে পারেনি বলে কি—আমি তোমার সন্তানের মা হ'তে পারব না ? ওগো আনন্দ, আমি যে একমাত্র তোমাকেই আমার আরাধ্য স্বামী, আমার প্রাণের অর্ঘ্য দেওয়া দেবতাটিরূপে দেখতাম—সেদিনের অনেক আগে থেকেই। আমার রূপ, তুমি কি তা জানতে না ? আমি জানি, আমার আনন্দ সেটুকু জানলে পর অমন ক'রে ভয় পেতো না। তাই ভয় পেয়ে সরে গেছিলে তুমি।

সে কথা শুনতে শুনতে আনন্দরূপের নিজের স্বত্বা হারিয়ে যাচ্ছিল প্রিয়ার গর্বিত ভাবের মধ্যে। তার চোখের মধ্যে ভরা জল থৈ থৈ ক'রছে। কান্না আসছে তার দারুণভাবে। কিন্তু কাঁদতে চেয়েও কাঁদতে পারছে না। এর মতো কষ্ট নেই ! কেন না একবার কেঁদে ফেললেই—কষ্টের অনেকটা অবসান হয়। তাই দেখে কথা থামিয়ে রাধা মিষ্টি আদর ঢেলে দিল প্রিয়ার জলে ভরা চোখে। শান্ত হয়ে উঠলো তার ঐ অবস্থার সেই ভয়ানক অস্থিরতা।

ঐভাবে তাকে শান্ত ক'রে রাধা বলল—ওগো আনন্দ, কৈ তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রেছ ত ? আর কয়েক মাস পরেই আমি তোমার সেদিনকার অবাঞ্ছিত সন্তানের মা হব তাই বলে কি তুমি আমায় ক্ষমা ক'রবে না ? শুধু একটা সামাজিক ঘটনা ঘটবার আগেই এমনটি হলো বলেই কি এর জন্যে কোন রকম ক্ষমা নেই ?—বিয়ের পর সবই বুঝি বৈধ ? আর তার আগে সবই বুঝি অবৈধ ? তা হলে আনন্দ, তুমি যে আমাকে অনেক বছর ধরেই ভালবেসে এসেছো, সেটাও ত আনন্দ, তোমার

উচিত ছিল এই পৃথিবীর আলো-বাতাসের মধ্যে থেকে সরিয়ে ফেলা! কিন্তু রূপ, তুমি ত' তা ক'রলে না! আমার প্রতি তোমার সীমাহীন ভালবাসাই যে তোমাকে সেরকম কিছু ক'রতে দেয় নি। তবে তোমারই দেহে থেকে আমার শোণিতে অঙ্কুরিত হওয়া এই ভাবী শিশুটির বেলায়—কেন অমনটি ক'রতে চেয়েছিলে?

আরো আবেগের সঙ্গে রাধা জানালো—তুমি কি জানতে না, যে, তোমার ও আমার এই যৌথ প্রয়াসের সৃষ্টি কাজের মূলই হলো—আমাদের ভালবাসার পূর্ণাহুতি? ধর আনন্দ, বিয়ের পরে আমাদের জীবনেতে কোন না কোন সময়ে—আমার মধ্যে তোমারই সন্তানের জন্য প্রাণ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারতো। আর সম্ভাবনা দেখা দেওয়া কি হওয়টা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। রূপ, তখন সে সন্তানের ব্যাপারে বৈধতার প্রশ্ন জাগে না ত'? আর যত্ন প্রশ্ন জাগে তার সবই আমার মত মেয়েদেরই ব্যাপারে? আনন্দ, বাস্তবের মধ্যে সমাজ অনুমোদিত বিবাহিত জীবনেতেও ত দৈনন্দিন হাজার রকম অবৈধ ব্যাপার ঘটে চলেছে!—কিন্তু সে নিয়ে ত সমাজের কোন রকম মাথা ব্যথা হ'তে দেখা যায় না? বরং নিশ্চিন্তে হেলে-দুলে ঘুমিয়ে থাকে সে সব সমাজ ব্যবস্থাগুলো। কোন জুজুবুড়ির অতি দাপটে তার মুখটি সেলাই করা থাকে। সে মুখ খোলবার উপায় থাকে না তার। এই, চুপ করে রইলে কেন? কথা বল লক্ষ্মীটি। ছিঃ, পাগলামি করে না। ওগো আনন্দ, এবারে ক্ষমা ক'রেছ নিশ্চয়?

রাধা কথা শেষ ক'রলো। তার বলার যতটুকু ছিল, বলেছে সে ততটুকুই। এবার আবেশে ভরিয়ে নিজের মাথা রাখলো আনন্দরূপের কাঁধেতে শুইয়ে। হাতের আঙুল দিয়ে স্বামীর সুন্দর মুখেতে বুলানো পরশ লাগিয়ে—আদর ক'রতে লাগলো আবেশ দিয়ে।

নিজের ভুলে আর রাধার মহানুভবতার শান্তরাগে ভরানো ভাবী মায়ের অপূর্ব গরিমায় সুস্নাতা মূর্তির কাছে—এই মুহূর্তে আনন্দরূপের অভাবনীয় পরাজয় ঘটে গেছে। রাধা মেয়ে হয়ে যে অসম সাহসের পরিচয় দিতে পারলো, ছেলে হয়ে আনন্দরূপ ত তার এক অংশও সাহস ক'রতে পারেনি। প্রিয়া নারী যা ক'রতে ভয় পায়নি, তাই ক'রতে ভয় পেয়েছিল তার-ই প্রিয়তম পুরুষ। সত্যি প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে এই পরাজয় স্বীকারের মধ্যেই তার আনন্দের সুখ সব চাইতে বেশী। তাই মনে ক'রে আনন্দরূপের পঁচিশ বছরের পরিপূর্ণ যৌবনের সুখী প্রাণটি কেঁদে উঠলো—শিশুর মত। তার চোখ থেকে জমা হয়ে থাকা জল দুই গাল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো বিছানার ওপরে।

তাকে ও ভাবে কাঁদতে দেখে রাধা তখন অস্থিরা হয়ে উঠলো। এ সে চায়নি কখনো। অন্ততঃ তার লীলার সঙ্গীকে কাঁদতে দেখলে পর নিজেকে না কাঁদিয়ে রাখা

যায় না। আনন্দরূপের বুকের ওপরেতে রাধা উপুড় হয়ে পড়ে বলল—চোখের জল ফেলছো ? কষ্ট পেয়েছ ?

বলতে বলতে রাধা ক্ষিপ্রগতিতে আনন্দরূপের জল ভরা চোখ থেকে সমস্ত জল—মুখ লাগিয়ে পরশে পরশে শোষণ করে নিল। শেষে বলল রাধা—আমার রূপ, এবার বেশ একটুখানি খিল্‌খিল্‌ ক'রে হাসো।

ঝক্‌মকিয়ে তখনি হাসির ঝিলিমিলি ফুটে উঠলো আনন্দর মুখেতে।—তুমি রাধা। তুমি আমার ভাবী সন্তানের মা হবে! তুমি মিষ্টি রাধা! তুমি মিষ্টি মা হবে। উঃ, কি সুখের কথা! রাধা, তুমি শুধু অফুরন্ত সুখ! দুষ্টু রাধা! তুমি শুধু সুখ আর সুখ!

বলতে বলতে ছোট্ট শিশুর মতো হয়ে উঠলো আনন্দরূপের মনের তাজা উচ্ছলতা। সুখের শুধু মধুর নাচ নাচতে লাগলো—তার প্রাণ জুড়ে। খুশীয়াল যুবক তাই হাত দিয়ে টেনে রাধার লাজুক শরীরের যৌবন চঞ্চলতাকে বুকেতে কঠিন বাঁধনের ভেতরে—জড়াতে লাগলো। মুখ দিয়ে তার শুধু খুশীবিভোর হাসির রঙীন ছর্‌ররা ছুটেছে। আর নাচছে। রিদম্‌ ধরে ধরে।

ওদিকে রাধা তার সেখানকার মোলায়েম রূপের নিটোলতার মধ্যে মধুরভাবে অপরূপ পুলকানন্দের ছোঁয়াচ্‌ পেল। তার বুকের শিল্পশোভার এই অনন্য ব্যঞ্জনার মধ্যে—নিজের মুখখানাকে এনে রেখেছে আনন্দরূপ। রাধা অনুভবের পরশে পরশে মাতোয়ারা হয়ে উঠতে লাগলো—প্রিয়তমেরই মুখের এক একটা উষ্ণ পরশের মদিরা ভরা—সিক্ত বিহ্বলতায়। সুখের তালে তালে আর খুশীর কাকলিতে—কলকলিয়ে উঠলো রাধার চব্বিশ বসন্তে ভরা রাঙা যৌবন।

—আনন্দ। আমার রূপ। তুমি আমার ভাবী শিশুর বাবা। আর আমি তার মা। কত সুখী আমি! সুখী তোমারই জন্যে।

কথা বলে নিয়ে আনন্দরূপের বুকেতে কঠিন বাঁধনের মধ্যে বন্দী অবস্থাতেই—হাসির খুশীবিহ্বল ঝরনায় ঝলমল করে নেচে উঠলো—প্রিয়ার সুখ আর খুশী। রাধা মুখ নীচু করে আনন্দরূপের গালেতে হাসির সে ছোঁয়াচটি বসিয়ে দিল।—খুশীরই তরঙ্গের মাঝে আলো আঁধারির লুকোচুরি খেলাতে করা সুখের মদির সুরভিতে কল-কাকলি মুখর হয়েই থাকল তারা দু'জনা—বেশ কিছু সময়। তারা দু'জনা। এক সুখ। আর তারই খুশী। দুষ্টু আনন্দরূপ আর মিষ্টি রাধা।

—তখন রাতের শেষ যাম।

—মহাকবি শ্রীমধুসূদনের জন্মদিনে, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৫৭।

আমাদের 'কাকু'—আই. সি. এস দেবেশ চন্দ্র দাস

লেখক-জায়া রুচিস্মিতা সন্ধ্যা রায়ের লেখা

ছোটখাটো চেহারর স্মিত মুখ এই দেবেশ দাস একাধারে ছিলেন ভারত সরকারের জবরদস্ত প্রশাসক ও সেই সঙ্গে অনন্য এক সাহিত্যিক, সৃষ্টি ধর্মের স্বকীয়ত্বে। উনি এবং আমার শ্বশুরমশাই ঢাকার পাশাপাশি অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। সেই সুবাদে দুজনের মধ্যে ছিল অগ্রজ ও অনুজের সম্পর্ক। উনি বিখ্যাত টেকনো- ব্যুরোক্র্যাট বি. কে. রায়-কে 'দাদা' বলে ডাকতেন। যদিও শ্রীযুত রায় ১৯৩৩ সালে বিলেত থেকে ইম্পিরিয়াল সার্ভিস অব্ ইঞ্জিনিয়ার্সের সদস্য হয়ে ফিরে আসেন। সেই বছরই দেবেশ দাস প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতি নিয়ে পাস করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে টাটা মেমোরিয়াল স্কলারশিপ পেয়ে, এখান থেকে আই. সি. এস পরীক্ষায় কম্পিট করে—বিলেত যান। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন ভাবী কালের আইনমন্ত্রী অশোক সেন, আই. সি. এস. ভবানীপুরের শিশির দত্ত (ভারত খ্যাত চন্দ ভ্রাতাদের ভাগীনেয়), নিখিল চক্রবর্তী (বিধান রায়ের ভাইঝির স্বামী), ভারতের প্রাক্তন বিচারপতি অজিত নাথ রায় এবং ম্যুর অ্যাভেনিউয়ের বিজয়ানন্দ মুখার্জী ওরফে মিশনের স্বামী হিরন্ময়ানন্দ।

ঢাকা জেলার সদরে ষাঁটীর পাড়ার বিখ্যাত রায়বাড়ির সঙ্গে রমণার বিখ্যাত আইনজ্ঞ শ্রী গোপাল চন্দ্র দাসের সম্পর্কটা ছিল—আত্মার আত্মীয় সদৃশ। এই গোপাল দাসই দেবেশ দাসের পিতা। ছেলে যখন বিলেতে তখন তিনি এখানকার ল'কলেজের অধ্যাপক। ছেলে দেবেশের জন্য (যে ছেলে দুদিন পরে আই. সি. এস্ হয়ে দেশে ফিরছে) এক নম্বর অভিজাত এলাকা আলিপুরের নিউ রোডে সুদৃশ্য এক বাংলো-বাড়ি তৈরি করান রাতারাতি, যদিও সিটি কলেজের কাছে নিজের বড় বাড়ি থাকা সত্ত্বেও—অবশ্যই আমার শ্বশুরমশাইয়ের পরামর্শে। তখন বি. কে. রায়-এর কর্মস্থল সারা ভারত জুড়ে।

সসম্মানে সতীর্থ শিশিরের সঙ্গে দেবেশ—শেষ ধাপে উত্তীর্ণ হয়ে আসাম ক্যাডারের তালিকাভুক্ত হন। ছবির মতো সেই সেদিনকার অখণ্ড আসামের দু-একটি মহকুমার কর্তৃত্ব করে, তারপর বছর পাঁচেক লামডিং ও কোহিমায় ডি. এম-এর দ্বায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মাত্র ৩৪ বছর বয়সে আসীন হন ওই বিরাট রাজ্যের—মুখ্য সচিবের পদে। সে সময় আসাম রাজ্যের রাজধানী ছিল শিলং। সেই 'শেষের কবিতা'র দেশ। পাহাড়, ঝরনা, গাছ-গাছালি, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—তরুণ দেবেশকে আরও উদ্দীপ্ত করে তোলে সাহিত্য সাধনায়। যেন এক নতুন 'অমিট রে' হয়ে উঠতে চাইলেন লেখক। বেরোল উপন্যাস 'অর্ধেক মানবী তুমি'। পাঠককুল সেই বইয়ের খুশবু উপভোগ করল।

বলার কথা—আসামে থেকেও লিখে ফেলেন মনের মাধুরী মিশিয়ে বিলেত প্রবাসের কথা ও কাহিনী। 'ইউরোপা'। বইটি সৌভাগ্যবশত বিশ্বভারতী প্রকাশ করে সেই তাদের চিরাচরিত রীতিমাফিক ছবিহীন হলুদ মলাটে। শুধুমাত্র লাল কালিতে লেখক ও বইয়ের নামটি ছাপা। মানে একটি প্রেস্টিজিয়াস প্রকাশনা। আর ভূমিকা? স্বয়ং কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের লেখা। সেদিনকার দিনকাল এমনই ছিল—দেশের এক নম্বর ছাত্ররাই তখন হত—আই. সি. এস। পদাধিকার বলে বা চাকরির সেই বিরাট কৌলীন্যের জন্য নয়—ওদের প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথের খুবই কাছের মানুষ হতে পেরেছিলেন। এ শুধু মনিকাঞ্চন যোগ নয়, তার চাইতেও অনেক, অনেক বেশি পারম্পর্য যুক্ত।

সে সময়ে একজন ভারতীয়—আই. সি. এস—হয়ে দেশে ফিরলেই কী বাঙালী কী অবাঙালিতে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত—কে তাঁকে আপন ঘরের জামাই করতে পারবে। দেবেশের যিনি শ্বশুর হন তিনি অনেক দিক দিয়েই ভাগ্যবান। ঢাকার বিখ্যাত বারোডির নাগ পরিবারের মানুষ। শ্রীযুত কে. সি. নাগ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। আইন ব্যবসায় নেমে, সফলতার কিছু দিনের মধ্যেই—শ্রীযুত নাগ ওয়াজ টীপড টু দ্য বেঞ্চ। হলেন অনারেবল জাস্টিস। তাঁর ছিল দুই মেয়ে। বড় মেয়ে বিমলাকে বিয়ে করেন আই. সি. এস. ব্রজকান্ত গুহ। যিনি পরে উন্নীত হন প্রশাসক থেকে হাইকোর্টের বিচারক পদে। আর অবসরান্তে হন নবগঠিত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের—দ্বিতীয় স্থায়ী উপাচার্য। যেহেতু তখন ওই পদ থেকে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত—বিশ্ববিশ্রুত আই. সি. এস. সুকুমার সেনকে আরও বড় কাজের দায়িত্ব দিয়ে—খোদ জওহরহলালজী—প্রচণ্ড সমস্যা জর্জরিত উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দায়িত্বে বহাল করেন। মহাভারতের সেই দণ্ডকারণ্যে।

আর শ্রীযুক্ত নাগের ছোট মেয়ে কমলার পাণিগ্রহণ করেন আমাদের কাকু—দেবেশ দাস। 'এই বিখ্যাত জামাতা যে পরবর্তী কালে একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকও হবেন তা কে জানত?' উপরের এই মন্তব্য করেন অশোক রায়ের প্রতি, পরবর্তী কালে ওঁর জেঠশ্বশুর—শ্রীযুক্ত বি. সি. নাগ। আইনি দুনিয়ার এই বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব—স্কুলের প্রেসিডেন্ট হিসাবে ওঁকে খুবই স্নেহ করতেন। এই বীরেন্দ্র চন্দ্র নাগ ছিলেন সরকার পক্ষের পি. পি. এবং জি. পি। ওঁর উপরে বর্তেছিল স্বাধীনোত্তর কালে ঘটিত—সেই দমদম-বসিরহাট আরমারী রেইড কেসের বিচার-বিশ্লেষণ পর্ব। তখন সাদার্ন অ্যাভেনিউ-এর ছবির মতো বাড়ির সর্বত্র ছিল—পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। এই নাগ মহাশয়ের আইনজ্ঞা স্ত্রী-শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী নাগ পরবর্তী কালে এই রাজ্যের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের—প্রথম মহিলা বিচারপতি। উনি তখন নেই। দেখে যেতে পারলেন না যে, প্রিয় ভাইঝি 'কমল দাস' নামে একের পর এক উপন্যাস লিখে চলেছেন। যদিও স্বামী দেবেশ দাস তখন যেন সাহিত্য রচনা থেকে অবসর

নিয়েছেন— নিজের স্ত্রীকে জায়গা করে দিতে। কমল দাসের 'অমৃতস্য পুত্রী' উপন্যাস বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগায় ও সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়। স্বামী দেবেশ স্ত্রীর প্রতিভা বিকাশে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বামীরা নিজেদের প্রতিভা বিকাশে সচেষ্ট থাকেন। আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি— আমাদের মেসোমশাই অন্নদাশঙ্কর রায় অনন্য প্রতিভার অধিকারী হলেও—তাঁর স্ত্রী লীলা রায় কখনোই নিজস্ব প্রতিভার বিকাশে—সচেষ্টা হয়ে ওঠেননি। যদিও তিনি স্বামীর চেয়েও বেশি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় ও সানন্দ চিত্তেই স্বামীর সাফল্যকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। একই পথ অবলম্বন করেছিলেন রবিশঙ্করের স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী। দেবেশ দাস চেয়েছিলেন স্ত্রীকে সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা দিতে। তার মধ্যেই তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল, নাম—'প্রেম, আগ্রা স্টাইল।'

যখন কেন্দ্রে—কাকু দেবেশ দাস সচিব পর্যায়ে সমাসীন তখন রাজস্থানের রাজপুত ঘরানার অনন্য সৃষ্টির মাধুর্যকে নিখুঁত করে ফোটানোর জন্য দুটি গ্রন্থ লেখেন, নাম—'রাজসী' এবং 'রাজোয়ারা'। এই দুটি সৃষ্টি, না উপন্যাস, না রম্যরচনা, না কাব্যাশ্রয়ী বিভূষণা। এ যেন তিন ধারার এক নতুন সঙ্গম।

দেবেশ কাকু জীবন যাপনে পুরোদস্তুর সাহেব ছিলেন। যখন তিনি প্রশাসক তখন তিনি দুঁদে আই. সি. এস.। কিন্তু এই কাকুই যখন সাহিত্যের বাসরে উপস্থিত তখন বাঙালিত্বে অসাধারণ। প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব ছেড়ে তখন তিনি পুরোপুরি একজন সাহিত্যিক। বহু আগে থেকে বছরের পর বছর ধরে—প্রতি শীতকালে অনুষ্ঠিত হত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। কখনও এ রাজ্যে, কখনও-বা অন্য রাজ্যে। গত শতক থেকে ছয়ের দশক পর্যন্ত—একজন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী-এর দায়িত্বে থাকতেন। তিনি আই. সি. এস হিসাবে যে ভাষাভাষি বা যে প্রদেশের হোন না কেন কেন্দ্রীয় সরকারের চোখে এবং আলাদা আলাদা রাজ্যের চোখে তাঁর একমাত্র পরিচয় ছিল তিনি একজন ভারতীয়। একজন কেন্দ্রীয় সচিব যেকোনো রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছ থেকে সম্মান আদায়ের চেষ্টা না করেও—আপনা থেকেই পেয়ে যেতেন আন্তরিক সম্মান। বাংলার সাহিত্যিকদের ওই মহাসম্মেলনের জন্য দেবেশ কাকু সহযোগিতা করতেন কেন্দ্রীয় চাকরির সুবাদে—যাতে যখন যে রাজ্যের যে শহরে সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তার জন্য সে রাজ্যের মুখ্য সচিব—উপরওয়ালার সনির্বন্ধ অনুরোধ সমেত বাংলা থেকে আগত প্রতিটি প্রতিনিধির ৩-৪ দিনের জন্য থাকা, খাওয়া ও ঘোরাফেরা—সমস্ত দায়িত্ব বহন করতো। এক কথায় বলতে গেলে দেবেশ কাকুর এই প্রচেষ্টায় প্রতি বছর এক এক রাজ্যে অভ্যাগতরা হতেন—রাষ্ট্রীয় অতিথি। পেতেন সসম্মান, সমন্বয়ী আন্তরিকতা। সেইজন্য সম্মেলনের কর্তাব্যক্তিরা ওঁকে করেন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি। তার মানে অন্যান্য সব কর্তাব্যক্তিদের

নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হত—কিন্তু সভাপতি থাকতেন এর বাইরে। একটা কথা—কাকুর শুধু ইচ্ছা রূপায়ণে বিভিন্ন রাজ্যের এই তৎপরতা দেখে—এই রেন্ডারিং হসপিটালিটি টানটান সৌহার্দ দেখে—দিল্লিতে সমপর্যায়ের কেউ কেউ—গট্ জেলাস্ অফ ইট। ফলে চাকরির ব্যাপারে কিছু অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও আমাদের কাকু—নেভার কেয়ারস্ ফর দ্যাট। তিনি উপেক্ষা করতেন। যার ফলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও হত এ নিয়ে মন কষাকষি। বাঙালি বলে দু-পর্যায়ে দুজন বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী মণীষীপ্রবর বিধান রায় এবং জনতার সম্রাট প্রফুল্ল সেন ছিলেন—কাকুর আত্মপক্ষ সমর্থনের—আপসহীন বর্ম ও অস্ত্র। টানা বারো বছর তিনি তখন আই. সি. এস দেবেশ দাস নন, সাহিত্যিক কাকু দেবেশ দাস হয়ে বারোটি রাজ্যের বারোটি শহরে স্থায়ী সভাপতির ভাষণ দান কালে সুভাষিত, সুবিনীত বক্তব্য রেখেছেন। প্রতিটি ভাষণই ছিল লিখিত প্রবন্ধ। সেই বারোটি জায়গার বারোটি প্রবন্ধ একত্র করে 'ভারতবর্ষ, নামে একটি গ্রন্থ বেরোয়। যা কাকুর এদেশীয় সাম্রাজীয়—অল্ মোস্ট অল্ টীট বীটস সমেত—তিনি লেফট নো কালচারাল এপিসোডস—আনটোল্ড। তবে মজার কথা ও হাসির কথাও—লজ্জার কথা বলছি না এজন্য লজ্জার মাথা খেয়ে সেই সময়কার অনেক সুবিধাভোগী সাহিত্যিকই তাঁর কাছ থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়েও 'আনফেইথফুল' কথাটিকে নিজেদেরই শিরোপা করে তুললেন—যেই আমাদের কাকু দিল্লি থেকে অবসর নিলেন—ঠিক তখনই। সম্মেলন ভাঙতে শুরু করল। লেখকরাও ছত্রাকার। কাকু সাহিত্যের প্রতি হতে লাগলেন—বিমুখ। এছাড়া ছা-পোষা সাহিত্যিকরা তাঁদের দেউলিয়া ঘরে থেকে আর কীবা দিতে পারতেন? স্টিল ফ্রেমের আমাদের কাকু মনে দুঃখ পেলেও তাতে কোনো গুরুত্ব দেননি। তিনি যে কটি বই লিখে গেছেন চাকরির মাঝে মাঝে—রোম থেকে রমনা, পশ্চিমের জানলা, রক্তরাগ, কুমড়ো ফুল—সবগুলিই ভালো সৃষ্টি, কেননা পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার আই. সি. এস-ই চার হাজারি বেতন—কাকুকে দিয়ে টাকার জন্য লেখাজোকা করায়নি। এ ছিল দেবেশের নেশা, পেশা নয়। তাই তাঁর সৃষ্টিকে ক্লাসিক বললে ভুল বলা হবে না। কাকুর 'রক্তরাগ' বইটি স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় বিপ্লবীদের নিয়ে লেখা। ব্যাপ্তিতে ও প্রসারণে ক্ল্যাসিক রীতির ধারাবাহিক এই রক্তরাগের পাণ্ডুলিপি পড়ে—ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডা. রাজেন্দ্র প্রসাদ নিজেই দেবেশকে ডেকে—পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়ার সময় সবিনয়ে জানান—'বাংলা জবানে দেবেশবাবু আমি কি তোমার এই বইয়েতে একটা ভূমিকা দিতে পারি?' দেবেশের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতি খোলসায় নামেন।—'কোনো অস্বস্তি নেই, তোমার বইয়ের ভূমিকা আমি বাংলাতেই লিখব।' বলেই দারুণ এক হাসি হেসে পাশের শ্বেত পাথরের টেবিল থেকে একটা রোল করা কাগজ তুলে ধরে বলল—'দেখো, তুমি না চাইলেও এত সুন্দর বইয়ে আমার কিছু মন্তব্য রাখা

দরকার। দেবেশ বাবু তুমি তো জানো, স্বাধীনতা পাওয়া ছিল আমাদের ব্রত। এর জন্য সংসার, সমস্ত রোজগার বন্ধ করে এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। অনেক কষ্ট পেয়েছি। অত্যাচার সহ্য করেছি। ব্রিটিশের জেলে বহু বছর কাটিয়েছি। দেবেশবাবু, 'সেই সংগ্রামীদের নিয়ে তুমি এই বই লিখেছ। সুতরাং আমারই কর্তব্য এর মুখবন্ধ রচনা করা।' অতি বিনয়ের সঙ্গে কাকুর হাতদুটো ধরে ভারতের রাষ্ট্রপতির মিনতি, 'দেবেশবাবু তোমার বইয়ের প্রথমে আমার ভূমিকা যাওয়া—তার মানে আমার জীবনে একটা বড় পুরস্কার পাওয়া। ইট হ্যাভ অনার্ড মী।'

ভাবা যায় দেবেশ কাকু—আজ ভাবছি তুমি নেই, ডক্টর প্রসাদও নেই। টেলিফোনে, চায়ের আসরে রাষ্ট্রপতি ভবনে স্বয়ং রাষ্ট্রপতির এই আহ্বান তোমার প্রতি, এই উষ্ণ ব্যবহার তোমার প্রতি—যখন ভাবি, তখন ভাবি অবাঙালি হয়ে বাঙালি তোমার প্রতি, এই বাঙালি-মনস্ক রাষ্ট্রপতি—তামাম ভারতের দ্য ফার্স্ট সিটিজেন হয়ে এভাবে তোমায় সংবর্ধিত করা—চাট্টিখানি কথা নয়।

দেবেশ কাকু তুমিও নেই, নেই কমলা কাকীমাও। জানি না কোন অজানিত অস্বস্তিকর কারণে অনেকবারের মতোই লন্ডন গিয়ে—আর কিন্তু ফিরলে না এদেশে। ওখানেই ঘটল তোমার ব্যারিস্টার কন্যা নৃত্যশিল্পী অনুরাধা পারিখ-এর বাড়িতে অন্য পৃথিবীর জন্য—শেষ যাত্রার তোড়জোড়। আগে গেল কাকীমা। তাঁকে অনুসরণ করলে তুমি।

মনে আছে তোমার নিউ আলীপুরের বাড়ি 'কমলা'য়—সারা বাড়ি ঘুরিয়ে দেখানোর সময় হাসি খুশি মুখ ঐ চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট জামাই—পারিখের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মুখে হাসির ছররা ফুটিয়ে বলেছিলেন—'এই যে এই শ্রীমান হনুমানই হচ্ছে আমার জামাতা।' পিছনে কাকীমার মুখে হাসির হিল্লোল।

কাকু তোমার স্টিল ফ্রেমি সেই হেভেন বর্ন সার্ভিসের কথা আমরা জানি। আরও অনেকেই জানে। কিন্তু, বড় বেশি বাস্তবের অস্তিত্বে স্ট্যাটিক ভাব-ভাবনা এখনও দারুণ ডায়নামিক হয়ে আছে—তোমার ও কাকীমার লেখা বইগুলিতে। কেন জানো। প্রতিটি উপহার দেওয়া বইয়ে—আমাদের নাম সস্নেহ সম্ভাষণে বিভূষণী বিভাষে—যেন করে রেখেছ সম্মানীয়-সম্মানীয়া। তোমার বই পুরোটাই তোমার হাতের লেখায় উপহৃত প্রেজেন্টেড। কিন্তু কাকীমার বইয়ের নাম-ধাম সবকিছু তুমি নিজের হাতে লিখে তারপর কাকীমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছ 'ওগো তোমার নামটা এবার নিজে হাতে—লিখে দাও।' ভুলিনি, ভুলব না। টাইম ইমমোরিয়ালে তোমরা, বিশেষ ভাবে তুমি দেবেশ কাকু—আজও আলোচিত।

মাসীমা লীলা রায় যে কথা বলে বিশেষ ভাবে—ওঁর স্বামী অন্নদাশঙ্করের বিলেতের বন্ধু শ্রীযুক্ত বি. কে. রায়ের পুত্রবধূ এই সন্ধ্যাকে পরিচিত করাতে বলেছিলেন, তা ভোলার নয়, তা আশীর্বাদী ফুল। মনে আছে দেবেশ কাকু, লীলামাসী স্বগর্বে সুহাসে তোমাকে মানে তোমাদেরকে বলেছিলেন, 'অশোকের বউ,

মানে আমাদের এই বউমা সব ব্যাপারেই রুচিযুক্তা। ওঁর হাতের তৈরি রান্না প্রায়ই আমাদের রসনা তৃপ্তির কারণ হয়।' দেবেশ কাকু সম্পর্কে বলি, 'আমার বাবা ও কাকু তখন চাকরির সুবাদে হয়ে যায় ওপর-নীচের সম্পর্ক। আমার স্বামীর কথায়—"কাকু তখন দিল্লিতে ভারতের যোগাযোগ সচিব। ওঁর মন্ত্রী তখন বাবু জগজীবন রাম। বাবা তখন দিল্লি ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরে নবগঠিত দূরবানী নগরে। সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইন্ডিয়ান টেলিফোন ইন্ডস্ট্রিজ। বাবা তখন এর বড় কর্তা। তাই বয়সে বড় হলেও বাবা হয়ে যান দেবেশ কাকুর সাব্‌অর্ডিনেট। তাতে কিন্তু স্নেহ প্রীতিতে কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। কারণ ওঁরা দুজনেই সমতুল্য ক্যাডারের মেম্বার ছিলেন। মনে আছে—১৯৫৩ সালে যখন লালদিঘির দক্ষিণ পারে তৈরি করা আকাশছোঁয়া ইমারতে টেলিফোন কেন্দ্র স্থাপিত হল—সে কথা স্মরণ না করে পারছি না। সেই বিরাট অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হিজ্ এক্সেলেন্সি ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখার্জী এবং প্রধান অতিথি ছিলেন ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়। উদ্বোধন করেন স্বয়ং বাবু জগজীবন রাম। আর প্রস্তাবক দেবেশ দাস। প্রধান বক্তা ছিলেন 'দ্য ডয়েন অফ্ ইন্ডিয়ান জার্নালিজম'—আচার্য হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। সেদিন সকালেই ফোন করে কাকু চলে আসেন আমাদের বাড়ি তাঁর বিরাট ডজ্ কিংস্‌ওয়ে নিয়ে—বাবাকে ও আমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সঙ্গে ছিলেন কলকাতা টেলিফোনসের প্রাণপুরুষ—স্যার রাজেন মুখার্জীর নাতি—কর্নেল সরোজ কুমার কাঞ্জিলাল। তিনি তখন এর জি. এম। সেই বিরাট সভায় সকলেই বক্তব্য রাখেন। আমার বাবাও তা থেকে বাদ যাননি। কিন্তু এই পঞ্চাশ বছর পরে তাঁদের দুজনার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা এখনও স্মৃতিতে জাজ্বল্যমান। চলার পথে অনেক ভারতীয় দিকপালের চোস্ত ইংরেজি জবান শুনেছি কিন্তু মনে হয়— বাবু জগজীবন রামের ইংরেজি বাচনভঙ্গি ভোলার নয়। যেন খাস ইংরেজ তাঁর বক্তব্য রাখছেন। আর হেমেন্দ্র প্রসাদ বলেছিলেন, 'রোমান্স ইন টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ।' যদিও সেদিন সকালে অমৃতবাজার পত্রিকায় এই সম্পর্কিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে বাবার লেখা যে রচনাটি বেরিয়েছিল—তার ক্যাপসন ছিল উপরোক্ত ওই নামে।

বরাবরের জন্য বিলেত যাওয়ার আগে দেবেশ কাকু আমার লেখা 'ভালোবাসার শিল্প কথায়' ওঁরই সমসাময়িক এক ডজন লেখকের উপর করা সহৃদয় আলোচনা দেখেন আর নিজেরটা না দেখতে পেয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'আমাকে নিয়ে কবে লেখা লিখছ।' বারবার জানতে চান। সাক্ষাতে ও ফোনের মাধ্যমে। সে লেখা হয়েছিল একটু পরে। কিন্তু উনি বেঁচে থাকতে তা দেখতে পাননি। এটা আমার কাছে খুব অস্বস্তির বিষয়। লেখাটি বেরোবে সম্প্রতি। বইয়ের নাম—'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে।'

১৮ মার্চ—২৫ মার্চ, টু মেমোরাইজ কন্যা চুনী ও মা টিপসী, দ্য পেটস।

একান্ত দাম্পত্যিক

আমার চুমায়ীতী আদরের জায়া—রুচিস্মিতা সন্ধ্যা রায়, মধুরিকাসু।

বধূজীবনের বুকভরা মধু নিঙাড়িয়ে সকালের সোনা রঙ রোদে ঝকমক ক'রতে—করতে স্বামী গৌতমের প্রতি কথাকাকলী জানালো মিষ্টি যুবতীকার রিমঝিম ছান্দসিকা—শ্রীমতী সন্ধ্যা।

—"ঈষ্! ঈষ! আজও যদি গত কালকার মতো দেরি ক'রে রাত দশটা বাজিয়ে ফের, তা হোলে কিন্তু আজ রাতে আমার কাছটিতে আর তোমাকে বিন্দুমাত্র ঘেঁষতে না দিয়ে—জানাবো অভিমানী বৌ-টির অসহযোগ। সত্যি সত্যি। দেখো, আজ ঠিকই তা করবো। হ্যাঁ, কোরবো ব'লেও আজ পর্য্যন্ত তা ক'রতে পারলাম না ব'লে ভেবো না যেন, তোমার এই সন্ধ্যা তা পারে না জানাতে! বা ক'রতে! পারি খুবই। আজ ঠিকই কোরবো। গৌতম, এই?"

শ্রীমতী সন্ধ্যা হোল গ্রাম বাঙলার—এক বৌ। তবে উপস্থিত আর কি।— এই পরিচয় ছাড়িয়ে, ও শহুরে। ও আধুনিকা।—কিন্তু ছোটবেলা থেকেই পল্লী গাঁয়ের প্রতি থাকা মস্ত এক প্রীতির টানে টানে—সন্ধ্যা তার স্বামী গৌতমকে নিয়ে ছোট্ট একখানা শান্তির আর স্থিতির নীড় রচনা ক'রে নিয়েছে—গ্রাম বাঙলারই এক অতি নিঝুমতায় সাজানো—এই নিভৃতিটির কুলায়। বছর খানেক ধরে এখানে গাছ-গাছালির পাতায় পাতায় তৈরী করা ছায়ার ঘেরাটোপ দেওয়া—শুধু নিরালায় সুনিবিড়—এই এক রকমের আধুনিক বাংলোখানাকে দূর থেকে দেখলে পর মনে হয়—প্রাচীন ঐতিহ্যের যেন এক লতাবিতান। এরই মধ্যে সংসার পেতেছে—এই সন্ধ্যা ঘোষ। আর তারই যৌবনের সুখ—ঐ গৌতম ঘোষ। আর আছে ওদেরই দুটি ছন্দ এক হোয়ে সৃষ্টির—প্রায় এক বছরের মেয়ে,—নাম যার—'টুলটুল'।

হ্যাঁ,—শহরেরই এক আধুনিকার যৌবন-স্বপ্ন গ্রামীন বধূ হোতে চেয়ে—নীড় বেঁধেছে তাই। কিন্তু, হ্যাঁ এত শান্তির নীড়খানায় আজ বেশ অনেকদিন ধরেই—যেন একটা না-বোঝা এমন কিছু ধূসর মেঘ দিয়ে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে! মেঘের আড়ালে যেন দুলে উঠছে—অস্বস্তির ঝড়। —সন্ধ্যাকে যেন তা ভয় দেখাচ্ছে। ভয় পাইয়ে কাঁপাচ্ছে। বাংলোর বারান্দায়—সিলিঙ্ থেকে ঝুলে থাকা চকচক মতন মাধবীলতাগুলো যখন মৃদুল হাওয়ায় দুলতে থাকে,—আর বারান্দারই কাঠের থামগুলোতে লতানো জুঁইফুলের ঝাড় থেকে যখন—গত সাঁঝেতে ফোটা সুবাস-ঝরা ফুলগুলো প্রভাতের আলো তীব্র হওয়ায়—একে একে শুকিয়ে উঠে নীচেকার বালু-চিকচিক মাটিতে পড়ে—জমায় ঝরাফুলের জন্য শোকের আসরখানা—তখন গৌতম ঘোষের অফিস যাওয়ার পথেতে সাত-সকালেই তোড়জোড় করার ফাঁকে-

ফাঁকে—স্ত্রী সন্ধ্যা ঘোষ না-জানা এক ভয়ের দোলনে অস্থিরা হ'য়ে পড়ে। মাঝে মাঝে গোরোচনা রঙের দেহলতা কেঁপে ওঠে।

হ্যাঁ, —সাত সকালেই অফিসে বেরিয়ে পড়ে সন্ধ্যার স্বামী। আর বেরুনোর মুখে—প্রায় এক বছরের ফুটফুটে মেয়ে টুলটুলকে প্রিয়ার কোল থেকে নিজের কাছেতে নেয়। —রোজকার মতো বেশ সময় ধরে দু'হাতের মুঠোয় রাখা আপন সৃষ্টির অতি ছোট্ট আকারের প্রাণময় স্বতঃস্ফূর্ততাটিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে হাসিয়ে-নাচিয়ে—প্রায় ক্লান্ত ক'রে এনে—শেষে শুইয়ে দেয় ছোট বেবি-কটে। আর তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে শোবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে—বসবার ঘরটিতে। আদরভরা গলায় রোজ যে ভাবে প্রিয়াকে কাছে ডাকে, সেভাবে আজও ভোরের রাগ-রাগিণীদের জাগিয়ে দেওয়ার মতো কোরেই ডেকেছিল—"আমার দেরি হ'য়ে যাচ্ছে সন্ধ্যা, শোন। কাছে এসো একবারটি। এই, এসো। সন্ধ্যা। লক্ষ্মীটি বলছি।"

তারপর রোজকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে যেমন অপেক্ষা করে স্ত্রী সন্ধ্যার জন্য—তেমনি আজও সকালে গৌতম কোরল তাই।

তাই সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কাছে এসে একটু ব্যবধান রেখে আজও সন্ধ্যা বলেছিল—ওপরের কথাগুলো।—প্রথমেই সেই মানা জানানোব—'ঈষ্' শব্দখানাকে স্বামীর প্রতি ছুড়ে দিয়ে। জানিয়ে।

অন্য দিনের মতো সন্ধ্যা ঐ কথা শেষ ক'রে—পুরনো ব্যবহারে ও কথালাপে নামিয়েছিল নিজেকে। বলে উঠলো সন্ধ্যা মুখময় ছাপিয়ে তোলা পবিত্র সিঁদুরের মতো রঙীন ঝলস্ ফুটিয়ে—

—"আচ্ছা, আচ্ছা। এ ত' বেশ আবদার! বলি, আমায় কী টুলটুল ঠাওরেছো? এই গৌতম, ওকে যেমনভাবে আদর কোরলে তুমি এইমাত্র, বলি, আমায়ও কী সেই ভাবে আদর আর সোহাগ জানাবে? না-না। অত আদর আমি পারবো না সহ্য কোরতে—এই দিনমানেতে। দ্যুৎ। ভারী দুষ্টুমি হচ্ছে কিন্তু। আরে, এ কি! যাও, ভালো লাগে না, না..."

ততক্ষণে প্রিয়ার কথা চালাচালির সুযোগেতে—গৌতম এগিয়ে এসে নিজের বুকের মধ্যে ঘন ক'রে কেড়ে নেয়—সন্ধ্যাকে। সজোরে চাপ দিয়ে প্রিয়ার দেহরাগে ফুটিয়ে তোলাতে চায়—আবেশের ঊর্মিময়তা। আর তারই মধ্যে দুরন্ত হ'য়ে সন্ধ্যার মুখের সচলতায় আদর ঝরাতে চাওয়ারই দরুন—প্রিয়ার কথা এর পর সত্যি বাধ্য হয়—থেমে যেতো। একটি যুবতী-অধর যখন তারই একান্ত একান্তের যুবকাধরের সোহাগে বন্দী হয়ে—চুমার আলিম্পন ফোটাতে চায়, তখন আর একটুও সুযোগ থাকে না কথা বলার—জন্য। —তাই এই মুহূর্তে গৌতম—তার আদর করার

সন্ধ্যাকে ঘনভাবে অধরালিঙ্গনে টেনে নেওয়ায়—স্ত্রীর পক্ষে কোন অনুযোগভরা কথায় আর ঝলমলানো সম্ভব হ'ল না। এমনভাবে সাত-সকালে অফিসে বেরুবার পথেতে—স্ত্রী সন্ধ্যাকে করা আদর-সোহাগ দেখলে পর মনে হবে—স্বামী গৌতম যেন অনেক দিনেরই জন্য কাছ-ছাড়া হয়ে কোন দূর দেশের পথেতে—পাড়ি দিচ্ছে। হ্যাঁ, তাই যেন প্রিয়াকে অনেক দিনের জন্য দেখতে পাবে না!—ঠিক তা ভেবেই তৃষিত দেহমনের উৎফুল্লতায় নেচে-নেচে—বরনারী সন্ধ্যাকে আশ মিটিয়ে আবদারী-আদর কোরে তোলে—লাজে-লাজে নিলাজিতা। আর দোদুলা।—কিন্তু গৌতমের ভালো লাগলেও,—এমনটা এই ফর্সা আলোর মধ্যে পেতে সন্ধ্যার একান্ত যুবতী-মনখানার কাছে মোটেই সুন্দর লাগে না। সন্ধ্যা চায়—'আমার গৌতমের এ সব দুষ্টু-দুষ্টু আদরগুলো ঝরুক মুষলধারে সেই নিভৃতির 'সন্ধ্যা'য়। হ্যাঁ, সেই নিরালার নিঝুম-নিঝুম রাতের গহন আঁধারে যে প্রহরগুলো ফুটে-ফুটে ওঠে প্রমত্ত হ'য়ে—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই ত' হ'ল আমার আদর করার, আর আমাকে নিলাজ করাবার প্রশস্ত সময়। ধ্যাৎ, গৌতম যে কি না! সময়-অসময়ের ধার মোটেই ধারে না। এমনি ওর ভালোবাসা জানাবার স্বভাবখানা। দ্যুৎ। কী যে না!'

আজও গৌতমের কাছ থেকে সাত-সকালে তেমনি প্রণয়ের ঝড়ে পথ হারিয়ে শিউরে-শিউরে কেঁপে উঠে—সন্ধ্যা তাই আবার ভাবলো। না চাইলেও এই অনির্বচনীয়তার আবেদনটি—গৌতমের করা অধরের আদরকণা ধরে-ধরে—স্ত্রী সন্ধ্যার দেহে—আবেশ ধরালো। ঠিকই। চোখ দু'খানা আমেজে তাই বন্ধ হ'য়ে যায় তখন প্রিয়ার। তবু মুখ ফুটে অস্ফুটে কথা বেরুবার মতো দুটি ঠোঁটে বিন্দুপরিমাণ ফাঁকটিকে পর্য্যন্ত—দুরন্ত স্বামীরই মুখের দস্যুময়তা আবরিত ক'রে রাখলেও—তারই মধ্যে দ্রুত একটা বিকর্ষণ সত্যি ফুটে ওঠে। সন্ধ্যার, চুমায়-চুমায় বিপর্য্যিত — ঠোঁট দু'খানায় জাগা সেই অশ্রুতপূর্ব কথায়।

আজও অন্য দিনের সকালের মতোই গৌতম বেশ কয়েকটি পলক ও-ভাবে আবেশেরই নিঝুম ঘরেতে নিলাজে কাটিয়ে ওঠার পর—দু'হাতের বাঁধনে সন্ধ্যার কাঁধ শক্ত ক'রে ধ'রে জানালো—

—"সন্ধ্যা। আমার মিষ্টি। এই ? এবার তুমি সন্ধ্যা, কেমন ?" কিন্তু সেই মুহূর্তে সন্ধ্যা নিজেকে স্বামীর কবোষ্ণ ছোঁয়ার মাদকতা থেকে জোর ক'রে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'রেই বলল—

—"না। না। বার বার বলি, সকালে আমায় আর এমন ভাবে দুলিয়ে দিও না। কিন্তু তুমি তা শোন না কিছুতেই। বল, সব সময়ে ভালো লাগে ? এই, অনেক হ'য়েছে। আর দেরি করে না। ও-দিকে তোমার নির্দিষ্ট ট্রেনখানাকে হয় ত ফেল ক'রে বসবে। না, না। কিছু হ'বে না। কিছুটি এখন পাবে না। আর আমি দেবোও

না তা আমার কাছ থেকে পেতে। সত্যি বলছি। হ্যাঁ পাবে। খুবই পাবে—তবে এখন আর নয়। আগামীকাল সকালের জন্য ডবল্ ভাবে জমা রেখে দিচ্ছি—আমারই কাছ থেকে পাওয়ার—পাল্টা আদরটিকে। —অবশ্য মস্ত শর্ত থাকছে। সত্য থাকলো এই, যে, আজ তাড়াতাড়ি অফিস ছুটির সঙ্গে সঙ্গেই—বাড়ী ফিরতে হবে। হ্যাঁ, কথা দাও—সত্যি-সত্যি ফিরবে বলে ? ফিরবে ঠিক-ঠিকই ? তাড়াতাড়ি ? কেমন ? শোন গৌতম, যদি না ফের তা হ'লে আজ রাতেতে, হ্যাঁ, —সত্যি বলছি। তা হ'লে আজ সত্যিই একটা কিছু...না, না। থাক। যখনকার যা তখনি দেখা যাবে 'খন। এই গৌতম, বলছি ত' আজ আর পাল্টা আদর না হয় নাই পেলে !"

বলতে বলতে থামলো সন্ধ্যা। ঝলমলালো আমেজ মুখর হাসিতে। স্বামীর কপোল বরাবর নিজের মুখের একটি ধার ছোঁয়ালো। আস্তে আস্তে বলল—"এই, তুমি বল যে, আমি কখনো কারুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রতে পারি না, এই ত ? তা গৌতম, আজ তুমি যদি কথা না রাখতে পার, তাহ'লে তুমি দেখবে এই সন্ধ্যা কেমন ভীষণ ঝগড়াখানাই না ক'রে বসে ! হ্যাঁ, হ্যাঁ। সত্যি বলছি।"

"তুমি, মানে সন্ধ্যা তুমি ঝগড়া ক'রতে পারবে কী ? ওগো দুষ্টু মেয়ে, মনে হয় তুমি তা পারবে না।"

তাই বলে প্রিয়া সন্ধ্যাকে এই ফুটফুটে রোদ থেকে মধুর ভাবে ঝলকিত সকালটিতে—আরেকবার, মানে বাড়ী ছেড়ে বেরুবার আগে শেষ বারের মতো—নিজের হাতের ছড়ানো বাঁধনটি সঙ্কুচিত করার মধ্যে—গৌতম কাছে আটকালো। ঘনতর করালো। আর তখনি সন্ধ্যার কাকলীকথা ঝরে পড়লো মেয়েলি ভয়কাতরতায়—

—"এই গৌতম, ও কি কোরছো ! দ্যুৎ। লাগছে বড়। সত্যি ব্যথা দিচ্ছ। ছাড়ো। তা না হ'লে এখনি হয়ত আমি কেঁদে ফেলবো। সাতসকালে প্রিয়ার চোখে জল দেখে অফিসের পথে পা বাড়াতে কী তোমার ভালো লাগবে ? তবে ছেড়ে দেও এইবারটি। ঈষ্, কি যে না তুমি ! ছাড়ো, লক্ষ্মী ছেলে। লাগছে সত্যি। এ ত' দুষ্টুমিপনা নয় ! এ যে নিখুঁত দস্যিপনা ! বাব্বা। চোখের জল ঝরাবার কথা বলতে না বলতেই দেখছি লক্ষ্মী ছেলেটি হ'য়ে উঠেছো। গৌতম, শোন মাথার দিব্যি রইলো, আজ কিন্তু তোমার তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা থাকছে মনে রেখো। এই, বুঝলে গো ?"

বলতে বলতে—সকালের এই আমেজ থেকে মধুরতায় নেচে উঠে সন্ধ্যা তার স্বামীর দস্যুবৃত্তিতে এই একটু আগে পর্য্যন্ত মেতে থাকা অধরের ওপরেতে—আপন অধর নিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললো —কাটা কাটা কথায়—আর ঝলকানো গলায় সুরেলা ক'রে—

—"দুষ্টু ? বলি চোখ বোজো। আর, আর, এই গৌতম, একবার পেলেই খুশী হবে ত' ?"

চোখের সুন্দর দৃষ্টিখানা পাতার ফাঁকে ঢাকতে ঢাকতে বলল গৌতম—"ঈষ্। একেবারেই কি খুশী হবো! সন্ধ্যা, যদি না হই ?"

মেয়েলি ভয়কাতরতায় সাজা মুখের অভিব্যক্তি নাচিয়ে সন্ধ্যা জানালো—"এই ত' মুস্কিলে ফেললে দেখছি! তুমি ত' বয়েসে আমারই সমান। মাত্র সপ্তাহ খানেকের মতো বড়। —বলি অন্তত তুমি ত' আমাদেরই টুলটুলের মতো অবুঝ শিশু নও ? আর তুমি ত' হলে ওরই বাবা। দ্যুৎ। ও না হয় আমার কাছ থেকে অমন আদরখানা বারংবার চেয়ে-চেয়ে—ওরই ছোট মুখখানাকে আগাগোড়া ভরিয়ে নেওয়াতে পারে। কিন্তু ওর বাবা হ'য়ে তাই বলে কী ওরই মায়ের কাছটি থেকে—এত বেশী ক'রে এইসব আদর চাওয়া যায় ? ভারী দুষ্টু তুমি। টুলটুল এখন ও-সব বোঝে না তাই আর কি! ও যদি বড় হয়ে জানতে পারে, যে, তুমি তার মায়ের কাছ থেকে—ওরই শুধুমাত্র আবদার করার এক্তিয়ারগত আদরগুলো থেকে—দস্যুর মতো খালি লুট ক'রে-ক'রে কেড়েই নিচ্ছ—কি সময়ে, কি অসময়ে,—তা হ'লে দেখো ও তোমায় কেমন জব্দ করে। ঈষ্। টুলটুল এমন অবুঝ আর ছোটটি বরাবর থাকলেই বড় ভালো হয়, না ? থাক, থাক। আমি কিন্তু এখন একবারের বেশী আর দুবার আদর কোরতে পারবো না। তা আগেই জানাচ্ছি। রাজী না হ'লে আমার করার কিছুটি নেই।"

প্রিয়ার পিঠময় হাতের তাপভরা আদর মাখাতে মাখাতে গৌতম তখন হাসতে হাসতে রঙীন হ'য়ে বলল—

—"বেশ। রাজী আছি। তবে তোমার দেওয়া ঐ একবারটির মতো আদরখানাকে—তুমি লক্ষ্মীটি মুহূর্তেই থামিয়ে দিও না কিন্তু। হ্যাঁ, করাবে তা বিলম্বিত। ছন্দিত। ঠিক-ঠিক, তাই আর কি। দেখ সন্ধ্যা, ওদিকে আবার দেরি হ'য়ে যাবে যে! সন্ধ্যা, এই ?"

তৃষ্ণাভরা অধরেতে সকালের সোনা রঙ্ নাচিয়ে—আর চোখের কালো কালো মণিতে খুশী হতে চাওয়ার ছবি দুলিয়ে—নিজের জানানো দুষ্টু আবদারখানায়—স্বামী গৌতম সত্যি এক অসহায় যুবকেরই মতো যেন ভেঙ্গে পড়লো। —প্রিয়ারই বুকের সপেশল—আরাম দরিয়ায়।

প্রিয়া সন্ধ্যা এইবারটি মান-অভিমানের রেশ থেকে প্রভাতেরই আতপ্ত সোনা রঙ-রোদেতে ঈষৎ তাতিয়ে ওঠায়—শেষ পর্য্যন্ত আদর দিয়ে স্বামীর প্রতি—সারাদিনমান ধরে কাজ করার জন্য—উৎসাহ ভরাট দীপখানাকে চাইলো জ্বালিয়ে দিতে। সাজিয়ে দিতে। —তাই এবার হাতের বালা-চুড়িতে রিনী-থিনী আওয়াজ

কোরতে থাকা—দু'খানা হাতেরই প্রসারণেতে রাখা বিস্তৃতিটি সংক্ষিপ্ত করাতে-করাতে—প্রিয়ার প্রেমডোর করালো সঘন। কংক্রীট। যেন হৃদয় দিয়ে হৃদি।—স্ত্রী সন্ধ্যা তার সুন্দরী বুকের মাধবীরাগ ঘেরা আপীনতার যাদুময়তাতে—অতি মধুরভাবে পরশ ভরিয়ে—আরামঝরার সুখ লাগালো—স্বামী গৌতমেরই কবোষ্ণ বুকখানার অধিত্যকা প্রদশেতে। যুবকের বুকের সুখ নাচলো—খুশীয়ালিনী মধুরিকারই ছবি হ'য়ে ছন্দিত থাকা, সেই বক্ষসাজের দু'ধারার—বৃন্তে বৃন্তে মিতাক্ষর হ'তে না পারা—পাহাড়ী পথেরই মতো দু'ধারের উদ্ধত থাকা—পীনোতায়। সকালের সোনা রঙ্ রোদের তাপ-ম্লানিমা ঈষৎ ভাবে যেন তাতল—সৈকত ক'রে তুলেছে।—আটপৌরে ছাঁদে পরা সন্ধ্যার ভাঁজ-ভাঙ্গা রেশমী শাড়ীর আঁচলের ভেতর থেকে—ঢেউ খেলানো রূপবতী বুকখানার শৈল্পিক সুষমার ওপরে—সেই তাপ ঝরছে এখনো। হ্যাঁ, তারই উদ্ধত বঙ্কিমাতে। এ রূপ দেখিয়ে আর সাজিয়ে—প্রিয়া তার স্বামীর যুবকত্বকে শ্রীরাধার মতো সুভাষিত ক'রে বলতে চায়—

"মৃগমদ বলি ঝাঁপিয়া কাঁচলি রাখিব হিয়ার মাঝে ;
তোমার বরণ বসনে ঝাঁপিয়া রাখিব লোকের লাজে॥
কিম্বা কেশপাশে কুবলয়-দামে রাখিব যতন করি।
একলা হইয়া মুকুত করিয়া দেখিব নয়ান ভরি॥"

প্রিয়া তার যুবতী দেহময়তার কারাপ্রাচীরেতে—প্রিয়কে যেন আড়াল করাতে করাতে, আর মধুছন্দার হাসিতে দুরন্ত হ'য়ে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে—শেষ মুহূর্তে অধরের অনির্বচনীয় আদর ধারাটিকে লুটিয়ে দেওয়ালো—স্বামী গৌতমেরই তৃষায় নাচানাচি করা অধরেতে ছাপা—সাত-সকালের ঐ সোনা রঙ রোদ ঢেকে দিয়ে।

প্রিয়র করা এই বিশেষ ধারার আবদার মেটাবার জন্য—প্রিয়া যে লাজময় আদরটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়ালো চোখে-মুখে—তারই অভিব্যক্তি খুব ছোট্ট ছোট্ট শব্দ হয়ে-হ'য়ে—বার কয়েকের জন্য ছোট-বড়-মাঝারি লয় ঝরে-ধরে—ফুটলো। ফুটতে ফুটতে প্রিয়ার অধর দিয়ে করা কারুকাজের সিক্ততায় ভিজতে-ভিজতে—সে শব্দ-মুখরতা ম্লান হ'তে-হ'তে মিলিয়ে গেল—গৌতমেরই অধর বরাবর। তারই মিষ্টি খুশীতে নেচে ওঠার—ছন্দে ছন্দে। যতিতে যতিতে।

হ্যাঁ—সকালের চনমনে সোনালী রোদ মাখতে মাখতে—ষ্টেশনের পথেতে পা বাড়াবার আগে রোজকার অভ্যাস মতো—প্রিয়ার অধরাধারের সুরভিতে বন্দিত স্বামী—স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণময়তায় মশগুল থেকে বেরিয়ে পড়ে—অসম এক খুশীর মাতনে, নাচতে-নাচতে।

তারপর রোজই শেষটায় সন্ধ্যা যেমন ক'রে থাকে—তেমনিভাবে শাড়ীর আঁচল হাতে নেয়। —স্বামীর অধরের ওপরে ওরই দুষ্টুময়তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে

জানানো—প্রিয়ার আপন দুষ্টুপনায় ঝরা চুমার সিক্ততার ছাপা, আলপনার রঙীন রেখাগুলোকে—আঁচলেরই প্রান্ত-ভাগ দিয়ে—মুছিয়ে দেয়।

আর, তারপর সন্ধ্যা আবার বলে ওঠে কল্‌কলানো স্বরলহরেতে—

—"শোন। শোন। দুষ্টু, বলি মনে রেখেছো আজকের ফেরার ব্যাপারে আমার জানানো ফরমানখানা ? না, না। দেরি ক'রলে চলবে না। রোজ কথা রাখ না তুমি ! আজ রাখতেই হবে। তা না হ'লে জান ত' গৌতম—"

বলতে বলতে কথা শেষ না ক'রে সন্ধ্যা তার মদিরাভরা চোখেতে এখনো আবছায় ফুটে থাকা—সেই গত সন্ধ্যায় করা কাজল-প্রসাধন ছাপিয়ে—হঠাৎই যেন ছলছলালো। —আর সন্ধ্যার দু'খানা ঠোঁটেতে রাঙানো লাল রঞ্জনীর সাজখানা গত রাতের প্রণয়-দুষ্টুমিতে ধুয়ে-মুছে যাওয়ায়—সেখানকার শুভ্র হাসিটা এখন কেঁপে-কেঁপে উঠলো।

কয়েক পলক মাত্র। তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে প্রিয়া সন্ধ্যা মধুরিকার মতো বলে উঠলো, ছন্দিত গলায়—

—"না, না। ও কিছু না। শোন গৌতম। লক্ষ্মীটি, ফিরে এসো তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, আমার বুঝি অত রাত পর্য্যন্ত একলা থাকতে ভয় করে না ? টুলটুল ত' সন্ধ্যা হ'তেই ঘুমিয়ে পড়ে। ভাবো ত' দেখি আর তখন থেকে আমার অবস্থাখানা কেমন নিঃসঙ্গ হ'য়ে পড়ে ? এই, আজ তাড়াতাড়ি ফেরা চাই-ই-চাই। ঠিক ত ?"

সুন্দর এক মনোলোভা হাসি ছড়িয়ে গৌতম জানালো—বাংলোর জাফরি দিয়ে ঘেরা সিঁড়ি থেকে হলদে পাথরে ছাওয়া—ঘুটিঙ বাঁধানো পথখানায়—নেমে দাঁড়াতে দাঁড়াতে—

—"ঈষ্‌! না এলে তোমার করা রাগ আর অভিমান দেখার মধ্যে কিন্তু বেশ মজা পাবো। এই, এই ? দেখ ত' আবার অভিমান ক'রে সন্ধ্যা তুমি ছোট্ট মেয়েটির মতো যে ঠোঁট ফোলাচ্ছ! বাব্‌বা। দুষ্টু মেয়ে, তুমি শুধু থেকো মিষ্টি। শুধু মধুরিকাটি। মাঝে মাঝে দুষ্টুকা হ'য়ো অবশ্য। —তাই ব'লে চোখের পাতায় ফোটাবে কেন ছলছলানো সজল ভাবখানা ? দ্যুৎ। শোন সন্ধ্যা, ঠিক ফিরবো সময় মত। ফিরতে খুবই চেষ্টা কোরবো। আর একটা কথা। সন্ধ্যা, শোনো ? এই, একটু কাছে এসো।"

বলতে বলতে সিঁড়ির শেষে—পর-পর দু'খানা ধাপে উপরে-নীচে ক'রে পা দুটির অবস্থান রেখে—গৌতম হাত বাড়ালো ওপরের দিকে। মধুর হাসির স্ফূর্ত গমক লাগালো স্ত্রীর প্রতি। দু' একটা ধাপ নেমে নীচেকার সিঁড়িতে—সন্ধ্যা সামনাসামনি প্রায় হ'য়ে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই ছান্দস্‌ কাকলীতে বলল সন্ধ্যা—

—"ঈষ্‌। আজ কিন্তু অফিসে বেরোবার আগে যেন তোমায় পেয়ে বসেছে—দুষ্টুপনার দুরন্তময়তা। বাব্‌বা। আর সিঁড়ির ধাপ ভেঙ্গে হ'তে পারবো না তোমার

মুখোমুখি। ভয় হচ্ছে। এখনই বোধ হয় আবার দুষ্টুমির পাগলামিতে মেতে—আমায় ছোট্ট টুলটুলের মতোই বুকে টেনে নেবে। তারপর দারুণ ভাবে জড়িয়ে-জড়িয়ে ধরবে ত'? ঈষ্। আর কাছে আসছি না দুষ্টু। ওখান থেকেই বল না কি বলবে। গৌতম, এই তোমার যে সত্যি দেরি হ'য়ে যাচ্ছে?"

প্রিয়ার থেকে অল্প একটু ওপর-নীচের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে থেকেই—গৌতম দু'হাতের আদরকে একটু ওপরের দিকে প্রসারিত ক'রে সন্ধ্যার রুচিস্নিগ্ধ মুখখানা ধরে নিয়ে বলল—"শোন। তাড়াতাড়ি ফিরবো। তবে আজ কিন্তু তোমায় সাজতে হবে আমারই ফরমায়েশী পোশাকে। লাল ব্লাউজে। লাল শাড়ীতে। লাল ওড়নায়। শুধু রেশমে। আর রেশম সাজেতে। লাল ভেল্‌ভেটের স্লিপার থাকবে অলক্তকলেপা পায়েতে। কপালের কেন্দ্রস্থ সিকির মতো সিঁদুরের বড় টিপ্‌টির দু'ধার দিয়ে কপোল অবধি নেমে আসবে—চন্দনের লবঙ্গ ছাপ। গলায়-হাতে-কবরীতে থাকবে জুঁই ফুলের হার। রজনীগন্ধার বালা। আর মালা। সাজবে তুমি ফুল সাজে। প্রতীক্ষা কোরবে। আমি আসবো তাড়াতাড়ি। এসে তোমারই জন্য তৈরী করাবো নিজেকে। তারপর তুমি নিজেকে তখন—নতুন থেকে নতুনতর ক'রে ক'রে—আমার কাছটিতে হবে সমর্পিতা। কেমন? শোন, শোন। মান-অভিমানও যদি পার ত' সে সব তুলবে ফুটিয়ে অমন ভালোবাসার নিভৃতিটি ধরে-ধরে। ঠিক, তাই? এই, এবার চলি। তা না হ'লে নির্ঘাত আজ ফেল কোরবো আমার ক'লকাতা পৌঁছানোর নির্ধারিত ট্রেনখানাকে। এই, হেসে ফেল ঝলমলিয়ে। সন্ধ্যা, গেট পেরিয়ে যেতে-যেতেও যে তোমারই মিষ্টি হাসির রিনী-ঝিনী সুরখানা বাজতে থাকে অনবরত আমারই মন্‌মহলের ছন্দে। দুষ্টু, আসি তা হ'লে।"

কথা শেষ কোরলো। প্রিয়ার আরক্তিম মুখখানাকে হাতের আদরে আর একটু ঘনভাবে আরাম ছোঁয়াচের উষ্ণতায় ভরালো। তারপরেই প্রিয়ার দিকে পেছন ফিরে হলদে কাঁকর বিছানো পথখানায় নেমে—চলতে লাগলো—জুতোর মচ্ মচ্ শব্দতে মাতিয়ে। বারেকের জন্য পেছনে মুখ ফিরিয়ে—স্ত্রী সন্ধ্যার প্রতি ছুড়ে দিল দুষ্টু হাসিরই—গমকমালা। প্রিয়াও তেমনি হাসির মাধুরীতে জানাতে লাগলো সানন্দ বিকাশ। চৌকাঠের গায়ে নিজের ছবির মতো শরীরখানাকে হেলিয়ে দিয়ে রেখেছে। আবেশের মাদকতায় যেন প্রিয়া আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।—এমনি ভাবখানায় ফোটা মূর্তি নিয়ে দেখছে—চলতে চলতে তারই দিকে পেছন ফিরে-ফিরে তাকাতে থাকা—স্বামী গৌতমের সুন্দর মুখটিকে। প্রিয়র সহাস ঘেরা মুখের দুষ্টু ঝরনাটিকে। আর তাই দেখে নিজেও সেই হাসির সাথে সাথে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে চলেছে। সন্ধ্যা মনে মনে বলছে—অস্ফুট ক'রে—"আমার গৌতম। আমার দুষ্টু ছেলে। আজ কিন্তু ফিরে এসো তাড়াতাড়ি। বিকেল গড়িয়ে ঠিক সন্ধ্যা হওয়ার মুখোমুখি। আচ্ছা,

সকালে যেমন সাত-তাড়াতাড়ি অফিসের জন্য বেরিয়ে পড়, বলি, ঠিক তেমনি কী ঘরে ফেরার জন্য ফিরতে পার না—দেরি না ক'রে ? আমি যে একলা থাকি তুমি যতক্ষণ না ফিরে আসছো ! সেটা ভুলে যাও কেন ? তুমি যাওয়ার পর সেই সকাল থেকে দুপুর পার করিয়ে বিকেল গড়ানোর পর—আস্তে আস্তে ফুটে উঠতে থাকা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—কোনো রকমে নিজেকে স্থির রাখি। —নানান কাজের তদারকি করার মধ্যে—মেয়ে টুলটুলকে কোলে-পিঠে রেখে-রেখেই। একলা ওকে রেখে কাজ ক'রতে মন চায় না। যতক্ষণ ঘুমায় ততক্ষণ শুইয়েই রাখি দোলনায়। যখন জেগে থাকে—তখন কোল ছাড়া করি না। ভয় কী জান ? ভয় এ জন্য, যে, তোমার অনুপস্থিতির মধ্যে মনে জেগে ওঠা একাকীত্বের নিঃসঙ্গতাকে কাটাবার জন্য—ছোট্ট টুলটুলকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখি। ওর হাত-পা নেড়ে, মুখেতে খৈ ফোটানোর অভ্যাসের সাথে—আমিও যোগ দেই।—ওকে আদর মাখাতে মাখাতে। রোদ পশ্চিমের দিগন্তে—মাটির শেষ সীমানা ছুঁয়ে হেলে না পড়া পর্য্যন্ত—মালি. চাকর, ঝি, দরোয়ান, তোমার শখের করা পোলট্রির ছোট-ছোট ঐ দুটি ছেলের সাথে কাজে আর কথায় সময়টা বেশ কেটে যায়। তারপর সন্ধ্যা ছাড়িয়ে রাত যখন গভীর হ'তে থাকে—তখনই আরম্ভ হয় আমার মধ্যে অস্বস্তিকর বিরক্তিখানা। আমাদের এই বাংলোখানায় অবশ্য পল্লীগাঁয়ের রাত—তার পাখায় বিস্তার করা কালো আঁধার দিয়ে ঘন ভাবে ঢাকতে পারে না ঠিকই। বাংলোর চারধারে অন্ধকার ঐ রাতের মাধুর্য্য ছড়িয়ে দিলেও—ভেতরের ওপর আর নীচের প্রতিটি ঘরেই জ্বলতে থাকে ঝকমকে বিদ্যুতের আলো। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই দরোয়ান এসে সুইচ্ অন্ ক'রে দেয়—নতুন লাগানো—হোম জেনারেটরটির। ঘরে ঘরে আলো থাকে ঠিকই। তবু যেন কেমন-কেমন লাগে কৈ, ছুটির দিনে তুমি যখন কাছে থাকো তখন ত' আমি বেশ—স্বস্তিরই মধ্যে থাকি ! আর অন্য দিনগুলোতে—তোমার ফিরতে দেরি হওয়ারই সাথে মিল ধরে যেন আমি ডুবে যাই—বিরক্তিকর অস্বস্তির মধ্যে ! না, না। তুমি গৌতম আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। —কেন ভালো লাগে না তা আজ জানাবো। তোমারই ফরমায়েশী সাজখানায় ঝলমল কোরতে কোরতে—তোমারই হাতের আলিঙ্গনে প্রসারিত করা বাঁধনে ধরা দেবার জন্য—বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বো। হ্যাঁ, তারপর পরম স্বস্তির সঙ্গে জানাবো, কেন আজকাল রাত গভীর হ'তে থাকলেই আমি কেমন যেন অস্বস্তিতে ঢাকা পড়ে যাই। আর তারপর রোজকার মতো সন্ধ্যা গাঢ় হ'তেই—ঘুমিয়ে পড়ায় টুলটুলকে এই সময়টায় কোল-ছাড়া ক'রে—ওরই ছোট্ট খাটখানায় শুইয়ে দেই। হ্যাঁ গৌতম, ঠিক তখন থেকেই আমার দেহে আর মনে অস্বস্তির সঙ্গে জুড়ে বসে—এক ধরনের ভয়। ভয় পেয়ে আমি তা সহজে কাটিয়ে ওঠাতে পারি না এই পল্লীর অতি নির্জন পরিবেশখানারই কতগুলো বিহ্বলতার মধ্যে থাকায়। তখন

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে পর—ভয় লাগে। ভয় পাই। বাংলোর পেছনে তখন ঘুটঘুট্টি অন্ধকার—কোন না জানা রহস্যময়তার জাল হয় ত' বুনে-বুনে চলেছে। অনেক দূরের ঐ গোয়ালের আটচালার ভেতরে—টিম্‌টিম্‌ ক'রে জ্বলতে থাকা হ্যারিকেন নিয়ে—মাঝে মাঝে মধু গোয়ালাকে দেখা যায়। আর কিছুটি নয়। আর বাংলোর সামনের জানালায় এসে বাইরের আঁধারের প্রতি আমার ভয় জড়ানো চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে দেখতে পাই—বেশ অনেকটা দূরে, যেখানে আমাদের বাগান বাড়ীর এই হলদে কাঁকড়ের পথ শেষ হয়েছে ফটক পর্য্যন্ত,—হ্যাঁ, ঠিক তারই বাঁ দিকে একজন নিঃসঙ্গ মানুষের পক্ষে শুধু হাত-পা ছড়িয়ে ওঠা-বসার মধ্যে সংসার পাতাবার মতো ঐ টালির ছোট্ট ঘরখানায়—বুড়ো দরোয়ান রামকিষেণকে দেখা যায় শুধু। —কেন না হ্যাজাকের প্রজ্জ্বলিত আলো একই সঙ্গে ওর ঘরখানা এবং ফটকের আশে-পাশে—মায় জেলা বোর্ডের সড়ক পর্য্যন্ত ছটাকখানা রাস্তা ক'রে রাখে—আলোকময়। তবু চারধারে ঘনভাবে সুবিস্তৃত আঁধার দেখে-দেখে মনে হয়—আলো যেন আঁধারের বুকেতে আছড়ে পড়ে—ভালোবেসে চলেছে। আর চোখে পড়ে—বুড়ো রামকিষেণকে। তার পাকা শনের মতো একরাশ চুলে ভরা মাথাখানা দোলাচ্ছে, আসন-পিড়িতে বসার মতো—বসে-বসে। —আর সামনেকার ছোট্ট বইদানিতে হেলিয়ে রাখা সেই তুলসীদাসী রামায়ণখানা—ওদেরই মৈথিলী ঢং-এর সুর ধরে-ধরে পড়তে দেখা যায়। অবশ্য এ মুহূর্তটি আমার দেখতে বড় ভালো লাগে। একটু স্বস্তি পাই। জান গৌতম, ও যেন মস্ত এক অনির্লিপ্ততা। এক মস্ত নির্বিকারচিত্ততা। দায় নেই বাঁধন নেই। কোন দাবী-দাওয়া পর্য্যন্ত নেই। দু'বেলা নিজের হাতেই যা হোক ডাল-ভাত কি দু'একটা ভাজাভুজি তৈরী ক'রে খাওয়ার মধ্যে—যেন থেকে যায় পরম খুশী! হ্যাঁ-হ্যাঁ, যখন ভয়-ভয় ভাব আমায় জড়িয়ে নিয়ে শুধু ভয় পাওয়াতে চায়—তখন আমি এই জানালাটিতে এসে দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে সত্যি স্বস্তি পাই আর তোমার ফিরতে দেরি হওয়ার প্রতিটি মিনিট গুনতে গুনতে আমি অধীরভাবে দাঁড়াই কিছু সময়।—আবার কিছু সময় একটা বই নিয়ে মনোযোগী হবার জন্য পড়তে বসি—টুলটুলেরই ছোট্ট খাটখানার পাশটিতে। তবু কি জান গৌতম, এখনও তোমার একটা জিনিস জানানো হয় নি বলেই—তোমার ফিরতে দেরি হ'লেই—আমি ভয় পাই। ভয় পেয়ে সময়ে সময়ে—হয় ত' অযথাই আঁতকে উঠি। মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে থাকা টুলটুলকে বিছানা থেকে তুলে বুকে জাপটে রেখে কেঁদেও ফেলেছি! না-না। তুমি তাড়াতাড়ি এসো। আজ নিশ্চয় বলবো,—কেন আমায় এ ধরনের ভয় কিছু দিন হ'লো আঁধার গভীর হ'তে না হ'তেই—জড়িয়ে ধরছে। আজ, হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যার মধুক্ষরা মুহূর্তটিতে তুমি এসে আমায় পাবে আমারই যথার্থ রূপঝরনারই মধ্যে। কলোচ্ছলতায়। গৌতম, আমার আদর আমার মধুর।

তুমি এসো কিন্তু কথা মতো। প্রিয়ার দিব্যি রয়েছে তোমার আজ অন্তত দেরি না করার জন্য! জান গৌতম, তোমার এই দুষ্টু প্রিয়াটি তার স্বামীর যৌবনেতে সন্ধ্যার রঙীন মেঘ হ'য়ে সাঁতার কাটার জন্য—রোজই তৈরী রাখে নিজেকে।—হ্যাঁ গৌতম, তোমার এই আদরণীয়া স্ত্রী তোমারই দেহসায়রে অনুরাগ ভরিয়ে ডুব-সাঁতারে মিলে-মিশে যাওয়ারই জন্য—যাতে কোন কণামাত্র বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি না হয়, —হ্যাঁ, ঠিক তারই শঙ্কায় চালিত হ'য়ে-হ'য়ে—আমি আমার বুকখানার যুবতী লজ্জাধারকে কোন আবরণের লজ্জাভারেতে আবরিত রাখি না। শ্বেতশুভ্র কঞ্চুলিকার মঞ্জুলিত ঊর্মিময়তায় পবিত্র চন্দনের বিলেখনে ফোটাই না কোন—মৃগমদ চিত্রপাঁতি। আর আমার গলা থেকে ঝুলিয়ে রাখা সোনার দ্যুতি-ঝলকিত করা কোন হারখানা পরি না, এ জন্য, যে, তা পরলে পর হয় ত' তোমারই বিশেষণে অভিনন্দিত—আমারই মনোলোভা বুকখানার যুবতী-অনিন্দ্যতায় রিমঝিম করা লজ্জাধারেতে—অস্বস্তির আবরণ দিয়ে থাকবে—ওরই মুক্তা বসানো লকেটের দোদুল ছোঁয়া লাগাতে-লাগাতে। কেন জান? গৌতম, তোমারই জন্য আমার এই অনয়া আরাধিতার মতো রূপ গ্রহণ করা। এ আঁধার ঘন হ'তে থাকার মুহূর্তে একাকিনী আমার কাছটি থেকে ত' তখন তুমি থেকে যাও যেন—ছোট-ছোট নদী বা কোন পাহাড়েরই দূরত্ব ধরা—ছাড়া-ছাড়িতে। তাই আমার মনের যুবতী শখ চায় প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধার মতো—

"চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা।
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কি না কহলা।।"

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হ'লো আমার মতো এক আধুনিকারও দেহমনের—মিলিত আকুলতা। ছন্দিত বিলোলতা। তারপর বুঝলে গৌতম, আমার মনে কবি বিদ্যাপতি আশ্বাসের বাতিদানটি জ্বালিয়ে দেন এই নিরিখেতে, যে, তুমি যত দেরিই কর না, —তবু এখানে ফিরে আসবে ঠিকই। আমার বাড়ীর আঙ্গিনা ছেড়ে, —আমার বুকের প্রণয় ঝরনায় সাঁতার কাটতে না চেয়ে,—ওগো গৌতম, তুমি সাত সকাল থেকে অনেক রাত পর্য্যন্তই যে থেকে যাও—'আন' জায়গায়। —মানে তোমার ক'লকাতার কর্মস্থলে। তাই তোমারই অনুপস্থিতি বিলম্বিত হওয়ারই দরুণ মনে হয়—"আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।

পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরজ ধরয় চিতে মিলব মুরারি।।"

হ্যাঁ। সত্যি বলছি। ওগো গৌতম, তুমি আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। তোমার কাছে ধরা দেবো আজ একেবারে নতুন সাজেতে। নতুন আস্বাদনে। স্বাধীনা রাধার মতো আজ সন্ধ্যায় প্রিয়ার দেহসাহরে পরাবো—লাল রেশমের আবরণ। আর নানান ফুলের অলঙ্কার। তুমি গৌতম আমার ঐ বাসকসজ্জাখানাকে শুধু ফুলের বিছানায়—তোমারই সুনন্দিত স্বামিত্বের প্রণয়কলায় করাবে—এলোমেলো। হ্যাঁ, করাবে বিপর্য্যস্ত। না, না। আর আমি কিছুটি ভাবছি না! বলবও না। কিন্তু তুমি এসো। হ্যাঁ, এসো। ঠিকই তাড়াতাড়ি।"

বাংলোর একতলার দরজায়—যেখানে হলদে কাঁকরের পথেতে নামার জন্য সিঁড়ির কয়েকটি ধাপ দু'ধারে ছড়িয়ে গেছে—তারই ওপরের কাঠের জাফরিতে তৈরী প্রায় ছোট্ট এক 'ওয়াচ্-ঘরে'র মতো দেখতে ছাউনির নীচে সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে থেকে—গৌতমের পথ চলার দিকেতেই চোখ রেখে মনে-মনে ভাবলো—এতসব মধু কথার রাগ-আলাপন। হলদে কাঁকর ছাওয়াকে ছুঁয়ে থাকা সিঁড়ির শেষ ধাপে সন্ধ্যা নেমে এসে—কাঠের রেলিঙে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। একটা মোড় ঘুরে গৌতম যখন স্টেশনের পথখানা ধরলো—তখন সন্ধ্যা আর দেখতে পায় না। রোজই যতক্ষণ না গৌতম জেলা বোর্ডের এই মেঠো পথখানার বাঁক ঘুরে পিচের রাস্তা ধরছে—ততক্ষণ পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত চোখের পলক পড়তে দেয় না সন্ধ্যা। তারপর প্রিয়ার মাথার ওপরের জাফরির ছাউনির ফোকরগুলো থেকে ঝরে পড়া সোনা রঙ্ রোদের চক্‌চক্ করা জাল বুনে তোলা আমেজ পেতে পেতে—চোখের প্রায় সজলিত দৃষ্টি ভেজা ভেজা হ'য়ে আসে—গৌতম স্টেশন রোডে ঢুকে আড়ালে চলে যাওয়ায়। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা তখন ভেতরে আসে। ঘরকন্নায় নিজেকে তারপর থেকে মাতিয়ে রাখে।

অন্য দিনের মতো আজ দুপুরে জেগে-জেগে বই পড়া, বা ছবি আঁকা, বা সেলাইয়ের টুকিটাকি কাজ না ক'রে—ঘুমিয়ে পড়েছিল। বেশ অনেকক্ষণই ঘুমিয়েছিল। কী আশ্চর্য্য! পাশেই দোলনার দুলুনিতে ঘুমিয়ে থাকা টুলটুলও আজ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছে! ঘুম ভাঙ্গায় ওর হাত-পা ছুড়ে-ছুড়ে জানানো চীৎকারে—সন্ধ্যা উঠে পড়েছিল ঘুম থেকে। তারপর টুলটুলকে আদর ক'রে দুধ খাইয়ে, সাজিয়ে-গুছিয়ে—অনেকক্ষণ কোলে-কোলে রেখে ঘুরেছিল। ফিরেছিল আধুনিকা সন্ধ্যা মেয়েকে ছোট ছোট আদরে—কোরে তোলাচ্ছিল ব্যতিব্যস্ত। মেয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে গুনগুনিয়ে শোনালো ছড়া।—ঘুরতে-ঘুরতে চলতে-চলতে।—সেই 'আতাগাছে তোতাপাখী ডালিমগাছে মৌ' থেকে আধুনিক ছড়াকার—অন্নদাশঙ্কর রায় পর্য্যন্ত। সুকুমার রায়ের পর সন্ধ্যার সব চাইতে প্রিয় ছড়াকার হলেন—এই অন্নদাশঙ্কর। কেননা তাঁর রচনা করা ছড়ার মধ্যে আধুনিক সমাজের অনেক কথাই উঁকি-ঝুঁকি দেয় বলেই—সন্ধ্যা এত ভালোবাসে। ও মনে ক'রে—

শিশুরা এর মানে না বুঝেও ছড়ার মাধুর্য্য যেমন ক'রবে উপভোগ—হ্যাঁ, তেমনি বড়রাও মাধুর্য্য পেয়ে উপরি পাওনার মতো পাবে—অন্য এক কথা,—যা ছড়ার আকারে জানানো হ'য়েছে। তাই আজ সন্ধ্যা মেয়েকে বুকে চেপে—ওর ছোট্ট মুখখানায় ফোটা জ্যোৎস্নাময় হাসির ওপর-ওপর হাজারবার চুমা খেতে-খেতে—জানালো মৃদুল গলায়—অন্নদাশঙ্করেরই ছড়া। মেয়েকে দোলাতে দোলাতে—সুর ধরে ধরে গুণগুনালো মিষ্টি সন্ধ্যা—"ওঃ টুলটুল। ও দুষ্টু। আমার মা সোনা, জান কি—

'ব্যাঙ্ বললে, ব্যাঙাচ্চি, দাঁড়া তোদের ঠ্যাঙাচ্চি।
তা শুনে কয় ব্যাঙাচ্চি, আমরা কি, সার ভ্যাঙাচ্চি?

—ঈষ্, টুলটুল, তুমি বুঝলে না, না? তবে শোন আরেকখানা—

'আদুড় বাদুড় চালতা বাদুড় বাদুড় দেখ'সে
ট্রামগাড়ীতে ঝুলছে বাদুড় রাত্রিদিবসে
বাসগাড়ীতে ঝুলছে বাদুড় টিকিট না কেটে।
রেলগাড়ীতে ঝুলছে বাদুড় প্রাণটি পকেটে।'

—কী, কেমন মজা লাগছে শুনতে, না? বাঃ, বাঃ। আমার খুকুসোনা। আমার দুষ্টু সোনা। আমার টুলটুলরানী। এবার, এবার তা হ'লে প্যারাম্বুলেটারে শুয়ে থেকে—ঘুরে এসো কেমন?"

বলতে বলতে সন্ধ্যা তার শত আদরের ছোট্ট মেয়ের দেয়ালা হাসিতে ভরপূর মুখখানাকে—শতেক চুমায় ঢাকতে ঢাকতে—প্যারাম্বুলেটারের গদীর বিছানায় শুইয়ে রেখে—রঙীন চাদরখানা পায়ের দিক দিয়ে বুক পর্য্যন্ত টেনে দিল। আর ছোট্ট হাতখানায় কোন রকমে মুঠো করানো শিখিয়ে, ধরিয়ে দিল—একটা প্লাস্টিকের ঝুমঝুমি। তারপর বেশ কিছু সময়ের জন্য সন্ধ্যা পোলট্রির ছেলে দুটোর জিম্মায় ছেড়ে দিল টুলটুলকে। ওরা রোজকার মতো ওকে গাড়ী ঠেলে-ঠেলে সমস্ত বাগানের পথে ঘোরাবে। এই বেশ কিছু সময়টায়—সন্ধ্যা নিজেকে তৈরী করাতে পারে—সাজে-পোশাকে-হাবে-ভাবে। আগতপ্রায় বাসক-সন্ধ্যাটি, গৌতমের সঙ্গে রভসেতে কাটাবার জন্য।

বাংলোর দো'তলার পেছনে—দক্ষিণ খোলা চওড়া বারান্দা। ঐ বারান্দা ঘুরে যাওয়া যায় এক তলাকার প্রশস্ত ছাদে। তার পরেই শ'খানেকের মতো একরের সবজু জমীন। সবটাই ওদের। দক্ষিণের যে প্রান্ত ছুঁয়ে ওদের জমির সীমানা শেষ হয়েছে—ঠিক সেই সীমারেখা ধরে পাহারা দিচ্ছে—দেবদারু গাছের চলমান সারি। মাঝে মাঝে রয়েছে—পাইন আর নারিকেল। হাওয়া যখন দক্ষিণ থেকে তাদের উঁচু হয়ে থাকা মাথা ডিঙ্গিয়ে বাংলোর দিকে আসতে-আসতে, দমকা হ'য়ে পড়ে—তখন

পাইন ও নারিকেলের ঝালরের মতো পাতায়-পাতায় খেলে যায়—দোলনের ঢেউ। তা দাঁড়িয়ে থেকে সন্ধ্যার দেখতে খুবই ভালো লাগে নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোতে,—যখন পাশে গৌতম থাকে না। আর টুলটুলও থাকে না। মনটা খালি ভ্রমর-গুঞ্জনে হতে চায় বিবাগী। হাতের চুড়িতে-বালাতে-শাঁখাতে জাগে—বেলোয়ারী বাজনা।—পলকে পলকে সন্ধ্যার যুবতীকা তখন নাচের রিদম্ ঘেরা অভিমানে দুলতে থাকে। আর মদালসা চোখের মদিরতা অজানতে কখন জানি পদ্মপাতায় জলের মত টলমল করা কয়েক ফোঁটা—মুক্তা-বিন্দুর অশ্রুতে ভরিয়ে তোলায়। তারপর কখন জানি সন্ধ্যারই অজানায়—বৃষ্টি শেষে নারিকেলের মসৃণ পাতার খাঁজ ধরে ধরে চুইয়ে যাওয়ারই মতো ক'রে—সেই জমাট বাঁধা কয়েকটি মুক্তাশ্রু আনন্দেরই সুখী গমকেতে—মুক্তি খোঁজে দু'ধারার—কপোল বেয়ে। সন্ধ্যার মদিরেক্ষণ যুবতীকা তখন—অনুরাগবতী সন্ধ্যার জন্য—নতুন সাজে-পোশাকে আবরিতা হওয়ার আগে—সেই বিকেলের গোধূলিতে হ'য়ে পড়ে কেমন যেন—বিশ্রস্ত। বাঁধনহারা। তাই সুযোগ বুঝে দখিনা হাওয়া তখন পাগলামিতে মেতে ওঠে। হাওয়া নিজের দমকা ঝাপটায়—বিবাগিনী হওয়া যৌবন-স্নাত ঐ পেশল মাধবীরাগে টইটম্বুর বুকখানার লাজ-নিটোলতাকে—বারে বারে চাইছে নিলাজে প্রকট করাতে। সত্যি সন্ধ্যা তেমন মুহূর্তে বুঝেও যেন ইচ্ছা করেই বুঝতে চায় না এ হেন অবস্থায় এটাই, যে—

"ঝরে যায় উড়ে যায় গো আমার বুকের আঁচলখানি
বাধা মানে না হায় গো তারে রাখতে নারি টানি!"

—ঠিক-ঠিক। তাই হয়ে ওঠে সন্ধ্যার মনের সঙ্গে—দেহেরই মিল ধরা এমন উদাসীনতাটি। সন্ধ্যা আজকেরও গোধূলি-লগ্নের মিষ্টি আলোতে—এই প্রশস্ত বারান্দার খোলামেলা পরিবেশের আমেজটি উপভোগ ক'রতে ক'রতে—আপন অঙ্গসজ্জার বর্ণময়ী প্রসাধনে মেতেছে। আবিষ্টা রেখেছে। বারান্দার সবুজ রঙ্ করা কাঠের জফরি বসানো ওপরের ঢেউ-ঢেউ খেলানো সীলিঙের নীচেতে—নিভৃতির প্রসাধন কক্ষটিকে সন্ধ্যা তৈরী করিয়েছে—তার আদরের গৌতমেরই পরিকল্পনায়। শোবার ঘর থেকে বেরিয়েই—এই বারান্দাটি। বারান্দা আর ঘরের একখানা দেওয়াল ঘেঁষেই এই সাজ করার ঘরটি—আর সাজ করার ফাঁকে-ফাঁকে—নিলাজ হওয়ার মতো আব্রু দেওয়া পরিবেশটিকে ঠিক-ঠিকই সন্ধ্যা বজায় রেখেছে।—এই, এইখানটারই খোলামেলা প্রাকৃতিক শোভা—ও মাধুরীর মধ্যে। বাঁশের সরু সরু কঞ্চি চেঁচে-ছুঁলে—রঙীন সুতোয় বেঁধে-বেঁধে বোনা জাপানী কারিগরদের সেই নয়ন-সুখকর 'ব্যাম্বো ম্যাট্রেস্' ছাদের শান্ ছুঁইয়ে, প্রায় ছ'ফুট পর্যন্ত ঝুলিয়েছে ওপরের কাঠের সীলিং থেকে। শুধু পুব আর পশ্চিম দিকটায়। উত্তরে রয়েছে ঘরের দেওয়াল। আর দরজা।

শুধু খোলা রেখেছে দক্ষিণটা পুরোপুরি। কেননা, এখানে থেকে ছাদটা বারান্দার অল্প একটু উঁচু চত্বরেতে ঘেরা কাঠের রেলিঙ্ ছুঁয়ে —সামনে এগিয়ে গেছে প্রায় ষাট কী সত্তর ফুট পর্য্যন্ত। ছাদের শেষে তিন ফুট চওড়া পাঁচিল। কাঠেরই তবে জাফরির কাজ ফোটানো নয়। তারপর থেকে সেই শ'খানেক একরের ফুল ও সবজির বাগান বহু দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে গেছে। তারপরেই ত' কাঁটা তারের ঘনভাবে বেড়া দেওয়া লোহার খুঁটিগুলোর এ-পারে—ওরই সমান্তরালে সারি বেঁধে ঘুরে গেছে—দেবদারু-পাইন-নারিকেল গাছগুলো। —যেন পাহারায়—মোতায়েন থাকে। তাই সন্ধ্যা ভাবে, আর মাঝে মাঝে গৌতমকে শুধায় কথার উত্তরে—"দ্যুৎ। লজ্জা কেন পাবো। এমন সুরক্ষিত দুর্গের মতো বাগান-বাংলোর প্রাকৃতিক ছবিতে মুখর থাকা—এই পেছনকার পুরোপুরি খোলা দক্ষিণায়ণের পথেতে, বল, কার সাধ্য আছে যে, গোধূলির মায়াঞ্জনে রাজকন্যা হ'তে চাওয়া—আমারই আচমকায় লাজ-হারা করানো—দেহখানাকে দেখে ফেলতে পারে ? —লুকিয়ে-চুরিয়ে ? না, তা কেউ পারে না। হ্যাঁ, পারে শুধু একজন। হ্যাঁ, এমন বিশেষ একজন ! যার আমাকে সলাজের চাইতে বরং বেশী মাত্রায়—নিলাজ আর নিরাবরণ সৌন্দর্য্যে দেখে-দেখেও—আশ কিছুতেই যেন মিটতে চায় না ! জান গৌতম, সে কে ? ঈষ্ জান না, না ? তুমি কী তাকে চেন ?"

—সে কথায় দুষ্টু-দুষ্টু হাসিতে ঝলমলিয়ে থেকে কিছুটি না বোঝার মতো ক'রেই বলতো গৌতম—"বাঃ মেয়ে। আমি কী ক'রে তাকে চিনবো বল ? আমি যে নিজেকেই চিনি না যে ! এই, এই ? না, না। আর না। একবারটি শুধু !"—তাই বলতো গৌতম। আর তখনি কিন্তু আরেকবারটি সাঙ্গ কোরে নিত—স্ত্রীর প্রতি স্বামী-দুষ্টু-মানেরই—নিলাজক কৃতি ! তখন হয় ত' ঐ কথাকে পরস্পরের প্রতি চালাচালি করার ফাঁকে—মনে হয় স্ত্রী সন্ধ্যার প্রসাধনে ব্যস্ত থাকারই দরুন খেয়াল থাকতো না মোটেই, যে,—ওর যৌবনের বঙ্কিমায় মঞ্জুষা হ'য়ে ঝকঝক ক'রতে থাকা ভরাট—সুষমাঙ্কিত বুকের লাজরেখার উদ্ধতা—সত্যি কবিতার ছন্দ-সিমফনি নিয়ে—আবরণ-মুক্ত বোতামে ব্লাউজের আড়ালে দেওয়া কারাগার থেকে হ'য়ে পড়েছে—মুক্ত লাজ। তাই সে সময়ে মুহূর্তেকের সুন্দর দুরন্ততায় মেতে—স্বামী গৌতমের দুষ্টুমিতে আনচানানো অধরায়ন—সুন্দরতায় ভরিয়ে দিত—প্রিয়ার ঐ হঠাৎ হ'য়ে পড়া মুক্ত-লাজ বরাবর—নিলাজিত প্রণয়-সমীক্ষাটি ! কিন্তু এর পরেই আর কী,—স্ত্রী সন্ধ্যার মনে আবরিত হতো বিষম সংকট। সন্ধ্যা তখনি সুখ পেয়ে আর খুশীয়ালিনী হ'তে হ'তে —কেঁদে ফেলতো অঝোর ধারায়। কী আশ্চর্য্য সন্ধ্যা যুবতী মনেতে অনুসন্ধান করার পর তা বুঝেছে, যে, —স্বামী গৌতমের কাছ থেকে কারণে-অকারণে সময়ে-অসময়ে এমন সব প্রণয়-দুর্দমতারই ঝড়ের কাছে—ঝরে

পড়তে সত্যি ভালো লাগে ! তবু, —হ্যাঁ তবু, এত'র পরেও কেন জাগে—এ হেন কান্না ? সত্যি স্বামীর যুবকত্বে মুখর এই মঞ্জুলিত দুষ্টু আবদারটি সাঙ্গ করাবার জন্য—গৌতমও তার প্রিয়া স্ত্রীকে সুন্দরের অর্চনাতেই এ ভাবে দেহী-লাজরেখার প্রতি—জানায় আদর ! করায় অধরায়ন ! তবু কেন সুখ পেতে-পেতে আর রভসিতা হ'তে-হ'তে—সন্ধ্যা চোখের বাদুলে ধারায় ভেসে যায়—ঠিক-ঠিক এক ক্রন্দসী মধুছন্দারই মতন ? —তাই প্রিয়াকে সজলিত চোখেতে আরও মুক্তোর দানার মতো আকার ছাপিয়ে—ছোট ছোট অশ্রুকণায় অভিমানিনী হ'তে দেখা মাত্র গৌতম জানতে চাইতো—"এই ? এ কী ? এতে কান্নার কী আছে ? সন্ধ্যা, ভালো লাগে না বুঝি ? না কী মোটেই পছন্দের নয় ? তুমি সত্যি সন্ধ্যা যে কিনা আমার পক্ষে তা বোঝা মুস্কিল। আমারই হঠাৎ আচমকা ক'রে ফেলা—এমন সব আদর করার পরই দেখি—তুমি কেঁদে ফেল ! কী যে না তুমি ! সন্ধ্যা, এই দুষ্টু ?"

প্রিয়র কথা থামতেই—স্ত্রী সন্ধ্যা বলতো গৌতমের কাঁধের ওপরে কান্নায় আরো মধুর হওয়া মুখখানা আড়াল কারার পর—"না, না। তুমি ভুল বুঝছো কেন ? আমার ভালো লাগে। তবে কী জান, এই দুর্দম দুষ্টুপনায় চালিত হ'য়ে তোমার করা আদরেরই দুরন্তপনার মধ্যে—আগে থেকে নিজেকে তৈরী না রেখে—হঠাৎই সঁপে দেওয়ার মুহূর্তগুলোতে আমার যুবতী-স্বভাবটি ভারসাম্য রাখতে না পারারই দরুণ—আমি অসম সুখের আবেশে মুগ্ধ হ'তে হ'তে—তারই প্রকাশখানা দেখিয়ে ফেলি—কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আর কিছু নয়, গৌতম ! সত্যি বলছি। আদর জানাবার জন্য, বা আবদার মেটাবার জন্য তুমি যত সহজে মুহূর্তেই তোমার বুকের আশ্রয়ে বন্দী করাতে পার—বুঝলে গৌতম, আমি ত' মেয়ে—কাজেই অত সাততাড়াতাড়ি নিজেকে মদিরে-বিলোলে—দুষ্টুমতী করাতে পারি না আর কি।"

কথা শেষ কোরেই—বরনারী সন্ধ্যা মুখোমুখি চাহনিতে ভেজা-ভেজা ভাবখানা ছড়িয়ে দিয়ে—মধুস্নিগ্ধারই মতো ঝরাতো—হাসির রঙীন শুচিতা। আর কি আশ্চর্য, তারই মধ্যে কিনা স্বাভাবিক ছন্দর যতি ফুটিয়ে—সন্ধ্যার দু'চোখের কোণা দিয়ে তখনও পড়তো টপ্ টপ্ ক'রে—মুক্তোর ঝকঝকে দানা।

সে সব অতি দাম্পত্যিকে বোঝাবুঝির খেলায় মাতামাতি করার দুর্দমতা ভুলে—দুরন্ত যৌবন নিয়ে সত্যি শান্ত হ'য়ে উঠতো—এই গৌতম। স্ত্রীর ছবির মতো চোখের স্নিগ্ধতায় অশ্রুকণা টলমলাতে দেখলে পর—গৌতমেরও চোখের টানা মণি ছাপিয়ে—জল জমতো। চিকচিক কোরত। সন্ধ্যা এই কান্নায় বেশীদুর পর্য্যন্ত অকারণেই এগুলে পর—গৌতমও মাঝে-মাঝে কেঁদে ফেলেছে। ওরই মধ্যে একদিন গৌতম বেশ সুন্দর কথা বলেছিল—সেদিন সজলিত হওয়া নিজের দু'চোখের কালো-কালো কুটিমে এক রুচিস্নিগ্ধ যুবকের আর্তি সাজিয়ে। —আর একটু আগে নিজেরই

অতর্কিত ভাবে জানানো আদরের দুরন্তপনাতে এলোমেলো মুখ-রুচিরায় কান্নার গমক ধরা প্রিয়া সন্ধ্যার স্নিগ্ধ হ'য়ে থাকা—দু'খানা কাজল আঁকা চোখের পাতার কিনারায়—টলমলানো আনন্দাশ্রু রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিতে-দিতে বলেছিল—"ছিঃ, সন্ধ্যা! আর কাঁদে না। দেখেছো ত' যত বড় দুরন্ত স্বভাব নিয়েই না কেন আমি তোমায় আদরে-আবদারে ব্যতিব্যস্ত কোরে তোলাই,—সেই আমিও সত্যি তোমার অকারণের মস্ত এই মেয়েলি রীতিকায় কাঁদতে দেখলে পর—আমিও নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না মুহূর্তের জন্য। আমিও কান্নার সামিল হ'য়ে উঠি।" তাই বলে সেদিনের কান্নায় আর কান্না-দোদুল মুহূর্তে—স্বাভাবিক ছন্দ-যতি মিলেতে ফিরতে ফিরতে—সন্ধ্যার মুখখানা দু'হাতের দৃঢ় করা অঞ্জলিতে তুলে নিয়ে—কয়েকটি আলতো চুমায় রাঙাবার পর বলেছিল গৌতম হাসি মুকুলিত মুখে—"আচ্ছা সন্ধ্যা, তুমি অস্কার ওয়াইল্ডের লেখা পড়েছো? ভালো কথা, বলতে পার ইংরেজী সাহিত্যে ওঁর বৈশিষ্ট্যটি কী?"

—"হ্যাঁ। পারি বলতে। মোস্ট স্টাইলিস্ট লেখক। ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে নতুন-নতুন শব্দ তৈরী, আর শব্দের আহরণ ও যথাযথ যোজনার ব্যাপারে—উইলিয়ম সেক্সপীয়ার ও জন কীটস্—যেমন মহাকবি ছাড়াও ভাষার কারিকুরিতে মস্ত যাদুকর ছিলেন,—হ্যাঁ বুঝলে গৌতম, তেমনি আধুনিক লেখার মধ্যে চাকচিক্যে ভরা শুধু নতুন-নতুন বহু শব্দ, আর তারই মধুরেতে করা বিন্যাসের রূপকার হিসাবে—অস্কার ওয়াইল্ডও বিখ্যাত হ'য়ে আছেন—ভাষার যাদুকর নামেতে। কী, তাই না? শুধু কি তাই? ওয়াইল্ড একাধারে মধুর বাক্যবিন্যাসে ও ততোধিক সুন্দর শব্দের সমারোহে—খুবই সহজ ও সরল ভাবদ্যোতনা রেখে গেছেন। সত্যি বলতে গেলে কথার যাদুকর অস্কার ওয়াইল্ডের গল্পে বা উপন্যাসে বা প্রবন্ধে—মায় সাহিত্য-সমালোচনা সম্পর্কিত তাঁর সেই বিখ্যাত গ্রন্থ—"The Intentions",—হ্যাঁ, যার মধ্যে তিনি 'criticism as an art'-এর ভাষ্যকার হ'য়ে দেখা দিয়েছিলেন, —বলি গৌতম, সেসব রচনার যে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও শব্দ-চয়নের অনির্বচনীয়তা রেখে গেছেন—তার হদিস কী আর কোন প্রখ্যাতনামা লেখকের মধ্যে পেয়েছি? না, পাওয়া যায়? স্কুলের জীবনে ক্লাস টেনে উঠে পড়েছিলাম সিলেকশনের অন্তর্ভূত 'The Selfish Giant.'—পড়তে-পড়তে, বা শিক্ষকের পড়া শুনতে-শুনতে আমি ত' একদিন ক্লাসসুদ্ধ মেয়েদের মধ্যে বসে বসে থেকে—হঠাৎই কেঁদে উঠেছিলাম—গল্পের শেষ পরিণতিটি দেখে। আজও মনে পড়লে মন আমার ব্যাথাতুল হ'য়ে ওঠে। মনে হয়, যে, মানুষের মধ্যে যখন মঙ্গলময় ভগবান সত্যিই ক্ষণিকের জন্য হ'লেও উদিত হন,—হ্যাঁ তখন তাঁর পক্ষেই এ ধরনের একখানা 'Song Celestial.'-রূপী গল্পের আকারে তা রচনা করা—সম্ভব হয়। পরে কলেজে উঠে যৌবনের প্রথম

সোপানেতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম—ওয়াইল্ডের বহু বিতর্কিত ও সব দেশেতেই আলোচিত—সেই 'দি পোট্রেট অফ্ ডোরিয়ান গ্রে', বুঝলে গৌতম। সে আবার আরেক জগতের সন্ধান পেলাম। হ্যাঁ, ঐ উপন্যাসেরই মধ্যে আলোকপাত করা জটিল প্রণয়াদি সম্পর্কে। যাক্ সে কথা। এই বল, কেন ওয়াইল্ডের কথা জিজ্ঞাসা ক'রলে ?"—বলে দু'হাতের বাঁধন এক হাতে রেখে—সন্ধ্যা অপর হাতখানা তুলে আঁচলের প্রান্ত দিয়ে স্বামী গৌতমের চোখের কালো রঙ্ ছাপিয়ে থাকা—জলের টলমলে রেশ মুছিয়ে দিয়েছিল। আর হেসেছিল তখনি দুষ্টু মধুরিকার মতো।

গৌতম প্রিয়ার ঘন এলোচুলে ভরা মাথার সুগন্ধি আঁধারে অধরের ছোঁয়াকে ধরে রাখার মতো ক'রে বলেছিল—"জান, এই ওয়াইল্ড তোমাদের মতো মধুরিকা স্ত্রী-সুজনাদের সম্পর্কে রেখে গেছেন এক মস্ত প্রশস্তি ? আর সে কথাটিকে আজ তোমারই মধুরে-সুন্দর ঐ যুবতী স্বভাবেতে থাকা মুঠো-মুঠো অনির্বচনীয়তার আভাতে ঝলকিত হ'য়ে—না ভেবে পারলাম না। তুমি কত মধুর। কত অনিন্দ্যা। —তাই ওয়াইল্ডের প্রশস্তির ভেতর দিয়ে—তোমারই মহত্বকে বোঝাতে চেয়ে বলবো যে,—"There is nothing in the world like the devotion of a married woman.'—কি দুষ্টু তাই না ? বলি, আমাদের ছেলেদের সম্পর্কেও বোধ হয় এত বড় প্রশস্তি নেই ! এ ছাড়াও আর আর যা আছে—তার সবই তোমাদের বিবাহিতাদের গুণগাথায় ভরাট। জান ত' সন্ধ্যা—দার্শনিক সোপেনহর—যিনি পৃথিবী জুড়ে এক সময় পয়লা নম্বরের নারী-বিদ্বেষী হিসাবে পরিচিত ছিলেন—হ্যাঁ, সেই তেমন তিনিও পর্য্যন্ত একটি জায়গায় হার স্বীকার করেছেন—তোমাদেরই অসাধারণ এমন কিছুর ব্যাপারে। তোমাদের, মানে মেয়েদের যৌবনবাসরটি মিথুনলীলায় তাদের প্রিয়তমদের থেকে ধার করা অণু পরিমাণ এক শোণিতকণায়—নতুন প্রাণ সৃজনের জন্য অঙ্কুরিতা হ'য়ে—যে অসম ধৈর্য্য ও সহনশীলতা থেকে সৃষ্টির সম্পূর্ণ রূপখানা ফোটায়—হ্যাঁ, তারই পরম বিস্ময়ের টানাপোড়েনে ধাঁধিয়ে যাওয়া সোপেনহর করেছেন—তারই গুণগানটিকে। সন্ধ্যা, এই ধর না কেন,—তুমি যেমনটা ক'রেছো আমারই টুলটুলের 'মা' হ'য়ে। ঈষ্ ! রাঙা হচ্ছো যে এই কথায় ! দ্যুৎ। শোন, সন্ধ্যা। ধ্যাৎ, কী যে মেয়ে না তুমি ! ওঃ কিছু বলবে বুঝি ?"

স্বামীর কাঁধেতে মুখ ন্যস্ত রেখে শুধু বলেছিল তখন—"এই বলত' ওয়াইল্ডের বৌ যিনি ছিলেন—তিনি কী খুব সুন্দরী আর বিদুষী রমণী ? স্বামীকে কী খুবই ভালবাসতেন ? ওগো, বল না।"

তখনি গৌতম বলেছিল—"হ্যাঁ। শ্রীমতী ওয়াইল্ড মানে—কনস্টান্স মেরী লয়েড়—দেহী-রূপে ছিলেন—পরমাসুন্দরী। আর সেই সঙ্গে—গুণবতী। এ পায়াস লেডি। বেশ কয়েক বছরের ভালোবাসাবাসির পর—তিনি শেষে অস্কারের পরিণীতা

হন—তাঁরই সমবয়েসিনী সাথী এই কনস্টান্সের সাথে। বিয়ের পরই—পর-পর দু'বছরের মধ্যেই স্ত্রী কনস্টান্স দুটি সন্তানের মা হন। প্রথম সিরিল ও দ্বিতীয় ভিভিয়ান। তাতে নিজেকে তিনি যেমন গর্বিতা মনে ক'রতেন, তেমনি মন-প্রাণ দিয়ে গরিমা ভরিয়ে ভালোবাসতেন অস্কারকে। তিনি ছিলেন যুবতী রত্না। বুঝলে সন্ধ্যা, তারই জন্য—লেখক লুইস ব্রড্ ওঁদের জীবনী লিখতে গিয়ে ওয়াইল্ড-প্রিয়া কনস্টান্স সম্পর্কে বলেছেন, "A thoroughly womanly woman is the summing up of her character." আশা করি সন্ধ্যা, এ থেকে তোমার সব জানা হ'লো।"

মাস দু'তিন আগের এ সব কথা মনে পড়ায়—আজ সন্ধ্যা এমন মধুর গোধূলিতে ঘেরা ম্লান আলোর ঠাণ্ডাঠাণ্ডা আমেজে—একটু অন্যমনস্কা হয়ে পড়েছিল। আকাশের সীমাহীন নীল রঙ্ ছাপিয়ে মেঘের খেলা তখন চলেছে—রঙ্ ধূসরিমায়। হংস বলাকা আর চাতক পাখীরা তখন ঘুরছে কোথাও কোথাও দল বেঁধে। —চক্রাকারে। ঘুরতে-ঘুরতে নীচের দিকে নামছে। আবার পরমুহূর্তেই উঠে যাচ্ছে ওপরেতে-—ডিগবাজী খেয়ে। দক্ষিণ পথেতে বাগান শেষ হওয়ার সীমানাসূচক রেখা ধরে-ধরে—চারটি ধার ঘেরাও রাখার মতোই পাইন-দেবদারু নারিকেলের সারির—উঁচু-উঁচু মাথা ছুঁয়ে—আকাশের মেঘমালা—বড় ঝড় নামাবার ঈশারাখানা যেন জানাচ্ছে। নারিকেলের আর পাইনের ঝালর দেওয়া পাতার জাফরি মতন রূপখানা হাওয়ায়-হাওয়ায় দুলতে থাকায়—সন্ধ্যার চোখের দৃষ্টি আকর্ষিত রেখেছে। —কেন না সবুজ সবুজ শরীরেতে ছোট্ট লাল ঠোঁটখানায় সুন্দর দেখতে—অনেকগুলো টিয়াপাখী তখন ঘুরছিল আর ফিরছিল—এক গাছ থেকে উড়ে-উড়ে আর বসে-বসে—অন্য গাছটিতে। সবুজ পাতায় ঢেকে যাওয়া টিয়াদের সবুজ শরীরে—অপরূপ মিল ধরে, বারে বারে হারিয়ে যাচ্ছিল—সন্ধ্যার চোখের স্থির রাখা দৃষ্টিপথ থেকে। এ এক আশ্চর্য্য খেলায় পেয়ে বসেছে তাকে। কোন্ টিয়াটি এক জায়গা থেকে উঠে গিয়ে কোথায় আবার বসলো সবুজ পাতারই মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে—তাই খুঁজে বার ক'রতে চারধারে তন্ন তন্ন ক'রে সন্ধ্যা খোঁজ ক'রছে। খুঁজে দেখার মাদকতায় নেচে গেছে ওর মন। —কিন্তু বেশ কিছু সময় ধরেই যে ছাদের দক্ষিণ খোলা এই নির্জন প্রসাধন কক্ষের মধ্যে—গদি দেওয়া ছোট মোড়াখানায় বসে আছে—তা বোধ হয় সন্ধ্যা ভুলতেই বসেছিল প্রায় আটপৌরে ঢঙে পরা তাঁতের শাড়ীর রঙ-বেরঙ্ কাজে বোনা চওড়া আঁচলখানা—এতক্ষণ আলতোভাবে বাম কাঁধের আশ্রয়ে ছিল। ওর এক প্রান্তে বাঁধা ছিল ঘর-গৃহস্থালির জন্য চাবির একটা-থোকা। সন্ধ্যা একটি লুকিয়ে পড়া টিয়াকে দেখবার জন্য বাঁয়ে একটু হেলতেই—আঁচলখানা বারান্দার টালির মেঝেতে পড়ে গিয়ে—সেই চাবির থোকায় ঝনৎকার করা শব্দেতে মুখরিত করালো।

দখিনা বাতাস অবশ্য অনেক আগে থেকেই ছিল—আলতো হয়ে থাকা আঁচলখানাকে স্থানান্তরিত করাতে। এখন চাবির ভারে আঁচল কাঁধ ছেড়ে বুকের রূপঝরনার লাজরেখা আড়ালে না রেখে—নীচের দিকে পড়তে থাকায়—হাওয়ার ঢল তাকে ঝনঝনানির মধ্যেই ছড়িয়ে দেওয়ালো। লাজে লাল বুকের পাহারায় মোতায়েন থাকা আঁচলখানা ওড়াতে ওড়াতে। সন্ধ্যার খেয়াল হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলো পেছনের দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে রাখা হাল ফ্যাসানোর ড্রেসিঙ্ টেবিলের ফ্রেমে বাঁধা আয়নার দিকে। আয়নাতে যে দেহীরূপ নিলাজ সুষমায় ঝলমলালো—সন্ধ্যারই অন্যমনস্কতার সুযোগ পেয়ে—তা নিলাজ হ'তে পারে! কিন্তু তাই-ই হ'লো—আসল লাজ-যুবতীকা। সন্ধ্যার বিবাগী মনের ঘেরাটোপ সরিয়ে ওরই অজানায় কখন এক সময় আর কি আঁচলের কারাগারে বন্দী থাকা—যৌবন-সবুজতায় প্রগাঢ় দুই ছান্দসী রিদম—রেশম ব্লাউজের বাঁধনটি খুলে যাওয়াতেই,—আর হাওয়ারই দক্ষিণায়নী ঝাপটার দুরন্তপনায় সামলে না রাখায়—ঐ ব্লাউজের উন্মুক্ততাকে আরো প্রসারিত করিয়েছে। —দু'ধারের রেশমী প্রান্ত তাতে পাশ বরাবর স্থানান্তরিত হ'য়ে দুলতে থাকছে। আর কাঁচলি ছাড়া বুকের সৌন্দর্যসায়র ধরে ত্বক-যৌবনায়নী মাধুর্য্যধারার দুই ঝরনা—রিমঝিম ঝিলিমিলিতে স্বতঃস্ফূর্ততা পেয়ে—আয়নার স্বচ্ছতায় যেন হ'য়ে পড়েছে—আটক। আলিঙ্গিত। পীনোদ্ধ। সন্ধ্যা আজ এই গোধূলি রাঙা মুহূর্তে,—আর আকাশের নীল নির্জনতা ছাপিয়ে ঝরতে থাকা মেঘ-ধূসরিমায়, —আর দক্ষিণ থেকে শন্‌শনানো হাওয়ার দাপাদাপির মধ্যে—সত্যি এক ধরনের অতি মেয়েলি লাজে—লাল হ'তে হ'তে গুনগুনালো—“ছি ছি লাজে মরি হায়, /তরুণ এ তনু আর গোপন কি রাখা যায়?/সে এসে দেখার আগে বসনেলো ঢাকি কায়; /দেহ সে যে নাহি চায়।”—সন্ধ্যা তাই ভাবলো—“হ্যাঁ, এ যে তরুণীর লাজ! এ যে বিবাহিতা যুবতীর লাজ!—কিন্তু, সত্যি একটা কিন্তু আছে এই লাজময়তার শূন্যতায়।” স্ত্রী সন্ধ্যা টেবিলের থেকে চিরুণী হাতে নিয়ে মাথার কালো মেঘের মতো ঘন রাশি রাশি অলক প্রসাধন করার জন্য—ডান হাতখানা কেশে ছুঁইয়ে, আর বাঁ হাতেতে তার গোড়া ধরার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে ভাবলো মস্ত এক দুষ্টুকার মতো—“দ্যুৎ। সব সময় কী আর লজ্জার ধার ধারলে চলে? মাঝে-মাঝে লজ্জার মাধুরী ঝরা ভারখানাকে—মুঠো মুঠো নিলাজেরই শাণিত ধারখানার মধ্যে দিয়ে কাটাতে—যে কোন মিষ্টি যুবতীর ভালো লাগে খুব। —দুষ্ট মনেরই দুরন্ত অভিলাষে! হ্যাঁ, এই সন্ধ্যারও তা ভালো লাগে। খুব। তা কী হয়েছে? আমার এই রূপ দেখুক না এই খোলা পরিবেশখানা এর গোধূলি লগ্নখানা। তারই মেঘমেদুর আকাশের ঐ ছায়া-ছায়া ধূসরিমাখানা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেখুক বাগানের শেষ ধারেতে প্রহরীর মতো এক-এক পায়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকার—ঐ দেবদারু-পাইন-নারিকেলেরা। ঐ

টিয়া পাখীরাও সবুজ ডানা মেলে আকাশে উড়ুক। ঘুরুক এলোপাতাড়িতে। —আর ওদের সেই 'bird'seye view' ফেলুক—আমারই বুকখানার এই প্রভাসখানায়। হ্যাঁ, ওরা সবাই দেখুক আর চিনুক। ভাবুক। —হ্যাঁ, ভাবুক এটাই, যে, আমার বুকের এই রূপঝরনা ওদের পরশ করবার আর পরখ করার নাগালের বাইরেকার জিনিস! না পরশ পাওয়ায়, না ধরতে পারায়, না অনুভব করায়—প্রকৃতির ওরা সব এমন নিলাজ আকর্ষণ দেখে-দেখে হিংসা ক'রতে শিখুক, বা জানুক—এই পৃথিবীরই একজন বিশিষ্টতমকে। এই বিশিষ্টতম হ'লো সন্ধ্যারই স্বামী সুজনক। —হ্যাঁ, বরনারী সন্ধ্যা প্রিয়া-স্ত্রী হিসাবে জানে অন্তরঙ্গতায় আর একান্ত চাহিদায়, যে, —তার বুকের সৌন্দর্যভারের ঝকঝকানিতে—রিমঝিম করা মাধুর্য্যধারের আপীনতাকে, একমাত্র আবদার থেকে পরশ ক'রতে আর শুধু দুষ্টুমি থেকে আদরের দস্যিপনায়—এরই বৃন্তে বৃন্তে লাজ-পেশলতাকে শুধু নিলাজতায় স্নাত করাবার জন্য মধুরিক দেহ-মনের অধিকারক হ'লো—ওরই শত আদরের, আর শতেক আহ্লাদের মধ্যে রাখা হ্লাদিত স্বামী—ঐ গৌতম। —হ্যাঁ, সারা পৃথিবীর মধ্যে আর অন্য কোন রূপবান বনাম গুণবান যুবক—যতই সুজনক বা মধুরিকও হোক না কেন ভালোবাসা নিয়ে, —তবু বধূ সন্ধ্যার কাছে থেকে পাওয়া এই অনির্বচনীয়তাকে দেখার জন্য, জানবার জন্য, বা পরশ ক'রে আবদার ধরে আদর করাবার অধিকারেতে স্বামী গৌতমই হ'লো—যৌবনের প্রথম ও শেষ ধৃতি। ও—তারই কৃতি।" সে কথা মনে হওয়াতে আজ সন্ধ্যার ইচ্ছা জাগলো—নিজের অজানায় উন্মুক্ত হ'য়ে ওঠা বুকের রূপঝরনা ধ'রে-ধ'রে, আর আয়নার প্রতিফলন দেখে-দেখে—রঙ্ আর সূক্ষ্ম তুলির টানে-টানে এঁকে তুলবে—মৃগমদ চিত্রপাঁতি। আঁকবে শুভ্র ফুলের ছবি। খুব ছোট ক'রে ক'রে। জুঁই-চাঁপা-রজনীগন্ধা-শাদা গোলাপ—এদেরই পাপড়ি ফোটানো পুরোপুরি ছবি। —গোল আকারে। ধরে-ধরে। পর-পর। —হ্যাঁ, তারপর আঁকা শেষ ক'রে—সন্ধ্যা আজ সাজ-পোশাক পালটানোর সময়—বুকের রূপঝরনায় ফোটানো মৃগমদ চিত্রপাঁতিকে নিখুঁত রাখার জন্য পরবে না কোন—আঁট-সাঁট বাঁধনের ব্লাউজটি! কেন না শ্বেতশুভ্র ছোট্ট কাঁচলির আঁট ঘটনা মৃগমদ বিলেখনকে মুছে দিতে পারে। —কঠিনতর পীনোতায় বন্দিত রেখে মুছে দেবে। সন্ধ্যা তাই আজ সাঁঝের রূপপ্রসাধনে কাঁচলি ছাড়াই শুধু ধূপছায়া রঙের জরিদার রেশমী ব্লাউজখানায়—কৌশলে আড়াল দেওয়াবে আলতো ভাবে। তা হ'লে শ্বেত আর রক্ত রঙ্ চন্দনেতে বৃত্তাকারে আঁকা ফুলের ছবি—থাকবে নিখুঁত। আবরণের বাঁধনে যাবে না আর—মুছে। আর কুঁচিয়ে পরা লাল টকটকে মুর্শিদাবাদী শাড়ীখানা পরার পর—তার আঁচলটি সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে—পেছনে টেনে ফেলার আগেতে—বুক বরাবর রাখবে আলতো প্যাঁচে। টান-টান করালে অসুবিধা আছে। কেন না লাজ-বুকের পাহারাদার আঁচলেতে টানের

সৃষ্টি থাকলে পর—উপরের তৈরী টানে-টানে ব্লাউজের রেশম—নিশ্চয়ই ভেতরের ঐ মৃগমদ বিলেখনে ফুটে থাকা ছবিকে—মুছে নিশ্চিহ্ন করাতে পারে। আর টুলটুলকে সে জন্য কোলে নেবে খুব সাবধানে। এ ত' রোজের ব্যাপার নয়—শুধু আজ সন্ধ্যাটির জন্য। না-না। —আর দেরি করা যায় না। কেশ প্রসাধনটি পরিপাটি ক'রে আগেই, গা ধুয়ে নেওয়া ভালো। তারপর লাল মুর্শিদাবাদী রেশমখানা কুঁচিয়ে পরে, —আর ঐ আলমারী থেকে বার করা ধূপছায়া-রঙ্ জরিদার ব্লাউজখানায় বুকের দু'ধারে ঝলমল করা সুষম-শিল্পকে—মোতায়েনী পাহারার লাজ আবরণ দিয়ে—পুনরায় ফিরে, এইখানটাতেই বসে-বসে মনের আমেজ নিঙাড়িয়ে আঁকা যাবে—মৃগমদ বিলেখন। ততক্ষণে আঁধার ঘনালে, জেনারেটরের ত্বরিত গতি নিশ্চয় তড়িৎপ্রবাহে ছুটে এসে—জ্বালিয়ে দেবে মাথার ওপরকার বেলোয়ারী কাঁচের নক্সা তোলা—বাতির ঝাড়টি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভালো।" —এতসব ভাবনার মধ্যেই পরিপাটি ক'রে অজন্তা ছাঁদের মস্ত খোঁপাখানা বাঁধা হ'য়ে গেল সুন্দরী সন্ধ্যার সন্ধ্যা- ভাবে—"সত্যি এ-দেশীয় মেয়েদের খোঁপাবাঁধার নানান রীতির বহুল রকম চমৎকারিত্ব দেখে-দেখে বুঝি, যে,—এটা মস্ত এক আর্ট। যা আমাদেরই একচেটিয়া।" সন্ধ্যা না ভেবে পারে না তাই, —"হ্যাঁ, এই ত' কিছু আগে রাশি-রাশি এলো চুল যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ঘাড়ে-পিঠে-বুকে—সত্যি এখন যেন আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মতো উধাও হয়েছে—সব এলোত্ব সমেতই। —এই অজন্তা প্যাটার্ণের কবরী রচনার মধ্যে। সত্যি ও-দেশের ওরা যেসব সিঙল্, বব্, হর্স-টেল, পনি-টেল্ বা পিগ্-টেল্ করে অলক-বিন্যাসে—তা কী আগাগোড়া বৈচিত্র্য ছাড়িয়ে—শুধু একঘেয়েমিতাকে প্রতিপন্ন করায় না? —থাক্ ও কথা। আমাদের কবরী-রচনা করার আর্টেতে আছে—যাদু। —তা না হ'লে সময়ে-সময়ে কবরী রচনার পারিপাট্য হেতু—অনেক দেখতে ভালো নয় তেমন মেয়ের আকৃতিখানা সুন্দর বলে মনে হতো না! তাই আকৃতিবিজ্ঞান, মানে 'Science of Physiognomy' আমাদের নানান রীতির কবরী-রচনার মধ্যে নিহিত—এইসব মস্ত বৈশিষ্ট্য ও সুযোগাদিকে স্বীকার ক'রে।" —তাই ভাবতে-ভাবতে মুখের, আর চোখেতে নাচানাচি করা মাধবীরাগের মতো ঝলস্ আয়নার কাঁচেতে ঠিকরে পড়তে দেখে—খিলখিলানো শিশুময়তার ঝলমলানিতে স্ফূর্ত হাসি নিয়ে সন্ধ্যার পোশাকে এলো সারা শরীরে—বুলালো হিল্লোল রেখা। বুকের আপীন জৌলুসকে মুক্ত রাখা ব্লাউজের দু'পাশ বরাবর সরে থাকা প্রান্ত—টেনে বোতাম-বন্ধ না ক'রতে চেয়ে—টালির মেঝেতে লুটিয়ে বিশ্রাম ক'রে চলা আঁচলখানা তুলে—পিঠের পেছনেতে ঘুরিয়ে দিল। কিন্তু দখিনা হাওয়া তা ঠিক রাখতে দিতে রাজী নয়। এলো ক'রে, আর উড়িয়ে—আবার সামনে দিয়েই নীচে গড়িয়ে ফেলাতে

চাইছে। তাই আঁচলের একটা অংশ মুখে চেপে রেখে—ওপরে তোলা দু'হাতের চাপে-চাপে শেষ বারের মতো—রচনা করা কবরীর অবস্থানটিকে খুবই নিখুঁত রাখার জন্য—আনমনা ভাবেই রবীন্দ্র-সুভাষণে গুনগুনালো সন্ধ্যা—লাজে লাল রঙ্ ধরতে ধরতে—

"সজ্জা খুলিতে লজ্জায় মরি অঞ্চল-তল দংশিয়া ধরি
নির্জ্জনে একা বক্ষ আবরি' আপন কক্ষ-মাঝে।"

—"দ্যুৎ। আজ হঠাৎ আমি এ সব কী ভাবছি? এত নিলাজিতা হ'য়ে পড়েছি? বাব্বা। আর নয়। আজ এমনভাবে চললে সাজ-পোশাক পালটাতে অযথা দেরি করাবো।" —সন্ধ্যা মনে-মনে তাই অস্ফুটে বলে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলো। আর দেরি না ক'রে তোয়ালে হাতে ঐ ঘরেরই সংলগ্ন স্নানঘরে চলে এলো। ওর যুবতীমন উপছিয়ে তখন মৃদুল আওয়াজে—ছোট ছোট গানের কাকলী-কথা উঠছে—গুনগুনিয়ে। ঝলমলিয়ে। আনচানিয়ে।

তারপর কিছু সময়ের বিরতি দিয়ে সন্ধ্যা শোবার ঘরের দরজা খুলে ঐ বারান্দার ড্রেসিং টেবিলটির সামনে—ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগলো। লাল মুর্শিদাবাদী রেশমের কুঁচিয়ে পরার পরিপাটি ভাবখানা—এই মুহূর্তে সন্ধ্যাকে আরো মোহনীয়া, আরো লোভনীয়া ক'রে তুলেছে। বুকের মাধবীরাগে ঝলসানো শিল্প সম্ভারের যৌবন-উদ্ধতাতে—ধূপছায়া রঙের জরিদার ব্লাউজখানা খুবই ম্যাচ করেছে। এ মানানোটা অবশ্য একটু বেশী টাইট ফিটিংসে কেটে তৈরী করার জন্য—এক ধরনেরই মাদকতা নিয়ে আঁট আকারকে ফুটিয়েছে। হ্যাঁ, কথা মতোই সন্ধ্যা তার এই লোভনীয় সজ্জায়—নিলাজ দুষ্টুপনা ভরিয়ে দিয়েছে। শ্বেতশুভ্র কাঁচলের কঠিন বাঁধনমাখায় আবরণ না দিয়ে তা ধূপছাপা রঙ্ জামার দু'খানা প্রান্তকে—অর্গলমুক্ত রেখেছে। তবে লাল শাড়ীর রেশমী আঁচলে আবরিতা থাকায় মনে হওয়ার জো নেই, যে, ধূপছায়া-রঙ্ জামা এখনো আছে বোতাম-ু কেন না, খুবই আঁটসাঁট গঠনে তৈরী করারই দরুন—ব্লাউজের দুটি খোলা প্রান্ত অবশ্য পাশ বরাবর মোটেই সরে যেতে পারেনি—ওরই আকারগত সংক্ষিপ্ততার ফলে। তাই সন্ধ্যার সুষমে ছন্দিত বুকেতে লজ্জার দোলন ফোটানো দুটি ঝরনাধারার ভারসাম্য—নিটোলতার আপীন প্রকাশ ধরে থাকায় ধূপছায়া রঙ্—লাল আঁচলের নীচেতে বেশী ঝলস ছড়াচ্ছে। আর ঐ পীন ঔদ্ধত্যের ধারে ও ভারে আপন সংক্ষিপ্ততার দরুণ—তা আকারে-আকারে আছে স্থানগত। এ যে অর্গলমুক্ত!—তাই পাহারায় মোতায়েন থেকেও রয়েছে ঢিলেঢালা। এ কথা সন্ধ্যা নিজে জানে। কিন্তু তা দেখেও অন্যে কেউ সত্যি জানতে পারবে না, যে,—এর সংক্ষিপ্ততায় ঘেরা আঁট অবস্থানটি ত' পুরোপুরি

ভাবে—শুধু লাজরেখার ধার ঘেঁষে জুড়ে আছে। তা না হ'লে বাঁধনহারার দুষ্টুমিতে—মুহূর্তে জৌলুসখানা আছড়ে পড়তো—রেশম শাড়ীরই টকটকে লাল রঙ্‌টিকে পর্য্যন্ত—অস্বীকার করার মতোই।

মায়াবিনী মদিরেক্ষণার সজ্জায় ঝলমলানো—বধূ সন্ধ্যা কাকলী ভরা কথায়—বারান্দার স্নিগ্ধ পরিবেশের নির্জনতা ভাঙ্গতে-ভাঙ্গতে বলল—"না-না। এই সময়টাতেই সেরে রাখি সব। হ্যাঁ, গৌতম ঠিকই তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে বলে আজ কথা দিয়েছে। তবু যদি দেরি ক'রে ফেরে ? তবে ? তখন ? না, আজ বিশ্বাস রেখেছি—ওর ফিরে আসার জন্য দেওয়া কথাতেই। হ্যাঁ, যদি ফিরেই আসে তাড়াতাড়ি, তা হ'লে এর পরে আমার বুকের লজ্জাধারে অভিলাষিত সেই মৃগমদ বিলেখন ফোটাবার আর সময় কী পাবো ? মনে হচ্ছে, আমায় অকারণেতে কাঁদিয়ে তোলার দুষ্টুমিতে দুরন্ত—ঐ গৌতম যেন আজ আর দেরি ক'রবে না ! হ্যাঁ, আজ যদি দেরি ক'রেও আমার দুষ্টু মিতা ফেরে,—তা ব'লে আর অভিমান নিয়ে অনুযোগ জানাবো না। কাঁদবো না। আজ আমারই অবুঝ থাকা মধুরকে নিবেদনে জানাবো একখানা কথা,—যা এই কিছুদিন ধরে বলি-বলি ক'রেও—জানাতে পারলাম না। এটা জানানো দরকার। আজ সকালে কথা দিয়েছি—এটা জানাবো এই নিরিখেতে যদি আমার গৌতম তাড়াতাড়ি ফেরে। না-না, গৌতম আজ ফিরতে দেরি ক'রলেও—আমি যে ক'রেই হোক্ আজ জানাবো !"

সন্ধ্যা গুনগুনানা স্বর-লহরে নাচানো—প্রিয়া মনের কথা-কাকলী থামিয়ে ঝুপ ক'রে ব'সে পড়লো গদি আঁটা মোড়াতে।—আয়নার সামনে মুখোমুখি হ'য়ে। বিকেলের গোধূলির আলো ততক্ষণ ছন্দ মিলিয়ে দিয়েছে—মিটি-মিটি আঁধারেতে মিষ্টি সন্ধ্যারই উঁকিঝুঁকি দেওয়ার মধ্যে। এরই মধ্যে এক সময় জ্বলে উঠেছে মাথার ওপরের বেলোয়ারী বাতিদান। খোলা দখিনা পথে মাতাল হাওয়া ঘন হ'তে থাকা সন্ধ্যার অনুরাগনির্ঝরকে আপন ঝাপটায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিচ্ছে ওদিক পানে পেছন দিয়ে বসা—সন্ধ্যারই আমেজভরা—বর-অঙ্গে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা একটা শিহর আছে এই দখিনা বাতাস। সন্ধ্যার তা বেশ ভালো লাগছে। হাওয়ার সেই শিহরে-শিহরে মাদকতা নিয়ে সন্ধ্যা ব্যস্ত হ'লো তারই বুকের লাজ-রেখার যৌবনতায় ঝলস্ ঝরাতে থাকা—দুধে আলতায় মিল ধরা ত্বক-মসৃণতায় সূক্ষ্ম-তুলির টানে-টানে—শ্বেত আর রক্ত চন্দনেতে—বিলেখন-চিত্রপাঁতি আঁকার জন্য।—আর তাই মোলায়েম রেশমী শাড়ীর লাল আঁচলখানা—বুক-পিঠ থেকে তুলে দিয়ে যত্ন ক'রে জড়ো হ'য়ে আনচানালো ব্লাউজের ধূপছায়া রঙ্ ভাসছে—আয়নার স্বচ্ছতায়। তারই বাঁধনহারা ফাঁকটুকুন দিয়ে দুধে-আলতায় মেলানো গোরোচনা ত্বক-ঝলস্ হাসছে—দুষ্টুমির প্রকাশ ধরে-ধরে। আঁট গঠনায় তৈরি ঐ জামার ফিটিংস্ খুব বেশী কঠিনভাবে জড়িয়েছে—ওখানকার

যৌবন-পেশলতায়ই।—যার দরুণ বরনারী সন্ধ্যার এখনকার মধুরা অনুরাগে রাঙা আবেশটি পরিবেশের নির্জনতায়—নিলাজ হ'তে চেয়েছে। ঐ রূপঝরনা দুটির আপীন ঔদ্ধত্যকে বোতাম-মুক্ত জামারই অতি সংক্ষিপ্ততাটি—দু'ধারের পাশ অবধি একটুও সরে না গিয়ে—দুটি প্রান্তরেখা ওরই ভেতরের লাজরেখাকে আকারে-আকারে—পাহারার সীমিত আড়াল দিয়ে রেখেছে। তারই জন্য—আবেগ আর আবেশের উত্থান-পতন—সেই নিটোলতায় জাগিয়েছে কবিতার ছান্দস্ গতি! রিদ্‌মিক মিটার!—'সফ্‌ট ফল্ য়্যাণ্ড সোয়েল'।—হ্যাঁ, তাই। ঠিক-ঠিক। কি ভেবে সন্ধ্যা বলল—"আরে, আমি তা হ'লে এ মুহূর্তে বড় বেশী লাজ হীনা হয়ে পড়ছি না? তা বেশ ক'রেছি। গৌতম, হ্যাঁ, গৌতমকে খুশীয়ালে আজ চমকিত করাবো। বুকের মৃগমদ বিলেখন দেখাবার জন্যে আমি নিজে থেকে আবদার ধরবো,—যাতে ও যেন নিজের দুষ্টু হাতেই আমার বুকের ব্লাউজের বাঁধন সরিয়ে—তা দেখতে দেখতে—যৌবন-নাচা যুবকত্বকে ধাঁধাতে পারে! না, আর দেরি নয়। এইবারটি শেষ করা যাক্ এমনি এক দুষ্টু আর দুরন্ত হওয়া—একান্ত মেয়েলিপনা।"—তাই ভেবে সোনার কাঁকন আর চুড়ির ঝনক-ঝনক রিনী-থিনীর আওয়াজ সুদ্ধ বাঁ হাতটি একটু ওপরে তুলে—লাজ-পাহারারই আবরণের—ধূপছায়া-রঙ্ ধরে এক ধারের প্রান্ত, অল্প পাশে সরিয়ে—ডান হাতের তুলিকাটি ঘষে নিতে লাগলো চন্দনদানি থেকে। একটু শুধু অন্যমনস্কা হয়ে পড়েছিল। প্রায় এমন পরিবেশটির কথা সন্ধ্যা ভুলতে বসেছিল। কিন্তু—

"—আরে, তুমি কখন এলে? অথচ একটুও জানতে পারলাম না! এখানে যে এসে চৌকাঠটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছো,—কৈ তাঁরও বিন্দুমাত্র আভাষ পেলাম না! দ্যুৎ। গৌতম, কী যে না তুমি।"—বলতে বলতে মোড়া ছেড়ে উঠে পড়লো দ্রুত। হাত থেকে তুলিকা পড়ে গেল টালির মেঝেতে। কোলে রাখা লাল ঝলস্ ছড়ানো আঁচলখানাও মেঝেতে পড়ে গিয়ে—ছত্রাকারে ছড়িয়েছে। আর আপনা থেকে ছন্দ-চিরন্তনীর প্রভাব সন্ধ্যার মধুরেতে-মধুর মদালসা দৃষ্টির কাজল-ঘেরা-চাহনি—যন্ত্রচালিতের মতো নীচেতে লুটিয়ে পড়া লাজ-প্রতীক—ঐ লাল আঁচলেরই লাল দ্যুতির মধ্যে নেমে গিয়ে যেন—আটকালো। কাঁপা-কাঁপা লাল অধরাধার দিয়ে কাটা-কাটা ভাবে—সন্ধ্যা লাজময়তা জানালো—"ঈষ্। ঈষ্। কী যে না তুমি? ভারী দুষ্টু। দ্যুৎ। এমনভাবে মাঝে-মাঝে তুমি না..." কথা আর শেষ করালো না সন্ধ্যা। একটা নিখুঁত লজ্জারই স্থির ভাররূপতা হ'য়ে—নিশ্চলে আর কাঁপনে—চুপ হয়েই পড়লো প্রিয়া।—শুধু নিলাজ দেহী-সজ্জায়। লাল লজ্জায়। আর ছন্দ-চিরন্তনীতে।

—"এই? এই মেয়ে, বলি অত 'ঈষ্' আর 'দ্যুৎ' আর 'কী যে না' —বার-বার জানাচ্ছ কেন? ওগো দুষ্টুকা, বলি অপরাধ কী আমার? এত তাড়াতাড়ি আজ

ঠিকই কথা মতো এসে পড়েছি বলে ? আমি কী তোমার কাছে অচেনা ? না, না। যে ভাবেতে বিলোলিতা হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়েছো, হ্যাঁ, একটু থাকো না ও ভাবেই। হ্যাঁ, ঠিক হওয়ার আর চেষ্টা ক'রো না গো কিছু সময়ের জন্য। না, না।—সন্ধ্যা, থাকো তুমি এমনি বেঠিক ছন্দে আর যতিতে—এলো। আমি, হ্যাঁ, তোমার আদরের গৌতম—দুষ্টুমি ভুলে অতি লক্ষ্মীটির মতো এমন মুহূর্তটিতে—বেঠিকে এলোমেলো তোমায় জানাতে চাই—মহাকবি জন কীটসের কথাতেই—'No—yet still stedfast, still unchangeable,/Pillowed opon my fair love's ripening breast,/To feel ever its soft fall and swell,/Awake forever in a sweet unrest,...." হ্যাঁ সন্ধ্যা, আমারও এখনকার মনের সুভাষণখানাও হ'লো তাই। এই দুষ্টু ? তুমি স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়েই থাকো। নড়বে না। সরবে না। আমিই কাছে আসছি। আমার দুষ্টুকা।"—বলতে-বলতে হাসির মধুর স্ফূর্ততায়—খুশীয়াল ভাবেতে প্রিয়ার প্রায় নিলাজে কুসুমিত বুকখানাকে ছুঁয়ে দাঁড়াবার মতোই—গৌতম এক লহমায় কাছে এলো। দু'হাত সুবিস্তারিত করালো।—বুকের বাঁধনে প্রিয়াকে বন্দিনী করাতে। এক কি দুটি পলক কাটলো। তার পরেই ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো বধুরত্না সন্ধ্যা—তারই আদর করার ও দেওয়ার—গৌতমেরই পরম নিশ্চিত ও নির্ভয়ে ঘেরা—আলিঙ্গনেতে। পরম খুশীর আবেশময়তাতে।

তারপর ?—হ্যাঁ, তারপর ঝড়—সন্ধ্যার এই সমর্পিত ভঙ্গিমায়—তুফান হ'তে চেষ্টা কোরল। প্রাকৃতিক সন্ধ্যার অনুরাগ আগে থেকেই ভেতরে-ভেতরে কিন্তু—তার যুবতীকা ভরিয়ে—ছন্দ অভিমানখানা ফুটিয়ে রেখেছিল। এখন সুযোগ পেয়ে তা হঠাৎ নির্ঝরে ঝরা—বাদল হ'লো।

কিন্তু সব মান-অভিমান, আর লাজ-নিলাজের কথা ভুলে—এই মুহূর্তে সন্ধ্যা অভিমানের কান্নায় বাদলার রূপ ঝরিয়ে—আষ্টেপৃষ্ঠে গৌতমকে বুকের মধ্যে ঘন করালো।—নিজেরই একধারের কপোল নিয়ে স্বামীর কপোলে, গলায়, কাঁধে, দুষ্টু হাসিতে নাচতে থাকা ঠোঁটে—ঘষতে-ঘষতে বলল কাটা-কাটা আর কাঁপা ভাবেতে—

—"গৌতম আমার গা ধরে কথা দাও এই শপথ নিয়ে, যে, আর তুমি কখনো ফিরে আসতে দেরি ক'রবে না। রাত ক'রবে না। যত তাড়াতাড়ি পার ফিরে আসবে আমার, হ্যাঁ, আমারই জন্য। জান, আমাকে কিছুদিন ধরে রাত হওয়ার সাথে-সাথে এক ধরনের ভয় পেয়ে বসছে। তুমি কাছে না থাকলে আমি যেন একটু বেশী ভয়কাতরা হ'য়ে পড়ি। কেমন জান, ঠিক সেই পুরানো ভয়খানাই পেয়ে বসছে আমাকে। গৌতম, বিশ্বাস কর, সেই টুলটুলের জন্মের আগেতে কয়েক মাস ধরে যেমন রাত হ'লেই ভয় পেতাম, হ্যাঁ, ঠিক তেমনি ধারার ভয় আজকাল আবার

আমার মধ্যে—জুড়ে বসেছে। ওগো, তুমি এমন সময়ে যদি কাছে থাকো, তা' হলে কিন্তু আমি ভয় পাবো না। সত্যি বলছি।"—এক লহমায় কাটা-কাটা আর কাঁপা স্বরে এত কথা বলে, থামলো সন্ধ্যা। আর চোখের জলে তখন স্বামী গৌতমের কপোল, গলা, কাঁধ, আর শার্টের কলার থেকে কাঁধেরই পুট্ পর্য্যন্ত—ভিজিয়ে তুলেছে। তারই মধ্যে মুখ আর চোখ ঘষায়—ছোপ ধরে গেছে লাল ওষ্ঠরঞ্জনীর আর কালো কাজলের। আর সন্ধ্যার সিঁথিতে ঘন ও লম্বা ক'রে আঁক টানা—সিঁদুরের লাল পবিত্রতা আলগা থাকায় ওরই গুড়ো—ঝরে লেগে গেছে গৌতমের কপালের কাছে। কানের লতিতে।

—"আচ্ছা সন্ধ্যা, এমন ভাবে ভয় পাচ্ছ কেন ? আর আমার আসতে দেরি হ'লে ওদিকে রাত যত বাড়তে থাকে—ততই তুমি বা কেন মুষড়ে পড়—ভয়েতে ? বলবে না কেন, এই ? বল, আমার আদর ?"—কথার ফাঁকেতে জোর ক'রে গৌতম অধর দিয়ে—প্রিয়ার চোখেতে থৈ থৈ করা জলের প্রবল বান—পথরুদ্ধ করার চেষ্টা করালো। কতকটা পর্য্যন্ত বাঁধ গড়ে তুলে—জলের তোড় এগিয়ে আসাকে বাধা দেওয়ালো এ ভাবে।—ঠিক স্বামীরই মুখের অবস্থানে প্রিয়ার মুখটি অবস্থান পাওয়ায়—অতি কাঁপা-কাঁপা ঠোঁট দুটি নিয়ে সন্ধ্যা তা ঘন ভাবে রাখলো—গৌতমেরই কাজলের ছোপ ধরা অধরেতে। যুগপতে দু'জনই চুমায় চুমায়—দু'জনকে আদর কোরল। পালটাপালটি ভাবে।

তৃপ্তা হ'য়ে, আর দৃপ্তা থেকে—সজলিতে দিঠি দিয়ে একেবারে মুখোমুখি অবস্থানে থাকা স্বামীর খুশীয়াল মুখখানা দেখতে-দেখতে—সন্ধ্যা জানালো—"ভয়ের কারণটা জানালে পর তুমি খুশী হ'তে পারবে ত' ? আমাকে ভুল বুঝবে না ত' ? সত্যি বলছো ? সত্যি ? তবে শোন।"—হঠাৎ কথা থামিয়ে সন্ধ্যা আদুরে গলায় বলল—"বলছি। গৌতম ? এই, আবার বেশ দুরন্ত হ'য়ে আদরে এলো করাবে না ঐ না জানা কথাটি শোনার আগে ? এই, আদর কর।"

—"ঈষ্। আগে আদর খায় না আর ! তোমার কথা ত' শুনি। তারপর যত খুশী আদর চাও সবই পাবে। সন্ধ্যা, এখন শুধু এই।" বলে গৌতম ছোট একখানা আলতো চুমা ওর কপোলে ছোঁয়ালো।

গৌতমের কাঁধেতে মুখরুচিরা লুকিয়ে অধরের সিক্ত আদরে শার্টের পুট্খানা প্রায় ভিজিয়ে তোলার মতো ক'রে জানালো সন্ধ্যা—"এই গৌতম ? জান, টুলটুলের জন্য ভাই, নয় ত' বোন—এদের কেউ একজন আসছে—শীগগির। আসছে মানে, এসে গেছে। টুলটুল ছাড়াও যে আরো একজনের বাবা আর কিছুদিন পরেই তুমি হ'তে চলেছো,—তা কৈ গৌতম, তুমি কী বুঝতে পার নি ? আচ্ছা, আচ্ছা গৌতম, এত তাড়াতাড়ি আমায় আবার সন্তানসম্ভবা করালে কেন ? আমার টুলটুলের কথাটা

একবার ভাবলে না ? ও কিছু বুঝবে না ঠিকই, এমন কি ওর কিছু অসুবিধাও যে হবে না—সে আমি জানি। তবু এই ছোট্ট শিশুকে আমার কাছ থেকে কোলছাড়া করিয়ে ছাড়বে—ঐ নতুন শিশু। না-না। এমনটা এত তাড়াতাড়ি হোক্ না কিন্তু হলফ্ করেই তোমার সন্ধ্যা বলতে পারে, যে,—ও চায় নি কিন্তু! তবু, হ্যাঁ তবু, নতুন আরেকজনের জন্য প্রজায়ন করায়—আমি অচিরে যে দ্বিতীয়বার 'মা' হ'তে চলেছি,—বুঝলে গৌতম, তার জন্য কিন্তু আমি খুবই গর্বের সাথে—নিজেকে সুখী মনে ক'রছি—প্রতিটি পলকে-পলকে। আর আমার তুমি, মানে আমাতেই সম্ভাবিত দ্বিতীয় সন্তানের স্রষ্টার কারুকাজখানাকে—তোমারই অজানায় অনুরণিত মিথুনিক লীলা-বাসরেতে—যে সম্পূর্ণতায় অঙ্কুরিত করাতে পেরেছো,—বলি সে কথা জেনে তুমিও নিশ্চয়ই খু-উ-ব খুশীয়াল হ'য়ে উঠেছো ? কী গো দুষ্টু ছেলে, তাই না ? এই, কথা বল। এই সম্ভাবিত দ্বিতীয় সৃষ্টির কবি-স্রষ্টা এত তাড়াতাড়ি হ'য়ে পরেছো জেনে কোন ছেলেমানুষি অভিমানে ভেঙ্গে পড়ো না কিন্তু! কী, রাগ ক'রছো বুঝি ভয়ানক ? তোমারই সন্ধ্যা নাম্নী দুষ্টুটির ওপরে, না ? এই, কী যে না তুমি! চুপ ক'রে আছো কেন ? কথা বল। তা না হ'লে এই আনন্দ-সংবাদটি তোমাকে শোনানোর পর এত সুখ আমায় আনচানিয়ে তুলছে, যে,—তাঁ সহ্য ক'রত না পেরে—আমি এখনি বোধ হয় কেঁদে ফেলবো—অঝোরধারায়। ঈষ্, আমায় দ্বিতীয় প্রাণেতে অঙ্কুরিতা করিয়ে অমন মান-অভিমান ক'রে কী বেশীক্ষণ পর্য্যন্ত পারবে, অবুঝ থাকতে ? এই আমায়, হ্যাঁ, তোমার সন্ধ্যাকে খু-উ-ব বিলোলিতায় আদর কর ? বলছি কর। তবে ত' বুঝবো, যে, তুমি রাগ কর নি।"

বলতে-বলতে যা বলা, করলোও তাই সন্ধ্যা। গৌতমের কাঁধে মুখ রেখে অঝোর-ধারার ছলছলানো কলোচ্ছলতায় কান্নার মৃদুল শব্দে ভরালো—এই শান্ত নিঝুমতাতে। সে কী কান্না!—সন্ধ্যার মতো মধুরিকা স্ত্রীরা বোধ হয়—তাদের সন্তান-সম্ভাবনার বার্তাখানা—ওদেরই না জেনে থাকা, বা বুঝতে না চাওয়া স্বামী-সৃজনকদের—জানাতে পারার পরই—ভেঙ্গে পড়ে—এমনতর অভিমানে বাঙানো আনন্দাশ্রুর—ভারেতে আর ধারেতে।—নতুন প্রাণের সৃষ্টি—এ যে মহাকবির মহাকাব্য রচনা করারই মতো! তাই না ?

প্রিয়ার মুখ থেকে আচমকা ঘোষিত হওয়া প্রতিটি কথাকে শুনলো—তারই স্বামী। শুনতে-শুনতে আর অনুভবে আশ্লিষ্ট হ'তে হ'তে—স্বামী গৌতম অপার বিস্ময়ে ঘেরা আনন্দের ধারায় উদ্বেল ভাবে—স্ত্রী সন্ধ্যাকে পুরোপুরি বুঝতে পারলো। আপন যুবক দেহ-মনের অন্বয়—ঐ ভাবে দ্বিতীয় পর্য্যায়েতে আনকোরা প্রাণকণার সৃজন সম্ভব করাতে পেরেছে—প্রিয়া সন্ধ্যারই নিসর্গ-সন্ধ্যার মতো অপার রসহ্যময় শারীরিবিতানেতে।—সে কথা এই মাত্র প্রিয়ারই অভিমানে কাঁপা লাল লাল অধরাধর

ছাড়িয়ে—কাটা-কাটা ভাবে জানাতে পারায়—গৌতম মুহূর্তকের জন্য বাক্‌শূন্য না হ'য়ে পারলো না। সত্যি, কী মধুর, কী উদার হোতে পারে তারই সন্ধ্যা !—তা না হ'লে পর এত তাড়াতাড়ি—পুনরায় সন্ধ্যা আরেক প্রাণস্বত্বায় পুষ্পায়িতা হ'য়ে—ওরই প্রথম সৃষ্টির কবিতা—ঐ ছোট্ট টুলটুলকে এই অচিরে আগতর জন্য—কোলছাড়া হতে হবে বলে—অযথা ভয় পেতো না। না, না। গৌতম চোখের দৃষ্টিতে সজলি'ত হ'য়ে পড়ে ভাবলো—"কী বিরাট আনন্দ পাওয়ায় সন্ধ্যা আজ ছোট্ট টুলটুলের জন্য ওরই মায়ের বুকেতে পাতা আশ্রয়খানাকে—আগতপ্রায় নতুন প্রাণখানা শিশু-কবিতায় ফুটে উঠে—যদি আশ্রয়হীন করায়,—সে কথাখানাও সন্ধ্যা ভেবে ফেলেছে। হ্যাঁ, তারই মিষ্টিকা এই সন্ধ্যা ! আর কিনা, সেই টুলটুলের কী হ'বে তা ভাবার পর—নতুনকে সানন্দে শিল্পীর রসনির্য্যাসে স্পন্দিত রেখে -রেখে—আজ এই একটু আগে আমার সন্ধ্য এ কেমন প্রশ্ন কোরে বসেছে—ওরই উতলা মন থেকে, যে,—এই তাড়াতাড়ি সৃষ্টির ছন্দে স্পন্দিত নতুন প্রাণকণার পুনরাবির্ভাব কী—আমাকে তুষ্ট কোরল না ? আমি কী রাগ ক'রলাম ? না-না। সন্ধ্যা, এ কথা আর মুখে এনো না তুমি। জান'ত তোমার মধ্যে দ্বিতীয় সৃষ্টির এই উৎসবখানা যত তাড়াতাড়িই—শুভায় ভবতু আর আমার থেকে করিয়েই থাকুক না কেন এরই অঙ্কুরণ—জান সন্ধ্যা, এ ব্যাপারে অসহায় যুবকত্বে অবুঝ আমি—আমারই প্রতিটি শিরা-উপশিরায় ছন্দিত হয়ে বাজতে থাকা আনন্দনির্ঝর নিয়ে —বাক্‌শূন্য হ'য়ে পড়ছি। সন্ধ্যা, আমার সুখ ! তোমায় আমি আজ তোমারই মুখ থেকে এমন কথা জানার পর দেখছি যে, খালি 'My heart leaps up'. অহরহ ভাবে তাই মনে জাগছে—

"The Child is father of the Man;
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety."

—শুধু একথা ভেবে-ভেবে অনুরাগের মাধবীরাগে ছোঁয়া পেয়ে—দোদুল মনে আর সজল চোখের ইশারায় ঝরা জলরেখার দাগ—দু'ধারের কপোল দিয়ে নেমে-নেমে যাওয়ার মধ্যে—স্বামী গৌতম কথা বলল—

"না-না। সন্ধ্যা, তুমি যে এ ব্যাপারে আমায় ভুল বুঝবে না কখনো—তা আমি ভালো ক'রেই জানি। আচ্ছা, তুমি নিজেও কেঁদেছো এ কথায় ? কেন ? আমি জেনে রাগ ক'রেছি কিনা, তাই ? শোন, এ রকম প্রশ্ন আর কখনো ক'রো না। আমার দুষ্টু ! বুঝলে ? আমি সত্যি রেগেছি কিনা—তা মুখ তুলে আর কান্না থামিয়ে ভালো ক'রে চোখ খুলে দেখ—তা হ'লেই বুঝবে ! এই সন্ধ্যা, আমার মিষ্টিকা, তাকাও বলছি চোখ খুলে। তা না হ'লে কী ক'রে ঠিকই বুঝবে।"

গৌতমের ধীরে-স্থিরে জানানো এখনকার এই কথাগুলোর মধ্যে সজল ভাবখানার প্রকাশ পাওয়া মাত্রই—প্রিয়া সন্ধ্যা বিদ্যুৎচালিত ভাবে এক লহমায় তার কান্নায়-হাসিতে একাকার থাকা—মুখখানা তুলে ধরলো—মুখোমুখি অবস্থানে। তাকিয়েই চমকালো বিলোলিত থাকা কান্নার মধ্যেই। সন্ধ্যার চোখে হাজার মুক্তাবিন্দুতে জমা জল—টলমল ভাবে কাঁপছে। আর ঝরছে। বেয়ে পড়ছে ছড়ানো ধারায়। আনন্দাশ্রুতে ভেজা লাল-লাল ঠোঁট দু'খানা অভিমানে গমকে ফুলে-ফুলে উঠছে—ছোট্ট এক মেয়ের মতো,—যে মেয়ে হারিয়ে ফেলেছে তারই মুখের দেয়ালা হাসিটি। কান্নার ছন্দে বিলোলিতা হ'য়েও, মুহূর্তের দেখা থেকে সন্ধ্যা বুঝলো—গৌতমের দু'দিকের কপোল দিয়ে একখানা করে সরু-সরু ধারায় নেমে আসার—জলরেখা। তখনি নিজের ডান হাতখানা তুলে তর্জনী দিয়ে টেনে-টেনে সন্ধ্যা মুছিয়ে দিতে লাগলো—প্রিয়তমর সুন্দর সুখময় কান্নার স্বাক্ষরে ফোটা—সিক্ত রেখাকে। তারই মধ্যে নিজেরও কান্না ভেজা গলায়, সন্ধ্যা বলল—

—"ছিঃ। একটু দুষ্টুমি ক'রে আমার প্রশ্ন করায় তুমিও দেখছি ছেলেমানুষিপনায় কম যাও না! দ্যুৎ। সত্যি, কী যে না তুমি! বাব্ বা—ভাগ্যিস টুলটুল এখানে নেই, তা না হ'লে ও-ও তোমার চোখে জল দেখলে অবুঝ মনেতেই হেসে-হেসে, লাল হ'তো। শোন, আর একজন নতুন জন্ম নিয়ে আসছে বলে অত ভয় বা ভাবনার কী আছে? আমি ভেবেছিলাম পাছে যদি টুলটুলের কিছু অসুবিধা হয়, এই আর কি! উপায় অবশ্য আমি খুঁজে বার ক'রেছি। আপাতত দ্বিতীয়ের জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত, মানে এখন যদি আমার এই সন্তান-সম্ভাবনার সময়টা দু'মাসের হয়, তা হ'লে শেষের দিকে ও জন্মানোর মাস তিনেক আগেই—ক'লকাতায় তোমার মা'-বাবার কাছে ফিরে যাবো। আর থাকবোও ওখানেই। তা হ'লে আর আমাদের টুলটুলের অসুবিধা কিছুই হবে না। সংসারের প্রথম পৌত্রী হিসাবে ও ত'ওর ঠাকু'মা আর দাদুর থেকে—কাছছাড়াটি কখনো হ'বে না। তাই আমি আমার নতুনকে নিয়ে পড়বো না কোন অসুবিধায়। সব চেয়ে বড় কথা—পুত্রবধূর প্রতি দেওয়া আদরেতে-সোহাগেতে—আমাদের মায়ের নজরে-নজরে যে তখন থাকতে পারবো। শোন গৌতম, এখন থেকে যে মাস পাঁচেক এখানে থাকবো তার মধ্যে আর কোন দিনও তুমি অফিস ফেরত, বল, আর দেরি ক'রবে না? কথা দাও আমায়।"

প্রিয়া সন্ধ্যার কান্নায় ভেজা আর প্রসাধনে এলো মুখখানায়—নিজের কপোল ঘষতে-ঘষতে বলল গৌতম—"হ্যাঁ, সন্ধ্যা। তাই হবে। তোমার সিঁথির সিঁদুর ছুয়ে কথা দিচ্ছি। এরপর আগামীকাল থেকে আর কোন দিন ফিরতে—হবে না দেরী। ঠিক-ঠিক।"

আবার মুখোমুখি অবস্থানে মুখ রেখে—চার চোখেতে দু'জনারই ভেজা-ভেজা চাহনি বন্দী রেখে—সন্ধ্যা অনুরাগ-নির্ঝরে বহুত মিনতি করারই মতো জানালো—লাল-লাল ঠোঁটে মধুছন্দার কাকলী-স্বভাব নাচিয়ে রেখে। রাঙানো জৌলুস ভরিয়ে সন্ধ্যা বলল—

—"এই ? শোন মিষ্টি। এ ছাড়াও তোমার প্রতি এই সন্ধ্যার জানাবার আরও আরজি আছে। দুষ্টুমি পরে ক'রো। শোন। আমাদের দু'জনার বয়েসখানা এখন আঠাশেরই প্রখর যৌবনসায়রের পারাপারে রয়েছে। স্বামী হিসাবে তুমি ঠিকই স্ত্রীর ওপরে নিজর শ্রেষ্ঠত্বটি বজায় রেখেছো—মাত্র সাত দিন,—মানে পুরো একট সপ্তাহোর অগ্রজত্বে—আমারই বয়েসখানা থেকে। দেখ গৌতম, তোমার এই সন্ধ্যা শুধু তোমার প্রিয়া, বা শুধু স্ত্রী, বা শুধু 'বেটার হাফ'ও নয় ! ও হ'লো তোমারই —মস্ত বন্ধু। তাই বলছি যে, আমাদের সাতাশ বছর বয়সের মাঝামাঝি—আমরা প্রথম মা-বাবার পরিচিতিটি পেলাম—টুলটুলের জন্মতে। তুমি ত' জান,—টুলটুলের জন্য আমাদের দু'জনকারই ছিল কী বিরাট আর ব্যাপক আকাঙ্খা। কী দাম্পত্যিক অধ্যবসায়। কত যত্ন। কত শঙ্কা।—কিন্তু গৌতম, ওর জন্মের পরই সাত তাড়াতাড়ি—নতুন আরেকজঁনের জন্ম-সম্ভাবনাটি—একটি পুরো বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা দিল ! তবে কি জান, এজন্য আমরা কেউই নিজেদেরকে ভুল বুঝতে পারি না। একদিকে কিন্তু আমাদের এই সৃষ্টি-সমীক্ষাটি—বেশ রোমান্টিকই হ'লো আমাদের আঠাশ বছর পুরো হাওয়ার সাথে-সাথেই—টুলটুলের পিঠোপিঠি ওর জন্ম হচ্ছে।—কিন্তু গৌতম, তারপরই কিন্তু প্রতিজ্ঞার চরম দলিলে আমাদের স্বাক্ষর দিতে হবে এই নিরিখে, যে, আগতপ্রায় নতুনের জন্ম-অভিষেকটি সম্পন্ন হওয়ার পর,—হ্যাঁ, আর—মানে আর যেন না হয়,—মানে, মানে এই আর কি,—ঈষ্। তুমি সত্যি কি যে না! মুখ ফুটে বলতে পারছি না দেখছো ত'। তা তুমি বুঝে নিচ্ছ না কেন নিজে ? হ্যাঁ, মানে আর কি—এ ব্যাপারেতে একেবারে টানবো ইতিরেখা। কেমন ?"—বলতে বলতে সন্ধ্যা চোখের মুষলধারেতে ঝরা বিপর্য্যয়ে হওয়া মোহনীয় মুখশ্রীখানা একেবারে স্বামী গৌতমের অতি শান্তশ্রীতে ঢাকা—মুখেরই সাথে ঘন করালো। কপালে কপাল। ভুরুতে ভুরু। চোখে চোখ। আর অধরে অধরখানার অবস্থানটিই যা শুধু আলতো ছোঁয়াতে রাখলো। তারই মধ্যে সন্ধ্যার ডান চোখখানার ভেজা কাজল-চাহনিটি আধক-আধ-চিঠিতে ঠিকরে পড়েছে—গৌতমেরই পেছনের খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরেতে। সামনেকার দেওয়ালে জ্বলতে থাকা ল্যাম্প-ষ্ট্যাণ্ডের নীচেতে—বড় ফ্রেমে আছে ভগিনী নিবেদিতার ছবিখানা। ছবির নীচে বড় টাইপে ছাপা রয়েছে নিবেদিতারই এক দামী কবিতা। ভালোবাসা সম্পর্কে ছন্দিত করা—প্রবাদ বিশেষ ! আরো বড় টাইপের মোটা

'phase'-এ জ্বল-জ্বল ক'রছে নামখানা। 'A Litany of Love.'—সন্ধ্যার সজলিত চোখের 'আধক-আট-দিঠি' একটু ফাঁক পেয়ে—নিজেদের নিশ্চল আর নির্জন আলিঙ্গন বাঁধনেতে আবেশ পেতে-পেতে—ও দিতে-দিতে,—গুন-গুন ক'রে পড়তে লাগলো—অধরের কাঁপন-ছোঁয়া গৌতমের অধরেতে—ভারে বসিয়ে রেখে কাঁপন তুলে তুলে—

"Love all transcendent,
Tenderness unspeakable,
Purity most awful,
Freedom absolute,
Light that lightest every man,
Sweetest of the sweet, and
Most terrible of the terrible."

সত্যি তা চোখের সজলিত 'আধক-আধ-দিঠি' বিস্তারিত ক'রে পড়তে পড়তে—সন্ধ্যা অজানিত পুলকানন্দে হেসে উঠলো, ঝলমলিয়ে। রিমঝিম প্রাণোচ্ছলতায়। হাসির স্ফূর্ত দোলনে সন্ধ্যার ঠোঁট এ ধরনের মুখোমুখি অবস্থানে থাকায়—অধরেরই নম্র আঘাত হানলো—স্বামীর অধরেতে। হ্যাঁ, যে গৌতমের দুরন্ত অধর সময় কি অসময়ের কোন ধার না ধারার মধ্যেই—প্রণয়ের দস্যিপনায় মাতামাতি ক'রে বসে, ওরই যুবকত্বের একান্ত নিয়মমাফিক—আজ সত্যি এমন মধুরিক অবস্থানের মধ্যে পেয়েও—কিন্তু হোতে চাইছে না —দুর্বার। অনিবার। সন্ধ্যা তা দেখে-দেখে—দারুণ খুশিয়ালিনী হ'য়ে পড়লো। চাইলো খুশীর ছোঁয়ায় গৌতমকে সুখের অন্বয় ধরে—আরো খুশীয়াল করাতে।

সন্ধ্যা বলল—"বল, কেমন আদর চাও ? গৌতম, এইবারটি ছেলেমানুষিপানা ভেঙ্গে ফেল। কিছু বল ?"—বলতে-বলতে সারা শরীরে মাদক হিলোলতা ঝরিয়ে প্রায় লাফাতে লাফাতে—গৌতমের অধরে চুমায়নী ঋতুসাজ আঁকতে থাকার মধ্যেই বললো—"বাব্‌বা। তোমায় ত' জানি কী ছেলে ! একবার মাত্র চুমায় আদর ক'রলেই কী হোল ! সত্যি, সত্যি ! কিছুতেই যে, একেবারে তুমি খুশী হও না। হ্যাঁ, তুমি যে দুষ্টু তখন বল, 'না, একেবারে হবে না। চাই—Twice more, Thrice more. আরো। আরো। হ্যাঁ, তাই গো দুষ্টু। তোমায় ত' আমি জানি। আর গৌতম তোমায় ত' আমি চিনি আমারই দেহের'—প্রতিটি অণুতে-পরমাণুতে। আর সে ভাবেই ত' আমি তোমায় ভালোবাসি। তুমিও যে আমায় বাসো তেমনি। প্রণয়-স্বাক্ষর ফোটাতে যে তুমি তোমার এই সন্ধ্যার দেহমনেতে—ঝড় আর তুফান ডেকে আনাও। তা কী, আমারও সুন্দর লাগে না ? মধুর লাগে না ?"—বলতে বলতে মধুরিম করা

হর্ষোৎফুল্লতায় নাচের মুদ্রা ফুটিয়ে—শ্রীমতী সন্ধ্যা তার ফুলের মতন নরম লাল অধরেরই দুষ্টু প্রণয়কাজখানায়—গৌতমের অতি শান্ত অধরেতে মৃদু-মৃদু আঘাত হেনে—অশ্রু টলমলানো দু'চোখের মদালসা চাহনি ঝলমলিয়ে বলল—"কী গো গৌতম, আমার করা এই আদরকণা চাইছো বুঝি—আরেকবারটি, না ? কী, once more ? খুশী হ'বে ত', না পুনরায় দুষ্টু ছেলের মতো আবদার ধরবে ! নেও, নেও। আর কিছুটা বলত হবে না তোমায়। কী, এই once more হ'লো ত' ? এবার গৌতম ? হ্যাঁ, আমার আদর—এই যে twice more-ও হ'লো। উঃ, আর পারি না। কী যে দস্যি না তুমি ! আমার সব আদর লুট ক'রে তবে ছাড়বে দেখছি। ঈষ্। ঈষ্। এই যে, এই ত' thrice more-ও হ'য়ে গেল। না-না। আর হবে না। আর এর বেশী চাইলে পর আর আমি কিন্তু সত্যি তোমার দস্যিপনার কবল থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য—কান্নারই বাদলা ধারায়, ভয়ানক ভাবে ভাসবো।"

আদর লুট করার একান্ত দাম্পত্যিক ঋতুমহলেতে করা শুধু নিলাজক আবদার অনুযায়ী—স্বামী গৌতম জানতে চাইলো—

—"বাঃ। এত' বেশ কথা ! তুমিও ত—'আর হবে না, আর হবে না' হ্যাঁ আর পাবে না, আর পাবে না' বলে-বলেও আদরখানা জানাচ্ছই বা কেন ? আর পরমুহূর্তে তার জন্য শ্রাবণের বাদলায় এলো হ'তে চাইছো কেন ? ঈষ্। আমি দস্যিপনা করি, না ? আর তুমি ? এই সন্ধ্যা, জানই ত' তুমি ভালো ক'রে, যে,—তুমিই আসলে আমার দুরন্তপনা ধরে-ধরে—পরম দুষ্টুমান হবার মতো ইন্ধনখানাকে—প্রযোজনা ক'রে থাকো। দেহেতে। প্রাণেতে। আর মনের প্রতিটি অণু পর্য্যন্ত—আবদার করার ঢেউ তুলে-তুলে। কী ভুল বললাম ? এই, চোখে চোখ রাখো। কথা বল। তা না হ'লে বুঝতেই ত' পারছো—এই সময়টায় টুলটুল কাছে না থাকার দরুণ এমন সুবিধাতে..."

সন্ধ্যা তার চুরি-বালাতে ঝনক-ঝনক তানসুদ্ধ হাতখানা দিয়ে এক ঝটকাতে চাপা দিয়ে ধরলো—গৌতমেরই অধরের কথা-নির্ঝরে। বাঁধ বাঁধার মতো। বলল—"না। আর পারি না বাপু এ ভাবে তোমারই আবদারগুলোর সাথে প্রতিনিয়ত যুঝতে ! ধ্যাত, কী যে কোবছো না তুমি ! না, না। অনেক হ'য়েছে।—ঈষ্ ! তোমার জারিজুরির কাছে একটি মেয়ের জোর—আর কতক্ষণ 'না' জানাতে পারে ? গৌতম, দ্যুৎ কী কোরছো ! লাগছে যে ! দোহাই তোমার। হার মানছি। ছাড়ো না এইবারটি। সারা রাতের তিনখানা যাম ত' এখনো পড়ে রয়েছে। এই, তখন না হয় আবার আবদারেতে ঝড় হ'য়ো। কেমন ?"

প্রিয়ার কপোলেতে আপন অধরের আবদারটি লুটিয়ে রেখে—ডান হাতেতে গৌতম আদরণীর পরশ ভরিয়ে—সন্ধ্যার মাথায়, গলায়, ঘাড়ের দু'পাশে, পিঠেতে,

আর সুনিবিড় যৌবনরহস্যে ভাব ও আবেগের উত্থান-পতনে ছন্দময় বুকখানার পাশাপাশি ভালোবাসার শিহরণ ফুটিয়ে বলল—"দেখ সন্ধ্যা, এমন নিরালায়, এমন স্নিগ্ধ পরিবেশে আমি দুরন্ত হই। আর দুর্বার হই ঠিকই। হই। —তোমারই জন্য সন্ধ্যা তোমায় আদর করারই জন্য। সন্ধ্যা, কিছু বলবে না?"

হঠাৎই কথার পিঠেতে কথা বসাতে গিয়ে তার শত আবদার নিয়ে উৎফুল্ল থাকা গৌতমেরই কাঁধেতে, মাথা রেখে সন্ধ্যা বলল—"হ্যাঁ, তাই। তোমার সন্ধ্যা মনে-প্রাণে তাই বিশ্বাস ক'রে। আর কিছুটি যে নয়, ত' তোমারও ভালো ভাবেই জানা আছে। তুমি তোমার ভালোবাসা জানাতে নেমে যত বেশী দুষ্টপনায় আমায় এলো করাও না কেন—সেটিকেই আমার বেশী পছন্দ। তবু আজ এতদিনে টুলটুলের মা হয়েও—পুনরায় আবার যখন এমন সময়টার প্রজায়নের নতুন-সৃষ্টিতে সম্ভাবিতা হ'য়েছি—জানবে, এখনও আমি তাই চাই। তাই চাইবো। হ্যাঁ, চিরকালই তাই চেয়ে-চিন্তে চলবো।"

সন্ধ্যা কথা নিয়ে থামতেই—আগেও অনেকবারই ক'রে থাকা উত্তর-জানা প্রশ্নখানা জানতে চাইলো গৌতম—"তবে বাধা দেও কেন? এ রহস্য বার-বার উদ্ঘাটন করেও—এর কোন স্থির লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারি না যে, সন্ধ্যা! তুমি ত' আজ আমারই যৌবনধ্যানের মূর্তিখানাতে, নিজেকে হ্লাদিতে সঁপে দিয়ে দিয়ে—আমার ও তোমার সৃষ্টি-সুখেরই পালাবদলেতে—সত্যি প্রজায়িতায় সাজবদল ক'রায়—আত্মজাকে পৃথিবীতে এনেছো।—আর এনে 'মা'-তে নামধেয়া হ'য়েছো! তবু সন্ধ্যা, মাঝেমাঝে এই দাম্পত্যিক বাসরেতে সুখী থেকে—বুঝেও বুঝতে পারি না কেন—আমারই এই তোমাকে!"

সন্ধ্যা মদিরা ভরা হাসিতে ঝলমলিয়ে উঠে বলল—"ঈষ্! তুমি একেবারে ছোট্ট শিশু বুঝি! তবে, বুঝেও খালি 'বুঝি না' বল কেন? ওগো গৌতম, তুমি জেনে রাখো যে, তোমার সন্ধ্যা এর পরেও অনেক বছর ধরে—এমন ভাবেতেই নিজেকে হাসাবে। কাঁদাবে। রাঙাবে। আদরে-আবদারে করাবে এলোমেলো। অলাজুকা। কিন্তু, কী জান? এরপরও—তুমি নিজে থেকে সত্যি কিছু চাইলেই আমার মুখে তখনই শুনবে 'সম্মতি-বাচক'—সেই 'না। না' করার—প্রতিরোধখানা।"

গৌতম তার রঙের মাধুরীতে আনচানানো চোখের বিস্ময়-রাঙা ভাব ছাড়িয়ে উঠে জানালো—"আচ্ছা সন্ধ্যা, সে না হয় বুঝলাম। আর ভুলও না হয় বুঝবো না। কিন্তু বলি, তুমি যেদিন বার্দ্ধক্যের ভারে দিশেহারা হবে,—সত্যি সেদিন কী আর আগের মতো—যৌবনায়নী দুষ্টুমিগুলো না ক'রতে পারার দরুণ হবে না—ক্রন্দসী? একই বয়েসী যে আমরা দু'জন! জান সন্ধ্যা, এ-দেশের প্রবীণাদের ধারণা হ'লো, যে,—মেয়েরা নাকি কুড়ি পেরুলেই বুড়ি হ'য়ে যায়! অনন্ত ছেলেদের চাইতে

ত' ঠিকই। শোন সন্ধ্যা, আর কিছুদিন পরেই ত' আমারই মতো, তোমারও আঠাশ বছর পূর্ণ হ'তে চলেছে। আমার থেকে এক সপ্তাহের ছোটটি তুমি হ'লেও—তাতে কিছু সুবিধা হ'বে না এ জন্য, যে,—কবেই ত' তুমি কুড়ি পেরিয়ে এসে—তথাকথিত প্রবাদানুযায়ী—বুড়িয়ে যাচ্ছ না কি? জান ত' সন্ধ্যা, একই বয়সের তীরভূমি ছুঁয়ে থাকায়—মেয়ে বলে আমার আগেই ত' তুমি, হ্যাঁ আমার এই দুষ্টু বনাম মিষ্টি সন্ধ্যা নামের অতি লাজুকা যুবতী কী..."

প্রিয়তমার মুখেতে হাত চাপা দিয়ে—কথাটি আর শেষ করাতে না দিয়ে—একটি ভয়কাতর চাহনি ছড়িয়ে গৌতমের চোখেতে চোখ রেখে জানালো সন্ধ্যা তখনি—"না। না। অমন কথা তুমি মুখে এনো না কখনো। আমি কখনো বুড়ি হতে পারবো না। বুড়িয়ে গেলে বল কে তখন তোমাকে আদরে আর আবদারে পাহারা দিয়ে রাখবে? না না। তোমার সন্ধ্যা যে একদিন বার্দ্ধক্যের ভারে টাল খেয়ে পড়তে পারে,—ও কথা ভাবতে গেলে আমার সত্যি কান্না এসে যাচ্ছে। ওগো গৌতম, তুমি, হ্যাঁ, আরো অনেক বছর পর্য্যন্ত এইভাবেই ভালবাসবে শুধু। দেখবে তা' হলে তোমার সন্ধ্যার যৌবন থাকবে অটুট। অন্তত মনের দিক থেকে ত' নিশ্চয়ই। একথা ভাবতে পারি না যে।" বলতে বলতে বাদুলে বাতাসে আছড়ে পড়ার মতো দু'চোখে বাদলের ধারা নামালো সন্ধ্যা।—কিন্তু তারই মধ্যে—ভবিষ্যতের অমন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে—স্বামী গৌতমকে যুবতী প্রিয়ার চুমায় চুমায় সাজাতে লাগলো—সন্ধ্যা। তারই অন্তরতম আরাধ্যকে। হৃদয়কে দেবতাকে। একান্ত দাম্পত্যিকতায়—বধূরত্না সন্ধ্যা যে দেবিকা হয়েই থাকতে চায়—চিরন্তনীতে। তারই বরপুরুষের—কাছটিতে।

‘হেভেন-বর্ন’ সার্ভিসের ‘স্টীল্-ফ্রেমি’ আই. সি. এস.—করুণাকেতন সেন

ধ্যাতির কেতন ওড়ে—আজও এই পাঁচ দশকের পরেও ওই দুর্গাপুরে—বিধান রায়ের মনসিজ মানসপুত্রের ঘেরাটোপে—নয় নয় করুণায়, হয় হয় বরণীয় স্মরণ্যে। নয় নয় হাবেভাবে আটপৌরে। পারিপাটি মানুষী ব্যক্তিত্বটির—যাঁর নাম আই. সি. এস. করুণাকেতন সেন। ঢাকা জেলার জবরদস্ত এক বিক্রমপুরীয়ানের—যাঁর বাবা কুমুদ সেন, প্রভিন্সিয়াল সিভিল সার্ভিসের ছিলেন কেউকেটা, যদিও পুরোদস্তুরি বাঙাল, তায় বাঙালিবাবু। ছিলেন নানা জেলার সেশন ও ডিস্ট্রিক্ট জাজ। তখনকার বেথুন বিউটি শ্রীমতী বীরেন্দ্রমোহিনী অবশ্যই ইংরেজিতে নাম লেখার সময় বানানেব ‘বি’ না লিখে, লিখতেন ‘ভি’। আই. সি. এস. জননী এই মহিলা দেশের সমাজ সেবায়ও ছিলেন—অতিশয়ী খানদান য়্যারিস্টোক্রেট। বাংলার ফার্স্ট লেডি—সে সময়ের লেডি বঙ্গবালা মুখার্জী বলতেন—‘ছোট বোনটা বীরু যেমন সুন্দরী ছিল, তেমনি আদবকায়দায়িনীও।’ আর লেডি রমলা সিংহ অফ রায়পুর ব্যারোনেজ বলতেন, ‘ও না থাকলে আমাদের কাজে থাকত ঘাটতি’। আর সদ্য প্রয়তা সীতা-মাসি, অর্থাৎ ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শচীন্দ্র-জায়া সীতা চৌধুরী জানাতেন—‘বীরুদি মেজাজে মেম-সাহেব। বিলেত না গিয়েও। আবেগে ছিলেন খাঁটি বাঙালিনী।’ হ্যাঁ, এই মা-ই তার একমাত্র পুত্রটির পড়াশোনার সবটাই রাখতেন আপনার আয়ত্ত-সমৃদ্ধা আবর্তনে—যার ফল করুণাকেতন, নারায়ণগঞ্জ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকে উত্তীর্ণ হন—অখণ্ড বাংলায়—প্রথম হয়ে। শুধু প্রথমই নয়—কথিত আছে অঙ্কে ছিল আন-বিলিভেবেল নম্বর। বীজগণিতের বিখ্যাত কে. পি. বোসের জামাতা—বেলিয়াতোড়ের টেক্‌নোক্র্যাট্ পি. সি. নিয়োগী আমায় বলতেন, ‘করণা-দার মেধা অঙ্ককে ঘিরে, যার তুলনা পাওয়া ভার ছিল—সেদিন। এই নিয়োগী মশাই দুর্গাপুর ইস্পাতে করুণাকেতনের পর—মিঃ ডি. জে বেলের পরবর্তী ছিলেন। সুনাম বহালে।

যাক। আজও দুর্গাপুরের পথচলিত যে কেউ যদি শোনে—আমি চিনি, আমি ভালো পরিচিতির সাথ—কাছের ঘনিষ্ঠ ছিলাম। তবে তখনি হাঁটা থামিয়ে, দু-দণ্ড সময় নিতো স্মৃতিচারণায়। মোদ্দাকথা, আজও ‘সেন সাহেবই ছিলেন ইস্পাত কারখানার সবটাই। প্রতিষ্ঠাতা প্রশাসক, আবার প্রাণ-সঞ্চারী মহান ব্যক্তিত্ব। যা কিছু দেখছেন সব ওঁর করা প্রশাসনী উদ্যম। অমন কট্টর প্রশাসক—কিন্তু বিজ্ঞানে ছিল অগাধ পড়াশোনা আর পাণ্ডিত্য। ওনার মতো লোকের অভাব সারা দেশে, তাই আজ আমাদের অসহায়ী দুরাবস্থা। সেন কে. কে-র সাথে পরিচিতি পাই, সেই চুয়ান্নয়

এস. এফ. পরীক্ষার পর—তিন মাসের থমথমী সেই না ফুরানোর মতো অবসরটায়। রহস্য ভরা, রোমাঞ্চে ঘেরা। ষোলোর বয়ঃসন্ধি চলছে। মধুরাংশ্চ যখন কথাটা—য়্যাডোলিসেন্স। রোজ সকালে মর্নিংওয়াকে—লেকে যেতুম। হাঁটা তো মস্ত ব্যায়াম। বাবা তাই বলতেন। হাতে থাকত ন্যাশনাল লাইব্রেরির বরো করা বই। কখনো ইংরেজি, কখনো বাংলা। খুব দুষ্টু ছিলাম। তা না হলে পড়ার দারুণ উৎসাহ দেখে—বাবা ও তস্য বিলেতের বন্ধু ডা. বি. এস. কেশবন—আইন ভেঙে আঠারো না হতেই আমায় জাতীয় গ্রন্থাগারে সামিল করান—অবশ্যই এঁদের কমন্ ফ্রেন্ড সে সময়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষাসচিব ডা. হুমায়ুন কবীরের সাগ্রহী উৎসাহে। বলা ভালো—অনুজপ্রতিম কে. কে.-কে খুবই শ্রদ্ধা করতেন—শ্রীযুক্ত কেশবন—বিখ্যাত এই বিশ্ববন্দিত গ্রন্থাগারিক।

বলছি। সে সময় লেক হসপিটারের প্রধান গেটের সামনে দিয়ে লেকে ঢোকার রাস্তা ছিল—তিন কোণা হয়ে মিশে যায়—তেকোণী এক বসবার জায়গায়। তিন ধারে বেঞ্চ পাতা। সামনে তফাতে তিনি চারটি নব-নির্মিত চায়ের দোকান—সেই আদি ও অকৃত্রিম মাটির ভাড়ে সার্ভ করা—যা উদ্বাস্তুরা করেছিলেন। ওই জায়গায় জনা দশ-বারো পক্ক-কেশী বৃদ্ধের—সকালী আসর বসত—হ্যাঁ, যাঁরা কিন্তু প্রত্যেকেই বেশ বিখ্যাতর দলে পড়তেন। ষোলোর আমায় অলিখিত সভ্য করে নেন—হিন্দুস্থান পার্কের 'কমলালয়ের' নাইট উপাধিপ্রাপ্ত—স্যার কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী। ব্যারিস্টার, তায় শ্রমিক নেতা হিসেবে—ভারত-ভাইসরয় লর্ড চেমস্ফোর্ডের শাসন-পরিষদের অনারেবল মেম্বর অফ্ লেবার ছিলেন। বার পঁচিশেক তিনি জেনেভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ ও সি. এফ. এন্ডরুজ এবং ভারত্-সচিব লর্ড প্যাথিক লরেন্স ও পরবর্তী লেবার প্রধানমন্ত্রী লর্ড ক্লিমেন্ট এটলীর—অন্তরঙ্গ ছিলেন। যশোরের কৃষ্ণচন্দ্রের প্রেসিডেন্সির সহপাঠী ছিলেন—কে. কে-র বাবা—ওই কুমুদবন্ধু। আর যাঁরা যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে দুজন তখনও রিটায়ারে যাননি—একজন অধ্যাপক বনাম আইনজ্ঞ—হবু প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তী। আর একজন তাঁরই পরবর্তী স্যাকসেশর—আই. সি. এস. শ্রীকুলদাচরণ দাশগুপ্ত, আরও একজন ঢাকাইয়া বিক্রমপুরী।

যাক। কথায় আসি। পুত্র করুণাকেতন কলকাতায় থাকাকালে রাজা বসন্ত রায় রোড থেকে—পিতা কুমুদবন্ধুকে নিজে একটি ক্রীম রঙের সিঙ্গেল ডোর মরিস মাইনর চালিয়ে নিয়ে আসতেন। নিজে নামতেন। বাবাকে দরজা খুলতে সাহায্য করার জন্য। গায়ে থাকত করুণাকেতনের ট্রাউজার ও বুকে ফিতে ঝোলানো শার্ট ও গেঞ্জির মিলিত রূপ। সুপুরুষ। মেদহীন বেশ ফর্সা। তার চেয়েও অধিক ফর্সায়

লালভ ছোপ ছিল—ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহতি, পাম-শু পরা—বাবা কুমুদবন্ধুর। একদিন দেরি করে গেছি। বাবাকে পৌঁছে ছেলে গাড়িতে স্টার্ট নিচ্ছে। থামতে বলে—আমার সাথে পরিচিত করান ছেলেকে। 'লেখক। এখনই স্যুইট্ হার্টকে নিয়ে কবিতা লিখে শুনিয়েছে আমাদের বৃদ্ধের দলকে। বকব কেন, তারিফের যোগ্য ওর ওই রচনা। শতেক লাইনের। জানিস তো, খোকা ওর ডাক নাম বাবলু। এখনই গুরু বানিয়েছে—তোদেরই ক্যাডারের সিনিয়র অন্নদাশঙ্করকে। বলি, নট্ টু ফলো অলওয়েজ।'

করুণাকেতন ব্যাগ থেকে জি. এম. দুর্গাপুর স্টীল প্রোজেক্টস-এর আপন ভিজিটিং কার্ডখানা হাতে গুঁজে দিয়ে বলেন—'একদিন এসে দুর্গাপুর দেখে যাও। তৈরি হচ্ছে। ভালোই লাগবে।'

শুনে বাবা ছেলেকে বললেন—'এই শ্রীমানকে তো চিনি। দেখবি খোকা, ঠিকই গিয়ে ও তোর কাছে হাজির হবে। জানার চেনার কৌতূহলে—ওর কোনো ঘাটতি নেই।' বলেই ছেলে কে. কে-র হাসির ওপর রাখলেন—আপনভোলা বাজখাই হাসিকে।

আমি লেকে ঢুকছি। বাবকে নামিয়ে ছেলে ফিরে যেতে তৈয়ার। আমার হাতে ইংরেজি বই। কাছে আসতেই বইটা হাতে নিলেন। ছেলে আর স্টার্ট না নিয়ে চুপ থাকল। ন্যাশনাল থেকে নিয়েছি। ফ্রাঁসোয়া মারিয়াকের বিখ্যাত উপন্যাস 'এ কিস ফর দা লেপার'। লেপ্রস্রির রোগ ও রোগীকে নিয়ে সাড়া জাগানো কথারূপ।

বাবা নাম দেখে বললেন, 'দ্যাখ খোকা, এঁচোড়ে নয়। স্বাভাবিকভাবে এখনই পেকে গেছে, যেন টুসটুসে রসের কারবারী। পড়ায়। রিডিঙে। আমি নিলাম।' আমার দিকে তাকিয়ে—'কালই ফেরৎ পাবে।' বলেই খোলা জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে ছেলের পাশে, সিটে রেখে দিল।

কথা মতন পরের দিনই ফেরত দিলেন, 'অসাধারণ ভালো বই—শুধু পড়ো না এর বিষয়বস্তুতে যা আছে—লিখবে তা নিয়ে—আপন চিন্তার আদানে।

একটা কথা, বই ফেরত নেওয়া নিয়ে, পরবর্তীকালে—মজার ঘটনা শুনিয়েছিলাম—করুণাকেতনকে, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের এক উপাসনার—সন্ধ্যায়। উনি তখন এর কার্যনির্বাহী আচার্য। কথায় কথায় জানতে চান, 'বনফুলকে কেমন লাগে।'

উত্তরে বলি, 'ভালোই। তবে ওয়ান বুক ক্রিয়েটর, নাম জঙ্গম। সাহিত্যের ভাড়ারে স্থায়ী সাধক। তবে আর অন্যগুলো নয়।'

এতদিনে কে. কে-কে কাকু বলে সম্বোধন করি। তাই রেশ ধরাতে বলি—রীগার্ডিঙ্ রির্টান অব বুক, অর বুকস। —'বুঝলেন কাকু, আপনি কারুর কাছ থেকে

বই ধার নিতে চান না। কারণ ফেরত দিতে যদি অনিচ্ছাকৃত নয়ই, ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি হয়। কী ফেরত দিতে ভুলেই গেলাম। তবে আর কী, ফেরতই দিয়ো।

'জানেন কাকু, বাষট্টিতে বনফুল মানে বলাইবাবু সিংহীবাগানে বড় ছেলের কোয়ার্টারে উঠেছেন। ফ্ল্যাট আর কী। ছেলে মেডিকেলে ডিমন্‌স্ট্রেটর। অবাক লাগে, বাবা আর মা জানালেন, অল্প বয়সেই সহকারী অধ্যাপক। কিন্তু বনফুল খেয়াল রাখেননি এখনকার অধ্যক্ষ তখন আমারই পাড়াতুতো দাদা। যাক আসল কথা। বলাইবাবুর ইচ্ছে—লেপারদের জীবন ও সমাজ নিয়ে একখানা বই লিখবেন। আমার কাছে হেল্প চাইলেন। ওই বিষয়ী কোনো বই জানা আছে কিনা।'

কে. কে বললেন, 'এই সেই বাবাকে পড়তে দেওয়া বইটা নিশ্চয়ই। 'এ কীস ফর দ্য লেপার'। দেখলে তো অশোক, এত দিন পরেও মনে রেখেছি। হাসলেন, আর বললেন, 'কেমন স্মৃতিতে ধরে রাখার ব্যাপারে আমিও তোমার থেকে কম নই, কী বলো?'

দাঁত আছে আবারো দাঁত নেই কে.কে-র মুখের সেই তৃপ্তিধর হাসিটা আজও ভাসছে চোখের সামনে। 'তারপর' কে. কে-র উৎসাহ দারুণ তা জানত। ন্যাশনাল থেকে বইটা ইস্যু করিয়ে তার বাসায় এলুম। জানিয়ে এলুম, মেয়াদ পনেরো দিনের। ফেরৎ দেবেন মনে করে।

তখন ক'জনের বাড়িতে ফোন ছিল—তা গুনে বলা যেত। বনফুলের ছেলের ফোন ছিল না। তাতে সুবিধেই হয়েছিল, তাগাদা দেওয়ার সুযোগ নেই। দু-সপ্তাহ গেল। এক মাস যেতে যেতে, তিন মাস হল। মারিয়াকের ফেরতে কোনো পাত্তা নেই। স্বয়ং বনফুল দু সপ্তার মাথাতেই ভাগলপুরী হোয়ে যান, কিন্তু আমায় ভুলেই যেন। এক প্রকাশক বোধ হয় গোপাল মজুমদার মশাই বাজারি পরিচিতি আছে জেনেই আগাম পর পর যেন সব বইগুলি ছাপার বরাত আর কেউ নয়, তিনিই যেন পান—সেই কড়ারে—গাড়ীহীন বলাইবাবুকে—ঝকঝকে তকতকে ক্রীম-রঙি একটা নতুন অ্যামবাসাডার -উপহার দেয়—বিনামূল্যে। যেন এও যৌতুক। গাড়ি চড়ে মুলুক বিহারে—সস্ত্রীক পাড়ি। আর কিন্তু আর ওই গোপালবাবুর ভাগ্যে আর একখানাও নতুন বনফুল জোটেনি। ব্যস? নো ডকুমেন্টশ। এ হার সাহিত্যিকের অসাহিত্যকোচিত স্ল্যাপ। মার!

ডাক্তার ছেলের বাড়িতে হাজির। বইয়ের জন্য। 'ধের মশাই। বই ফেরত পেয়ে আজ এতদিন পরে বলছেন বই পাইনি। একজন ফার্স্ট ক্লাস লায়ার। বাবা কখনো এ কাজ করতে পারেন না। আপনি ঠকাতে এসেছেন।' যখন বলছেন ও কথা লেখক-তনয়—তখন ছোট্ট ফ্ল্যাটের জন্য দরজার সামনেই রাখা—ফেলে দেয়ার ও কাগজপত্তরে দেখি, মারিয়াক সাহেব উঁকি মেরে হাসছেন—হাঁস-ফাঁসে মুক্তি পেতে।

এক ঝটকায় হাত বাড়িয়ে বইটা নিতেই, 'এটা কী এটা কী'! জানেন, পুলিশে জানাতে পারি, হাতকড়া পরাব হাতে।' ভুলের তবু লজ্জা নেই। কোয়ার্টারের লোক ডেকে আপনাকে ট্র্যাসপাসার হিসেবে ধরিয়ে দিতে পারি। ধের মশাই তা জানেন।'

'দিন না, দিন না', আর কথা না বাড়িয়ে—বনফুলী ব্যড ওভার এড়াতে সিঁড়ি বেয়ে বাইরে চলে আসি—ঝরাফুল, বাসীফুল—যেন আর কস্মিনে এভাবে না দেখতে হয়।

আই. সি. এস-রা কিন্তু এই সব পেটি ব্যাপারে বিব্রত-বোধ করে। তাই কে. কে—খুবই বিশ্রী মনে করেই বলেছিলেন, 'শেমফুল ডিড। কেয়ারলেস টপ্ টু বটম্, ছিঃ।'

আর একটু। ভাবনুসরণ, না আত্মস্থীকরণ মারিয়াককে বনফুলেতে—তা আর আমায় কৌতূহলী রাখেনি। এই বইয়ের সাহায্যে ও সান্নিধ্য স্বীকারে লিখেছিলেন, 'মানসপুর'। বইটি প্রকাশক দিয়েছিলেন। বইটি পড়ার আগ্রহ আজও পাইনি। সংগ্রহে রেখেছি—মনোরম গেট-আপের জন্য।

রসবোধ্যে বোদ্ধা ছিলেন—কে কে.। সুযোগ পেলে তারিয়ে তার রসায়ন দেখাতেন। এই বই ধার নিয়ে ফেরত না দেওয়া প্রসঙ্গে বলতেন, করুণাকেতন—'বাংলা বর্ণের স্বরবর্ণীয় উ আর ই থেকে সাবধান থেকো। বই বা বউ যদি নিজের থেকে একবারটি হাতছাড়া হয়, তাহলে গেছ বাবা। কেউই অতি সহজে সরল পথে আসে না—ফেরত!' সেই হাসি, দাঁত নেই আবার দাঁত আছের।

হালফিলের কে. কে-র চেহারায় ফর্সা তনুরাগ বিবর্তিত ছিল—শ্যাম বরণে। বেশটি মলিন। তার কারণ—রোদে রোদে ঘোরাফেরায়—অস্বাভাবিক গরমে। স্ত্রী বাড়িতে তখন আধিব্যাধিতে জর্জরিতা। ওষুধ আর ডাক্তার। কাজের লোককে তদারকিতে রেখে উনি তাড়াতাড়ি লাঞ্চ গ্রহণান্তে বেরিয়ে পড়তেন। এখানে ওখানে ইতিউতি গেলেও প্রায় বিভিন্ন মিটিং অ্যাটেন্ড করতেন। গাড়ি-জুড়ি বিক্রি করে দেন। পাঁয়ে হেঁটে চলতেই ভালোবাসতেন।

অনেকদিনের অদর্শনের পর ওঁনাকে দেখি এ. জে. সি. বোস রোডের বুলেভার্ডে উঠে দাঁড়িয়ে আছেন—আর এক পারে—যাবার জন্য। চেহারায় ইচ্ছাকৃত আটপৌরীভাব। ময়লা ট্রাউজার। আকাশী রঙের হাওয়াই শার্ট। পায়ে পট্টি লাগানো হাওয়াই চটি। মুখে পাইপ। তাও তালি মারা—তামার। কাঁধে ঝুলছে কাপড়ের সাইড ব্যাগ। হাতে তিন-চারখানা বই, কষ্ট হলেও ভার বইতে—খুশিতেই যেন আটকে রেখেছেন। পড়ি পড়ি। বুঝলাম, ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে ফিরছেন। বাড়ির পথেই। ল্যান্সডাউন ধরে সামনে এগোলে পেয়ে যাবে অনেকটা পথ অতিক্রমান্তে—ডানহাতি

রাজা বসন্ত রায় রোড। খান কয় বাড়ির পরে ওনার পৈতৃক বসত। হাঁটবেন। হেঁটে হেঁটেই যাবেন। আর ফিরবেনও। কেউ যদি লিফট দেয়, তবে অন্য কথা।

বিদেশী পোশাক ছেড়ে শেষের দিকটায় উনি ধুতি-পাঞ্জাবীতেই বেশি সহজ বোধ করতেন। পোশাক পরার ব্যাপারে ছিলেন—নজরহীন। কাপড় কখনও কাচা, তা হলে পাঞ্জাবী থাকত ময়লা। দেখা যেত মাটি অবধি ঝুলছে সামনের কুঁচনো কোঁচা। কাছাটা অতি টাইট মেরে গোঁজা। ভিজাঁ ভেঁ। আবার কোনোদিন পেছনের কাছাটা। ঢিলেঢালা লুটপুটুনীতে। সামনের কোঁচা খাটোতে উঁচু হয়ে ঝুলছে। কাঁধে ব্যাগ। চশমা-কলম, আর চেক বইটা সবসময়ই তাতে থাকবে। আর খানকয় বই। নো ছাতি বাহন। ঝড়ে-জলে-রোদে চলছেন নির্বিকারে। কোনোদিন সিটি গ্রুপ অব কলেজেস-এর গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমহার্স্ট স্ট্রিট পৌঁছে গেলেন—পাঁয়ে হেঁটেই। অতটা লম্বা টানা পথ দিত না যেন কোনো অস্বস্তি কে. কে.-কে। আবার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ হিসেবে তেমনিভাবে এসে হাজির হতেন—কর্নওয়ালিশ পর্যন্ত। আর ভবানীপুরের দুটো প্রিয় জায়গা ছিল তাঁর পায়ে হেঁটেই আসা-যাওয়ার পথ। একটি ডা. রাজেন্দ্র রোডের ভবানীপুর সম্মিলনী ব্রাহ্মসমাজ। যার অধ্যক্ষ তখন তিনি। আর কথায় আছে না—শ্বশুরবাড়ি মথুরাপুরী—সেই ভবানীপুরের প্রান্তসীমানায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটের—দত্তবাড়ি খুবই যেতেন। ওই ঢিলেঢালা মেজাজে। স্ত্রী অনেকদিন প্রয়াতা। তবু টানে টানে এই বৃদ্ধ আই. সি. এস. যেতেন সেথা—নিশ্চয়ই মধুরা স্মৃতির হাতছানিতে—কস্প্রবক্ষে কী—যিনি জবরদস্ত সাহেব সিভিলিয়ান ছিলেন। তাও আবারোয় ভুলেভালে কী?

জীবনে যৌবনকাল ধন্য হয়, হয় বরেণ্য যুবকের সাথে যুবতীর সাত পথ পরিক্রমণে সপ্তপদীর রচনায়—হয় তা অচেনায়। নয় তো চেনায়। আই. সি. এস. কে কে সেন বলেছেনও সে কথা সুযোগ পেলেই। এটা ওঁনার জীবনদর্শন—বাই রীজন্। বাই রিয়েলিটি।

'বিয়ে করবে যাকে তার থেকে যেন ছেলেটি বেশি বয়সীর না হয়। বেশি এজ্—ফারাক তৈরি করে। ইট্ মারস্ দ্য মোটো অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং—ফর বোথ।

তারপরেই নিজের কথায় যান ব্যুরোক্রেট সেন, জবরদস্ত প্রশাসক। মানসিকভাবে যিনি মানাতে পারেননি আপন স্ত্রীর থেকে নিজের বয়সী ব্যবধানী—অনেকগুলো বছরকে।

গল্পটা এই। আই. সি. এস. কে. কে তখনো ব্যাচেলার। পোস্টিং হল নদী নালা-জলা—আর আইতে শাল যাইতে শাল—সেই বরিশালে। অ্যাক্টিং ডি. এম. হিসেবে। বিয়ে করার মোটিভ ছিল কী না ছিল তাই নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না কে. কে-র। অন্তত তখনও। অঘটন ঘটল—জেলা গার্লস স্কুলের খুবই অল্পবয়েসিনী

অবিবাহিতা—ব্রতে বিশ্বাসী—সুশ্রী প্রধানা শিক্ষিকা। বয়েস চব্বিশ। আর ওনার তখন পঁয়ত্রিশ শেষ হয় হয়। স্কুলের পদাধিকারবলে ডি. এম-রা হতেন সভাপতি—ম্যানেজিং কমিটির। সে বছর বাৎরিক উৎসবে আমন্ত্রিত—সেন কে. কে। সভাপতির ভাষণে তরুণ হাকিম বক্তব্যে মেয়েদের শিক্ষা বনাম স্বাধীনতা নিয়ে—কিছু য়্যাডভার্সে বলে যান। যা সত্যি মানতে পারেননি এইচ. এম. মিস দত্ত। উনি ওনার কথা বলতে উঠে হাকিম সাহেবের রাখা অপচ্ছন্দনীয় বক্তব্যগুলোকে—চোখা চোখা শাণিত কথার ভিয়েনে—এক এক করে খন্ডন করে যান—ভোট অব থ্যাঙ্কসকে বেমালুম ভুলে—সরিয়ে দিয়ে। একবারও সেনের দিকে তাকাননি—লজ্জায় আর মেয়েলি আক্রোশে।

যাক্। 'জানো অশোক, তুমি লেখক। ইউ উইল ফিল ইট বেটার। উনি, মানে সেদিনের মিস দত্ত কীভাবে যে আমাকে আমার কৌমার্যকে একেবারে ঝাঝরা করে দিল তার উত্তর আজও পাইনি। বাবার অনুমতি, মায়ের আশীর্বাদ পেতেই আমাদের বিয়েটা হয়ে যায়।' থামেন, আবার বলেন—'এ পর্যন্ত সব ভালোই ছিল। বাধ সাধলো বিবাহিত জীবন বোঝাবুঝির চেষ্টায় তখন সাড়া না দেওয়ায়—'আমার আপন কথায় এই উপলব্ধি পেলাম, বয়সের অনেক তফাৎ অস্বস্তির কারণে গড়ায়। ডরায় একে অপরকে। জানবে দেহের বন্ধু সহজেই হওয়া যায়—কিন্তু নেভার এভার মনের সখা হতে চেয়ে—সখ্যতা মেলে না। বয়সে বড় হওয়ায় প্রভুত্বগিরি মাথা চাড়া দেয়। অন্যের প্রতি, স্ত্রীর প্রতি। মস্ত অভাব যা তার আয়ত্তে নেই, তাই বলি। এমন বয়সী ফারাক না থাকই ভালো।'

'বলতে পারো, ভারত বেড়াতে এসে সংস্কৃতির বিনিময় করার ফাঁকে—ওই কাকুৎসু ওকাকুরা গান্ধীজীর নির্দেশে বিবেকানন্দের সাথে দেখা হয়—যার পর ওই বিবেকানন্দেরই কথায় জোড়াসাঁকোয় এসে নতুন দুনিয়ার খোঁজ পান। আর এই ঠাকুরবাড়ির কাউকে দেখে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া—জানো কাকে বলেছিলেন, ভারত স্বাধীনতা পেলে আপনিই মুকুট পরা সম্রাটের উপযুক্ত!'

কে. কে-র উত্তরে জানাই, 'রবির প্রিয়তম ভাইপো, আদরের সুরি—বাবা মানে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে—প্রথম আই সি. এস সত্যেন ঠাকুরের যিনি একমাত্র পুত্র।'

কিন্তু যার শেষ ভালো নয়, তার সব কীভাবে বলো ভালো হতে পারে? কে. কে বলেন—'সুরেন ঠাকুরের বিয়ের জন্যে নির্বাচিত হয় খোদ কুঁচবিহারের বড় রাজকন্যার সাথে। কিন্তু হল না বাস্তবায়িত। রাজকন্যা যে কেশবচন্দ্র সেনের নাতনি। বড় মেয়ে মহারানী সুনীতীদেবীর বড় মেয়ে। তাত্ত্বিক সংঘর্ষ ধর্মানুচারণে। তাই বাদ সাধলেন দাদু মহর্ষি দেবেন ঠাকুর—'নো, নট পশেবল। রিফিউজড্ দ্য প্রোপোজাল অফ স্যার নৃনেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর।' পাত্রী ঠিক আছে। কল্যাণীয়া সঙ্গা। বিখ্যাত

সংস্কৃত পণ্ডিতের কন্যা। দাদুর কথাই মান্য নাতির জন্য। জানো অশোক, রাজপুত্রের মতো সুপুরুষ আর সুপণ্ডিত সুরেন ঠাকুরের বিয়ে হয়ে গেল—চৌদ্দ বছরের ছোট ওই মেয়েটির সাথে। এর উপসংহার, জানো অত বড় জ্ঞানী ব্যক্তি—আপন মনের কাছে গুমড়াতে থেকে—মরে গেল। মনহীন অন্যমনস্কে বিরাট মাপেতে আর আরোহণ না করে, অবতরণে গেলেন। তিন কন্যা ও চার পুত্রের জনক হয়েই ফুরিয়ে গেলেন—সব হারানোর দেশেতে। রবিকা-র রাশিয়া সফরের ভাইপো-কাম-সচিব, 'গীতাঞ্জলি' তৈরির সময় নানান সহযোগিতার প্রদানকারী এই সুরেন ঠাকুর—'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' নামের গ্রন্থটি রচনার মধ্য দিয়ে।

'জানোতো সুরেন ঠাকুর সবাইকে বলতেন 'ডোণ্ট ডু দ্য ব্লাণ্ডার লাইক মি, বিবাহটা মনেরও, শুধু ফিজিক্যাল নয়। শোনো, স্বামী স্ত্রী বিয়ের মধ্যে দিয়ে যদি চায় সত্যিকারের সহযোগী বন্ধু হতে—একে অপরের আশা অভাবকে আর অভাব না রেখে, তবে তা হলে—বয়েসটার দিকে নজর রেখো। বয়েসী তারতাম্যতা যেন খুবই কম হয়।'

'ভাবতে খারাপ লাগে। মহর্ষি দাদু যদি—প্রিয় নাতি এই রবিকা-র চোখের মণি সুরি-বাবাকে কুঁচ-রাজকন্যার শিক্ষা, মাধুর্য ও সৌন্দর্যের সাথে—গাঁটছড়া বাঁধতে সাহায্য করতেন, তা হলে ঠাকুরবাড়ি—আর একজন বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বকে অর্জন করতেন। নিশ্চয়ই।'

আক্ষেপের ভাগীদার আমরাও। তবে বেশি ভাবিত ছিলেন—শ্রীযুক্ত কে. কে।

স্টিল ফ্রেমের আই. সি. এস ক্যাডারের মেম্বারদের মধ্যে—সমঝোতা ছিল সবারই সাথে সবাকার। বড় হোক, ছোট হোক, বয়সের সিনিয়ারিটি বা জুনিয়ারিটির তোয়াক্কা কেউই করতেন না। একে অপরের কাজের, সার্ভিসের প্রতি—থাকতেন ও ছিলেন—শ্রদ্ধাযুক্ত। সুসহযোগী, সমব্যথী।

রায় গুণাকর অন্নদাশঙ্করকে দাদার মতো শ্রদ্ধা করতেন। ওনার সাথে ব্যাচ্‌মেট্ হয়ে আরও ছ-জন বাঙালি আই. সি. এস. হন। বিলেতে থেকে পরীক্ষা দেন—সুবিমল দত্ত ও করুণাকুমার হাজরা। আর ভারত থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সাগর পারে পাড়ি দেন—অন্নদা সহ—দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার, রবি মিত্র, হিরন্ময় ব্যানার্জী এবং বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শেষোক্ত বীরেন তাঁর কর্মজীবনের শেষে লাস্ট বাট লাস্ট ওয়ানে—যথাক্রমে ছিলেন—রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি, আর হরিয়ানা রাজ্যের এইচ. ই. গভর্নর।

'সাত সাত বাঙালীর একই ব্যাচেতে আই. সি. এস হওয়া—সাংঘাতিক কোয়েনসিডেন্স। আমার বছর আমি আর রবি, মানে রবিচন্দ্র দত্ত। ভারতের দ্বিতীয় আই. সি. এস. মহান মনীষী ও অর্থনীতির এ দেশীয় প্রথম প্রবক্তা—রমেশচন্দ্র

দত্তর নাতি। আর আমার পরে পরেই কজন স্বকীয় সত্ত্বার সাহিত্যিক আই. সি. এস. হন। একজন দেবেশচন্দ্র দাশ, অন্যজন অশোক মিত্র। আর জেনে রেখো অশোক—বিখ্যাত স্যার নীলরতন সরকারের প্রিয় নাতি, বন্ধুবর মনীষীমোহন সেন মোটেই নন শেষ আই. সি. এস—এরকম একটা প্রচার আছে। এটা সর্বৈব ভুল। শেষ মানে, ভারতীয়দের মধ্যে সেই শেষ বছর একজনই উত্তীর্ণ হন এই সিভিলিয়ানী পরীক্ষায়। তিনি ভারতের প্রাক্তন ক্যাবিনেট সচিব—নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়। গৌরব তো বটেই, আই. সি. এস-এর ইতিহাস রচিত হয়েছিল যার সেই হেভেন বর্ন সার্ভিসের প্রথম-জন—বাঙালি—আর শেষ হওয়ার বছর—শেষ-জনও বাঙালি।

'লীলাদি, মানে লীলা রায় তো তোমার কাছে মাসীমার আসনে বসা। যেমন—তোমার কাকু। এমন সম্পর্ক মধুর। আরও মধুর। তুমি যেমনভাবে আমাদের সার্ভিসের প্রায় সবারই সাথে একটা না একটা সম্পর্কের সম্বোধনে টানতে পেরেছো, এটা চাট্টি খানি কথা নয়। এটা অসাধারণ ক্ষমতা, যা তোমার মধ্যে আছে। জানো তো—স্টিল ফ্রেমের এই মানুষেরা তাঁদের হেভেন-বর্ন সার্ভিসের বাইরে কারুর সাথে আত্মীয়তা তো দূরের কথা—পরিচিতিটুকু পর্যন্ত নিতে অপরাগ। এটা দোষও হতে পারে, গুণও হতে পারে। তার জন্য আমাদের কোনো অভাববোধ ছিল না। যা বলছিলাম—লীলাদি, কিছু মনে কোরো না, ওয়াজ স্যাপ্রেসড্ টোটালি বাই অন্নদাবাবু। জায়া বিদেশিনী হলেও যে কোনো কালচার্ড ফ্যামিলির বাঙালি বধূকে—নিজের কাছে—সব ব্যাপারেই হার মানিয়ে গেছেন। সী ওয়াজ মোর অ্যান্ড মোর দ্যান বেঙ্গলি মাদার—ইন য়্যাফেকশন্ ইভেন ইন্ কম্প্যাশন্। অন্নদাবাবুর মুখ চেয়েই ভারতীয় নারীরই যিনি আদর্শ হয়ে—নিজের সব প্রতিভা অটুট থাকা সত্ত্বেও—লীলাদি তাঁর আদর্শ বাঁচাতে কখেনোই অন্নদাবাবুকে ছাড়িয়ে—এগিয়ে যেতে চাননি।'

শেষ দেখা মাঘোৎসবে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে। দুপুরে ভোজনে—পাশাপাশি বসা ওপরের হলে। ডানদিকে উনি। বামদিকে ভোজনবিলাসী সদ্য প্রয়াত মিথু দাশগুপ্ত, ভালো নামে পি. কে, হ্যাঁ, পি. কে দাশগুপ্ত আর একজন আই. সি. এস। গান্ডেরিয়ার মানুষ—যিনি কেন্দ্রে স্টেট্ ট্রেডিং কর্পোরেশন গঠিত হলে ফার্স্ট চয়েস হিসেবে মিথু-ই তার প্রথম চেয়ারম্যান হন। রসিক লোক। খাওয়া নিয়ে ইংরেজিতে এক বই লিখেছেন, নাম 'পালেটেবল বেঙ্গলী ডিসেস'। প্রকাশিকা স্বয়ং লেডি রমলা সিংহ, যিনি নিজে খেতেন না কিছুই—কিন্তু অন্যকে খাওয়াতে ভালোবাসতেন। রমলামাসী লর্ড এস. পি. সিংহের ছোট ছেলে—অনারেবল সুশীল সিংহ, আই. সি. এস-র পত্নী ও প্রীভি-কাউন্সিলর—আই সি. এস. স্যার বসন্তকুমার মল্লিকের ভাইঝি।

খাচ্ছি। একটা সাদা ধবধবে বেড়াল সামনের খোলা ছাদ থেকে এসে হাজির, ভয়কে তোয়াক্কা না করেই আমারই সামনায়। নোবেল্ লোরিয়েট্ জীববিজ্ঞানী স্যার

জে. বি. এস. হগলডেন আমায় বলেছিলেন 'আম্রপালী' তে—কয়জনের মধ্যে কে বেড়াল পোষে তা ওরা —মানে ক্যাটকুল সহজেই ঘ্রাণ থেকে বুঝতে পারে। যে ভালোবাসে তার শরীরে—পোষাদের ছোঁয়া গন্ধ থাকে। আর থাকে সেই ছোঁয়ার গন্ধ, যা মানুষ পায় না, কিন্তু বেড়ালেরা পায়—বেশদূর থেকেই। তাই অকুতোভয়ে কাছে আসতে সাহস পায়।'

'তুমিও বেড়াল পোষো'। কে. কে. খেতে খেতে সামনের এটাকে দেখিয়ে দাঁত নেই দাঁত আছেরই অধরে হাসির ঝিলিক নাচিয়ে বললেন—'মিথু (পি. কে-কে) অশোকও তোমারই পাড়ার কাছের লোক। এর বাড়িতে অনেক বেড়াল এরই পোষ্য। ফাইন চয়েস পশু-পক্ষীর ক্ষেত্রে। মিথু, আমাদের ভুলা মহলানবীশেরও (প্রশান্ত) অনেক পোষ্য ছিল। রানীদি দেখতেন। হ্যালডেন অন্ন দিতেন। এদেরই মধ্যে একটি নাদুসী কালো বেড়াল—হ্যালডেন্ দম্পতির পোষা হয়ে যায়। আগের প্রভুকে বাদ দিয়ে পায় নতুন প্রভু। জে. বি. এস. নাম দেয় কালো বলে—'ইঙ্কা।' তো খুব মজাদার খেলায় মাতত।—বিরাট মেহগনির দরোজার ওপরের একটি তাকে থাকত। নতুন কেউ হ্যালডেনদের ঘরে ঢোকা মাত্র ব্যাস তক্ষুনি লাফ তার ঘাড়ে, তাকে ভড়কাতে। আমারও তাই হয়েছিল বার কয়।

হাসি আর হাসি। পেটুক আমাকে নিজে হাতে জিলিপি আর বোঁদে—তুলে তুলে দেন। এরা খানদান খাবার না হলেও—প্যালেটবল।—আবার হাসি।

প্রসঙ্গ মার্জার। মানেটা মেশা নয়, মিলে যাওয়াও নয়। অর্থে—ক্যাট কীটেন—বেড়ালেরা। কাকু কে. কে. শেষ দিকে একাকী আপন নিভৃতির নিঃসঙ্গতা কাটাতে—বেড়াল ভালোবাসতেন। বড় বাড়ি, তখন স্ত্রী নেই। দুই পুত্র অন্য পৃথিবার আশ্রয়ে। বৌমা দেবীকা থাকেন অন্যত্র। 'বেড়ালেরাই এখন আমার সময় কাটিয়ে দেয়। বই পড়ি। কিন্তু পড়ছি যখন খোলা বই-এর ওপর ঝুপ করে কেউ এসে বসে পড়ল। ব্যাস, পড়া বন্ধ হলো। করো এবার মর্জিমাফিক সারা শরীরে হাত বুলোনার কাজ।' কে. কে-র মুখে সেই হাসি। বলেন, 'অন্নদাবাবু তোমার বাড়িতে জন্মানো প্রথম দুটি বেড়াল-কন্যের নাম দিয়েছিলেন—টিপসী ও জিপসী। আর লীলাদি টিপসীর দুই কন্যের নামকরণ করেছিলেন—চুনীয়া ও মুনীয়া। তা বলি অশোক—শুনছি ওদের সমবয়সী একটু বড় দুটি মামা আছে। নাম দাওনি তো। আমি তাহলে দিচ্ছি—জনি আর টনি। ভালো বেশ। সাহেবী গন্ধ আছে।' হাসি আলোয় ঝলসাচ্ছিল শেষ বারের জন্য কবি কে. কে. সেন, হ্যাঁ স্টিল ফ্রেমি সিভিলিয়নে—'তুমি তো ভাগ্যবান। তোমার বেড়ালদের নাম-দাতা আমরা দুজন আই. সি. এস-রা। এর একজন আমাদেরই স্ত্রী। দারুণ কথা।'

যাক, মার্জার কথা। ওরা, মানে তাদের ছজনাই আজ আর নেই। শেষ দরবারে কাকু করুণাকেতন জেনে বলেন, 'আমরাও তো যাই। ওরা আর বাদ যায় কী

সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে থেকে।' বলেছিলাম, 'কবিতার ভেতরে ভেতরে ওদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পরিচিত সমেত এক একজনার নামে—কিছু লেখালেখি করছি। একেবারে নতুন চেহারায়। তুমি তো জানো কাকু, ডা. হ্যালডেন সেই কবে সাতান্নয় আমায় দিব্যি দিয়ে রেখেছেন, যেন যাতে আমারই কিছু সাহিত্যে ওরা স্থান পায়, অবশ্যই।' আপন অ্যানিম্যালী মাহাত্মে আর অ্যানালিসিসে—আজ তাই করছি।' 'বেশ-বেশ'। বলেন, 'আমায় তা দেখিও।' হ্যাঁ, দেখিয়েছিলাম। আমার মোস্ট প্যাট ক্যাট চুনীকে নিয়ে রচিত—লেখা কবিতা। এই চুনীই পরে —তার জন্য অভাববোধ থেকে—এসব লেখাতে, কবিতার কাড়িকুড়িতে ছিলো প্রেরণা। শুনে ও দেখে বলেছিলেন কাকু কে. কে—'একেবারে নতুন জিনিস। কবিতার ঘরানায়। থেমো না। চালিয়ে যেয়ো। পিপল মাস্ট র‍্যালিশ কাম্‌লি ইটস্ ইনার গাস্টো অ্যান্ড ফ্লেভার।' বলি একথাও কিন্তু এমনিভাবে কাকুর মতোই বলেছিলেন—ওই ওই কবিতারই প্রসঙ্গে—কাকু-কাম-মেসোমশাই, রায়গুণাকর অন্নদাশঙ্কর রায় ও আর মাসীমা লীলা রায়ও।

লেখা এবারটি শেষের শেষ ধাপে উপনীত। মনে আছে কাকু কে. কে. তখন কথাশিল্পী লিও লটস্টয়ের দারুণ ভক্ত ছিলেন। 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' আর 'রেজারেকশন্' দুটোই ছিল—হাই প্রোফাইলের। ওঁনার প্রিয় বিষয়। কিন্তু 'ফ্যামিলি হ্যাপিনেস' নিয়ে বেশিরকম সোচ্চার ছিলেন। বলতেন কে. কে—'পারো তো এটি বাংলায় তর্জমা কোরো।' তাই আজ এ লগ্নে এ মুহূর্তে মনে পড়ছে এ কাজ আমি না করলেও আমাদের অকৃত্রিম দাদামণি, বিলেতপ্রবাসী, সেই বিলেত দেশটা মাটির ছোঁয়ায়—আজ এখান থেকে মহতী সাহিত্যায়ানে প্রয়াসী আপন আন্তরিক প্রচেষ্টায়। সবাই জানে—ছয় খণ্ডে 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' এর বঙ্গানুকরণ হোচ্ছে। তাতেই তিনি ক্ষান্ত নন। আপন মনের মাধুরী মিশায়ে 'হোয়াই টলস্টয়' চিন্তনে আর বিন্তনী হিন্তনে মিলনে অরিজিন্যাল লেখী-সাহিত্যে নেমেছেন এই নামে। তিন খন্ডের সমানী জরীপে। প্রথমটি বেরিয়েছে। খুবই উৎসাহোদ্দীপ। আজ তাই করুণাকেতনের শেষে সমাপ্তি টানতে গিয়ে বলছি, 'উনি আজ থাকলে খুবই খুশি হতেন। শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়ের এই মহতী কাজ ও তার সাধ্যীয় সাধনা দেখে।

৯ অক্টোবর, ২০০৪ (লক্ষ্মীপুজোর দিন)
প্যাট্ কীটেন্ গুগলীর চলে যাওয়ার দিনে।
কুইন ক্যাট মার্শাল্নী টিটোর ছোটো ছেলে।

পলাশের লাল রঙ্

রমায়তী আদরের শুচিস্মিতা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুচরিতাযুকে—

খোলা বারান্দায় তখন বসন্ত-বিহ্বল হওয়া সন্ধ্যার রূপোলী চাঁদের সুষমার মধ্যে বসেছে—তারা দু'জনা।

বসে আছে তারা এক জোড়া কপোত-কপোতীর মতো মধুমাসের কল্-কূজনতায় মুখর হ'য়ে। জ্যোৎস্নায় স্নান করা সন্ধ্যার রূপোলী আলোর রঙীন ঝল্‌মলানিতে তাদের দু'জনাকে দেখাচ্ছে বড় বেশী—নয়নাভিরাম। বড় বেশী মধুরতায়—রিমঝিমানো।

বাসন্তী চাঁদের সুধা মেখেছে সমস্ত দেহ ভরিয়ে, আর মন রাঙিয়ে—তারা দুই রূপদর্শন যুবক ছেলে, —আর তারই শত আবদার জানানোর, আদর দেওয়ানোর সেই শত রূপে শত বার কোরো দেখা—যুবতী মেয়েটি।

ঋতুবিচিত্রার পরিণয়ে আশ্লেষ-বাঁধা—তারা একজন আর্য্যপুত্র বর।—আর অপরজনা হোল তারই—বরনারী প্রিয়া।

দু'জনা তারা। শুধু দু'জনা।

দুটি দেহ। দুটি মন। অবশ্য একে ও অপরের আলাদা হোলেও—স্বত্বে আর অস্তিত্বে—ওরা হোল এক। তখন আর দুই নয়।

ঠিক—একই অস্তিত্ব। যেন—এক অঙ্গে থাকা একই রূপ!—দু'জনারই।

ওরা দু'জনা, মানে—বরপুরুষ অরিজিতের। আর তারই বরনারী অশোকার।

বারান্দার রেলিঙের ধার ধরে বসানো ফুলের টব্‌গুলোকে ছুঁয়ে গেছে রজনীগন্ধার কুঁড়ি ফোটাবার জন্য রাতের আগমনী গান গেয়ে চলা—মর্ম্মর বাতাস।

সেই মর্ম্মর কার বাতাসের শন্ শন্ গতির চঞ্চল তাড়নায় নিজেদের ফুটিয়ে তুলেছে রজনীগন্ধারা। আর ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের অশেষ পরাগের সুবাসখানাকে। সে সুরভির মদিরতায় তারা দু'জনা তখন বিভোর।

তারা বসে আছে নীল ভেলভেটিনের চাদরে ঢাকা একখানা ডিভানের ওপরে।

দু'জনার এই সময়টায় বসে থাকার ভঙ্গীমটুকু যে কোন শিল্পীর তুলির টানে টানে ক্যানভাসের ওপরে চিত্র হয়ে ব্যাঞ্জনা দিতে পারে—এক যুগল-দম্পতিরই। ওদেরই প্রণয়েতে সপ্রগল্‌ভিত থাকা আনন্দেরই এক নিরালা ঘেরা নিঝুম মুহূর্তকে।

আকাশ রঙীন দেওয়ালেতে ঠেসান দিয়ে অরিজিতের বসবার ভঙ্গি। তার গায়ে ঘিয়ে রঙীন রেশমের তৈরী শৌখিন পাঞ্জাবি। রূপোলী আলোর ঝলকানি লেগে জামার রঙ আরো রঙীন হয়ে আছে ঝল্‌মলে ভাবখানা নিয়ে। ধুতির কড়া মাঞ্জা লাগানো পাড়েতে—চুনোট করা রয়েছে। পাট পাট ক'রে ভাঁজ করা কোঁচার প্রান্তে তৈরী

ফুলখানা—একটু তফাতে নীল ভেলভেটেডর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে—বিস্তৃত হয়ে খুলে যাওয়ায়। বসে আছে নিজের শরীরের ডান দিকে, একটুখানি হেলে। কাত হ'য়ে।—আর বরনারী অশোকা—তার বর-পুরুষের বুকেতে আরাম ভরিয়ে হেলান দিয়ে বসে থেকে ডিভানের নীল আচ্ছাদনের ওপর—পা দু'খানা মুড়ে নিয়ে শাড়ীর আবরণীতে রেখেছে আবৃত। প্রিয়া যুবতীর ঐ সময়কার আনন্দ-সায়রেতে ডগ্‌মগ্ করা শরীরের লাজুক লাজুক ভাবেতে পরিপূর্ণা যৌবনাভারখানাকে—প্রিয় তার নিজের বুকেতে সেখানকার স্নিগ্ধতা ভরা কামনার মায়া-জালেতে করিয়েছে বন্দী। অমন ভাবের একান্ত অন্তরঙ্গতার মধ্যে বেঁধে রাখবার জন্যই অরিজিত তার বাঁ হাতের কঠিন ক'রে তোলা বাঁধন দিয়ে—জড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছে অশোকার বাঁ হাতের পেলবেতে—পেশল কব্জিখানায়। প্রিয়র একটি মাত্র হাতের কঠিন বাঁধনের মধ্যে থেকেই প্রিয়ার অপূর্ব অঙ্গরাগ নিয়ে ঝাল্‌সানো রূপাতিশয্য হয়ে পড়েছে—শান্ত আর ধ্যান-সমাহিত। চোখ ঝলসানো লাল সুইস্ সিল্কের সাজেতে রঙীন থেকে সুস্মিতা বধূটির গরিমায় মশগুলা অশোকা—একটু নত হয়ে আপন মাথা ধরে রেখেছে প্রিয় সুজনেরই কাঁধেতে। আসমানী রাগে রঞ্জিত প্রণয়েরই রভসে রভসে মুখর শুচিশ্রীখানা এক পরম খুশীর কারণ হয়ে অশোকার—মুখশ্রীরই সবটা নিয়ে আছে জড়িয়ে। প্রিয়ার সে অপরূপতার ছান্দস্ সুষমাকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে অরিজিতের টানা টানা চোখ দুটি পীনোদ্ধ হয়ে থাকলো তারই ধাঁধিয়ে দেওয়া বিভাসেরই মধ্যে। নিজের প্রেয়সী স্ত্রীর রূপধন্য করা চোখের কাজলে রাঙা দুটি কালো কালো কুট্টিম ঘিরে যে চাহনি ঝরিয়ে রেখেছে সুখলোভাতুর করা যৌবনাকাঙ্ক্ষা, আর মদালসা এক বিলাসকে—তারই আঙিনায় পড়ে বিহ্বলিত হয়ে গেল প্রিয়র মনের আকুতিগুলো। তাকিয়ে তাকিয়ে প্রিয় দেখলো—তারই অশোকার সব সময়ে স্মিতা থাকা অধরেতে—গাঢ় লাল পরাগ দিয়ে মাখানো অবস্থায়, টক্ টক্ হয়ে ফুলে ওঠা ঠোঁট-যুগলের উজ্জ্বলা আভায় স্পষ্টাক্ষরেই যেন ছাপিয়ে গেছে—স্বর্গ-দুহিতা উর্বশীরই মুখের মতো কুন্দশুভ্র হাসির কল্‌কল্ আর ছল্‌ছল্ করা ঝরনাখানা।

শুভ্র মতন ঝরনা-ধারায় ভেসে যাওয়া কাকলি-মূর্ছনা নিয়ে আদুরে গলায় আদরের রেশ ঢেলেই বরনারী অশোকা বললো—এই, কী দেখছো?

প্রেয়সী বধূর দু'হাতের পেলব বাঁধনের ভেতরে তখন জড়ানো অরিজিতের গলা। আর অন্য দিক থেকে মৃদুল ছন্দে বরপুরুষের ডান হাতের আঙুলগুলো অশোকার ছবির মতো নিখুঁত চোখে-মুখে-গলায়-বুকে-কাঁধে-গালের দু'ধারের সুন্দরী পেশলতায়—বুলিয়ে বুলিয়ে আদর ক'রে বেড়াচ্ছে।

অশোকা আবার বললো মুখের কাকলি-ভরা হাসির কল্‌কলানি তুলে—এই রিজিতা, শোন, কৈ বললে না ত' কী দেখলে এতক্ষণ ধরে আমার মুখেতে?

প্রগাঢ় রীতির ঋতুসাজে মুখর ভালোবাসা জানানোর মধ্যে নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দিয়ে —একমাত্র ভালোবাসারই সুজন ছেলেটির জন্য অশোকা নাম রেখেছে—রিজিতা। আপনার মনের মিষ্টি মাধবী-রাগ মিশিয়ে প্রেমিকা স্ত্রী তার এই সুন্দর-মনা স্বামীর আসল নাম থেকে—প্রথম অক্ষরটাকে বাদ দিয়ে—শেষের অক্ষরের সঙ্গে একটা আকার যোগ করে ডেকেছিল—"রিজিতা" বলে—ঠিক দু'টি বছর আগেতে, সেই সেদিনকার প্রেমিক অরিজিতের বাইশ বছরী যৌবন-মাধুর্য্যে সেজে ওঠা—সেই সুন্দরম্ পরিচিতিখানাকে। ঐ দু'টি বছর আগের সেদিনটি ছিল তাদের দু'জনার কাছেতেই—বিবাহের পর প্রথম মিলন রাতের, দ্বিতীয় যাম ঘেরা, ও যৌবন দিয়ে সাজা বাসরের মধ্যে। অশোকার মনেতে আজও সুস্পষ্ট হয়ে গাঁথা আছে এক অখণ্ড রূপ নিয়েই—সেই মনোরম রাতেতে অবিরাম আনন্দ-রভসেরই আদানে আর প্রদানে প্রগল্ভ হয়ে ওঠা—যুগপতে ভালোবাসাবাসির টুকরো টুকরো ছবিগুলো। এখনো অশোকার মনে জাগরূক রয়েছে—সেদিন ব্যারাকপুর রিভার সাইডের এই বিরাট জমিদার বাড়ীর বড় ছেলে অরিজিত রায়ের (বিলেত থেকে অল্প বয়েসেই ব্যারিস্টার হয়ে সদ্য প্রত্যাগত) জীবনে সজীব থাকা যৌবন বিভূষিত ক'রে এগিয়ে এসেছিল তারই কিশোর প্রাণেতে দোলা জাগিয়ে তোলা—দীর্ঘ আট বছর আগের সেই দুষ্টু মেয়েটি—পশ্চিমের এক বাঙালী জমিদারেরই সেখানকার লরেটো কন্‌ভেন্টের দশম শ্রেণীতে পড়া, সেই আদুরে মেয়ে—সেদিনকার মাত্র ষোলটা শীত আর গ্রীষ্মের তাপে সেজে ওঠা অনন্যা রূপবর্তী রূপে—অশোকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুমারী যৌবন—সবে মাত্র যা রমণীয় যৌবনের সবুজে হয়েছিল—শত ধারে উন্মেষ নিয়ে বিভাসিত।

ঝরনা-ধারার মতো হাসির কাকলিতে মুখর থেকে গেছে অশোকার অধরের দুটি ঠোঁট ধরে লাল পরাগ রেণুতে রাঙিয়ে থাকা—আলোক-নির্ঝরিত আভাকে ছাপিয়ে ছাপিয়ে। আবার ডাকলো অশোকা আদুরে গলায়—এই, এই রিজিতা, শোন ?

অরিজিতকে ডেকেছে তারই প্রিয়া-সুজনা। ডাকলো আবার "রিজিতা" বলেই। এই নামে ডাকতে ডাকতে—নিজের মনেতেই অশোকার মনে হয়—এই নামটা তার শুনতে লাগে, সব থেকে মিষ্টি। আর সেই সঙ্গে দ্বিতীয় কারুর অমন নাম নেই বলে তা আর এক দিক থেকে অমূল্য ! ও ভাবে—এই রিজিতা নামের মধ্যে বেশ একটা মনোরম আর কবিসুলভ কল্পনার অনুরণন খুঁজে পাওয়া যায়।—তাই নিরালা ঘেরা, নিঝুম পরিবেশেতে যখনি নিজের আনন্দে আর খুশীতে বিভোর বুকের সুখ-ঝরানো অঙ্গনে বন্দী করাতে করাতে—এই মধুরে আর যৌবনে সুন্দর হ'য়ে ফোটা যুবকটির খুশীময়তায় ঝল্‌মল্ করা স্পর্শখানা পায়—তখনি অশোকা আজকের এই মুহূর্তটির মতোই আবেশে নরম আদুরে গলায় ডেকে ওঠে—"রিজিতা। আমার

বিজিতা।"—বলে। হ্যাঁ। অশোকার মনে এখনও জ্বল-জ্বলে প্রভা নিয়ে ভাবে বিভাবে মুখর হয়ে উঠছে একটি মধুর ছবি।

অশোকার মনে রুমঝুম ক'রে নেচে উঠলো ছবির পর ছবি। —সত্যি সেদিন এই বাড়ীরই একটি ছবির মতো সাজানো ঘরেতে পাতা হয়েছিল নব-দম্পতির জন্য মিলন বাসরেতে—যৌবনায়ন করা প্রথম রাতটিকে। সেদিন রাতের প্রথম যামখানা ঘন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এগিয়ে এসেছিল যুগল স্বত্বায় নাচানাচি করা প্রণয়ের বাঁধনহারা স্রোতখানা। শুধু ফুল আর ফুলে ভরা সুখ-শয্যার মধ্যে অরিজিতের যৌবনাঙ্কিত দেহের বাইশটা বছরের এক একটা মধুরে উচ্ছলিত পরশ অশোকাকে করে তুলেছিল হত-চকিতা, প্রণয়-বিহ্বলা। ওরই রভসিত রবাব মুখরতাকে প্রিয়ার নরমে-পেশলে-মসৃণতায় পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা হয়ে থাকা বুকেতে—দুটি পেলবে—সুবলয়িত হাতের কঠিন থেকে কঠিনতর করা বাঁধনের ভেতরে বন্দী ক'রে ক'রে রেখেছিল—প্রিয়র বয়েসখানা থেকে আড়াই মাসেতে পিছিয়ে থাকা—বাইশ বসন্তেরই নিখুঁত সৌন্দর্য্য হ'য়ে বিকশিতা—বধূ অশোকার সলজ্জ সুতনুকার—আকার ঘেরা জ্যোতির্ম্ময় রূপশ্রীকে, ধাঁধিয়ে দিয়ে।

ঐ অবস্থার ভেতরেই একবার বরপুরুষ তার প্রতীক্ষিতা বরনারীর সুস্মিতা মুখের অধরে—কানায় কানায় লাল রঙ্ ছাপিয়ে অজস্র ভাবে নিজের মুখের মধুলোভী ভাণ্ডার থেকে সুধা বিতরণ করার মধ্যে—দিয়েছিল পরিপূর্ণতায় ভরাট কোরে।— আর তার পরেতে, তখনি আরেকবারের পালায় নেমে বধূ দ্বিগুণ ভাবে প্রতিদান দিয়ে দিয়ে পূর্ণ করিয়ে তুলেছিল—নিজেরই পরিণীত পরিচয়ের শ্রেষ্ঠ সুখ—স্বামী অরিজিতকে।

সত্যি দু'বছর আগে, সেদিনটিতে অরিজিত প্রথম দিককার সক্রিয়তায় প্রণয়ের কারুকাজ—চিত্র-বিচিত্রায় প্রিয়ার দেহের সবুজ ঘন বাঁকে বাঁকে ফুটিয়ে রেখে—বধূর যৌবনান্বিত লজ্জা-ধারাটিকে অমন ভাবেতে সুখ দেওয়া-নেওয়ার অজস্রতায়, বেপমান করিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল বলেই—সে সময়েতে সত্যি মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের এ-ধার থেকে সক্রিয়া হয়ে ওঠা অশোকা—সপ্রগল্‌ভা মেয়ের মতো দাম্পত্য সাজে রীতি মাফিক ঋতু ফুটিয়ে হয়েছিল—বধূ নিলাজিতা। তা' না হলে পর দয়িত-স্বামীকে নিজের লাল লাল অধরেতে, বাদুলে বাতাস কাঁপিয়ে যাওয়া হাসির ঝরনা থেকে সুধা বর্ষণের ভেতর দিয়ে—পারতো না প্রিয়কে পরিপূর্ণ আবেশে আর আমেজে—স্নান করাতে।—আর ঠিক সেদিনই রাতের শেষ যামের দিকে ঘুমিয়ে পড়ার আগে—চরম আর পরম সুখে বেপথুমন অবস্থায় বরপুরুষ অরিজিত তার বরনারীকে বলেছিল—"অশোকা। এই মেয়ে! বল, আজ থেকে আমায় তুমি কী বলে ডাকবে?"

সে কথা শুনে একটুও দেরী হয়েছিল না অশোকার পক্ষে তখনি নতুন একটা নামেতে—অরিজিতকে ডাকতে যাওয়ায়। আগে হতেই তার মনে ছিল এই নামটুকু। লাজুক লাজুক হাসির ছররা ছুটিয়ে সেদিন অরিজিতের কানে কানে প্রগল্‌ভতায় উপছানো আদরের মধ্যে বলেছিল—"রিজিতা। আমার রিজিতা। এই, কেমন, এখন থেকে তা হলে তোমায় আমি ডাকবো এই নামেতেই?"

প্রিয়াকে আদর মাখাতে মাখাতে অরিজিত বলেছিল—"বেশ। বেশ। আজ তেকে তোমার কাছে আমার নাম হোল এটাই। ভারী সুন্দর কিন্তু! এই অশোকা, যেমন তুমি, না?"

তারপর,—হ্যাঁ, দুটি বছর পরে—আজও ঐ একই ভাবে আর একই রূপের ছন্দ ফুটিয়ে রেখে অরিজিতের কানেতে প্রগল্‌ভতায় মুখর আদর মাখানো সুরটুকু ঢেলে দিয়ে ডাকলো অশোকা—রিজিতা। এই রিজিতা। বলবে না, কী দেখছিলে এতক্ষণ ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে?

প্রিয়ার প্রশ্নের দিকে নজর রেখে অরিজিতের চোখে-মুখে মধুর হওয়া হাসির ভেতর দিয়ে এক জানা ও অজানা অপরূপতার সপ্রগল্‌ভ ইচ্ছাখানা উঁকি দিয়েছে—প্রিয়তমেরই আপন মনের সবুজেতে ঘন হয়ে থাকা—গোপন কুঠুরীরই অপার রহস্য মাঝেতে লুকিয়ে থেকে।

বলল অরিজিত—দেখেছি কিছু। অনেক কিছুকেই। কিন্তু তবু বলবো না।

—এই। কী, তা হলে বলবে না ত'? বেশ, ভাল কথা। আমি তা হলে আগে থেকেই এটাও তোমায় এখনই জানিয়ে রাখছি, যে আগামীকাল ভোরের সময় তোমার সঙ্গে শিকারেতে আর যাচ্ছি না। বুঝলে? এই, ছাড় এবার। আমায় কাজে যেতে দাও। এই, ছাড় এবার, ছিঃ রিজিতা।

নিজেকে তখন অরিজিতের দুটি হাতের কঠিনতর বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা কোরল অশোকা।

অরিজিত বলল—আমি তোমায় ছাড়বো না। আর তোমায় এখান থেকে আমি যেতেও দোব না।

অশোকা বলল—এই, বেশ ত' মজা! ছাড়বো না আর দোব না বললেই হোল বুঝি, কি গো, বল?

বলল অরিজিত দুষ্টু হাসির গাঢ় ঝিলিক ছড়িয়ে—ছেড়ে যে তোমায় এখন অন্য কোথাও চলে যেতে দোব না সেটা ত' তুমি ভাল করেই দেখতে পাচ্ছ। এই অশোকা, এবার তুমিই বল, চেষ্টা করে কী নিজে থেকে আমার হাতের এই বাঁধনখানা ছাড়িয়ে নিতে পারছো?

তখনি অশোকা জানালো—নিজেকে এখন সত্যি তোমার দাপট থেকে সরিয়ে আর ছাড়িয়ে নিতে পারছি না যে, সেটা কিন্তু খুবই সত্যি কথা। শুধু আমি কেন, আর অন্য কোন মেয়ের পক্ষেও নয় কো এটা সম্ভব, সেও অনায়াসে তোমার এই অশেষ রকম দস্যিপনার কবল থেকে নিজেকে আনতে পারবে না, ছাড়িয়ে আর সরিয়ে! এই রিজিতা, বুঝলে, তোমায় এমনি দেখতে ত' দেখায় বড় বেশী শান্ত মতন, কিন্তু একবারটি যদি আমাকে নিরালায় পেয়ে নিজের বুকের মধ্যে আটকাতে পেরেছো কী, অমনি আরম্ভ হোল যত রাজ্যের দুরন্তপনা—এই আমারই ওপরে। একবার আরম্ভ হোল ত' সহজে আর তার থেকে নিষ্কৃতি নেই। আচ্ছা দস্যি ছেলে বাব্‌বা! উঃ, লাগে! ছাড়, এই। উঃ, সত্যি লাগছে বড়! ওগো, ছাড় এবারটি। আর বলব না তোমায় যে, তুমি দুরন্ত। তুমি দস্যি ছেলে। ঘাট হয়েছে বলে মেনে নিচ্ছি। সত্যি, সত্যি রিজিতা, তুমি দস্যি নও। তুমি, হ্যাঁ তুমি, বড় বেশী লক্ষ্মী ছেলে। কী, খুশী হোলে ত'? এবার ছাড়, লক্ষ্মীটি। আমায় একবারটি মা'র কাছে যেতে দেও।

নিজের শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে অরিজিত সজোরে চেপে ধরেছিল অশোকাকে। এখন কিন্তু হাল্‌কা ক'রে ধরেছে। চাপ পড়ছে না আর। অশোকাও আর উঃ শব্দখানা কোরছে না। তার মুখের লাল হাসিতে খিলখিলিয়ে উঠেছে একটা রঙীন আনন্দ, ও তার ছবিটি।

অশোকা আবার বলল—বেশ রিজিতা, শোন, আমায় যদি এখন যেতে না দেও তা হলে বল, তাকিয়ে তাকিয়ে আমার মুখেতে তুমি কী দেখছিলে?

বলল অরিজিত—আগেই বলেছি ত' বলবো না। খুব যে আমায় লক্ষ্মী ছেলে বলে ভোলাচ্ছ, না? কিন্তু অত সহজে আমি ভুলছি না। আর তোমায় ছাড়ছি না। আর তোমায় যেতেও দিচ্ছি না।

অশোকা বলল—ছিঃ, যেতে দেও। বলছি, ছাড় আমাকে। ছিঃ দিনের আলোর মতোই জ্যোৎস্নায় ধোয়া এমন সন্ধ্যার খোলা-মেলা জায়গায় এভাবে আমাকে আটকে রাখতে একটুও লজ্জা করে না, বুঝি?

হাসির দুষ্টুমিতে নেচে উঠে অরিজিত বলল—লজ্জা আবার কিসের? আমি এমন কী আজে-বাজে কাজখানা করেছি যার জন্য লজ্জা পেতে হবে?

অশোকা বলল—তোমার মধ্যে কী লজ্জা-শরমের একটুও জ্ঞান আছে, না থাকে! যদি থাকতো তা হলে কী আর এমন ভাবে এই অসময়ে আমাকে আটক করে রাখতে? ওদিকে দেখ, মা আমাদের একলা একলা রান্না ঘরে বসে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করছেন আর এ-দিকে কিনা তুমি আমাকে বুকেতে কেড়ে রেখে শুধু আদর আর সোহাগ করতেই চাইছ! এই, একলা একলা কাজ কোরতে বুঝি

মা'র কষ্ট হয় না, না? ছিঃ, অনেক হোল আর এভাবে ধরে রেখো না। এবারটি ছেড়ে দেও। আমাকে কাছে বসে থেকে মাকে কোরতে দেও সাহায্য।

অরিজিত বলল—তবু যদি তোমায় এখন যেতে না দেই মায়ের কাছেতে,—তা হোলে কী তুমি খুবই জোর করবে আমায় ছেড়ে যাবার জন্য?

অশোকা বলল—যেতে না দেওয়ার জন্য অবশ্য এখন তাই নিয়ে কোন রকম আর জোর কোরতে চাইব না। তবে এর জেরখানা কিন্তু সাধ ভরিয়ে পরে কোন এক সময়ে মেটাবো, তবে ছাড়বো।

জানতে চাইল অরিজিত—এই বল, কেমন ভাবে তা মেটাবে?

অশোকা তখনি জানিয়ে দিল—মাকে, মানে তোমার মায়ের কাছে বিশেষ কিছু বলে দিয়ে মেটাবো এর জের।

অরিজিত বলল—কী বললে তুমি, মাকে বলে দিয়ে! তা মাকে কী এমনটা বলবে শুনি?

অশোকা বলল—তা, এই আর কি, মানে মাকে বলবো আসল কথাটাই।

অরিজিত জানতে চাইল—আসলটা আবার কী?

অশোকা জানালো—আসছে কাল যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে শিকার কোরতে যাচ্ছ, এই তারই কথাটা।

বিস্ময় প্রকাশ করে অরিজিত বলল—মাকে বলবে যে, তোমাকে নিয়ে আমি কাল শিকার কোরতে যাব, এই ত'? তা এ আর এমন কি জের মেটাবে!

অশোকা বলল—এখন ত' নিশ্চয়ই বলবে এ আর এমন কী! আগে ত' গিয়ে মাকে এটা খুলে বলি, তারপর, হ্যাঁ, তারপরই টের পেয়ে যাবে এর মজাটা কতদূর পর্য্যন্ত গড়াতে পারে!

অরিজিত বলল—এর ভেতরে মজাটা টের পাবার মতো এমন কী আছে, শুনি? এর আগেও ত' কতবার তোমাকে নিয়ে শিকার কোরতে গেছি। কিন্তু অশোকা, কই কিছুই ত' হয় নি।

অশোকা বলল—এই রিজিতা বলি, আগে কিছু হয় নি বলে যে এবারেও হবে না কিচ্ছুটি, সে সম্বন্ধে কী তুমি একেবারে স্থির স্বীকৃতিখানা পেয়ে গেছ, বুঝি?

হেসে হেসে অরিজিত বলল—এই অশোকা, যদি বলি আমি এ ব্যাপারে স্থির।

ছন্দে ছন্দে হাসি মিলিয়ে অশোকা নিবেদন কোরল—তা হলে বলবো তোমার মধ্যে উপস্থিত বুদ্ধিখানার অভাব ঘটেছে। হ্যাঁ, সত্যি তাই হয়েছে।

অরিজিত কোরল প্রশ্ন—তার মানে?

বলল অশোকা—মানেটা হোল জলের মতো সোজা। তাও যদি বুদ্ধি খাটিয়ে ধরতে পারতে, তবে না হয় বুঝতাম যে তুমি সত্যি সব ব্যাপারেই থাক হুশিয়ার। কিন্তু বলি, পেরেছ কি তেমনটা খাটাতে?

অরিজিত বলল—তা সত্যি পরিনি।

বলল দুষ্ট হাসির ঝিলিক হেনে তখনি অশোকা—তা' পারবে কী ক'রে। সত্যি নিজে যেমন, বলেছো ঠিক তেমন ধারার কথাটাই। বলি রিজিতা, ছোট্ট এক খোকার মতো ব্যবহার করতে বুঝি খুব ভাল লাগে, না ? তুমি সময়ে সময়ে হয়ে পড় এক ছোট্ট শিশুটির মতো নও ত' কী এর চাইতে কম, শুনি ? হায়, এটুকুও যদি তোমার মধ্যে খেয়াল কোরে রাখতে!

বিস্ময়ে বিমূঢ় চাহনি ফুটিয়ে বলল অরিজিত—এই অশোকা, তুমি যে এখন কী বলতে চাইছ, তার থৈ পাওয়া আমার পক্ষে সত্যি মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে পড়লো দেখছি। এই মিষ্টি, শোন গো তোমার এখনকার কথার কিছুটি আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। সত্যি বলছি। বিশ্বাস কর। তুমি এই একবার বলছ বুদ্ধির কথা, আবার তারপরেই বলছ তার ভেতরে যদি আমার খেয়ালখানা থাকত! এই, খুলে বল, কী ব্যাপার।

দুষ্টুমির রঙ্ মাখতে মাখতে বলল—তা কী আর এখন খেয়াল হবে রিজিতার! এখন এটিকে না বুঝতে পারলেই যে তোমার পক্ষে ভালো হয়, তাই না ? সাধে কী আর তোমাকে ছোট্ট খোকা, মায় ছোট্ট এক শিশু বলতে ইচ্ছে হয়! হওয়ার মতো কারণ আছে বলেই তা বলতে ইচ্ছে ক'রে। এদিকে ত' বেশ ছোট্ট ছেলেটি সাজতে তোমার খুবই ভালো লাগছে, না ? কিন্তু, এই দুষ্টু, এই রিজিতা, একটু ভালো ক'রে শোন এবার। এই, এই তুমি যে ওদিকে আবার আমার খুকুসোনার বাবা হবার জন্যই যে চাইছ—সুন্দরে আর মধুরে মশগুল হোয়ে, বলি, ভুলেই গেছ নাকি সে কথা ? এই, ও কথা খেয়ালে রাখতে পার না কেন ? খুকুসোনা ত' আর আমার একলারই হবে না। সে হবে তোমারও। আমার আদর খাবার, আর আদার পাওয়ার এই "তুমি"টির জন্যও।—কথা শেষ কোরেই অশোকা তার প্রিয়তমর অধরে ঘন ভাবে ছোঁয়াল আদর করাবার জন্য—নিজের লাল লাল ঠোঁটে নাচানাচি করা দুষ্ট হাসিখানাকে, আবেশ থেকে।

অশোকা জানে, আর তার অরিজিতও জানে এটাই যে—তার প্রিয়া অশোকা আজ যে প্রজায়নী ঋতুসাজেতে বিদিশার সন্ধ্যার মতো গরিমায় রিমঝিমাতে পেরেছে—তা প্রথম থেকে শেষ অবধি হোল—পরম এক আকস্মিকেরই রূপ-ধৃতি। কবি-কৃতি।—তাই অশোকা এই নিরিখে বার বার আজ মনে না কোরে পারছে না "ড্রীম চিল্ড্রনে"র স্রষ্টা—সেই মহান কথাশিল্পী চার্লস্ ল্যামের সুভাষিত ভাষণখানা। ল্যাম তাঁর "দি চাইল্ড্ এঞ্জেলে" যা লিখেছেন—তা আজ একটু সময় পেলেই বসে বসে পড়তে থাকে অশোকা। আপনার প্রজাবতী রীতিকায় আকার ঘেরা রূপসুষমায় ঝল্মল্ করতে করতে ল্যামের রচনার "স্বপ্ন শিশু"দেরেই সুখী কল্পনায় না হোয়ে

পারে না আজ অশোকা—বড় বেশী মশগুলা। আর ধ্যান নিয়ে জাগা শিশুময়তায় বিহ্বলা। ল্যাম্ তার কাছে মায়ের ভাবী আর্তিতে হোয়ে উঠেছেন—স্মৃতির স্মরণিকা। তারই সরণি ধরে অশোকা চলতে চলতে মনে কোরল "দি চাইল্ড্ এঞ্জেলে" লেখা আছে ঃ—

"Whence it came, or how it came, or who did it come, or wheter it came purely of its own head, neither you nor I know—but there lay, sure enough, wrapt in its little cloudy swaddling bands—a Child Angel......

Sun-threads—filmy beams—ran through the celestial napery of what seemed its princely cradle, All the winged orders hovered around, watching when the new-born should open its yet closed eyes ; which, when it did, first one, and then the other—with a solicitude and apprehension, yet not such as, stained with fear, dim the expanding eye-lids of mortal infants, but as if to explore its path in those its unhereditary palaces—what on inextinguishable titter that time spared not celestial visages! Nor wanted there to my seeming—O the inexplicable simpleness of dreams!—bowls of that cheering nectar,

—which mortals *caudle* call below.—Nor were wanting faces of female ministrants,—stricken in years, as it might seem,—so dexterous were those heavenly attendants to counterfeit kindly similitudes of earth, to greet, with terrestrial child-rites the young *present,* which earth had made to heaven."

তখনি অরিজিতের মনের সুখ নেচে উঠলো এক মধুর ছবির ভাবী স্বাক্ষর সমেত। প্রজায়নী রীতির আরাধনা থেকে প্রিয়তম তার মঞ্জুলা স্ত্রীর চব্বিশটা বসন্তে ঘেরা দেহের ঋতুবিচিত্রয়া স্পন্দিত করাতে পেরেছিল প্রজাবতী পরিচিতিকে শেষ পর্য্যন্ত।—ওরই সেদিনের স্পন্দন ধরে বরনারী অশোকা তার শারীরী-যৌবনে উপছানো খুশীর চরমা ব্যাপ্তিকে বিকশিত করাতে করাতে—বরপুরুষ স্বামীর সবুজেতে সবুজ যৌবনায়নে মাতামাতি কোরে—হোয়েছিলই সুখ মিতালির—আলো ঝরা আঙ্গিনায়।

তারপর থেকে মাস চারেকের মতো সময় অতীত হয়ে এলো।—ওরই মধ্যে সুদীর্ঘ রেশ টেনে চলা প্রায় তিন হাজার প্রহর থেকে প্রহরান্তরে, সৃষ্টির সূক্ষ্ম কারুকাজখানাকে পুষ্পিত করাতে করাতে করাতে চলে এলো তা সুবিনীতা অশোকার

সূতনকায় আড়াল করা দেহ মঞ্জিলে।—আজ এই মুহূর্তে চারটি মাস পেছনে ফেলে রেখে অশোকার বরবর্ণিনী রূপখানা হোয়ে উঠেছে সম্ভবামি "খুকুসোনা"য় প্রজায়িতা। পুষ্পায়িতা।—সত্যি বরনারী অশোকা আর বরপুরুষ অরিজিত—এই দু'জনারই মীনপীয়াস দেহ-সায়রের অয়নে সঙ্গত থেকে যে রূপতিয়াসে ফুটিয়েছিল মধুরম্ সৃষ্টিকলার সাজ ও কাজ—এই তারই অয়নান্ত চয়ন সমেত, প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে পলে পলে—এক অপরূপ আনন্দ আর অশেষ ধারার খুশীময়তায় আনচানানো "খুকুসোনা"র জন্ম-সম্ভাবনারই রূপরেখা—যার সৃষ্টি পূর্ণতা পাবে—এক ছোট্ট-মতা ফুট ফুটে মেয়েতে। নাম তার এখনি হয়ে গেছে ঠিক। আপাতত থাকবে—খুকুসোনা!—নিজের মধ্যে সরব আভাসে স্বাক্ষর নেওয়া সম্ভাবিত মেয়ের জন্য বরনারী অশোকা অনেক আগে থেকেই মনে মনে ঠিক করে এসেছে—এই মিষ্টি আর হাল্কা মতন নামটুকুকে।

এবার অরিজিতের মনে পড়লো—একদিন দুপুরে বিশ্রাম করার সময় অশোকা কোথা থেকে যেন ছুটে এসে তার বসে থাকা সোফাখানার পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ে—সামনের দিকে ঝুঁকে থেকে ওরই গলা এক হাতে জড়াতে জড়াতে—প্রিয়র কোলেতে চার্লস্ ল্যামের লাল রেক্সিনে বাঁধানো বইখানা ফেলে রেখে, একটা বিশেষ পাতার যেটা শব্দ কোরে পড়তে বলে, নিজেও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তির মতো কোরে গেছিল পড়তে পড়তে—ঠিক যেখানটিতে মনীষী ল্যাম তাঁর "দি চাইল্ড্ এঞ্জেলে" লিখেছেন ঃ—"And in the archives of heaven I had grace to read, how that once the angel Nadir, being exiled from his place for mortal passion, unspringing on the wings of parental love (such power had parental love for a moment to suspend the else-irrevocable law) appeared for a brief instant in his station ; and depositiong a wondrous Birth, straightway disappeared, and the palaces knew him no more, And this charge was the self-same Babe, who goeth lame and lovely—but Adah sleepeth by the river Pison."

শত রূপে দেখা, আর শতেক সাজেতে শত বার ধরে কাজল চোখের সঙ্গে চোখাচোখি কোরে—প্রিয়া তার প্রিয়তমের একান্ত কাছাকাছিতে থেকে যায়—অচেনা, আর অজানা! তাই প্রিয়াকে অপার বিস্ময়ের মায়াজাল থেকে ছাড়িয়ে এনে—তবে শেষ পর্য্যন্ত এবার বুঝতে পেরেছে অরিজিত—যথার্থই। সম্ভবা খুকুসোনার কথা শোনামাত্র তার মনের সমস্ত সুখ খুশীতে ভরপুর অবস্থায় শিহরণ তুলে গেল—সবুজ আনন্দের পুলক সঞ্চরণে।

আপন বরনারীব লাজে আরক্তিম প্রণয়ের রভসতায় ভরাট থাকা মাধুর্য্যকে নিজের দুটি হাতের মধ্যে ধরে রাখলো। চোখে-মুখে আদর করার জন্য আঙ্গুলের পরশ ছুঁইয়ে খুশীতে স্নান করাতে করাতে বলল অরিজিত—এই, অশেকা, বুঝলে তুমি না এখন আমাকে সত্যি আরো মুস্কিলে ফেললে। আমি ত' কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে,—তোমাকে নিয়ে আগামীকাল শিকারেতে যাওয়ার প্রসঙ্গে এমন কী যোগাযোগ আছে আমাদের সম্ভাবিত খুকুসোনার সাথে ? আর যার জন্য এ কথা তুমি এখন তুলেছ। এই, তুমি নিশ্চয়ই এটা নিয়ে বেশ দুষ্টুমি কোরছ, অশোকা ! তাই না ?

ও কথা শুনতে শুনতে বধূ অশোকার লাল অধরের রঙীন তীর দুটিতে ছাপিয়ে ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেল, মুক্তোর মতো ঝক্ ঝকে হাসি। সেখানকার মায়াবেশ মাখানো রঙ্ আরো উজ্জ্বল হোয়ে ঝল্‌মলিয়ে পড়েছে। বরনারী তখন তার বরপুরুষের বড় বেশী মনোরম থাকা মুখে ডগ্‌মগ্ করা শান্তশ্রীখানার সামনে—দুষ্টু হাসিতে ছোপানো অধর সমীপবর্তিকার ওপর দিয়ে—আপনার ছবির মতো আর কল্পনা দিয়ে ফোটানো সুনিপুণ ছাঁদের সপ্রগল্ভ মুখখানাকে—এগিয়ে নিয়ে এলো।

রভস ভরা হাসিতে কুঙ্কুমিতা থেকে বললো অশোখা—রিজিতা, আমি দুষ্টুমি ঠিকই কোরছি। এবার যদি গিয়ে মাকে বলে দিই যে, তুমি আমাকে শিকারেতে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাচ্ছ, তখন ? এই, বলি, তা হোল কী আর তারপর আমাকে পারবে সঙ্গে নিয়ে যেতে ? আমার এখনকার এই অবস্থায় আমাকে শিকারে নিয়ে যেতে চাইছ যে, তা জানতে পারলে পর আমাদের মা আমায় না যেতে দিয়ে, শুধু তোমাকেই বকবেন। ফলে মার কাছ থেকে বকুনি খাওয়ার পর আমায় নিতে না পারার দরুন তোমার জন্য শিকারের আসল সুখটুকুই যাবে মাঠে মারা। তখন সল্ট্ লেকেতে তুমি আমায় পাশটিতে না পাওয়ায়, একলা একলা নীরস ভাবে শিকার কোরে বেড়াবে। আর, হ্যাঁ গো রিজিতা, আর আমি তখন শুধু আরামের মধ্যে মায়ের আদরে আদরে তারই চোখের কাছটিতে থেকে এক সময়ে হয় ত' লক্ষ্মী মেয়েটির মতন তাঁর কোলেতে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়বো।

অরিজিত বলল—বুঝেছি। এখন দেখতে পাচ্ছি তুমি দুষ্টুমি কোরেই আসছে কাল ডাক্ স্যুটিংয়ে বেরুনোটাকে নষ্ট করাবে। আমাদের ভাবী খুকুসোনার কথা তুলে এ ব্যাপারে এখন বেশ একটা চেষ্টা কোরছ যাতে যাওয়াটা আর না হয়, তাই ত' ?

তখনি অশোকা বলল—কেন কোরব না শুনি ! তুমি কী আমার উত্তরটা এখনও দিতে পেরেছো ?

অরিজিত বলল—উত্তরটা যদি এখন দেই তা হলেও কী মাকে বলে যাওয়াটা বন্ধ করাবে ?

অশোকা বলল—ছিঃ, ছিঃ। অত মন্দ আমি নই। এরপরে আর মাকে বিন্দু বিসর্গও জানতে দোব না যে, আমি আমার এই রকম অবস্থাখানা নিয়ে তোমার সঙ্গে চলেছি—ডাক্ স্যুটিংয়ে। সত্যি রিজিতা, এবার বল কী দেখছিলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে?

—শোন, তা হোলে, এই মিষ্টি।—অরিজিত বলল।

লাল হাসির ভেতর থেকে বললো অশোকা—এই, বল। আমি শুনছি, রিজিতা।

ঘন লাল সুইস্ সিল্কের চোখ ঝলসানো শাড়ীর মায়াবী সাজে ঝল্মল্ করা বধূ অশোকার সলাজ-প্রখরতায় রঙীন দেহকে অরিজিত হাতের কঠিনতর বাঁধন দিয়ে প্রগাঢ় ভাবেতে জড়িয়ে নিলো নিজের বুকের আশ্রয়েতে। ঐ অবস্থার আশ্লেষিত ডুব থেকে সুখ আর খুশীতে মুগ্ধা বরনারী অশোকার—পেশলে সুউচ্চ রীতিকার ঘেরাটোপ দেওয়া বুকের অনন্যরূপম্ দুটি বেহায়া ছন্দ থেকে নির্ঝরিত পরশের কঠিনতা—চুম্বন কোরল দয়িত অরিজিতেরই বুকের আরামকে। বরপুরুষও অনুভব কোরল—মধুরতর আবেশে নেচে ওঠা নিজের বুকেতে আনন্দ-নির্ঝরিত-পুলকভার আহরণ করার তালে তালে—অশোকার দেহে শোভিত হওয়া সুরভিত আবরণ থেকে নির্য্যাস বিতরণ করা সুতনুর সব চেয়ে রঙীন থাকা অবস্থায় —মাধবীরাগ ছড়ানো বুকের—সুন্দরম্ সুখখানাকে।

ভাব-মাধুরীর অমন বিভাবেতে প্রভাবিত হোয়ে শুভ্র হাসিতে ঝল্মলিয়ে উঠলো অরিজিত। আলোক-সম্পাতের অপরূপ ঝলকানি উপছে পড়ছে তখন তার চোখের টানা টানা রূপ ডিঙ্গিয়ে, মুখের কিনার ধরে ফুটে থাকা হাসিতে, আর হাসি-হাসি তৃপ্তিতে। তার মধ্যে বিকশিত হোয়ে আছে সুখের আনন্দ আর খুশীর রভসমুখরতারই ছড়াছড়ি। আদর কোরে বরনারীর পরাগ রেণুতে ছাপিয়ে থাকা আরাম জড়ানো গালেতে, একান্ততায় ছোঁয়ালো নিজের মুখের ডান দিকটি। প্রিয় তারই প্রিয়ার লজ্জার আবরণেতে ঘেরাটোপ দেওয়া—অশোকার আরক্ত যৌবন-গভীরতায় পেশলিত রূপ ও অপরূপ পর্য্যন্ত—প্রতিটি ভাব-প্রখরতার ভেতর শিহরণে শিহরণে বিহ্বল হোতে লাগলো। সবুজে সজীব দেহ নিয়ে আর মন নিয়ে বিভূষিতা দয়িতা তারই মধুরের জন্য রূপ জানাজানির মাতামাতিতে দিয়েছে—এক একটা আবেশে শত-ধার হওয়া—বিহ্বলতামুখর সুস্নিগ্ধ ছোঁয়াচের—ঘনঘোর নরমতা, কোমলিত নিটোলতা।—তাই বসন্ত-রাঙা সন্ধ্যায় রুমুঝুমু তান-মান-গমকের সঙ্গে আলোকাভিসারে নেমে—প্রণয় আর পরিণয় দিয়ে ঘেরা রূপারূপ থেকে—ওরই যুগল-স্রোতের ধারায় ধারায় মাতাল না হোয়ে পারলো না—ওরা। প্রিয়তমা স্ত্রীর সুন্দরী লাজে রঙীন দেহের সোনালী যৌবন—মুহূর্তে মুহূর্তে স্নান কোরে চলেছে দয়িতের প্রণয়-রীতির ঘনঘোর সুখাতিশয্যে। অরিজিতের মধ্যেকার আরাম আর আবেশের প্রতিটি আদর-ভরা

ছন্দগুলোতে পুলকেরই দোলনে—ঝুলন খেলার মতো এক অপার অনুভূতির সৃষ্টি হোল। মনে হোল তার—সেও যেন অশোকার মনের গরিমাধারা—আর দেহের যৌবন-নাচা মদিরাধারারই যুগল রূপের সায়রে সায়রে কোরছে—আনন্দ-স্নান। মুক্তিস্নান। রূপস্নান।

মুঠো মুঠো আবেশ মাখাতে মাখাতে প্রিয়াকে জানালো অরিজিত—শোন, অশোকা। আমি, হ্যাঁ, তোমার এই 'আমি' তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম তোমারই মুখখানাকে। হ্যাঁ, সত্যি, দেখছিলাম আর দেখে দেখে ভাবছিলাম,—আমার প্রিয়া কোথা থেকে পেয়েছে এমন অনিন্দ্য রূপ-সুষমাকে! আমারই প্রিয়ার লাল অধরের ঐ কুন্দশুভ্র হাসিখানা কী স্বর্গ-দুহিতা উর্বশীরই দান, না আশীর্বাদ? এই, অশোকা, এটাই ভাবছিলাম তাকিয়ে দেখে দেখে।

ছোট্ট এক আদুরে মেয়ের মতো খিল্‌খিলিয়ে হেসে ফেলে বললো অশোকা—এই, শুধু এইটুকুই কী? জান, আমার মন বলছে যে, না তুমি দেখছিলে আরো কিছু!

প্রিয়ার মুখেতে পাল্‌টা প্রশ্ন জাগতে দেখে অরিজিতও হেসে ফেলল। বললো হাসি উপছে পড়া মুখেতে—মধুর ওগো, হ্যাঁ! ধরেছো তুমি ঠিকই। দেখছিলাম আরো কিছু।

অশোকা বলল—আরো কিছুটা যে কী, সেটাও বল আমায়। এই দেরী কোর না।

অরিজিত বলল—অশোকা শোন। এই যে বলছি।

—তুমি বল। আমি শুনছি রিজিতা।

একটু পলকের জন্য থেমে অরিজিত বলল—জান অশোকা, দেখছিলাম তোমার রঙীন হাসিতে ঝিলমিল করা জোয়ারের কানায় কানায় ভরাট থাকা অধরের মধ্যে, এই আরো কিছু দেখাটাকে। উর্বশীর মুখের মতো কুন্দশুভ্রতা কোরছে টল্‌মল্ তোমারই প্রগাঢ় লাল পরাগের ছোঁয়া লাগিয়ে রাঙানো দুটি ঠোঁটেতে। ঝল্‌সে ওঠা ঐ টক্‌টকে আভাকেই ভেবেছিলাম আরো কিছু বলে। আমার মধুর ওগো, আমার দুষ্টু, বুঝলে তাই দেখতে দেখতে আমার মধ্যে রণিত হোয়ে উঠলো এক সুন্দর ইচ্ছা। মধুরে তা অভিলাষিত। আকাঙ্খিত। তাই থেকে আমার অভীপ্সা জেদী হোয়ে উঠলো তখনি—তোমার লাল হাসিতে উপছানো অধরসমীপবর্তী থেকে সেখানকার উজ্জ্বলে-মধুর সুখাবেশকে আপানার একান্ততায় কেড়ে নেবার জন্য। তারপর বুঝলে অশোকা, তোমার ঠোঁটের অগ্নিশিখার মতো জ্বল জ্বলে রঙে রঙীন কোরে তোলাব আমার মুখখানা। এই, কথা শুনলে?

কথা বলতে বলতে মিষ্টি হাসির ছর্‌ররায় দারুণ ভাবে চক্‌মকিয়ে উঠলো—অরিজিতের মধুপিয়াসে লোভাতুর মুখখানা—এক হঠাৎ পাওয়া সুখের ঝলস্ থেকে রাঙা ঝলকানির ঝিকিমিকিতে।

প্রিয়র ঐ অভিব্যক্তি দেখতে দেখতে—খুশীর সোনালী রঙ্ ভরা হাসিতে হাসিতে ঝল্‌মলিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হোয়ে উঠলো অশোকার লাল অধরের কানাচে কানাচে—স্বামী অরিজিতের জন্য সমস্ত ব্যাপ্তিতে ভরা মধুরেতে সুন্দর সুখখানা। হঠাৎ আরামের এক টুকরো ঝলক্ দিয়ে রূপবতী অশোকার প্রণয়-পিয়াসী মুখের অনন্য শিল্পশ্রী ঝাঁপিয়ে পড়লো—বরপুরুষেরই রূপানুরক্ত মুখের ওপরেতে। অরিজিতের তিয়াসী মুখের সুন্দরতম অভিলাষকে মাতাল কোরে তুললো তারই প্রিয়া—ঠিক তখনি। প্রিয়র জন্য প্রিয়া তার রূপসী মুখের মাধুর্য্যের ঢল্ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে—দেওয়াতে পারলো এক একটি ছোঁয়াচ-মধুরিমার—সঘন মদিরতা ভরা রভস্।

তাই থেকে বরনারী অশোকার মনেতে এক অপরূপ সুখের আদানে মাতামাতি করা অনুভাবখানা উঠেছে ফুটে। এবার অরিজিত সক্রিয় হোয়ে যোগ দিল তারই মধ্যে। বধূ বরবর্ণিনীর মুখের অনিন্দ্যা শিল্পকলার শুচিশ্রীখানাকে—নিজের মুখের রবাবে ঝরা বাদুলে হাওয়ার ঝাপ্‌টার গতিতে মিল পাওয়া—সুখ-দেয়া-নেয়া করা স্পর্শগুলো দিয়ে দিয়ে বিপর্য্যস্ত কোরে তোলাতে লাগলো। ওরা দু'জনা আগের মতোই এখনো যুগপতে সঙ্গত থাকা দাম্পত্য-রীতিকার ঋতু ফোটানো আলিঙ্গনের কঠিনতর বাঁধনের মধ্যেই—একজন আটক কোরে রেখেছে—তারই আর একজনাকে। অরিজিতের সবুজাভা পরিচিতির যুবকত্ব আপন বুকেতে না হোয়ে পারলো না—লাজহরণক—তারই প্রিয়ার ভরাট বুকের তাজা যৌবনতার প্রতি। তাই ঋতু বিপর্য্যয়ে আবাহন করা অশোকার মাধুর্য্যস্নাত বুকের সলাজেতে বাধা না মানায়—অসম্ভব রকমে তা বেহায়া হোয়ে পড়া আরাম-নির্ঝরিণীর পেশলিত ছোঁয়ায় বেঁধে—তীব্র বিভাসের আপীনেতে প্রতিভাস পাওয়া চুম্বনে চুম্বনে—প্রিয়ার ল্যজ কেড়ে নিল প্রিয়তমর বুকের লাজহরণক—ঐ যুবকত্ব—আর ঐ যৌবনত্ব।

ভালোবাসার মদির কার আরামের মধ্য অশোকার মন খুশীতে বিভাসিতা হোয়ে ওঠার তাড়নায় নাচতে যেয়ে, দোদুল দোলনেতে উঠলো দুলে দুলে। তার মনে হোল—অরিজিতের মুখেতে মুখ রেখে সে টাটকা পলাশ ফুলের রক্তবর্ণকে প্রগাঢ় ভাবের রূপরেখা ধরে রাঙিয়ে দিতে পেরেছে—আপন অধরেরই লাল আভারই সুধা মাখিয়ে মাখিয়ে। আর তারই স্বামীর ঔদার্য্য ভরিয়ে অরিজিত যেন প্রিয়ার বুকেতে নিজের বুকের তাজা যুবকত্বকে এলিয়ে রেখে, যৌবনায়নী আরামকে আহরণ করার—সৌন্দর্য্য-চাপে আর মাধুর্য-চাপে—সেখানকার দু'ধারার স্তবক-ভারে আনম্র—লাল লাল পলাশ ফুলকে দিয়ে নির্য্যাস তৈরী করাতে চাইছে। পলাশময় নির্য্যাসকে চিপে চিপে ওরই গাঢ় রঙ থেকে জৌলুস শোষণ করার ভেতর দিয়ে—নিজেতের দাম্পত্য স্বত্বার স্বত্ব সমেত তুলছে—রত্নত্বে রাঙিয়ে।

অশোকা কথা বললো আবেশের সায়র থেকে স্নান কোরতে কোরতে। মুখ আর চোখ ছাপিয়ে কাজল আঁকা পাতায়, আব লাল পরাগ মাখা অধর-কিনারেতে লেগে আছে শুধু সোনালী হাসির উজ্জ্বল ঝলমলানি। বলল অশোকা—এই, এই রিজিতা। শোন, একবারটি।

আর ওদিকে ঝিকিমিকি করা হাসির শুভ্রতা ফুটে আছে অরিজিতের মুখে। বলল সে—অশোকা, কিছু বলবে বুঝি ?

অশোকা বড় মিষ্টি কোরে শুধালো—হ্যাঁ!

তেমনি ভাবে অরিজিতও বলল—এই মধুর, এই লাজুকা, বল।

—রিজিতা। এই লক্ষ্মীটি। আগে বল, আমার একটা কথা রাখবে তুমি ? যদি বল রাখবে তা হোলে আমি এখনই তোমাকে বলব। লক্ষ্মী ছেলে, কথা রেখো কিন্তু।—তা বলতে বলতে অশোকা বেশ একটা মিষ্টি সুরের রেশকে অনেকটা পথ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেল।

—এই, আমি কথা দিচ্ছি অশোকা। এবার জানাও কী তুমি বলতে চাইছ।— তা জানবার জন্য অরিজিতের আনন্দ মাখানো চোখে-মুখে দেখা দিয়েছে অশেষ এক আগ্রহের আভাস।

অশোকা বলল—রিজিতা শোন, আমার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর কোরে রাখা এমন কোন ভয় জড়ানো ভাবখানা উঁকি দিচ্ছে।

অরিজিত বলল—এই, তুমি কিসের জন্য ভয় পাচ্ছ ? খুলে বল, তা না হোলে যে ধরতে পারবো না।

তখনি কথার উত্তর দিল অশোকা। প্রিয়ার কথার ভেতরে এবার সত্যি ভয় জড়ানো স্বর অনুরণিত হোয়ে উঠলো। নিজেও তা বুঝতে পেরেছে। তাই অশোকার স্নিগ্ধতায় সাজানো হাসি হাসি মুখের আরক্ত রূপের ঝিলিমিলিতে একটু যেন করুণ ছবির স্পষ্টতা নিয়েই তা উঠেছে ফুটে।

প্রিয়র মুখের এক পাশেতে কপোলে কপোল ছুঁইয়ে আদর করার মতো কোরে ঘষতে ঘষতে অশোকা বলল—লক্ষ্মী রিজিতা। আমাকে তুমি এবার একটিবারের জন্য ক্ষমা কর। দোষ নিও না আমি তোমার সঙ্গে শিকারে যেতে পারবো না বলে। আর তোমার সাধ মিটিয়ে নিজের হাতে বন্দুক ধরে শিকার করা, সে ত' আমার এখনকার এই অবস্থার দিক থেকে দারুণ ভাবে অসম্ভব। সত্যি বলছি, আমার এই অবস্থারই কথা ভেবে তা থেকে সরেই থাকতে চাইছি। ওগো রিজিতা, শোন লক্ষ্মীটি, তোমার আর আমার, মানে আমাদের ভবিষ্যতের খুকুসোনার আসার সম্ভাবনা দিনে দিনে এগিয়ে যাওয়ায়, ওরই মঙ্গলের জন্য যেতে পারবো না। এই দুষ্টু, জান না তুমি যে, একেবারে প্রথমবার হিসাবে সন্তান-সম্ভবা অবস্থায় কোন মায়েরই উচিত

নয় নিজের শরীরের ওপর অযথা দৌড় ঝাঁপ বা হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে পরিশ্রমের ধকলখানাকে সহ্য করানো। আর তারই থেকে দেহে-মনে ক্লান্ত কোরে তোলানোটা। এ বাপারে মেয়েরা মা হোতে যেয়ে যতটা হুশিয়ার হোয়ে থাকে,—এই, মানে তোমরা ছেলেরা কিন্তু ততটা থাকতে পার না। তোমার প্রতিও আমার এই অভিযোগ থাকছে। হুঁশ থাকলে কী শিকারে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোরতে জোর? এই, শোন, আমার আজকের এই মিনতিখানাকে তুমি গ্রহণ কর ক্ষমা কোরে। লক্ষ্মী রিজিতা, কথা রাখ আমার।

কোন রকম আশ্চর্য্য হোল না অরিজিত প্রিয়ার এ সব কথা শুনে। একটু মাত্র বিস্ময় বোধ কোরল না। কেন না—ভাবী মা'র মনের হঠাৎ জাগা এই ইচ্ছার চাইতে আর কোন কিছু—এত দামী ও খাঁটি হোতে পারে না। শুধু অশোকা কেন,—যে কোন যুবতী মেয়েরই পক্ষে—প্রথমবার মা হওয়ার সময়েতে মনের অবস্থাখানা এমনই ভয়ের আর শঙ্কার ভারে—একরকম কাতর হয়েই থাকে। অরিজিত হৃদয় দিয়ে অকপট ভাবে সে কথাগুলোকেই এখন কোরতে পেরেছে—অনুভবে বিভাবিত।

এমন এক বিভাব মনেতে জাগার জন্য আনন্দ-সায়রে নেচে উঠলো অরিজিতের খুশীভরা প্রাণের সবুজে ঘন রঙটি। যৌবনে তাজা মুখর সাজটি। নিলাজে ভরা সুখটি।—আর তার পরেই সুদর্শন বরপুরুষ তার লীলাসঙ্গিনীর রূপানুরক্ত মুখের শুচিস্নিগ্ধ লাল আভাকে আদরে আদরে বড় বেশী রীতিতে প্রগল্‌ভ কোরে তোলাতে লাগালো—নিজের হাতের আঙুল বুলানো শিহর দিতে দিতে।

অরিজিত বলল—এই মধুর, এই অশোকা, তুমি ঠিকই বলেছ। এটা আগে আমার খেয়ালে থাকলে পর নিশ্চয়ই তোমায় শিকারে নিয়ে যাবার জন্য জোর করতাম না বিন্দুমাত্র। তুমি আমাদের "খুকুসোনা"র মা হোতে চলেছো। তোমার এই অবস্থায় কখনো কোন অঘটন ঘটতে দিতে পারি না। উঃ, কী সুন্দর তুমি! খুকুসোনার পৃথিবীতে এসে পৌঁছুতে এখনও কিছু দেরী আছে। প্রায় মাস ছয়েকেরই মতো কিছু কম-বেশী।—এই মেয়ে, বলি যে, আর এরই মধ্যে এখনই কি না তুমি একেবারে সাক্ষাৎ মা'র মতোই হোয়ে উঠেছো, হাবে-ভাবে! সত্যি, সত্যি, আমার প্রিয়ার অন্য কোন তুলনা নেই। বাব্ বা, কি যে তোমার ব্যাপার, তা বোঝা সময়ে সময়ে আমার পক্ষেও হোয়ে ওঠে না।

হঠাৎই কথা থামালো অরিজিত। পলক ফেল্‌তে না ফেলতেই প্রিয়ার শুচিস্মিত অধর থেকে লাল ঠোঁটের ওপরে সজোরে আপন অধর নিয়ে লুটিয়ে পড়ে আঁকতে আঁকতে সঘন করালো—চুমার ভেজা ভেজা রূপরেখাগুলোকে। পারস্পরিক চুমাচুমির ঋতুসাজে মধুবাতায় কাঁপা গুঞ্জরন ছড়িয়ে ওঠা হলাদিত দয়িত, নিবেদনেতে অভিযোগখানা জানালো—বাব্ বা। বাব্ বা, এর পরে যখন খুকুসোনা

জন্ম নেবে, তখন কী আর তোমার কাছটিতে আমার জন্য এই এখনকার মতো আদর, আর শত রকম আবদার জমা থাকবে? তখন থেকে খুকুকে নিয়েই ত' সব সময়তে হোয়ে থাকবে ব্যস্ত। তোমার বুকের আরাম-সায়রে আমাকে নিশ্চয় তখন আর দেবে না—খুশীর সাঁতার কাটতে! আর দেবে না নিশ্চয় এমন এক অধিকার, যার প্রতিদানে তোমারই অনুপম এই বুকের সুষম ছন্দে ছন্দে—নাচাবে আর রাঙাবে সুন্দরী লজ্জাভারখানাকে—প্রিয়রই নিলাজ হওয়া যুবক-রীতিকার এক দুরন্ত-সন্ধ্যায়। এই, এই মেয়ে শোন, আমি কী আর তখন তোমার কছে পাত্তা পাব! এক কণামাত্র আদরও বোধ হয় এখনকার মতো অসময়েতে—সময় ছাড়াও যাবে না পাওয়া—তোমারই কাছ থেকে। এটা ভাবতেই কেমন কেমন যেন লাগছে আমার। উঃ, সত্যি তখন ত' তুমি শুধু বুঝবে, মেয়ে আর মেয়ে। খুকুসোনা আর খুকুসোনা। মনেতে ত' অন্য কিছু ধরবেই না। আর ভাববেও না। এই মিষ্টি, আমায় ত' তখন একরকম ভুলেই যাবে, না অশোকা? কী হোল, অত হাসছো যে দুষ্টু মেয়েদের মতো? শিকারেতে আর যেতে হবে না বলেই বুঝি এত আনন্দ, আর এত হাসি, না?

দয়িত স্বামীর এমন কথা শুনতে শুনতে ছোট্ট এক মেয়ের মতো খিল্‌খিল্ করা হাসির জোয়ারে আছড়ে পড়লো অশোকার উক্তি—ওগো রিজিতা, অত ভাবনা কেন তোমার? মেয়ে হবে, তারই অশেষ আনন্দের মধ্যেও ভয় জাগছে যে! খুকসোনা আমার কোল জুড়ে বসে থাকবে, আর মাঝখান থেকে তখন তুমি আমার অধর থেকে আদর আহরণ করার ব্যাপারে হবে বঞ্চিত। প্রতিহত। তাই না? এই, ভারী দুষ্টু তুমি! কত পরিকল্পনায় সাজানো, কত আনন্দে খুশীতে আকাঙ্খিত খুকুসোনাকে পেয়ে যাচ্ছ,—আর তবু কি না ভয় কোরছ মেয়ের বিনিময়ে যদি হারিয়ে যায় প্রিয়াটি, তাই কী? ওগো প্রিয়, ওগো দুষ্টু, ছেড়ে দাও এ সব ভাবনা।

অরিজিত বলল—আর তুমি, হ্যাঁ গো তুমি তা' হোলে কী?

অশোকা বলল—আমি হলাম আমি। আমি মানে হোল, বিশেষ ভাবেতে তোমারই আমি। আবার বেশী কি শুনি! কেন না এ মুহূর্তে আমায় নিজের বুকেতে বন্দী কোরে রাখা এই রিজিতা নামের সুন্দর ছেলেটিই যে হোল ভাবী খুকুসোনার মায়ের—একমাত্র সব সুখ। সব কিছু আনন্দেরই আকার। আর তারই অসম এক খুশী। সত্যি, সত্যি—হাসিতে খুশীতে, সুখেতে মিলিয়ে তুমিই যে হোলে আমার এখনকার একমাত্র স্বত্বা! জান নিশ্চয়?

কথা বলতে বলতে অরিজিতের হাতে আদর কোরে চলার ফাঁকে একটি ছোট্ট চিমটি কেটেই—সেই ফিকিরে বরপুরুষের বাঁধন থেকে সজোরে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। তখনি নেমেও পড়লো ডিভানের ওপর থেকে। আর নেমেই চকিতের মধ্যে অশোকা বারান্দা ঘুরে পালিয়ে গেল মা'র কাছটিতে—আপন যুবতীদেহকে

বিভূষিত রাখা লাল সুইস্ সিল্কের শাড়ীর এলোমেলো হয়ে থাকাকে—ঠিক কোরতে কোরতে। যাওয়ার সময় অরিজিতকে উঠে তাকে ধরে আনবার মতো এক মুহূর্তের সময়টুকুও দিল না।

তারপর সেদিনের সন্ধ্যা ছাড়িয়ে রাতের রাকা রূপের মায়া-রঙ ছড়াতে ছড়াতে হোয়েছিল ঘনায়মান। নিঝুমিত। নিশ্চিলিত। মন্দাক্রান্তা ছন্দে তুলে দিয়েছে—আঁধারের চেয়ে আলোক অধিক—রূপঝরা বিভাসেতে পাওয়া বিভূষণখানা।

সেদিনের তেমনি একটা রাতে তারা দুজনা মঞ্জুলে রসমধুরিক দাম্পত্য রীতির সুরীতিকা ধরে ঘুমিয়েছে—স্প্রিংয়ের দোদুল করা খাটের ডান্‌লোপিলো পাতা বিছানায়। তারই মধ্যে দুটি যৌবনেতে তাজাদেহের ঘুমিয়ে থাকা অবস্থা বেশ একটু মৃদু মৃদু দোলায় উঠেছে দুলে দুলে। শুক্ল-পক্ষের সোনায়-রূপোয় ঝল্‌কানো পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না তার মিষ্টি আলোর ছড়া-ছড়ি করা ভাব নিয়ে, সাজানো ঘরটির তিন ধারেরই বড় বড় জানালাগুলোর ভেতর দিয়ে আছড়ে আছড়ে পড়েছে এসে সমস্ত-জায়গা জুড়ে। সুবিস্তৃতির ঘনতা নিয়ে। স্প্রিংয়ের দোদুল সুখশয্যায় শরম লাগা আবেশ নিয়ে ভালোবাসা জানাজানিতে মাতা-মাতি করা—দুটি সুখী যৌবনেতে ঝলকিত থাকা আভাময় সৌন্দর্য্যকে, রাতের রুপোলী রাকা আলো মাখিয়ে স্নান করাচ্ছে—রূপো থেকে সোনা হোয়ে ওঠা রঙ্ ঢেলে ঢেলে। এই শুক্লপক্ষের আলোর স্নিগ্ধতা বরনারী প্রিয়া আর বরপুরুষ আর্য্যপুত্রের দেহের দুটি যৌবনান্বিত রূপের কানাচে কানাচে—এঁকে দিচ্ছে অপরূপ এক মায়াবেশেরই ঝলমলানিতে ভরা রেখাঙ্কনগুলো। বাইরে বেশ শন্-শনানি নিয়ে বাদুলে বাতাস বয়ে চলেছে। জানালা দিয়ে বাদামী রঙের সিল্কের পর্দাগুলোকে উড়িয়ে উড়িয়ে ঘরের মধ্যে এসে হুল্লোড় তুলছে। খাটের ওপরে ঠিক মাঝখানটায় সিলিঙ্ থেকে ঝোলানো পাখাখানা পূর্ণ গতি দিয়ে চালু থাকায়, বাতাসের ঠাণ্ডা আমেজকে বড় বেশী কন্‌কনে কোরে বিলোচ্ছে। তাই ঘরের ভেতরটায়—বাইরের ও ভেতরের বাতাসের সংমিশ্রণে ঘটা তীব্রতার জন্য কোরে তুলেছে—প্রায় শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। তাইতে ওদের দু'জনার বেশ একটু শীত শীত লাগছে। আর একটু একটু কাঁপুনিও জাগছে। তাই দু জনায় ঘুমোচ্ছে জড়াজড়িতে জড়ো-সড়ো হোয়ে।—বরনারী অশোকা শুয়ে আছে আপন দেহ-গাঙ্গেতে গাঢ় রঙে উপ্‌ছানো মদালসা মদিরতা ভরিয়ে। তার শুয়ে থাকার ভঙ্গিমাখানা ভারী সুন্দর হোয়ে ফুটেছে। ঘুমুচ্ছে সে বরপুরুষের বুকেতে বন্দী থাকা আদর মাখানো আলিঙ্গনের মধ্যে পেছন ফিরে, পিঠ রেখে। তার অনন্যরীতির সুন্দরী যৌবন দিয়ে সাজানো দেহের সামনের সমস্ত অংশ, বিচিত্রিতায় জ্যোৎস্নার ফুটফুটে বর্ণ-ছটায় রাঙিয়ে গেছে সপ্রগল্‌ভ ভাবেতে। বরপুরুষ অরিজিতেরও সুদর্শন রূপ-যৌবন তেমনি ভবে আলোকধারায় উঠেছে ঝকমকিয়ে।—সেই লাল টক্ টকে সুইস্ সিল্কের নয়নাভিরাম

শাড়ীখানা সুন্দরী-অনিন্দ্যা অশোকার নিটোলতায় নিখুঁত আর পেশলতায় বঙ্কিমা-ঘন শরীরী যৌবনের পরিপূর্ণ রেখাগুলোকে কোন রকমে রাখতে পেরেছে লুকিয়ে—বড় বেশী এলো হোয়ে জড়িয়ে যাওয়া আবরণেতে। তারই সুমসৃণতায়, আর লালচে আভা জড়ানো শুভ্রতায় পেলবিত বুক আর পিঠ রয়েছে —সম্পূর্ণ ভাবেতে উদোল। আর যেন অমন রূপের নিলাজ ভরানো বিকাশের প্রতি পড়বে না অপর কারুর চোখের চাহনি—তাই যেন অনেকটা উদাসীন। সুইস্ সিল্কের লাল টুকটুকে আঁচলখানা স্প্রিংয়ের বিছানার ওপর থেকে গড়িয়ে গিয়ে পড়েছে—নীচের মোজাইক্ করা মেঝেতে। সেখানে পাতা নীলে আর সাদায় কাজ করা কাশ্মিরী কার্পেট। খুব পুরু। তেমনি মোলায়েম। নীল আর শাদায় টকটকে লাল—বেশ মানিয়েছে মেঝের বাদামী রঙ্ মোজাইকের কাচের মতো স্বচ্ছতার মধ্যে—আলোর ঝিকিমিকি করা ভাবের সঙ্গে মিলে যাওয়ায়। তাই শাদা, নীল আর বাদামী রঙকে যেন বাতাসে বাতাসে দুলে উঠে—লাল আঁচলখানা নাচের তালে তালে নিজের জৌলুসের ছোঁয়াচ লাগিয়ে—আদর কোরছে। আঁচলের মধ্যে মাখানো রয়েছে অশোকারই যৌবন দেহের প্রাণ মাতাল করা—সুরভির সুবাস।

আরো গভীর শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার সোনায় আর রূপোয় ফোটা ঝরনাধারাটি বরবর্ণিনী অশোকার সবুজ-গাঢ় যৌবনকে ঘিরে ঘিরে রূপদক্ষ শিল্পীর নিপুণ হাতেতে খোদাই কার তনুশোভাকে—প্রকৃতির মায়া দর্পণের কাঁচেতে প্রতিফলিত করিয়ে তুলে ধরেছে। তারই থেকে দেখে দেখে নিশ্চয় প্রকৃতি নিজেই হোয়ে পড়েছে অপার খুশীতে মুগ্ধা। তার এই খুশী হওয়ার সমস্ত ভাবখানা উপছিয়ে গেছে। ঐ ভাবটি অশোকার আবরণ-লাজেতে সাজা—লাল সুইসে বৃত থাকার মধ্যেও জেগে উঠেছে প্রায় নিলাজ-নিরাবরণতায় উদোল হওয়া দেহের তটে—রূপবঙ্কিমা ধরে ধরে বিকাশ করা অনন্যতায় রুচি-স্নিগ্ধ যৌবনশ্রীখানা ঘিরে ঘিরে—চিত্রবিচিত্রার পরিবেষ্টনী দিয়ে দিয়ে।—এই সুমধুরিক মুহূর্তটির নিরালায় স্বতঃস্ফূর্ত থাকা—নিঝুম নিঝুম অবস্থা নিয়ে ফোটা প্রিয়ার নিরাবরণার মতো দেখতে হওয়া অতি সুষমিত রূপখানাই হোল—সুন্দরী যুবতীর দেহী-রীতিকারই এক চরম ধারাঙ্কিত খাঁটি সত্য। সবুজাভায় আন্চানানো যুবতী মাত্রেরই মঞ্জুলিত ঋতু-ময়তায়—স্ফূর্ত এই শিল্প-বিচিত্রিতার মধ্যেই নিহিত আছে—সত্য, শিব আর সুন্দর।

তাই এক পরম সত্যের কানুনে নিখিল পুরুষজাতির যৌবনে অঙ্কিত যুবকত্বকে—এই যুবতী-প্রকৃতির দেহগত এমন এক সৌন্দর্য্যের অশেষ প্রাচুর্য্যতা —আপনারই যৌবনান্বিত শৈল্পিক সম্ভারের কঠিন পরশে পরশে দান করাতে পারে—একমাত্র যৌবনকে। ছন্দে ছন্দে অটুট রেখে। সচলিত করিয়ে। গতির আবেগে আর অনুরাগে ফোটা আবেশিত অভিমানে—কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে।

এমনটাই হোল সবুজের সাজঘর—প্রণয় ও পরিণয়ের দুনিয়াদারির শতেক ধারার—কারুকাজ ফুটিয়ে রাখার জন্য।—তাই নিজেকে হ্লাদিতার পরিণীতা পরিচিতিতে বিভূষিত রেখে আপন যৌবনকেই যুবকের দেহে সজীবতারই সবুজ রঙে রাঙিয়ে দিয়ে যেতে পারে—একমাত্র ওরাই মানে—যারা যুবতীর মাধুরী রাগেতে রূপবতী। প্রণয় প্রসঙ্গে লাজবতী। মধু, মধু, সেই মধুক্ষরা মিথুনাবাসরের সুচরিতা থাকা সুবিনীতা থেকে তপ্তালিকা হওয়া পর্য্যন্ত—ওরা। সেই শুচি-স্নিগ্ধারা। সেই শুচিস্মিতারা। তাই, হ্যাঁ তারই রীতিতে ফোটা শরমহারা ঋতু বিপর্য্যয়ে অবগাহন কোরেছে—প্রিয়র জন্য প্রিয়া ঘুম ঘুম আলোকধারার মধ্যে, শ্রান্তিভরা ছন্দেতে ঘুমিয়ে পড়ে।—তাই আজ শুক্লপক্ষের এই জ্যোৎস্না-ধোয়া আর মধুর বাতাসে মাতাল করা রাতেতে—স্বামী অরিজিতের বুকেতে ভালবাসার জীয়নকাঠির সন্ধানে রূপাভিসার করাচ্ছে—বধূসুজনা অশোকা নিজেরই যৌবন প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ, আর মাধবী রাগে রঞ্জিতা—যুবতীর সেই মঞ্জুলে-সহাসে বিকশিত সৌন্দর্য্যকে। বিভাবিত মাধুর্য্যেতে। স্বাভাবিক ঔদার্য্যের অনুরণনে।

বধূ অশোকার সুন্দর সুন্দর আর লাল লাল দুটি ঠোঁটের মিষ্টি রঙ্ নিজেরই ঘুমন্ত মুখের কমনীয় মাধুরীধারাকে আলোর সোনা-ঝরা মুহূর্তগুলো সমেত—মধুবর্ষী এক হাসিতে নাচিয়ে রেখেছে। অধরেতে উপছানো খুশীর নাচেতে হাসির রবাব হোয়ে উঠেছে শুধু—লালে লাল। ঘুম ঘুম ছন্দেতে মাতা পাপড়ির মতো সুমসৃণ পাতায় ঢাকা চোখ দুটির কিনারেকিনারে টানা—সরু কাজলের রেখা, অমাবস্যার তমসায় ঝরিয়েছে মদিরতা। তার আরক্তিম গালেতে ছোপান পরাগ রেণুর প্রসাধন ছাপিয়ে তা কপালের মাঝখানটিতে আঁকা কুঙ্কুমের টিপের চক্ চক্ করা বর্ণ-ছটার সঙ্গে তাল রেখে স্পষ্ট হোয়ে আছে চিক্ চিক্ করার মধ্যে। বধূত্বে রূপবিভূষিতা অশোকার টানা সিঁথির সিঁদুর—রূপোলী চাঁদের আলোর ছোঁয়াছে ছোঁয়াছে চিকন সরু সোনার পাতের মতন উঠেছে ঝক্ঝক্ কোরে। ওই ভাবেতে লাল রঙ্কে রুপোলী গ্রাস কোরে তবেই হোয়ে উঠেছে—রঙ্-সোনালী। আর নিখুঁত সোনার মতোই ঝলকে ঝলকে ঝলস্ ছড়িয়ে দিয়েছে—সিঁথিতে আঁকা সিঁদুরের মতোই পবিত্রতম দ্যুতিতে।

যে কোন রূপবতীর যুবতী পরিচিতিতে প্রিয়ার রীতি ধরে বধূ নামে নামাঙ্কিতার দেহ ঘিরে প্রকাশ পাওয়া এই পবিত্র ভাবখানা—সত্যি একটা মস্ত কানুন হিসাবেই অপরের চোখের রূপতৃষ্ণা ছড়ানো অপলক চাহনিকে মুহূর্তেরই প্রতিভাসে কোরে আনে—শুচিস্নিগ্ধ।—আজকের এই রাকা ঘেরা জ্যোৎস্না-ধারার পরিপূর্ণতার মধ্যে সব চাইতে বেশী উজ্জ্বল, আর সেই সঙ্গে লাজহরণক হোয়ে উঠেছে—বরনারী অশোকারই শরমে শরমে প্রকটিত তার পেশলিত রূপসী বুকের ওপরেতে, সুষম

ছন্দে ছন্দে ফোটা সৌন্দর্য্যকে রাঙিয়ে রাখা—মাধুর্য্যের চরম অভিব্যক্তিখানা। তারই ছন্দ মেলানো ওঠা আর নামায় জাগে—এক রূপাতীতেরই মধুরিক ব্যঞ্জনা! এমন ভাবখানা আরো বেশী কোরে ঝলমলিয়ে দিয়েছে অশোকার দেহরাগেতে ছাপা দুধে আলতায় ভরা অতি শুভ্রতার রঙখানাকে। সেই দুধে-আলতায় মেশানো শরীরী রঙ্ নাচিয়ে যেন তারই পেশলে পেশলে ছন্দিত আর স্পন্দিত বুকের দুটি নিটোল মধুরিম শিল্পধারাকে—রূপদক্ষ শিল্পী দেবদত্ত যেন আপনার মতোই প্রিয়া সুতনুকাকে—প্রকাশ করার জন্যই অশেষ ধৈর্য্যের মাপকাঠি ধরে খোদাই কোরে কোরে তৈরী করাতে পেরেছেন। নিজের সুষমিত বুকের দু'ধারার এই শিল্প-শোভার অপর্য্যাপ্ত সম্ভার নিয়ে—অশোকা সত্যিই অপরার কাছে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী। অনন্যায় অনিন্দিতা। চেনা-জানা যুবকেরা তার এই আবরণেতে বারণ না মানায়—সপ্রকট থাকা নিটোলতা দেখে দেখে হোয়ে ওঠে হতবাক্। হতচকিত। আর অচেনাদের ত' কথাই নেই। সমবয়েসী অঙ্গনারা সামনাসামনি কিছুটি অবশ্য বলতে সাহস পায় না—ঠিকই। কিন্তু পেছনে ফিরে না কোরে পারে না—ঈর্ষা। তাই দেখে আর জেনে-শুনে তারই গর্বের বরপুরুষটির মন আনন্দ আর খুশীতে উপ্‌ছে পড়ে, ভরাট অবস্থায়। অশোকা যে তারই বিবাহেতে সাত পাকে বাঁধা—স্ত্রী। ও যে বাঙ্‌লার বধূ—তাই কানুন বলেই অশোকার মধ্যে টইটম্বুর হোয়ে আছে—বুক ভরা মধুতে। আর সে যে হোল তারই প্রিয়-সুজন। প্রণয়ের একান্ত সহচর, আর উদ্দীপক। তারাদু'জনায় মিলে-মিশে মিতালি পাতা ভুবনেরই হোল লীলাসঙ্গী আর লীলা-সঙ্গিনী। সে হোল ও। আর তেমনি ও হোল সে। মিলিত প্রেমের ঝুলন খেলা নিয়ে মাতা—এক যুগল স্বত্ত্বা। কোন রকমেই এখন একজন তারই আরেকজনাকে কিছুতেই পারে না আর—কাছ ছাড়াটি করাতে!—আজও তাই অরিজিত তার বরনারীকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে—পেছন ফেরা অবস্থাতেই জড়িয়ে ধরা আবেশ দিয়ে বুকেতে ঘন কোরে রেখেছে, তারই আবদার করা আহ্লাদেতে। ওই আবেশেরই রেশ থেকে বধূ অশোকার অসম সুষমা নিঙাড়িত আর উত্থানে-পতনে নাচের রিদম্ ঘেরা—উঁচু উঁচু স্তনশোভার নীচে দিয়ে বরপুরুষের হাতের বাঁধনখানা জড়িয়েছে—পিঠ থেকে বুক পর্য্যন্ত নিজেরই বুকের সঙ্গে। এক মঞ্জুলিক যুবক স্বামীর সুরীতি-মুখর অধিকার থেকে অরিজিতের দুটি হাতের লাজহরণক স্পর্শ—সুন্দর ভাবে ছুঁয়ে আছে—প্রিয়তমা অশোকার সৌন্দর্য্যে পেশলিত বুকের ওপরকার জ্যোৎস্নায় ঝল্‌মল্ কোরে রূপস্নান সারা—সেই দু ধারার দুই কঠিন মাধুর্য্যভারকে। পলকে পলকে সোনায়-রূপোয় ঝলকানো পূর্ণিমা রাতেতে অপরূপ সেই ঝিলিমিলি ভরা রূপের ভেতরে তা সত্যি এক অনন্য ধারার শোভা হোয়ে উঠেছে—ঠিক যেন দুটি পলাশে রাঙা সঘন লজ্জা। লজ্জার ভাবখানা বড় প্রগল্‌ভিত। লাজ হারানো হোয়েও—প্রিয়র ছন্দিত পরশেরই থেকে ঝরা আরামেতে

রূপ-মাখা অবস্থায় খুশীয়ালিনী অশোকার—মধুময় বুক সেখানকার শরমহারা সুখকে লুকোতে চাইছে—লাজেরই আবরণে আবৃতা রেখে। তেমনি হোল অরিজিতের দুটি স্পন্দনভরা হাতের বাঁধন—যা প্রিয়ার সুষমিত বুকে ঝরিয়েছে আরাম, আবেশ, আর মুঠো মুঠে নিলাজ-সুখ। রূপোয় আর সোনায় অনুরাগ ভরা রাকার আলোকসায়রেতে ঘুমানো বরনারী অশোকার শরীরী জৌলুসের দুধ-আলতা মেশানো রঙ থেকে—পেশলে কঠিন হওয়া পীনোন্নত স্তনশোভার ওপরে নিটোল বৃন্তে বৃন্তে ফুটে উঠেছে—লাল লাল পলাশগুচ্ছ। শুধু কুঁড়ি হোয়ে ফুটে থাকতে চায় নি। অপেক্ষায় আছে নিখিল প্রেমিক জাতির এক সুজনতম ছেলের যৌবন-সবুজ অবস্থারই, হাসিতে হাসিতে উপছানো ঠোঁটের পাগল করা খুশীর ঘন ঘন ছোঁয়াচ পেয়ে—ফুটবে বলে। সুস্মিতকান্তি অরিজিতের সুন্দর মুখখানার মিষ্টি মিষ্টি পরশ নিয়ে, থরে থরে সাজানো ঠোঁট দুটি শুধু একটিবারের জন্য—অশোকার বুকের ওপরকার সবুজ যৌবন দিয়ে খোদাই করা অনন্যরীতির মাধুর্য্যধারার ওই পীনোন্নত থাকা—দুই সুকঠিন রূপের বৃন্তে বৃন্তে—ওঠা-নামায় করা নাচানাচিতে কাঁপা কাঁপা পেশলতায় ছাপিয়ে দিয়ে যাক্—অধরেরই সুখলোভাতুর থাকা প্রগাঢ় চুম্বনখানা—তা হোলেই হলাদিতা হবে প্রিয়া সব চাইতে সুখে। আর সব থেকে বেশী রকম খুশীতে। আর তখনই সঙ্গে সঙ্গে লাল লাল পলাশেরা তাদের পাপড়ি মেলে ছড়িয়ে দেবে আসমানী আভা। রূপোয়-সোনায় ঝলকানো আলোয় স্বাক্ষর যাবে রেখে। সত্যি এই রূপ দেখে একদিন অরিজিত তার প্রিয়ার কানে কানে শুধিয়েছিল একটা সূক্তি—অনোরে দ্যঁ বালজাকের থেকে—"A man loves with his heart, but a woman with the point of her breast." সত্যি, সত্যি, সত্যিই ত তাই। আর তাই সে কথায় সায় দিয়ে বলেছিল অশোকা—ঈষ্। ভারী দুষ্টু কথাখানা যে শোনাচ্ছ! কিন্তু কী জান, তবু শুনতে আমার লাগছে বেশ মিষ্টি মিষ্টি, তোমারই হাসি ভরা মুখ থেকে।

ওদিকে কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা স্বপ্নকে অশোকা দেখে যাচ্ছে। স্বপ্নে দেখছে—অরিজিত যেন আজ ভোরে একলাই গেছিল সল্ট্ লেকেতে ডাক স্যুটিঙ করার জন্য। সকালে বেরিয়ে, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার কুলায় আশ্রয় নিতে যাওয়ার গোধুলি রাঙা মুহূর্তটিতে এসেছিল—ফিরে। শিকার কোরে প্রায় ডজন খানেক হৃষ্টপুষ্ট হাঁসকে কখনো আয়েসে, আবার বা কখনো অনায়াসে বন্দুকের ছর্‌রা গুলিতে—সহজেই ঘায়েল করাতে পেরেছিল। কোনটা হয় ত' গুলি বিঁধে ঝুপ কোরে পাখা আছড়াতে আছড়াতে কাছেই পড়ে যায়। আবার কোনটা বা শিকারীকে একটু শব্দ করবার জন্য—বেশ অনেকটা দূরের জলে এসে পড়ে। তখন অরিজিতকে বন্দুকখানা পিঠে ফেলে রেখে, প্যান্টের পা গুটিয়ে তুলে নিতে নিতে, সামনে এগুতে হয়। ও ভাবে জল ভাঙতে ভাঙতে সামনে এগিয়ে যেয়ে ধরতে হয়েছে। হাতে গুলি

বেঁধা হাঁসটিকে তুলে নেবার পরও ক্ষণিকের জন্য সেখানকার জলের ওপর খানিকটা জায়গা জুড়ে ঝরা রক্তের ফোঁটায় ফোঁটায়—ঈষৎ লাল হোয়ে থাকতো। ঐভাবে সবগুলোকেই ধরার পর অন্য লোক দিয়ে একসঙ্গে পায়ে পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে—ক্যাডিলাক্খানার পেছনে রেখে নিয়ে এসেছিল।—তারপর গাড়ী বাগানের গেট ছাড়িয়ে ভেতরে ঢোকার সময়—অশোকা দাঁড়িয়েছিল বাড়ীরই বাইরের দিককার বারান্দায়। সেখানে দাঁড়িয়ে বাড়ীর দরোয়ান ডালা খুলে ভেতর থেকে সমস্ত হাঁসগুলোকে তুলে নিয়ে কাঁকর বিছানো রাস্তার ধারেতে, বাঁধানো ঘুটিঙের ঠিক পাশেতেই—সবুজ ঘাসের লনের ওপরেতে রাখলো সেগুলোকে। অশোকা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো—মৃত হাঁসগুলোর গা দিয়ে এখনও যেন ঝরে ঝরে পড়ছে রক্তের ছোট ছোট বিন্দু। তার একটু পরেই ওদের ওখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হোল মালির ঘরের দিকে।—কিন্তু মনে হোল যেন—ওরা অন্যত্র যাওয়ার আগে সেখানকার সবুজ ঘাসের জায়গাটাকে—কিছুটা নিয়ে, রক্তে রক্তে দিয়ে গেছে ভরিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে তাই সে তাকিয়ে দেখছিল। হুঁশ হোল যখন অরিজিত স্নানঘর থেকে পরিচ্ছন্ন হোয়ে পোশাক পালটিয়ে, প্রসাধন সেরে—ডাকতে এলো।

—ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই অশোকা স্বপ্নখানা দেখে চলেছে।—তারপর তারা কত গল্প কোরল রাত গভীর না হওয়া পর্য্যন্ত। অরিজিত নিজের কাছটিতে রেখেছিল বসিয়ে—প্রিয়াকে আদরে-সোহাগে নাচিয়ে-হাসিয়ে। শুধুমাত্র শিকারেরই কথা নয়। আরো অনেক কিছুর কথাই বললো।—তারপর খাওয়ার পালা শেষ হওয়া মাত্র একটু তাড়াতাড়িই যেন ওরা দু'জনাই ঢলে পড়েছিল—গাঢ় ঘুমের রাজত্বে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার পরই এ কী হোল তার!—সন্ধ্যা হওয়ার আগে বিকেলের অস্তগামী আলো এসে না পড়তেই, অশোকা তখন যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিল সবুজ ঘাসের ওপরকার অল্প একটু জায়গায় কেমন ভাবে একটু একটু কোরে রক্তের ফোঁটা—জমে জমে কোরে তুলেছিল লাল—তাই-ই এখন তার মন জুড়ে, দিয়ে বসেছে দারুণ এক ভয়। সত্যি ত' হাঁসগুলো যেন মরে যেয়েও কী এক আক্রোশের ঝোঁকে—বেশ আলোড়ন তুলেই ঝটাপট পাখনা আছড়াচ্ছে! কিন্তু, ব্যাপার ত' ভালো নয় বলেই মনে হচ্ছে। বড় বিশ্রী এই ছবিটা। আরে, আরে! ও, কী? আমার খুকুসোনা না? হ্যাঁ। ঐ ত' আমার খুকুসোনাই যে ঐ ভাবে তার কচি কচি হাত আর পা নিয়ে—থপ্ থপ্ কোরে হামাগুড়ি দিচ্ছে বাগনের ঘাসের মধ্যে—সামনে এগুবে বলে। কিন্তু, কিন্তু ঐ ধারটিতে ও যাচ্ছে কেন? আরে, ঐ ত' ঐ দিকেতেই খুকুসোনা তার ছোট্ট মতন রাঙা টুকটুকে মুখখানায়—খিল খিল করা হাসিতে ভরিয়ে নিয়ে এরকরকম যেন জোর কোরেই ছুটছে, হামাগুড়ি দিতে দিতে। ঐ ত, ঐ খানেতেই ঘাসের ওপরের লাল অংশটুকু ওদের গা দিয়ে ঝরা রক্তেই ত' হোয়ে আছে—লালে লাল। ওঃ মা, ওঃ কী; মরা হাঁসগুলো যে আবার কখন এ দিকটিতে এসে গেল

দেখছি! এই, দেখেছ দেখেছ; হাঁসগুলো এগুতে এগুতে খুকুসোনাকে সামনে দেখতে পেয়েই কিনা দাঁড়িয়ে পড়েছে—থমকে যাওয়ার মতো। কিন্তু এ কী কোরছে ওরা! প্রত্যেকটি তাদের লম্বা লম্বা মুখের ছুঁচলো ঠোঁটকে হাঁ করিয়ে ধরে, আর পাতা পায়ের ধারালো নখ্‌কে বাগিয়ে রেখে—যেন একটা হিংসা নিয়েই এগিয়ে আসছে—খুকুসোনার দিকে। এখনও ত' ওদের গুলি বেঁধা গা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা বিন্দুর মতো রক্ত ঝরছে। ওরা নিশ্চয়ই এখন একযোগে খুকুসোনার ওপরে চার ধার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার তুলতুলে নরম শরীরখানাকে কামড়ে-খিমচে-ঠুকরে—রক্তাক্ত কোরে তোলাবে। ঠিক, ঠিক, এই ভাবেতেই তাদেরকে একাট কৌতুহলী খুশী মেটাতে গিয়ে গুলি কোরে মারবার প্রতিশোধটি নিতে চাইছে—খুকুসোনারই ওপরে!—কেন না, কেন না ওরই বাবা যে—

—এই, ধর, ধর। খুকুসোনাকে ছুটে গিয়ে ধরে আন। ওকে এখনি একসঙ্গে থাকা হাঁসেরা কামড়ে-খিমচে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার ঘটাবে যে! ওগো রিজিতা, ওঠো। এই, উঠে পড় লক্ষ্মীটি।.....

ঘুমের গাঢ় ঘোর থেকেই চিৎকার কোরে উঠলো—বরবর্ণিনী অশোকা। আর তখনই স্বপ্ন দেখা তার মুহূর্ত মধ্যে হোল—উধাও। অরিজিতের হাতের বাঁধনের ভেতর থেকেই সে পাশ ফিরে শুয়েই শক্ত কোরে জড়িয়ে ধরল—বরপুরুষকে।

অশোকার এমন ভাবে এই মাঝ রাতেতে ঘুম থেকে জেগে চিৎকার কোরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অরিজিতেরও ঘুমখানা গেছে ভেঙ্গে—প্রিয়াকে ভয় পেতে দেখে। সেই সঙ্গে ভয়ের কাঁপন থেকে কুঁকড়ে-মুকড়ে উঠে প্রিয়কে জড়িয়ে ধরার আভাস থেকে। তখনি বিছানার উপর উঠে বসে অরিজিত অশোকাকে হঠাৎ ভয় পেয়ে কাঁপা অবস্থা থেকে নির্ভয় করার জন্য—বুকেতে তুলে নিয়ে আটকালো। প্রিয়ার ভয়ে বিহ্বল শরীরে আদর করার মধ্যে, হাত বুলোতে বুলোতে বলল—এই অশোকা। লক্ষ্মীটি বল, কী হোল তোমার। এই, হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকার কোরে উঠলে কেন? বল, এই?

ভয়কাতর চোখের কাজল মাখা চাহনি নিয়ে ভালো করে অরিজিতের চোখের দিকে তাকালো অশোকা। তখনো ঘুম ঘুম ভাবের ম্লান একটা জড়তা মাখা থাকলেও—জ্যোৎস্নার আলোকধারা ঠিকরে পড়েছে তার কাজলে টানা ছবির মতন, আর সেই সঙ্গে মোহ জড়ানো চোখ দুটোয়।—অরিজিত দেখলো তার বরনারীর চোখেতে ভরা জল থৈ থৈ কোরছে। জ্যোৎস্নার ঝল্‌মলে রূপ তারই মধ্যে কোরছে চিক্ চিক্। কী একটা মনে হওয়ায় অশোকা তার গাল অরিজিতের মুখেতে ছুঁইয়ে ধরে ঘষতে লাগলো। ঐ রকম কোরতে কোরতে বলল অশোকা—এই রিজিতা। শোন, ও এমন কিছু নয়। এমনি আর কি। সত্যি বলছি, এমনিই অমন ভয় পেলাম।

অরিজিত বলল—কিন্তু না, বেশ বুঝতে পারছি যে তুমি একটা কিছু লুকোতে চাইছ। তোমার চোখ-মুখের কাঁপা কাঁপা ভাবে ফোটা ভাবখানাই ত' বুঝিয়ে দিচ্ছে—যে তুমি বেশ ভয় পেয়েছ। কী বল, ভুল ধরিনি ?

অশোকা যেন অভয় পেয়ে বলল—হ্যাঁ রিজিতা, হ্যাঁ। ঠিকই ধরছ। আমি কিন্তু লুকোতে চাই না তা।—এই বলে অশোকা অরিজিতের কাঁধে নিজের মাথাখানা আরাম কোরে রেখে পর পর সব কথাই বলে গেল—স্বপ্নে এই একটু আগে যা দেখলো, তার সবটাই।

সবটাই শুনলো অরিজিত। তার পরে বলল—এর পর ? এই, বল ?

—এর পর কী ? শুনবে রিজিতা ?

বলতে বলতে অশোকা ঝৎ কোরে দুষ্টুমি ভরিয়ে বরপুরুষের স্নিগ্ধ চোখ দুটোকে গাঢ় ভাবে আদর কোরলো নিজের লালে লাল নরম ঠোঁটের থেকে—পরপর আঁকা কয়েকটা ভেজা ভেজা পরশ টেনে দিয়ে। একটু পরেই মনের খুশী নিয়ে কল্‌কলিয়ে উপ্‌ছে পড়ে বলল অশোকা—এই মধুর, শোন, আগামীকাল আর কিন্তু তোমার শিকারে যাওয়া চলবে না। বুঝলে রিজিতা ? সত্যি বলছি, মোটেই যাওয়া চলবে না। আর এটাও জেনে রাখ যে, অন্ততঃ আমাদের খুকুসোনার জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি আর একটি দিনের জন্যও শিকার কোরতে যেতে পারবে না। বুঝতে পেরেছ, এই ?

হাসতে হাসতে অরিজিত বলল—যদি তবু যাই ? তা হোলে ?

—এই, যাবে ? তা হোলে বেশ যেও। কিন্তু তার আগে জেনে রাখ যে, আমার মাথার দিব্যি রইল। এবার যাও দেখি কেমন এর পরেও যেতে পার তারই সাহসটা একবার দেখবো।

কথা শেষে অশোকার শুচিশ্রী ভরা মুখের খুশীর রঙেতে দুষ্টু হাসির জোয়ার উজাড় হোয়ে উঠলো।

আনন্দেরই গমক থেকে অরিজিতের সুন্দর মুখশ্রীতে ছাপিয়ে যাওয়া শিশুর মত কৌতূহলী ভাবখানা—আরো রঙীন হোল। বলল আদর ঝরানো গলায়—এই অশোকা। এই দুষ্টু মেয়ে। সত্যি তোমার মতো মেয়ের দুষ্টুমির কাছেতে পার পাওয়াটা যে শুধু আমার একলার কেন, তা অন্য কারুরই পক্ষে নয় সম্ভব। তবু দিব্যি জানিয়ে রাখছো ? বাব্‌বা ; ভারী দুষ্টু মেয়ে ! এই এসো, সমস্যা ত' মিটলো, বলি আর ঘুমুবে না ? জেগে জেগেই কাটিয়ে দিতে চাও না-কি বাকী রাতটা ?

—না। না। ঈষ্, তুমি ঘুমুবে বুঝি ? কিন্তু তোমাকে ঘুমাতে দিলে ত' ?

সুবিনীতা অশোকার লাল আভায় ঝল্‌মলানো অধরেতে শুধু রিমঝিমিয়ে নাচানাচি কোরছে—দুষ্টু হাসিরই খিলখিলিয়ে ওঠা—ঝর্‌র্‌রা। ছর্‌র্‌রা।

—এই, বলি, ঘুমাতেও দেবে না ? তা হোলে কীকোরবে বল জেগে জেগে ?— অরিজিতের মনেতেও তখন প্রিয়ার অধরে ধরা হাসির ছোঁয়াচখানা লেগেছে।

আর তখনি আপন সমস্যাটির সমাধান পাওয়ারই নির্ভয়তায় খুশী থেকে, দয়িতকে পুরস্কৃত করার জন্য প্রিয়া হোল সক্রিয়া—প্রণয়েরই ছান্দস্রীতিতে। নীতিতে।

তাই সুস্মিতদর্শন বরুপুরুষেরই কান্তিঝরা মুখের রঙীন থাকা সুখের ব্যাপ্তিতে—বরনারী প্রিয়া তখনি আপন মুখের দীপ্ত ঊষার রাঙা মাঙ্গলিকি জানালো—লাল লাল ঠোঁটে আনচানানো খুশীর সঘন ছোঁয়ায়। সিক্ততায় কাঁপা কাঁপা ভাবেরই বাঁকা-চোরা কোরে আলপনা এঁকে এঁকে। তারপর বলল অশোকা—এই, রিজিতা।

অরিজিত প্রতিবেদন কোরল—কী ?

বলল অশোকা আদুরে মেয়ের মতো চোখে-মুখেতে রূপের ঢল নাচিয়ে নাচিয়ে—শোন। এই লক্ষ্মীটি, আমায় এখন বুঝতে পারছো কী ?

শুধালো অরিজিত—এই। বুঝেছি। পেরেছি। ওগো মধুর, হ্যাঁ।

কাটা কাটা কথার ঝনঝনানি মৃদুলে দোলাতে দোলাতে নিবেদন কোরল অশোকা—এই রিজিতা। এই মিষ্টি ছেলে ! তবে তোমার চপলতা কেন দুষ্টুমি না কোরে থাকছে নিশ্চুপ ? কেন তোমার প্রণয় জানাজানির ভাবখানা হোয়ে উঠছে এত নিঝুম ? এত নিথর ? বল, বল আমায়, ওগো সুন্দর ?

শুধু জানাল অরিজিত—আমার অশোকা। এই, তুমি অশোকা সত্যি দুষ্টু। বড় দুষ্টুমতি।

আগের মতো সোনায়-রূপোয় মাখামাখি করা—জ্যোৎস্নার রূপনির্ঝরটি আলোয় আলোয় খালি স্নান করিয়েই চলেছে—ওদের দু'জনাকে। নিজেদেরই ভালবাসাবাসির ঋতুমহলেতে সঙ্গত থাকা অবস্থাতেই। ঘরের তিন ধারের বড় বড় জানালা দিয়ে মাতাল বাতাস বাদুলে ধারার ঝটপটানি সমেত প্রচণ্ড ভাবেতে তেড়ে তেড়ে এসে তাদের রীতি-সুন্দর, নীতি মধুর বিবাহিত ভালবাসার শান্ত আর স্নিগ্ধ মূর্তিকে—মিথুনেরই ভাস্কর্য্য ফোটানো নিয়ে—বিপর্য্যস্ত কোরে তোলাবার জন্য অনেক চেষ্টাই কোরে চলেছে। কিন্তু সত্যি ওদের মিলনবাসরের রূপবিচিত্রার সমাহিত আরাধনার সঙ্গে যুঝতে পারছে না। ওদের দু'জনায় তখন—সুখ আর খুশী—এদেরই দেওয়া আর নেওয়ার পালা চলেছে।

অশোকা আর অরিজিত—তারা হোল দুটি তাজা রক্তধারার মতোই—লালে বিভূষিতা লাল পলাশ। সুখ আর খুশী দুইয়ের এখনকার রঙ হোল প্রগাঢ় লাল থেকে হওয়া—আরো টক্‌টক্ দ্যুতি ঝরানো—লাল আভা।

আর এই ভালবাসাবাসির স্বতঃস্ফূর্ততায় অশোকা ও অরিজিতের বিবাহিত যুগল থেকে এক ও অদ্বিতীয় হোয়ে ওঠা ঐ একই স্বত্ত্বাখানা ঝল্‌মলিয়ে আছে—অস্তিত্বময় তাজা লালে। লাল তাজায়। রক্ত পলাশের মতো। তাজা তাজা লাল রঙ্—তাদের দাম্পত্যবিচিত্রার সুনিকেতনটিকে প্রগাঢ়তায় ভরিয়ে রেখেছে।

আর, ওদের দাম্পত্যরীতির রহস্যঘেরা বাসর থেকে সৃষ্টির তিতিক্ষা ধরে, যৌথ প্রয়াসে রূপদান করা—ঐ ভবিষ্যতের খুকুসোনাও হোল ওদেরই প্রণয়ে বাঁধা আর পরিণয়ে স্বাক্ষরিত অভিব্যক্তিখানার—আরেক তাজা লাল রঙ। প্রখর তার রূপ। প্রগাঢ় তার স্থিতি। অসম তার ধৃতি। অশেষ তার কৃতি। তা একখানা লাল পলাশেরই প্রতিচ্ছবি।

সত্যি, সত্যি—এই সুমধুরিক ঋতু নিয়ে স্ফূর্ত যৌবনায়ন চয়ন কোরে আনে—সৃষ্টি সুখেরই সলাজ-সুন্দর অসীমতাকে, আর শেষ না হোতে পারা—সেই অশেষতাকে। সেই সুন্দরের আর মধুরের বৃতি—সত্যি কৃতির শৈল্পিক কারুকাজে—হোয়ে ওঠে—নিটোল রূপকুট্টিম। অটল থাকা কবি-কৃতি। কেন না,—এই পলাশের মতো তাজা লাল বিভূতির মধ্যে সেজে ওঠা—দম্পত্তির পুণ্যশ্লোকেতে আকার ঘেরা যৌবনায়নী সৃষ্টির শৈল্পিক ঋদ্ধিখানা—তাই না হয়ে পারে না—নিখুঁত কবিতার মতো। আরো ব্যাপকে—তা হোয়ে ওঠে—লিরিক্যাল্ ব্যালাড্! সৃষ্টিতে। স্থিতিতে। অস্তিত্বে।

তাই—লাল লাল পলাশেরই পুণ্য দ্যুতিতে ঝলমল করা প্রিয়ার সলাজ-মধুর প্রজাপতি-পরিচিতিকে আরতি কোরে আজ মাঝে মাঝে জানায় অরিজিত—ওগো মধুর। ওগো শুচিস্মিতা। তুমি কবিতার মতো! সৃষ্টির অন্বয় নিয়ে ছন্দে ছন্দে তুমি পুষ্পিতা করিয়ে চলেছো—ছন্দ-যতি-মিল গমক ধরা গীতালি মূর্ছনারই—মীড় আর গমকে। ওগো, তোমায় আজ জানাতে ইচ্ছে হয় যে, তুমি মধু। তুমি শান্তির নীড়। তুমি শক্তির উৎস। তুমি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রা।

অশোকা তখন জানায়—দ্যুৎ। এ যে রিজিতা, তুমি কবিতা বানানোর মতোই দুষ্টুমি কোরছ, কথার ফুলঝুরি ফুটিয়ে! তাই না?

—সত্যি। ঠিকই বলেছো। জানো, আজ তোমায় লাল পলাশেরই মতো কোরে—বুকেতে বন্দী রেখে মনে পড়ে—ওমর খৈয়ামেরই মতো—

"সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে ছন্দে গেঁথে দিনটা যায়,
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর
সেই ত সাকি স্বপ্ন আমার সেই বনানী স্বর্গপুর।"

—এই অশোকা। কি গো, বল, তোমায় পেলে এমনটা মনে করা কী ভুল ?

পলাশেরই মতো তাজা লাল পবিত্রতায় ঝল্‌মলিয়ে, আর সঘন, যুবতীত্ব নিয়ে রিমঝিমিয়ে প্রিয়কে নিবেদন করে থাকে অশোকা প্রায়ই—ওগো রিজিতা, ওগো আমারই মধ্যে সৃষ্টি করারই উৎসরূপী স্রষ্টা, তুমি কী ভুলে যাও, যে, আমার মতো কবিতাখানাকে তুমিই করিয়ে রেখেছো—মিতাক্ষরা। প্রজায়িতা। পুষ্পায়িতা।

সুরেলা লহর ফোটানো কবিতারই কাটা কাটা ছন্দ নিয়ে কথা বলতে থাকা এই অশোকা—হলো বধূ-নিলাজিতাটি রূপে—আকারে ও প্রকারে—নিখুঁত এক লিরিক্যাল্ ব্যালাড্। গীতি-কবিতা।—কেন না—যুবতী প্রিয়ারা বিদিশার আঁধারেতে ও শ্রাবস্তীর সন্ধ্যায়—হোয়ে ওঠে কানুন ধরেই—কবি-প্রাণা। তা না হোলে যে—প্রিয়তম পথ চলতে চলতে—হোয়ে পড়বে—দিশাহারা। প্রিয়া থাকবে বিনিদ্র—প্রিয়রই শান্তির নীড়ে বন্দী থেকে থেকে—তাজা লাল পলাশ হোয়ে, প্রভাসিত হবার জন্য। ঐ ভাবে প্রিয়া—পৃথিবীর সব রকম ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে পাহারা দিয়ে রাখবে—তারই প্রাণের সুজনক প্রিয়তমকে। জাগতিক অনেক কিছুরই ভ্রান্তিবিলাস—তার অন্তরতম এই যুবককে মায়ায় ধাঁধিয়ে দিয়ে—পথভ্রষ্ট করাতে পারে—যে কোন মুহূর্তে!—তাই আজ, প্রায়ই মুঠো মুঠো পলাশের লাল বিভূতি ছড়াতে ছড়াতে জানায় অশোকা, প্রিয়তমের শুচিতা ভরা অধরে সুধার আমেজ থেকে চন্দ্রমল্লিকার হাসি মাখাতে মাখাতে—ওগো মিষ্টি? শোন, ছিলাম এক। তোমায় নিয়ে হোয়েছি দুই। এবার? ওগো দুষ্টু! এবার তোমার স্রষ্টার তিতিক্ষা ধরে ঐ মিতাক্ষরা দুই থেকে সৃষ্টি করাতে করাতে চলেছি—আগত ঐ তিনকে—খুকুসোনার মধ্যে। তাই না? ছন্দ ছিল—দ্বিপদী। এবার হোয়ে উঠেছে মিল পয়ারেরই—ত্রিপদী। ঠিক, ঠিক, তাই। তুমি মধুরে থেকো নিশ্চিন্ত। ভয় করো না। আমি থাকবো তোমারই জন্য বিনিদ্র। পাহারা দিয়ে।

প্রিয়ার অধরের লাল লাল পরাগের ওপর দিয়ে—পলাশের দ্যুতিকে আরো সঘন কাবার জন্য চুমার স্থায়িত্ব বিলম্বিত করাতে করাতে—অরিজিত না জানিয়ে পারে না আজ—ওগো আনন্দিতা। তুমি আমায় রাখবে শঙ্কা থেকে, ভয় থেকে পাহারা দিয়ে দিয়ে। তার মানে জান কী? তার মানে, তুমি তো হোলে—শ্রীরাধা। তুমিই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। তুমিই যুবকের হলাদিনী স্বত্বা। তুমি ধী। তুমি শ্রী। শোন গো মধুরা, রাধা হোল চিরন্তনী। রাধা শাশ্বত যৌবনাবতী। নারীর সব রূপ, সব মাধুর্য্য তাঁরই মধ্যে হোয়ে আছে একাকার। তোমায় দেখে দেখে মনে পড়ে—তুমিও তাই। তোমারই একই অঙ্গে সমারোহ নিয়ে ফুটেছে নানান রূপ। তাই কবির ভাষাতেই বলতে চাই—

"গোরোচনা গোরী পেখনুঁ ঘাটের কূলে
কানাড়া ছান্দে কবরী বান্ধে নবমল্লিকার মালে॥
ফুলের গেড়ুয়া ধরয়ে লুফিয়া সঘনে দেখায় পাশ।
উঁচু কুঁচযুগে বসন ঘুচে মুচকি মুচকি হাস॥"

—সত্যি অশোকা, ছন্দে সুষমায় আর অভিধায় যা বোঝাতে চেয়েছেন কবি—তা প্রকারন্তরে তোমার এই একই অঙ্গে থাকা এত রূপখানার আতিশয্যকেই পরিচায়িত কোরছে। তাই না?

আর তখন তাজা লাল পলাশের মতো রঙীন দ্যুতিতে ঝকমকিয়ে থেকে অশোকা প্রতিবেদন করে—ওগো, এ তোমার দুষ্টুমি হোচ্ছে। এতই কী আমার পরিচয়? এতই কী আমার রূপের ধৃতি? কী জানি! দ্যুৎ, এবার নিরস্ত হও শুধু আমারই কথায়! আর শোন লক্ষ্মীটি, আমার খালি মনে পড়ে কী জান? মনে পড়ে স্মৃতির টানে যে, ওগো প্রিয়তম, আমরা দু'জনাই যেন খুকুসোনার আগমনের পথ চেয়ে বসে থেকে মনে রাখতে পারি এটাই, যে, "This day is almost done. When the night and morning meet it will be only an unalterable memory. So let no unkind word; no careless, doubting thought; no guilty secret; no neglected duty; no wisp of jealous fog—becloud its passing. For we belong to each other—to have and to hold—and we are determined not to loose the keen sense of mutual appreciation which God has given us. To have is passive, and was consummated on our wedding day, but to hold is active and can never be quite finished so long as we both shall live."

প্রিয়ার কথার এই অভয়ঙ্কর রূপারূপ থেকে বারে বারে নির্ঝরিত হোল—লাল তাজা, আর তাজা লাল সুরভির প্রখর দ্যুতি—পলাশময়তায় প্রিয়র অধরকে আদর করাতে করাতে।

—১৬ই জুন, ১৯৫৮

গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও তাঁর গল্প

সহলেখিকা ঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

অন্তরঙ্গের রাগ আলপনার বহিরঙ্গের বিচিত্র স্বভাবে মিলে মিশে—কেমন আপন প্রিয় হয়ে—রূপনির্ঝর ফোটায় সুর্য্যমুখীর সূর্য্যায়ণে প্রতিভাসিত সত্যান্বেষণে—তারই গল্পকার—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। বলিষ্ঠ মানস সত্যের রূপ-অরূপের কারুকাজে—তাঁর বক্তব্য মুক্ত বিহঙ্গমের মত ভাবনার হাজার তরঙ্গ-ভঙ্গে—নয় বিচলিত। নয় এলোমেলো, দিশাহীন। স্থির আর শান্ত স্বভাবের সুন্দরতায় শিল্পীর বোধজ্ঞান আপনাতে আপনি খুশীবিহ্বল। আর প্রকৃতির আলাপনে রূপ-মহাদেশের আনন্দঝরার মধ্যে নিষ্ঠচেতা। লেখক তার সাহিত্যায়ণে অনেক ভাবনার পশরায় সাজিয়ে, গুছিয়ে, অনেক কাহিনীর রূপদান কোরেছেন এ পর্য্যন্ত। কোনটির আধার উপন্যাস, কোনটি গল্প। তবে গল্পই সংখ্যায় বেশী। শুধু যে এক বিরাট ব্যাপকতা নিয়েই কথাসাহিত্য উপন্যাসে পরিসীমিত তা ত নয়,—চোখে না পড়া, চিনতে পেরেও জানতে না চাওয়া ডেইজি ও ঘেঁটু বা সন্ধ্যামালতীর মতই কত ছোট ছবি, ছোট ছোট ভাব, ছোট সুখের এতটুকু খুশীর কথা, কত ছোট দুঃখের সাময়িক যাতনা, মনমদির প্রণয়-কাকলীর রঙছুট কথা, ছোট স্বার্থের জন্য অযাচিত লোভ ও তার সাময়িক সংক্রমণ, কত পথের চলমান জীবন ধরা সালতামামি, সামাজিকতার হাটে-বাজারের পাটোয়ারী কথার—শিল্পী রূপেই তাঁর ছোট ছোট রচনায়, গল্প করেই সাজিয়েছেন। রাঙিয়েছেন মনসিজার মতো সুনিশ্চিতা কোরে।—ভাল ভাবেই বলতে পারি—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মানসবিহার কোরেছেন মূলত ছোট গল্পের সীমিত দুনিয়াদারির পরিবেশে, প্রমিতিবোধের পরিবেষ্টনীতে। তাঁর গল্প একটি বৈশিষ্ট্যের ওপরে আলোকপাত করে, যা সহজেই উপলব্ধি করায় তাঁরই লেখা গল্পের দুটি ধারায় পরিবেশিত কাহিনী-সম্ভারের জল্পনা-কল্পনার। একধারে অভিজ্ঞতার বোধসঞ্জাত চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ভাবলোকের সঞ্চরমান রূপযান চড়ে কল্পনার রঙবাহার মাধুরীতে হোয়ে ওঠে—আদর্শরকম রোমান্টিক সৃষ্টি। ভাষায় ভাষায় চলে রং-তুলির চিত্র-কুশলীতা, সুদূরাভিসারের আহ্বানে, রাগে, অনুরাগে, প্রেমের কবোষ্ণতায়, ঋতুরঙ্গীন বিচিত্রায়। মুঠো মুঠো অপরাজিতা, চন্দ্রমল্লিকা, ম্যাগনোলিয়া কাঁঠচাঁপা, পলাশ—মনসুখকর হয়ে দাঁড়ায় গদ্যশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সুগভীর কল্পনার ইন্দ্রজালে বোনায়। সে সব গল্পের রভস কথায়, সুরলোকে বিহারিণী সুতনুকাদের যৌবনবিহ্বল আবেশ কথায়, বরপুরুষের আকুতিঝরা আকাঙ্খার চাওয়াতে ভুল কোরে ভুল বুঝতে মননিষ্ঠ প্রেমবিলাসের রসনির্ঝর কথায়। এখানে লেখকের সুনিপুণ ভাষাশিল্পায়ণের রূপনিষ্ঠার মতই নায়িকারা মনসিজের তাগিদে, দেহদেউলে সাজায় বনফুলের সুরভিতে ভরানো

যৌবনের আলপনা। যুবতীর মন তাই—সংস্কারমুক্ত মনবিলাসের মাদকতায় হিল্লোলিতা। শিল্পীর "মীরার দুপুরে"র জীবনের মানে খুঁজে ফেরা সুখান্বেষী মীরা, বারো ঘরের বরনারী সুরুচি, পূর্ণিমার রাকায় সাজানো শুধু "আলোর ভুবনে"র বিশাখা, সূর্য্যের প্রখরতায় ঝলসানো "গ্রীষ্মবাসরে"র জয়তী-তপতী-লিলিরাই—তাঁর সমস্ত গল্প-কল্পনার আঙ্গিনাকে রঙ্ ও বেরঙে, ঋতুতে ঋতুতে ভরিয়ে রেখেছে। এখানে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সুন্দরের প্রেমিক।—সত্যি অসুন্দর বলে কিছু নেই। অসুন্দর যে চোখে দেখার ভুল। মনে বোঝার অসুবিধা। তাই ত এ পৃথিবী—আলোর ভুবন। রূপঝরা থেকে লেখকের আকুতি নির্ঝরেতে ভাসে—"স্বর্ণচাঁপা গাছ। কিন্তু ফুল সুন্দর কি পাতা সুন্দর! সোনারঙ চাঁপা-ফুল, চাঁপাকলির দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়ায়। সবুজ নধর পাতাগুলিও ত কম সুন্দর নয়। ফাল্গুনে কুঁড়ি ছিল। চৈত্রে কিশলয় হল। আর বৈশাখ পড়তে যৌবনপুষ্ট হয়ে প্রত্যেকটা পাতা আকাশের নীল ছুঁয়ে দেখতে আকুল হয়ে উঠেছে। অনন্তে তৃষ্ণা? অনন্ত সৌন্দর্যের পিপাসা?" তারপর "...রুনি ফুলের আগুন আর পাতার সবুজ দেখতে দেখতে ভাবছে—কেবল কি মানুষ, গাছের ফুলটি পাতাটিও আলোর দিকে আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে দুর্নিবার পিপাসায় ক্ষণে ক্ষণে অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাটির বন্ধন ছেড়ে ছুটে যেতে চায়। কিন্তু পারে কি? পারে না। সহস্র বাহু শিকড়ের শিকলে আটকা পড়ে ফুলের দল, পাতার দল কাঁদছে। কাঁপছে। দক্ষিণের দমকা হাওয়ায় গাছের সেই কান্নার সুর, পিপাসার দীর্ঘনিশ্বাসই ত থেকে থেকে ছড়িয়ে পড়ছে। দিন মানুষ পারে, রুনি পারে বন্ধন ছিঁড়ে বাঞ্ছিতের কাছে ছুটে যেতে। চাঁপার আগুনের চেয়েও দ্যুতিময়, সবুজ নধর পাতার চেয়েও লাবণ্যময় একুশ বছরের এক নগ্ন পুরুষ দেহের আশ্চর্য ঐশ্বর্যের এ কী দুর্নিবার আকর্ষণ। রুনির চোখ বার করেয় ফিরে যাচ্ছে সেদিকে। নিজেকে শাসন করত গিয়ে—"

বাস্তবে রুনিরা, মানে অন্যান্য আধুনিক বরবর্ণিকারা নিজেদের ও-ভাবেই শাসন করতে চায়। কিন্তু পারো না। ওরা যে আধুনিক ইভ্। এখনও অভিশপ্ত—যদি নিজেদেরই কার্য্যকলাপ পরম্পরায়। তবু স্বপ্ন দেখে। কল্পনা আঁকে মনেতে—পৃথিবীর কোন এক নিরালা কোণে, শান্ত পরিবেশে একটুকু সুখের জন্য ছোট্ট একটা নীড় বাঁধার জন্য—কোন এক সমবয়েসী সুজনের সঙ্গে। তবু ভুল হয়। আসে হঠকারিতা। জাগে লোভ। মনে থাকে শঙ্কা। নিশ্চয়ে তারা হয়ে পড়ে—অনিশ্চিতা। দোষ—ওরা স্বাধীনা মনের হতে চায়। বিদ্রোহিনী হয়। কিন্তু, তারপর যথাপূর্বং তথাপরম। ওরা হাসতে হাসতে, কাঁপতে কাঁপতে ভুলে যায় আপন ব্যক্তিত্ব উন্মেষের কথাকে। ওদের মনের প্রেমাকুল মিনতির সুযোগে—পুরুষের প্রেম সময়ে সময়ে লোভের আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। নিঃশেষে সুনিশ্চিতাকে ব্যবহারে, প্রয়োগে, মিথুনলগ্নে—অপবিত্র

কোরে তোলায়। আবিলতার অমা রঙে ঢাকে। আবার সময়ে সময়ে প্রভৃতির পরিহাস যেন—প্রতিশোধ নিয়ে নেয় নারীকে দিতে প্রীতির মানুষটির সরল মনেতে আঘাত হেনে। ঠকিয়ে। এমন মলিন পরিচয়ে, আবিলতা ঢাকা পরিবেশে নর-নারী দুই-ই একই স্বভাবের হয়ে ওঠে।—ঠকো অথবা ঠকাও—নয় ত কেউই ঠকো না।—সত্যি আজকের দারুণ, জটিলতায় ভরাট সমাজের তথাকথিত সামাজিকতার ভেতরে যেসব মলিনতা, অপবিত্রতা দেখা দিয়েছে নিছক স্বার্থ, প্রতিপত্তি, বিত্ত, সুনামের মিথ্যা মোহে, তার সব কিছুরই অপ্রতিরোধ্য ছোঁয়াচ জনমানস অতিক্রম করে পুরুষ ও রমণীর দাম্পত্য জীবনের আগে ও পরে—সর্বত্রই ছন্দহীন কোরে দিতে চাইছে। অমিল, অসামঞ্জস্য রূপ ছড়িয়ে গেছে।—জোরাল ভাবের চিত্রপটে ব্যক্তিত্ববাদী কথাকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এ সবেরই সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর এক ধারার গল্পে—প্রেমই মুখ্য। নায়ক-নায়িকার গীতালীমুখর জীবন-যৌবন অভিসারকুঞ্জের কাকলীকথাতেই ভরানো। সে ধারায় থাকে গল্পলোকীয় বিচিত্রিতা। প্রমাণ বহন করেছে 'নায়ক নায়িকা' 'চার ইয়ার' 'চামুচ' 'সমুদ্র' 'গিরগিটি' 'চন্দ্রমল্লিকা' 'ট্যাক্সিওয়ালা' 'বনানীর প্রেম' 'শালিক কি চড়ুই' 'ষ্ট্যাম্প' 'ক্যাম্যাক্ স্ট্রীট' 'মহীয়সী' ও আরো অনেক গল্প।

জ্যোতিরিন্দ্র গল্প-সাহিত্যের অন্যধারায় যে সব গল্প সুন্দর রূপায়ণ হয়ে আছে—তাঁর প্রত্যেকটির লক্ষ্য হচ্ছে কৃত্রিমতায় সাজানো সমাজের লোকদেখানো সামাজিকতা, তার ঈর্ষা, লোলুপতা, ব্যাভিচার, সমাজনীতির সঙ্গে রাজনীতির সংঘর্ষে জাগে যে সব অসভ্যতার স্বার্থান্বেষণ, সর্বোপরি মারাত্মক পরশ্রীকাতরতার প্রধ্যুম্ন বহ্নি। এ সব গল্পের পরিকল্পনা এসেছে যন্ত্রণা-কাতর মানুষের অকাল বসন্তে ছাওয়া, অবেলায় সুর হারানো ব্যথা থেকে, হতাশা থেকে। 'স্যাডেষ্ট্ থট্' থেকে জীবনের গল্প সহজ সুরে গেথেছেন এখানে সুদক্ষ কথাকার। পুষ্পধন্বার মাদল বাতাসে বোধ হয় 'ট্যাক্সিওয়ালা' গল্পের সুন্দরী নায়িকা নিজেকে পরিপূর্ণা নারীর তৃপ্তির ভুবনে দাঁড় করাতে পারেনি। তার জীবনে জ্বলে ওঠা দ্যুতি হঠাৎই আঁধারে ঘিরে যায়—ট্যাক্সিচালক যেন নিজের হয়ে ওঠা সমাজসচেতনতার দর্পণে এ মেয়েকে তার লাঞ্ছিত রমণীত্ব—সমেত বুঝতে পেরেছিল। একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, আজকের সভ্যতার অলঙ্করণে ঝক্ঝক্ করা শহরের সওয়ারীবাহী যে কোনো ট্যাক্সিওয়ালারই জীবনে—অনিবার্য কারণেই এসে যায় নানান ঘটনার চমক দেওয়া অভিজ্ঞতা। এ থেকে সারাদিন গড়িয়ে রাতের নিশুতিপুরের যাত্রী-বন্ধুরূপে তারা যে জ্ঞান পায়,—তার ধারণা থেকে অনেক সময়েই আমাদের সভ্যতার আর মনুষ্যত্বের গর্ব—নিরাসক্ত নির্বিকার ট্যাক্সিচালক যুবকদের কাছে পরিহাসের মত ধিকৃত হয়। ওরা ভাবে—এই কি শিক্ষা? এই বুঝি রুচি? এরই নাম সভ্যতা?—নিজের জীবনে আপন

পরিণীতার কাছ থেকে হঠকারিতা পাওয়াতে আজ সে তার আবেগ, অনুরাগের জগত ছেড়ে—একরকমেরই এই যাযাবরী বৃত্তির ট্যাক্সির-চালক ও মালিক হওয়ায়, কোন কিছুর ওপরই আর তার ভয়, করুণা, মমতা নেই। সে নির্ভীক আর দৃঢ়চেতক, ঠকানো সমাজের রূপের কাছে। এমনি পরিবেশে তার সঙ্গে সওয়ারী রূপেই পরিচিতা হয় এই যুবতী,—যে পরিচিতিতে রমণীয় রমণী, সাজে পরিবারের বধূসদৃশা। কিন্তু—হ্যাঁ, আজ নিজের অপমানিত নারীত্ব নিয়ে সে তার দেহের যৌবনের বাঁকে বাঁকে ধরে রেখেছে রতির রঙ—ঝাঁকে ঝাঁকে অপেক্ষাকৃত অনেক পুরুষের মৌ—চোখের লোভী দৃষ্টির কাছে। তারা নেয়, সময়ে অনেক বেশীই—কিন্তু ওর মত মেয়েরা পায় না কিছুই। না সম্মান। না ঘর বাঁধার সুনিশ্চিত আকুতি। সমাজ বলে, ওরা অপবিত্রা। ভ্রষ্টা। অমাকন্যা। কিন্তু,—মানবতাবাদ তা বলে না। এই যুবতীর দেহ-বেসাতির পেছনে—আছে দারুণ ইতিহাস। সে ইতিহাস এক স্বাভাবিক ভাবে প্রতিষ্ঠা পায়, যার সংস্কারের জন্য কোন প্রয়োজন বোধ হয় না—নির্মোক জড়ানো সমাজের। ওর আকাঙ্খা পৃথিবীতে কোন দিনই বোধহয় পূর্ণতা পাবে না। সে কাঁদবে আড়ালে। আবার সাজাবে দেহ-বেসাতি—রতিলোভী হঠকারীদের জন্য। তারা আবিলতায় ভাসাবে নারীসত্বমকে।—তবু অলকারা এগিয়েই আসবে। কারণ তারাও বাঁচতে চায়। আর বাঁচার জন্য—চাই অর্থ। তাই দেহবাদের জগতে নারীর দেহমঞ্জিলে বিকিকিনির হাট-বাজার—দেশে ও দেশে, সর্বত্রই। এ নারী নিশ্চয়ই ভুল করেছিল চালককে বুঝতে, এমন অবস্থায় ওদের মনসমীক্ষা এসে পৌছয়, যেখানে তারা প্রথম চাহনিতেই পুরুষকে ভাবে—ঋতুরঙে ধাঁধানো আসঙ্গ-ইঙ্গিত। কিন্তু তা ভুল জেনেও এই যুবকের বেলায় সে ভুলই করেছিল তার মনসজি সুতনুর উরোজ রূপরে বজ্রশ্রীর পীনোদ্ধতাকে—নিরাবরণা করানোর মধ্যে। এই ট্যাক্সিচালক আজ এমন এক অনুভূতির দেশের মানুষ, যেখানে তার সেক্স—কৃষ্টালের মত কঠিন। নিশ্চল। নারীর কোন আবদেনই তাকে অচলায়তনে টানতে অক্ষম।—লেখক এই ভাবনাকেই সহজ সুরের সরল কথায় গুছিয়ে—তৈয়ার করেছেন তাদের জীবনের কঠোরে-কোমলে গাথা এক—'সুইটেষ্ট সঙ্'।

আধুনিকা বরকন্যার কাজল চোখের দীঘল কোণে ঝলকানো অন্তরের আপন আর আঁধার ঘেরা জীবনের মুঠো মুঠো রভসকে—নতুন জীবনের মানে তুলে ধরা রূপকথা কোরে তুলেছেন—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তার 'শালিক কি চড়ুই' 'চামুচ' 'গিরগিটি' 'সমুদ্র' গল্পের মনসমীক্ষায়—প্রকাশমান চিন্তাজালের দুর্ভেদ্য—অমানিশায় আর রোমাঞ্চে।—এ সব গল্পে এমন এক না বোঝা ভুলের জগতের ভ্রান্তিবিলাস সাজানো হয়েছে। বর্তমান যুগে—দাম্পত্য জীবনের প্রেমবিলাস—রতিবিলাসের নিরাবরণ নিরাভরণতায়—ব্রীড়াবনত হতে চায় না।—চায় না একে অপরের ইচ্ছাই

স্বাধীন ভাবে উদ্ভূত ইগোটীজম্ থেকে—সহজে আর স্বেচ্ছায় তা বরণ কোরে নিতে। সামাজিক, পরিবেশগত শৃঙ্খলা, পারিবারিক ঘনিষ্ঠতায় থাকা সত্ত্বেও রাকা রজনীর নিশুতিলগ্নে—মধুমাসের আহ্বানকে দম্পতিরূপ অযথা অকারণে অবুঝের মতই করে বসে ভুল—মিথুন-কল্পনায়, ঋতুরঙ্গীন আলোর ভুবনে। ভুলে যায় প্রীতিলোকের আনন্দনির্ঝর কথা। ভাললাগার নিছকতার পরিবেশে—দেহাচারীতায় বেশী কোরেই ভুল বোঝার পরেও, ভুলকেই ধরে রাখে হেমকান্তি ভালবাসার নিকষিত রূপকে —না মানার মধ্যে। প্রেম মুক্ত বিহঙ্গমের মত শরীরী লিপ্সার মাদকতার বিলোল হিল্লোলতায় নজরবন্দী হয়ে মুক্তি আস্বাদনে রংচংএ ফুলবাহার ডানা নিয়ে ছট্‌পট্ করে চলে। কামনা তখন দেহদেউলে নিগূঢ়। রাগালাপে প্রমত্ত প্রহরগুলোকে গুনে গুনে যায়, পলকে পলকে অকারণ পুলকে। তারপর, কখন রূপমদিরে ঝলসানো দুটি আধুনিক প্রাণ সুপ্তিলোকে ক্ষণাকলের মৃদু মন্দাক্রান্ত ছন্দে—জীবনবাসরকে মনে করায়,—ধন্য, তৃপ্ত করান হয়েছে।—কিন্তু পরমুহূর্তেই যতিভঙ্গ হয় 'গিরগিরি'টর মায়ার মধ্যে প্রণবের সান্নিধ্যে, 'পতঙ্গ' গল্পের দেহচেতনাকে , 'শালিক কি চড়ুই-এ দম্পতি জীবনের শেষ চমকে, 'চামুকে' সব অনুকুল থাকার পরেও প্রতিকূল করার জন্য অশোক-সরলার অভিপ্রায়ে, 'নায়ক-নায়িকা'র কুহেলি-স্বভাবে, 'গোঁয়ার' গল্পের যুবক ব্যারিষ্টার রথীন রায়ের পুষ্পবিলাসিনী প্রিয়া-স্ত্রী রেবার সুখীপ্রাণেতে জাগা—সংশয় কথায়।—ওরা সকলেই লেখককে ভাবিয়েছে। পাঠকও ভেবেছে তা পড়ে পড়ে। সব থেকে বেশী কোরে দোলা দিয়ে যায় সমাজ মানসের মুকুরেতে।

প্রথমে 'গিরগিটি' গল্পের ভেতরকার রং-বেরং কল্পনার মায়াজাল বিস্তারের পট-ভূমি ধরে আমরা আলাপনে আসছি। প্রিয় আর অপ্রিয় দুই ভাবেরই সমতা ভরানো এর কারুকাজে, গল্পায়ণের আলাপনা সাজনোয়। গল্প তার আরম্ভে পাঠকের ভাববিলাসকে এক নয়নাভিরাম বর্ণনার প্রাঙ্গণে এনে দাঁড় করায়।—একটা বিষয়ে আমরা জ্যোতিরিন্দ্র-সাহিত্যের সুন্দর আবেশমুখর মুহূর্তের রূপায়ণে দেখতে পাই—মানুষের, বেশী কোরে যুবতী হৃদয়ের রঙে প্রকৃতি আর ঋতু-বিচিত্রা নিয়ে কত গভীর ভাবে মোকাবিলায় মিতালী পাতায়। রাঙায় পলাশ ফুলের মত মুখরুচিকে। ফোটায় সুস্মিত ব্যঞ্জনা, রক্তবরণ অধরের কাঁপন বিলোলতায়। আর দেহের যৌবনে সবুজ গাঙে গাঙে। এর পরেও দেখা যায় পুরুষের এলোমেলো স্বভাব শান্তরাগে ভরে ওঠে।—বর্ণনার সময়ে গাছ, লতা, ফুল, পাখী, ঝর্ণা, ছোট্ট নদীর কলহাস, দোয়েলের শিষ, টিয়ারঙের মসৃণতা, পূর্বালী হাওয়া, এমন কি বরবর্ণিনী রেবা রায় কলাবতীর গর্ভকেশরের সুরভিতে মাতোয়ারা হওয়ায়—তার টিকোলো নাকের প্রান্তে ওর হলুদ রঙ পরাগরেণু পর্যন্ত আঁকা হয়ে যায় বিন্দু বিন্দু—এমনি প্রকৃতির উদার

রাগ-আলাপন ভাষার মধুময় সত্বায় ভেসে ভেসে জ্যোতিরিন্দ্র-মানসের প্রকৃতি—নিষ্ঠতার—পরিচিতিকে বিশিষ্ট করে রেখেছে।

অষ্টাদশী মায়া আর বাইশ বছরী প্রণব, আর তাদের বসন্ত মাদল বাতাসে কাঁপানো যৌবনবিলাস স্বামী-স্ত্রীর মিথুনচেতনায় পথ খুঁজে ফিরে চলেছিল। 'গিরগিটি' গল্পে, নামকরণে একটা রূপক ধরা হয়েছে। আর তার প্রতীক, মায়া নিজে। প্রণবের কাছে তার অস্বিত্ব দেহদেউলের সুখাবেশের তাড়নায় সরীসৃপের মত ধীরে, মৃদুলা, গতিতে আবেগ মথিতা। যৌনচেতনায় লাজহরা। প্রণব শান্ত। সুস্থির। যৌবনান্বিতার অনুরাগের পরশে সে নিথর। নিশ্চলতায় অনুরঞ্জিত। ভাবে, প্রকাশে সে শুধু যুবক। আর বেশী বিছু নয়। মনে হয়, ভাবতেও চায় না। কী তার নেই, তা নিয়ে। যুবকের মধুক্ষর যৌবনত্ব নিয়ে আপন পরিণীতার যৌবনকে কি ভাবে রাঙাবে, নিলাজ করাবে, সে সম্বন্ধে—সে অবুঝ। প্রণবের সরল মন শিশু বিলাসের মতই মায়ার সান্নিধ্যে ভুলে যায় মনের আকুতি জাগা মিনতিতে ঝরে পরা—শরীরচারিতার কথা।—ভুল বোঝে, যৌবনের তাগিদে প্রিয়ার সবুজ দেহের নিরাবরণা যৌবনকে পুষ্পায়ণ মানসে লাজহীনা করাতে। দেহে দেহে ডাক দিয়ে যাওয়া সোনা ঝরা রাকাতে আলপনা আঁকা সে মিথুনরূপে। প্রথম প্রথম প্রণবের মধ্যে দেখতাম সেক্সের অনুভূতিহীন কৃষ্ট্যাল রূপ। বলতে বাধা নেই, শুধু প্রেম—মিথুন বিলাস ছাড়া অপূর্ণ। আবার শুধু দেহবিলাস ইররেশনাল্। অমানুষিক। আর এ দ্বন্দ্ব থেকেই বঙ্কিমান হয়ে ওঠে স্বামী-স্ত্রীর প্রীতিঘেরা আঙ্গিনা। তাদের যৌবন ধর্ম অন্ধকারে ডুবে যায়। সেই সমীক্ষার অনুরণনেতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ভাববিলাসিনী মায়ার আঠারোর দুর্দম সুখ নিজের রূপের প্রেমে নার্সিশাস্ হয়ে উঠেছিল—"দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা বড় আরশীর সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে দেখছে। দেখছে আর যেন আনন্দের আতিশয্যে মৃদু শিস্ দেওয়ার মতন একটা সুর জিব ও ঠোঁটের মাথায় জড়িয়ে রেখে রেখে তার পর এক সময়...গায়ের জামার বোতাম নেই, আঁচলটা ঢিলে হয়ে মাটিতে লুটোয়, খোঁপার বাঁধন খুলে দেওয়াতে ঘাড়ে পিঠে কোমর অবধি একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাঝারো গড়ন। রং খুব ফর্সা না। কিন্তু মুখখানা সুন্দর। অন্তত মায়ার নিজের কাছে নিজের ছোট পাতলা কপাল আর দু'ধারে একটু বেঁকে যাওয়া না-সরু-না-মোটা ভুরু ও ঢালুর দিকে ঈষৎ ছড়িয়ে পড়া নাক ও কালো পালক ঘেরা চোখের লালচে মতন বা বলা যায় বাদামী রঙের চক্‌চকে মণি দুটো অসম্ভব ভাল লাগে। হ্যাঁ আর ওর কচি পেয়ারার মতন ছোট্ট সুগোল মসৃণ একখানা থুঁতনি। নিজের কাছে ত বটেই প্রণবের কাছেও এই চোখ এই নাক এই ভুরু গাল কপাল এবং বিশেষ করে শক্ত পালিশ গোল ছোট্ট থুঁতনিটা যে কত প্রিয়, তা মায়া এই দু'বছরে বেশ বুঝে নিয়েছে। বাপ্, আদর করতে সকলের আগে প্রণব এই থুঁতনি

ধরে নাড়া দেবে টিপবে রগড়াবে নয় তো থুঁতনির ওপর নিজের গালটা চেপে ধরে ঘষবে।" আর এমন ভাবনা যাকে নিজের রূপ সম্বন্ধে সচেতন রাখে, সে ভাল লাগাতে পরছে না প্রণবের কাছ থেকে পাওয়া আঁধারের রভস মিলনের উচ্ছ্বাসকে—"....সব কেমন যেন মায়ার কাছে পূরনো, বড় বেশি একঘেয়ে ঠেকতে লাগল। যেন জন্মবধি সে এসব দেখছে শুনছে। যেন শুনে শুনে দেখে দেখে এখন তার হাঁপিয়ে ওঠার সময় হয়ে এলো। এমন কি রাতটাও। আদর চুমা আবেগ উচ্ছ্বাস, কোন কিছুর মধ্যেই আর ও দিশেহারা হয়ে যেতে পারছিল না। যেন কতকাল ধরে চলছে। যেন এসব কাজ এখন কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকলে ভাল হয়....বিছানার অন্ধকারে আধশোয়া স্বামীকে...বেশবাস "ছেড়ে নিজেকে কুৎসিত মনে হয়।"—মায়া প্রণবের কাছ থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু আত্মপ্রীতির সৌগন্ধে সে তার রূপকে প্রকৃতির অনাবিলতার মধ্যে মুক্ত করাতে, সূর্য্যের পবিত্র ছটায় সাজাতে খুশী হয়।—"একলা মায়া ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ তা দেখছে বলে আজ আর সে মনে করতে পারল না। অথচ ওরা রোজ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে, হাঁ, সহস্র পাতার চোখ মেলে এ বাড়ির নিমগাছ, রোদ কি জল ঠেকাতে বড় বড় পাতা মাথায় ওধারের পেঁপে গাছগুলো, এ ধারের কচি পেয়ারা গাছটা, ওদিকের পাঁচিলের মাথায় কাকগুলো পর্যন্ত ; ইটের পাঁজা ছেড়ে লাল ফড়িং দুটো উড়ে এসে ঘুরে ঘুরে মায়ার ভিজে চুল দেখে, নাভি দেখে, স্তন দেখে, জঙ্ঘা দেখে। কচি কলাপাতার বোঁটার মত ওর পিঠের ঋজু মসৃণ শিরদাঁড়া...."—প্রকৃতির উদার আকাশের নীলিমায় যেমন সে নিজেকে আদুর কোরে ধরে, তেমনি চার দেয়ালের নিঝুমতায় বনানী-কন্যার নিলাজতায় নেচে ওঠে—"দুপুরে খাওয়ার পরে চোখে আজ ঘুম আসে নি। শুতে গিয়ে শোয়া হোল না। এক আশ্চর্য্য নেশায় মন শরীর আচ্ছন্ন হয়ে রইল। সত্যি ত। মায়া মাদার গাছ বা নোনাধরা পাঁচিলটা যদি হঠাৎ মুখ ফুটে বলে ওঠে, 'চমৎকার, কত সুন্দর তুমি', অথবা 'তোমাকে দেখে বর্ষার রজনীগন্ধা, কি বৈশাখের চাঁপার কথা মনে পড়ে আমাদের' তা সে কি খুব অবাক হবে? হয় নি। এখনও হোল না। বরং নূপুর বাজার মতন উত্তেজনায় আনন্দে তার রক্তের মধ্যে একটা মিষ্টি রিমঝিম শব্দ হচ্ছিল। সেই কখন থেকে। শোয়া ছেড়ে এক সময় ও উঠল। আস্তে দরজার দুটো পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে উঠোনোর দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিল। তারপর এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। ঠিক মাঝ জায়গায় দাঁড়ালেই দেওয়ালের আরশীতে ও পায়ের নখ থেকে সিঁথির ডগা পর্যন্ত দেখতে পায় না, আরশী মুখ করে দাঁড়ালেও সব দেখা যায় কি। সব বাঁধন খুলে পা দিয়ে একদিকে ঠেলে সরিয়ে দিল ও। আর সেই মুহূর্তে আয়নার দিকে তাকিয়ে ও স্থির হয়ে গেল। যেন রক্তের বাজনাটাও কিছুক্ষণের জন্য থেকে রইল না, নিজের মূর্তি সে ওর আগে কখনও

দেখে নি এভাবে। ডালিম গাছ, পাতা ফুল ফল কাণ্ড শাখায় ছড়িয়ে পড়ে যৌবনের সতেজ প্রগল্ভ লাবণ্য। পুলকের বিদ্যুৎ শিহরণ তার মেরুদাঁড়ায় খেলা করে গেল। টের পেল মায়া। আর রক্তের বাজনাটা যেন প্রচণ্ড শব্দ করে তখন বেজে উঠল ঝম্ ঝম্ ঝম্। ঘরের চালে শব্দ হচ্ছিল। বাইরে, গাছের পাতায়, পাঁচিলের গায়ে। কুয়োতলায়, ডুমুর জঙ্গলে। আকাশে ভেঙ্গে জোরে বৃষ্টি নামল। আর আয়নার সামনে নাচের ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে কোটিবার ও নিজেকে দেখল।"

মায়া এখানে যা করেছে প্রগল্ভতায়, তা মনস্তাত্বিক দিক থেকে একটি মেয়ের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, আমরা তাই মনে করি। নূপুর ছন্দ প্রত্যেক প্রেমিকা কন্যার মধ্যেই থাকে। অনেক সময়ে বেশী কোরে। প্রকৃতি-প্রেমিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এখানে তার স্বাভাবিকভাবে ভাষায়, ছবিতে মুখর করে তুলেছেন। স্বীকার করতে হয়। তাঁর আঁকা মানসিক ছবিও অপরূপ কারুকাজে ভরা।—শেষ চমকে 'গিরগিটি' গল্পের প্রগল্ভিতা যে সমস্যায় পৌঁছেছে, আমাদের মনে হয় তা আরো বেশী রোমান্টিক ও ভাবহিহ্বল হোত, যদি ঠিক প্রণবের ক্রন্দনরত মুহূর্তে তা সমাপিকা হোত। মায়া প্রণবের বুকের প্রমত্ত প্রহরকে আবেশে, আহ্লাদে, আলিঙ্গনে যদি ভরিয়ে দিত। চিন্তার বেড়াজাল থেকে মুক্তা মায়া বুঝতে পেরেছিল নিজেরই ভ্রান্তিবিলাসে—"সত্যিই প্রণব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। যেন বালিশ ভিজে যাচ্ছে।"—তবু সে মুক্তিপ্রিয়া হোতে চেয়েছিল। শুধু দেহের দোসর নয়। মায়া প্রণবকে বলেছিল—হ্যাঁ, আমার রূপ আমি আকাশকে দেখাই, বাতাস এসে আমার গায়ের গন্ধ শোঁকে, গাছ, গাছের পাতারা, শালিক বুলবুলিরা আমার যৌবন দেখে। কোন মানুষ না, পুরুষকে দেখাই না।..."

রূপঝারার মুক্তিস্নাতা মায়া যেমন 'গিরগিটি'তে দেহচেতনায় বিহ্বলা, বনানীকন্যার মত প্রগল্ভা,—তেমনি ভাববিলাস কত নিষ্ঠুরতায় প্রকাশ পেতে পারে বাস্তবের কুটিল ঈর্ষার মধ্যে, তারই আশ্চর্য ঘেরা কাহিনীকে তুলে ধরেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর "হিংসা" গল্পের নায়িকা রেবার মধ্যে। আগের গল্পে দেখেছি প্রণবের না মেটা শরীরচারিতার কথা যেমন দ্বন্দ্ব বাঁধিয়েছিল প্রেমের পরিণীতার সঙ্গে—এ গল্পে দেখি দম্পতির প্রেমরূপ কোন স্থান পায় নি, যদিও পাশাপাশি দুটি ঘরে রেবা ও মীরা,—দুজনেরই দাম্পাত্য-জীবন ঘিরে আছে দুটি কর্মিষ্ঠ পুরুষের অস্বিত্বে। স্বভাবে। প্রতিষ্ঠায়।—যা নিখুঁত নিটোলতা নিয়ে ঈর্ষার ইন্ধনকে প্রধূমিত কোরেছে, তা হোল মাতৃত্ব। যদিও তা একজনকে ঘিরে আরেকজনার 'হিংসা'। একজন ঝুনুর মা রেবা। তার ছেলে নাই। অন্যজনা মীরা, তার সুনু—একটি ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে। এই মীরাকে সহ্য কোরতে পারল না রেবা শেষ পর্যন্ত। কারণ মীরার সৌভাগ্য দর্শনে। রেবার তুলনায় কত ভাগ্যবতী এই মীরা, সন্তান ভাগ্যে আর স্বামীকে ঐশ্চর্য-গর্বে। গল্প আরম্ভ হয়েছে প্রতীক ধর্মে—ঝুনুর মা দেখছে তার স্বামী একটি

মুর্গি কাটছে। এমন এক মুর্গি যে আর দু'দিন বাদে ডিম পারত। এমন সময় প্রতিবেশিনী মীরা এলো। রেবা দেখল মীরা প্রজাবতী। আসন্নসম্ভবা জানল এবারও তার ছেলে হবে। আর রেবা? এক মেয়ে ঝুনু ছাড়া ছেলের অভাব তাকে হিংসা করতে শেখাল মীরাকে। মনে কুচিন্তা জাগল—মীরার অবস্থাকে কি ঐ ডিমভরা মুর্গিটার মত নিশ্চুপ করে দেওয়া যায় না! অবার শুনল রেবা, ওর স্বামী নাকি অফিসার হয়েছে। অফিস থেকে বিলেত পাঠাচ্ছে। কত আনন্দ মীরার! আবার সে মা হতে চলেছে। এক ছেলে থাকা সত্ত্বেও আবার আরেকটি অচিরে হবে। এত সৌভাগ্যকে হিংসা না করে পারল না রেবার সামান্য নারী মনের তুচ্ছতা, নীচতা। অবশ্য কেন এমন হয় নারীর স্বভাবে, এর সমাধান মনসমীক্ষাও সমাধান করতে অপরাগ। এ গল্প পথ চলতে থেমে গেল মধুরা অকালমৃত্যুতে। রেবার কথায় পিছল কলতলায় যেতে গিয়ে মীরা পিছলিয়ে যায়, তারফলে অসময়ে হোল কুমারসম্ভব ও নিজের মৃত্যু। এর জন্য রেবা দায়ী। রেবার পুত্রাকাঙ্খা আর স্বামীর অভাগ্য তাকে প্ররোচিত করেছিল এরকম অমানবিক কাজে—যা স্বাভাবিক নয়। তবু মনের, দেহের অতৃপ্তিতে, আর চাহিদায় রেবার মত নারী কুৎসিত কিছু করে বসে!—সব থেকে কৃতিত্ব লেখকের। তিনি রেবা ও মীরার দ্বন্দ্বকে হিংসায় টেনে যে সব উপমা, কল্পনা, প্রকাশে ব্যঞ্জনা দিয়েছেন তা গল্পের রূপায়ণকে নিখুঁত করে তুলেছে। এক জায়গায় প্রজাবতী মীরার সৃষ্টিরূপ অবলা প্রাণীর মধ্যে তারই আসন্ন অবস্থাকে নীরিক্ষা করতে চাওয়াটা অনুরঞ্জন করেছে বর্ণনাকে ঈষৎ লাজ রঙে ছাপিয়ে—"...ডিমওয়ালাগুলো (মুর্গি) বড় একটা কাটা হয় না—তাই তো তখন ছুটে গেলাম তোর বর যখন ঐ জাতের একটা কাটছিল—পেটের ভেতরটা দেখব বলে—হি-হি—এবার ঝকল দিয়ে হেসে উঠল মীরা। আর ওর ফুলো পেটটা থর থর করে কাঁপতে লাগল। যেন কি ভেবে শিউরে ওঠে রেবা,—মুখে শব্দ নেই।—'তাকিয়ে দেখছিস যে দুষ্টু মেয়ে—হঠাৎ আমার ওদিকে তোর নজর পড়ল কেন?' মীরা আরো জোরে হাসে। অপ্রস্তুত হয়ে রেবা চোখ সরিয়ে নেয় লাল হয়ে ওঠে। তারপর অল্প হেসে মীরার চোখে চোখ রাখে।"—

এরকম অভাবনীয় কল্পনাকে কত সরল চিন্তায় ফুটিয়েছেন, বক্তব্য সমৃদ্ধ করেছেন তার প্রমাণ মেলে "তিন বুড়ি" ও "বৃষ্টির পরে" গল্প দুটিতে। আমরা বোধ হয় কখনও ভাবতে পারি না, আর না ভাবাটাই স্বাভাবিক যে—একদিন আমাদের বয়েস বাড়তে বাড়তে বৃদ্ধের শেষ পরিসীমায় এসে স্থানান্তরিত হতে হবে ওপারের উর্দ্ধায়ণে। ভাবলে পর শিহর জাগে। বিস্ময়কে চাপা দেই। বৃদ্ধত্ব যবুককে, আর তার চোখের চারধারের ব্রীড়ানতা যুবতীদের সেদিন কিরূপে জবুথুবু করায়—সে কথা ভাবার আগে মনে জাগে পুরুষের বৃদ্ধত্বকে, কেন না 'পালামৌ'এ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

তা জানিয়েই গেছেন—বৃদ্ধেরও এক ধরনের সৌন্দর্য্য আছে—যা ঐ বয়সেই প্রকাশ পায়।—কিন্তু নারীর সম্বন্ধে এমন 'এ্যাডেজ্' দিয়ে তাকে অলঙ্কৃত করা চোখে পড়েনি। সে বৃদ্ধা, পরিচয় সে বুড়ি। আবার কি? এই তার আসল। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ভাবনায় সুন্দর রূপায়ণে তা প্রকাশ পেতে পেরেছে—"আকাশটা সীসার রঙ ধরে আছে। জল হবে না। কেবল সারাদিন একটা বিশ্রী গুরু গুরু শব্দ হচ্ছে। বাতাস বন্ধ। কেমন একটা গুমোট।... এমন দিনে থেকে থেকে হাই ওঠে, ঘুম পায়। অথচ ঘুমুতে গেলে ঘুম আসে না—কেমন যেন একটু তন্দ্রার মত আসে। আর তার সঙ্গে বিবর্ণ বিষণ্ণ এলোমেলো স্বপ্ন। টুকরো টুকরো। বিচ্ছিন্ন একটার আধখানা, আর একটার সিকি অংশ।....যন্ত্রণা হয়, অস্বস্তি জাগে বুকের মধ্যে—আর তখন তন্দ্রা ছুটে যায়। মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে—ঘোলাটে আকাশটার মত সারা পৃথিবী যেন বিবর্ণ নীরস ঠেকে। চারিদিকের শব্দ থেমে গেছে, গতি থেমে গেছে। গন্ধ নেই, রঙ নেই।....এমন অবস্থার মানুষ শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গী খোঁজে, সঙ্গিনী খোঁজে। যেন হতাশ শূন্য মন আশ্রয়ের জন্য, অবলম্বনের জন্য আর একদিকে হাত বাড়িয়ে এই মন সেই মনকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কেমন আছ, তোমার অবস্থা কি?'...."ভালো না। বুকটা খালি খালি ঠেকছে।"....'আমারও তাই।'....'ঘুমোলে না'... 'চেষ্টা করলাম, এলো না—কেবল একটু তন্দ্রার মধ্যে হাবিজাবি স্বপ্ন দেখলাম, ভয় পেলাম উঠে গেলাম।'...আমারও তাই হোল। তাই তোমার কাছে চলে এলাম ভাই।'...'দুই বুড়ি'র এমন বিষণ্ণ ছবির নিরালা যন্ত্রণা থেকে তাদের অভাব, অবহেলা, অসম্বলতা যুবককে না ভাবালেও, অন্তর তার যুবতীকে এক বার ভাবতে শেখাবে,—সত্যি সেদিন কোথায় থাকবে তার মধুছন্দা মুখশ্রী, পীনোন্নতা যৌবন-রাগ দেহের রেখায় রেখায়, কাজল চোখের দীঘল মায়া, অধরের হাসিতে ঝরা রক্তবরণ গোলাপ-সুরভি, বুকের উদ্ধত লজ্জায় বন্দিতা রূপ।—এ গল্পে সব কিছু হারিয়েও—বৃদ্ধা তার জগত খুঁজে পেয়েছে—এক নিবিষ্টতার মধ্যে—মায়াশূন্যতার।

'বৃষ্টির পরে' গল্পে দুই বন্ধুর বয়েস সীমান্তে হঠাৎ ঝলক দেওয়া মানসিকতার ঝড় থেকে মুক্তির স্বাদ পাওয়া আর নিজেদের যৌবন পরিসরে কথা উচ্ছৃঙ্খলতা, আজ বার্দ্ধক্যের শিবিরে পৌঁছে স্মৃতিচারণার মধ্যে দুজনেই দুজনকে ঘাত-প্রতিঘাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল না। বন্ধু প্রভাত আজ তার বন্ধুর কাছে কৈফিয়ৎ তলব করতে এসেছে, কোন অধিকারে সে তার নিজের আত্মজার সঙ্গে বন্ধুর আত্মজকে অবাধে করতে দিয়েছিল—মেলামেশার আলাপচারিতা,—যা একদিন প্রভাতের ছেলে ও বন্ধুর ডায়োসেশনে শিক্ষিতা কন্যার সঙ্গে যৌবনের জ্বালায় দেহচারিতায় অন্ধের মত ডুবিয়েছিল! প্রভাতের আত্মজ—বন্ধু-কন্যার মধ্যে প্রজায়ণে প্রাণ অঙ্কুরিত করেছিল! কিন্তু কোন অধিকারে বন্ধুর চোখের সামনে থেকে তারই

পুত্র আর সেই কন্যার বুদ্ধিতে—প্রভাতের ভাবী পৌত্রকে অমন আমানুষিক বর্বরতায়, জন্মমুহূর্তেই মৃত্যু দিয়ে ঢেকে—তারা দু জনে অন্তর্হিত হলো কেন? কেন?—আজ এই দাবী নিয়ে ঝানু ব্যারিস্টার প্রভাত তারই আবাল্য বন্ধুকে জেরা করছে। কিন্তু মানুষের মন যে পলকে পলকে, পাল্টায়—তারই, প্রভাবে প্রভাতকে কিছু আগে দেখা গেছিল তারই সন্তানের রক্তে—নিজেকে যে মেয়ে নিশ্চয়ই ভালবেসে নতুন এক প্রাণে পুষ্পবতী হয়েছিল,—হয়ে যে আবার সেই নতুনের আবির্ভাবকে প্রাণশূন্য করাতে দ্বিধা করেনি—যৌবন বিলাসে 'মা'-এর রূপকে পুতুল খেলা বলে মনে করে,—সেই মেয়েরই চুলের একটি লাল রীবন হাতে পাওয়ায়—প্রভাত তা পা দিয়ে দিয়েছিল রাগের আগুনে। কিন্তু আশ্চর্য্য পরিবর্তন, সেই—"প্রভাত নীরব। বৃষ্টির জলে স্নান করে করে গাছের রঙ ফেরা দেখছে। উল্লাস দেখছে। যেন একটু পরে সে আমার কথায় ফিরে এলো।...'মানে সার বসন্তটা ওরা মাঠে খেলাধুলা করল, গ্রীষ্মের শুরু থেকে ওই কামরায় ঢুকল।'...'তাই।'...'আর বর্ষা আসছে এমন সময় তোমার লনেও রইল না ওরা, ছোট্ট ঘরেও রইল না।'...'না।' সংক্ষেপে উত্তর সারলাম। প্রভাতের মুখের দিকে তাকাতে আবার ভয় করে। যেন তার গলার স্বার আবার ভাঙ্গছে টের পাই। 'এসো, ইদিকে—' প্রভাতের হাত ধরে আস্তে টানলাম। 'আমার মাধবীবনের কি চেহারা হয়েছে দেখবে।'.... 'মাধমী মরবে অপরাজিতা জাগবে।' যেন এই প্রথম একটা কবিতার লাইন বলার চেষ্টা করল প্রভাত। খুশি হয়ে তার হাত ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলি। বৃষ্টির জোর হঠাৎ কমে গেছে। ঝিঁঝি ডাকছে। মাথার ওপর পাখার ঝাপটা শুনলাম। একটা পাখি গায়ের জল ঝাড়ছিল। মাধবী বন দেখা শেষ করে আর একটু এগোই দুজন। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াই। প্রভাত ও আমার দৃষ্টি এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। ওপাশে ঘন কেয়া-ঝোপ। লম্বা ডাঁটার মত সাদা ফুলটা একটু একটু দুলছে। টুপটাপ জল ঝরছে পাপড়ি থেকে। কিন্তু আমরা তা দেখিনি। সেদিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই। দেখছিলাম না পাশটা। জমির একটু অংশ। যেন কাল রাত্রে মাটি খোঁড়া হয়েছিল—রাত্রে বা বিকালে বা কাল সকালে। নতুন মাটির চিহ্ন। গর্ত খুঁড়ে আবার মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টির তোড়ে ঘাস সরে গেছে, মাটি ফেটে গেছে। ভিজে মাটি ফুড়ে ফুলের কলি আকাশের মেঘ দেখছে।—ভুঁই-চাঁপার কলি। একটা না পাঁচটা, আমরা রুদ্ধশ্বাসে গুনে শেষ করলাম। প্রভাত কাদার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আমিও।...মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে প্রভাত ওটাকে টেনে বার করল। আশ্চর্য্য, রাগ করল না সে, কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে না।...'এটা করার দরকার ছিল কি?' প্রভাত আমার চোখ দেখছিল না। মেঘের ফাঁকে রোদ চিকিয়ে উঠছে তাই দেখছিল।...'হয়তো ভয়ে—লজ্জায়।' আমি আস্তে বললাম।....'তারপর পালিয়ে গেল দুটিতে।' তেমনি আকাশ মুখ করে

সোনা গলা রোদ চোখে নিয়ে প্রভাত বলছিল। আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে তার মুখ দেখছিলাম। কেবল কি অনুকম্পা? যেন আরো অনেক কিছু দেখলাম প্রভাতের চক্চকে চোখ দুটোর মধ্যে। ফুল শুকিয়ে যাওয়ার কথা,—ফুলের শুকিয়ে একটু একটু করে সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ। আমি তাই দেখছিলাম।"

—মানুষের চারধারে কত বিস্ময়, কত রহস্য, কত না বোঝা, না জানা কাহিনী চোখের আড়ালে আড়ালে ঘটে যায়, ঘটে থাকে—তারই অব্যক্ত সুর করুণার জগতে মুঠো ভরা অনুকম্পা হয়ে ঝরেছে "বৃষ্টির পরে" গল্পে। শ্রেষ্ঠ রচনার চিরন্তণী সুরঝঙ্কারে—তা মাতোয়ারা।

প্রেম তার চম্পাবরণ রঙে, সোনা ঝরা আবেশ মাদকতায়, আবীর ছোপানো পরাগ বেণুতে, গোরোচনা গোরীর মতন বহুত মিনতিতে, ঋতুসম্ভারে সাজিয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শিল্পী মনের সৃষ্টিলগ্নে দোল দেওয়া প্রণয়, প্রীতির মিতাচারিতায়, ছন্দবদ্ধ রাগালাপে, আলাপনের অনুরঞ্জনে, বর্ণনার রাজসীকতায়—আটিষ্টিক এ্যারিষ্টোক্রেসিতে। ভাষা এখানে মিষ্টি মনের বরবর্ণিতার তনুমনের ছন্দে ভরানো যৌবনে-ঝঙ্কৃত—সুষমাকে তুলে ধরেছে। এখানে গল্পের পরিপাটি রূপের মধ্যে তিনি আপন প্রেমদর্শনকে ফুটিয়েছেন। এ পর্য্যায়ে মনে স্বপ্নসঞ্চার করে তাঁর লেখা "সমুদ্র" আর "চন্দ্রমল্লিকা"।—দুটি গল্পই প্রণয়-প্রীতির সুধায় মশগুল। একটু আলাদা সুর আছে। প্রেম আগাগোড়া শতদলে রঙবাহার হয় নি "সমুদ্র"তে—কিন্তু "চন্দ্রমল্লিকা"য় শ্রীরাধার হৃদয়-নির্ঝরণের ঝঙ্কারে প্রেমের সোনা রঙ—নিকষ রূপ নিয়েছে, 'কামগন্ধ নাহি তায়।'

"সমুদ্র" নামটি রূপঝরার কলতানের সঙ্গে সঙ্গে ভূমার দিকে, বিরাট অনাবিলতার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। ছোট কিছু ভাবা যায় না। সব বিরাট। সব উদার, দিগন্তশূন্য নীল সামীয়ানার ছায়ায়। শ্বেতশুভ্র সফেন তরঙ্গমালায় তার নিঃস্বার্থতা মূর্ত, জাগরূক প্রকটতার মধ্যে। নায়ক আর তার স্ত্রী হেনা—ভ্রমণবিলাসে এসেছে সাগরমেখলা পরিবৃত—পুরীর বালুচরে।—বালুচর শাড়ীর স্বচ্ছতার সাজানো কিনা হেনার যুবতী ধরম, তা অন্তত ভাবিয়েছে তার পুরুষকে। সী-বীচে এসে যেদিকে তাকাও-সেখানেই মৃদুলতা ভুলে শব্দলহর তুলে আছাড়ি-পাছাড়ি খাচ্ছে বিরামহীনা সমুদ্র—দুষ্টুমি করে রূপোলী পাড়ের জরিদার ঢেউ-এর পিঠে ঢেউ ছিটিয়ে। ছড়িয়ে। এমন যে শাশ্বত রূপ, যার বিন্দুমাত্র আবিলতা নেই, তারই দর্শনে আর শীতল ছোঁয়ায় মনের কামনা, বাসনা—সব মলিনতাকে ক্ষণেকের ছন্দে, মিলে ভুলে যায়। নায়ক ভুলেছিল। কতকটা বিতরাগ জন্মেছিল তার মনে। কিন্তু চলনে, বলনে হেনা কিন্তু বদলায় নি। কলতাকার প্রেমবিহ্বলা হেনা এখানে এসেও তার সবুজ যৌবনের হুল্লোড়ে আরো বেশী মেতে পড়ে। সমুদ্র স্নানে তার রুচি নেই। অন্তত

সবাই যা পছন্দ করে। নায়ক সাগরবলাকার মুক্ত ভাবনায় মানসবিহার করতে যেয়ে আঘাত পেল—ছিঃ, হেনা কিনা তার দিকে ছুটে আসা ঢেউগুলোর রূপোলী মাথায় আলতা ছোপানো ফর্সা পায়ের আঘাতে—ভেঙে দেবার চেষ্টায় ছোট্ট মেয়ের মতন হেসে, গড়িয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে! ভাল লাগল না এ দৃশ্য নায়কের। কোথাকার পাগল সদৃশ, পরোপকারীর ভেকধারী সকলেরই মামা নামে পরিচিত লোকটির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হোল।—বোঝা গেল না কি যে দেখেছিল হেনার স্বামী ঐ বৃদ্ধের মধ্যে,—আর সে হেনাকে কথায় কথায়, আর চিন্তায় তুচ্ছ করছিল, নারীর স্বার্থপরতাকেই বড়ো করে দেখছিল, ফতোয়াও দিচ্ছিল নিজেরই স্ত্রীকে—বড় নীচু মন হেনার!—কিন্তু বিস্ময় আরো ঘন হয়ে এলো পুরুষেরই মানসবিহারে, যেখানে তার পক্ষে অনায়াসে প্রাপ্য হয়ে ওঠে—হেনার যুবতী দেহের ভরা গাঙে সাঁতার কাটা, তাকে লাজহরা করে একান্ত আপনাতে লীন করা।—কিন্তু সমুদ্র, তাকে আপন ভাবার মধ্যে আছে দুস্তর ব্যবধানে, অনেক সাধনা। ও তা নিজেও বুঝেছে, সমুদ্র অনেক দূর। তবু স্ত্রীর সাগরমেখলারঙ শাড়ীতে ঢাকা সুন্দর রূপকে নায়ক সহ্য করতে পারে না। নীল আকাশের ঢল্ খেয়ে লুটিয়ে পড়া সমুদ্রের-ধারে বালুচরে দাঁড়িয়ে আঁচল উড়িয়ে, বিনুনী দুলিয়ে, শাড়ী-শায়া জল থেকে বাঁচিয়ে আলতা রঙ পায়ে দুষ্টু মেয়ের নিলাজতা নিয়ে হেনার হুড়োহুড়ি করাটা।—এ রূপ তার চোখে কেবল জ্বালা ধরায়। কিন্তু—"সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া হেনাকে আবছা অন্ধকারে একটা খরগোসের মত দেখাচ্ছিল। ও যে মানুষ—কলকাতার ঝামাপুকুর লেনের দোতলার কোন ফ্ল্যাটের এক তেজস্বিনী মহিলা, সমুদ্রতীরে এই ছোট ঘরের বিছানাটার দিকে তাকিয়ে সে কথা কে বলবে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুশোচনায় বুক ভার হয়ে উঠল। যেন আমি নিজেকে করুণা করতে আরম্ভ করলাম। ওই ঘুমন্ত খরগোসের বুকের স্পন্দন দেখতে, হৃদয়ের ধুক ধুক শুনতে আমি কত রাত্রে ওর গাত্রাবাস সরিয়ে বোকার মত তাকিয়ে রয়েছি। কান পেতে থেকেছি। দেহ-সমুদ্র দেহ-সমুদ্র! আমি তৃপ্ত ছিলাম। চিন্তা করে প্রায় ঘরে যেতে ইচ্ছা করছিল। চোখের জল এলো। সমুদ্র আমার অতীতকে এমন করে তুচ্ছ করে দেবে কে জানতো। ঘুমের ঘোরে হেনা বিড়বিড় করছিল। ঝামাপুকুরের বাড়িতে আমি তৎক্ষণাৎ আলো জ্বেলে ওর ঠোঁট পরীক্ষা করতাম।—দেখতাম, হাসি জেগেছে, কি কান্নার বাঁকাচোরা রেখা জেগেছে ঠোঁটে। সুখের স্বপ্ন দেখছে, কি দুঃখের! বিছানার কাছে গিয়ে একটা পোকা হাটকারার গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে যেন নিষ্ক্রিয় কঠিন থেকে শক্ত হাতে জানালার গরাদ চেপে ধরে বাইরে চোখ ফেরালাম। হাওয়ার বেগ বাড়ছে, সমুদ্র উত্তাল হয়েছে। সফেন তরঙ্গ ক্রুদ্ধ গর্জন করে তীরের দিকে ছুটে আসছে—একটা এল ভাঙ্গল, আবার একটা; আবার, আবার, আবার ....কত কোটি বছর ধরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এভাবে

ছুটে আসছে, গর্জন করছে, হাসছে, ভেঙ্গে গুড়িয়ে রেণু হয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে অতল অন্ধকারে।"

—সত্যি নায়ক এখানে সমুদ্রকে ভালবেসেছে। মনের অস্থিরমতিত্বে সে স্ত্রীর আকুতি মিনতি দুষ্টুমিকে সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু নায়কের চিন্তাই ঠিক—দেহ-সমুদ্র! হ্যাঁ, যুবতীর প্রিয় দেহদেউলে শত তরঙ্গভেঙ্গে বসন্ত তাকে সমুদ্রের মতই অনাবিল, অশেষ রূপে ভরিয়ে তোলে। নারী তাই, পুরুষের তপ্ত, তৃষিতলোকে, ক্লান্তলগ্নে, মিথুন-মুহূর্তে আনন্দসায়র, আর রূপসাগর—পুরুষ ভুল করলে, লোভ করলে সেখান থেকে পিছলিয়ে যায়।—সাঁতার না জানলে, কুশলী না হোলে—সমুদ্রও তা তার শীতল পরশের গহন শৈত্যে ঢাকা পাতালে টেনে ছুঁইয়ে রাখে। আটক রাখে প্রাণ কেড়ে নিয়ে, পরে একদিন শুধু দেহখানা ভাসিয়ে দেয় ওপরে। তারপর, সত্যি আর প্রশ্ন থাকে না।—হেনাও নায়কের মনের এই সমুদ্রবিলাসের ভ্রান্তিতে উপহাস করতে ছাড়ে নি। হেনা জানতে চেয়েছিল তার পুরুষের কাছ থেকে—'তাকিয়ে কি দেখছ?'...'কিছু না।'...'নিশ্চয় দেখছ, আমাকে দেখছ।' প্রতিশোধ তুলতে ঠোঁটের হাসি নিভিয়ে হেনা গম্ভীর হয়ে ওঠে ঃ 'তা আমায় দেখে দরকার কি—ঘুরে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখ, সমুদ্র আমার চেয়ে সুন্দর।'...

—মনে হয় সমুদ্র-দর্শনে একটা মায়াবিকার আচ্ছন্ন করেছিল তার স্বামীকে, মনে আস্তে আস্তে রহস্য জড় হচ্ছিল হেনাকে নিয়ে, যা মামা নামে পাগলসদৃশ লোকটির সাক্ষাতে—নায়কের মনে বিরাগ আর অনুরাগের দ্বন্দ্ব বাঁধাত। গল্পের শেষে একটা অঘটন—পারতো। কিন্তু হোল না প্রিয় হেনার জন্য, স্ত্রীর ভয়বিহ্বলা কাঁদো কাঁদো কম্পমান অবস্থার জন্য। নায়ক হয় ত ভুল করতে চাইত না, কিন্তু হেনাকে হাত ধরে জলের কিনারে টেনে নিয়ে স্নান করাবার জন্য পীড়াপিড়ি আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তার স্বামীর কাছে দেখা দিয়েছিল সেই মামা নামে লোকটি—যার সম্বন্ধে হেনা জানতে পেরেছে, নিজের স্ত্রীকে নাকি লোকটা সমুদ্রের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। কী নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর! হেনা তার স্বামীকে খুবই ভালবাসত। আর তাই সে সুখের নীড় যাতে এত তাড়াতাড়ি হারিয়ে না যায়, তারই জন্য সমুদ্র-স্নানে স্বামীর সহযোগীতা পাওয়া সত্বেও—সঙ্গে যেতে রাজী নয়। দিনমানে বেশীর ভাগই সে লক্ষ্য করেছিল, স্বামী ঐ লোকটার সঙ্গে ওঠা বসা আরম্ভ করেছে। ফলে লোকটার স্ত্রীহন্তা রূপ তার স্বামীর মধ্যেও না জানি—অলক্ষ্যে ছায়া ফেলে যাবে! আর এ ভাবেই প্রেমের দ্বন্দ্ব আরো জোরালো হোয়েছিল দু'জনকার মধ্যে।—তবু বলব, লেখকের সুন্দর জবানবন্দীতে নায়কের চিন্তা তার প্রিয়া হেনার জন্য প্রীতির গাঢ় রঙকেই মুখর করে জানিয়েছে—"...সামনে ফেনশীর্ষ লক্ষ লক্ষ ঢেউ, ডাইনে বাঁয়ে পিছনে উত্তপ্ত প্রখর ঝকঝকে বালুরাশি—আর কেউ নেই, আর কিছু চোখে পড়ল না ; কেবল একজন—

একটি মূর্তি। বেণীটা দুলছে। শরতের এক টুকরো সাদা মেঘ হয়ে আঁচলটা উড়ছে। কি, একবার মনে হল সমুদ্র, আকাশ ও মরুভূমির মতো বিশাল বালুবেলার এই নগন্ন নির্জন ভয়ংকর সুন্দর পরিবেশ ছাড়া আর কোথাও ওকে মানায় না—মানান উচিত না।... হেনা খিল খিল করে হাসছে। এত বড়ো একটা ফেনার ঝকল ওর পায়ের কাছে ছুটে আসে, আলতা পরা পায়ের পাতা ভিজে যায়। যেন ইচ্ছা করে ফেনার দুধে ও পা ডুবিয়ে রাখছে। আজ অন্যরকম। ঝিনুক কুড়োতে মন নেই, জলের স্পর্শে ওর বুঝি রোমাঞ্চ জাগছে ; অসহ্য পুলকে হেনা হাসছে। ভাল লাগল দেখে। আমার মনে পড়ে না, প্রথম রাত্রে আমার স্পর্শ—পুরুষ-স্পর্শ এত আনন্দ দিতে পেরেছিল তাকে। শায়াশাড়ি কুঁচকে দলা করে হাঁটুর কাছে তুলে ধরেছে ও। নিটোল সুবাসিত সোনার রঙের পা দুটো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার মনে পড়ে না, এখন বালির বিছানায়, ঢেউয়ের মুখে ওর পা দুটো যেমন সুকুমার লোভনীয় চেহারা ধরেছে—আমাদের ঘরের বিছানায়, তার হাজার ভাগের এক ভাগ সুশ্রী লাবণ্যযুক্ত মনে হয়েছে কোনোদিন! মাথাটা ঝিমঝিম করছিল, যেন নেশা ধরতে আরম্ভ করেছে আমার, টের পেলাম। একটু একটু করে এগোই। হাঁটু থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত সুঠাম বাঁকা রেখায় কামনার রামধনু ফুটিয়ে হেনাও জলের দিকে পা বাড়ায়।...'আর একটু—আর এক পা এগিয়ে যাও।'... ভয়ে চোখ বোজে ও।....'ঢেউ এখানে আসছে নাকি।' ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে ওকে সামনের দিকে ঠেলে দিই।"...

শুধু অনাবিলতা আর স্বার্থহীনতার পরিচয়ে উত্তাল হোয়ে ওঠে সমুদ্রের পার ভাঙ্গা ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছড়িয়ে যাওয়া—গুরু-গম্ভীর কলোচ্ছল ছবিখানা। ওর ব্যাপক উদার ভাব আর আত্মভোলা ও ধ্যানমৌন বিরাটত্ব—সত্যি সাধারণ কামনা আর বাসনা জড়ানো মানুষের কাছে একেবারে ধরা ছোঁয়ার বাইরের বিষয়। তবু বলব, "সমুদ্র" নামকরণের রূপকটুকুর ভেতর দিয়ে এক শিল্পী এক অভাবনীয় মনসমীক্ষার সার্থক নিরীক্ষাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।—যার ভাবলোক আলোড়নের রূপমদির করা ঝলক মেখে উঠেছিল এক আধুনিক দম্পতির বড় বেশী নিলাজ হওয়া দেহসচেতনতার আড়ালে, আবডালে। দেহবাসরের মধুমাস হেসে খেলে বসন্তের জোয়ারে যুবতী স্ত্রী হেনার মধ্যে একদিন সত্যি খুঁজে পায় তার স্বামী—নিজের পুরুষ স্বভাবের অবেচতন মানসিকতায় জাগা সমুদ্র-প্রিয়তার আতিশয্যকে। সত্যি, যুবকের এই চিন্তার শেষ চমক তাকে বোঝাতে পেরেছিল বোধের প্রতিটি অণুতে ঘিরে—প্রিয়া স্ত্রী রূপে সুস্মিতা হেনার যৌবন তনুখানাই হলো—রূপে-অরূপে মায়াভরা দেহসমুদ্র! তাই "সমুদ্র" গল্প দু ধারাতেই—গল্প ও তার গল্পকার—উভয়ের জন্যই সাহিত্য রূপে চরম সার্থকতারই বুনোন কোরেছে।—এ গল্পেরই রেশ ধরে আমরা বলতে পারি, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রোমান্টিক সৃষ্টির অনিন্দ্য রূপায়ণ রূপে

"চন্দ্রমল্লিকা"র বিষয়টি অতি আধুনিক চিন্তার জটিল আর ধোঁয়াটে পরিস্থিতিতেও কম সূক্ষ্ম ও সেই সঙ্গে আটিস্টিক বীক্ষায় যৌবনের মৌ-কথার—দেহের ধেয়ানে বাসর সাজানো না দেখিয়েও, কোরে তুলেছে যৌবনাচারের অমূল্য মূল্যায়ণ। বাস্তবনিষ্ঠ রোমান্টিক শিল্পী রূপে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর নিজস্ব জীবনভাস্যের দ্যুতিময়তায় আজও এ কথা ভুলতে না দিয়ে প্রমাণ করাতে পেরেছেন যে—অতি নিষ্ঠার সুন্দর বিকাশ—বিনতা ও তার প্রিয়র সম্পকর্কে সহজ-মধুর কোরে তুলেছিল "Purification of love"—বা ভালোবাসাবাসির শুদ্ধিকরণ কাজেতে যৌবনের দুই দোসরকে দেহ থেকে মনের সুস্নিগ্ধ ঘরেতে টেনে নিয়ে—ভালর সঙ্গে ভালর দ্বন্দ্বকে মিতালিমধুরই কোরে। এ দ্বন্দ্বের অবসান নেই। নিরবধি কাল চলতে থাকে এর টানা-পোড়ানের—এ-দিক আর সে-দিক।—আমাদের ভুললে চলবে না ক্ল্যাসিক রীতির "বারো ঘর এক উঠোনে"র সুরুচি আর "মীরার দুপুরে"র মীরাকে! কেন না, ওদের নারী জীবনের যুবতী ধর্মকে ঘিরেই বাস্তব আর অবাস্তবের সংঘর্ষ নিয়ে যৌবনের পুরুষকে ধন্য কোরে সে সব কাহিনী প্রখর কল্পনাশক্তির ধ্যানে সার্থক রোমান্টিক ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করাতে পেরেছে—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে আর তাঁর গল্পকার পরিচয়ের রূপনিষ্ঠ মনীষায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মদিনে ১৯৬০

হিউম্যানিস্ট কথাশিল্পী সুবোধ ঘোষ

সহ লেখিকা ঃ শুচিস্মিতা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

মহাভারতের তুমি নব হিমালয়,
গঙ্গার ধারা তুমি কলগীতিময়,
জাগ্রত জনগণ গৌরবে জানিয়াছে সে কথা।
একজাতি একপ্রাণ একতা॥
হিন্দু-মুসলমান-অস্থির বজ্র এ কংগ্রেস,
নবযুগ-সাধিকার চিত্তের শঙ্খ এ কংগ্রেস,
শঙ্কা ও শৃঙ্খল অন্তরে ভাঙ্গিল যে কংগ্রেস,
নবযুগে নবরঙে কোটি প্রাণ রাঙিল যে কংগ্রেস,
চেতনার স্পন্দনে ভাঙিয়াছে জড়তা।।
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

—এ শুধু গান নয়, নয় কবিয়ালের রচনা করা ছন্দ-যতি-মিল। এ চারণকবির গাথা—জাতীয় গান। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন আর নজরুল ইসলামেরই দেশের লেখকের পক্ষে সম্ভব হোয়েছিল—এমন মধুর গীতালী মুখরতায় দেশের মনকে, জীবনকে মিতালিতে সুন্দর করাতে। এই গানের রচয়িতা আজও 'জাগে নব ভারতের জনতা'র পরিচয়ে লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকলেও, তিনি আজ বাঙলা সাহিত্যের একজন অনন্য আর অনিন্দ্য প্রতিভার শিল্পী—তাঁকে চিনতে দেরী হয় না—তিনি রূপদক্ষ কথাকার—সুবোধ ঘোষ।

যে দেশপ্রেম, যে জাতিপ্রেম, আর একান্তভাবে যে একতার স্বপ্ন শিল্পী সুবোধ ঘোষের চিন্তায় আলোড়ন তুলেছিল—আমি দেখতে পাই সে মুহূর্তে এই রূপধ্যানীর শিল্প-জিজ্ঞাসায় সার্বিক ভাবে রাঙিয়ে গেছিল—এই ভারতেরই মহামানবের সাগর তীরের শত তরঙ্গ-ভঙ্গে নির্বিকার-চিত্র মানবিকতা। সে দিন থেকেই তাঁর ভাবনায়, ধ্যানসমৃদ্ধ কল্পনায়, মানুষের সত্যসন্ধ রূপারূপের অনুসন্ধানে আপন স্বকীয়তা নিয়ে জাগরূক থেকে এসেছে এক পরম মানবিক মানসের হাজার বিচিত্রিত পরম্পরায়। মানবিক,—আরও জোরালো ভাষায় 'Humanist' কথাশিল্পী সুবোধ ঘোষের শিল্পকলা মূলত ও রূপত—সর্বোপরি শিব-চিন্তার সুনিকেতনে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে আছে বড় বেশী আলোকসম্পাত করা জীবন সম্পর্কিত বিচিত্র জিজ্ঞাসার 'Humane' দৃষ্টি-নিমেষ। এখানে তাঁর সম্বন্ধে মনে একটা প্রশ্ন জাগে—তিনি স্বনিষ্ঠ ও স্বকীয়তার রূপধ্যানে শুধুমাত্র শৈল্পিক কারুকাজের মহত্বতার মধ্যেই নিবিষ্ট থাকতে

পারেননি। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ আলোচিত 'আর্টাৎ পরতর' ধ্যানে যে রূপকল্পের ব্যাখ্যা করা হোয়েছে, তারই নিরীখে দেখতে পাই সুবোধ ঘোষের শিল্প-চিন্তা শিল্পের চাইতেও অন্য কিছু, অন্য কোনখানের অনামধেয় জীবনসঙ্গমের রূপচয়নে খুবই সচেষ্ট। তিনি চরম বাস্তবিক। সেই সঙ্গে তিনি তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রথম পদক্ষেপেই পরিচয় রেখেছেন নিখুঁত রোমান্টিকবাদীর সৌন্দর্য্যলোকের ঘরনা পরিচিতিটি। এই রূপ, অভিধা, 'আর্টাৎ পরতর' দৃষ্টি-নিমেষ থেকে তিনি মানবতাবোধকে জনগণের গণমাধ্যমী আলাপচারিতার অতি বাস্তবানুগতার বেদীমূলে আরাধনা কোরেছেন—অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে,—Humane worship-এর অর্ঘ্য দিয়ে। "ফসিল" হোল—এই ধ্যানের ভাবকুট্টিম শিল্পরূপ। আন্তর্জাতিকতারই গণ-মানস থেকে হোয়েছে এর—অনিন্দ্য সৃষ্টি।

তাঁর বাস্তবনিষ্ঠ কল্পনার উড়ানো উত্তরীয়ে—জীবনের রঙ্ বড় প্রকট ভাবে রেঙে উঠেছিল—হৃদয়ের রঙে জারিত হওয়ায়। সুবোধ ঘোষ তাঁর প্রথম উপন্যাস "তিলাঞ্জলি"তে একটা বাস্তবের রূপকথা তুলে ধরেছিলেন দেশ, কাল, চরিত্র ও বহু নীতির এক নীতির—রাজনীতির অশেষ কিছু ব্যক্ত করার অভিপ্রায়ে। তাঁর মানবিক চিন্তায় কথাশিল্পীর স্বদেশপ্রেমকে দেশপ্রেমিকের অনুরাগে অভিসিঞ্চিত কোরে এক নতুন জীবন ও মানসিকতার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি এই কাহিনীতে এক 'রাগমহাদেশের' পরিকল্পনাকে তুলে ধরেছেন চরিত্র চিত্রণের লিপিবিবেক সমেত। গত পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে "তিলাঞ্জলি"র ঘটনা রূপ পেয়েছিল এক আদর্শ-নিষ্ঠ গতিময়তার চাঞ্চল্যে। এর কিছু বিষয়বস্তু আজকের প্রায় দুই দশক পরে রদবদল হোলেও—তার ভেতরকার স্বতঃস্ফূর্ততার, আর প্রেম ভালবাসার মান-বিচিত্রাকে আঁধার ঘেরা করাতে পারেনি। এ গ্রন্থে তত্ত্ব আছে, রাজনীতির তথ্য নিয়ে। রাইটিষ্ট আর লেফ্‌টিষ্ট—চিরকালীন বাম আর ডান সম্পর্কিত—বাগবিতণ্ডার টানাপোড়েনে কাহিনীর প্রধান চরিত্র কয়টি মাঝে মধ্যিখানে গতিহীনতায় হারিয়ে ফেলেছিল—জীবনের রাশ। কিন্তু সুমধুর ভালবাসার ক্ষমারূপ পুরুষ ও নারীকে রাজনীতির তত্ত্বে ও তথ্যে জর্জরমান অবস্থা থেকে মুক্তির এক মহতীলোকে উত্তীর্ণ করেছিল। নায়ক শিশিরের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল—"চোখে দিয়ে শুধু ছবি দেখা যায়। হৃদয় দিয়ে দেখা যায় প্রাণ। সেটাই সত্যিকারের দেখা। আজ হরু ডোমের পরিণাম সমস্ত বেদনা নিয়ে যেন শিশিরের দৃষ্টির বাঁধা পথের মোড় ঘুরিয়ে দিল। কান পেতে শোনা যায়, দুঃখের আঘাতে নিঝুম সারা জাতির চিত্তের কলবেণু বিচিত্র সুরে উথলে পড়ছে। রাগমহাদেশ জন্ম নিচ্ছে। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম এক উপলব্ধির সাড়া শুন্‌ল শিশির।"—সত্যি মন্বন্তর পঞ্চাশের বাঙলার বুকেতে যে দানবলীলার নৃশংসতায় মানুষের, বিশেষ ভাবে অতি নীচু তলাকার প্রাণগুলো নিয়ে ছিনিমিনি

খেলায় মাতিয়ে তুলেছিল—তারই বহ্নিতে নিরীহ হরু ডোম প্রভৃতি ওপর তলার কিছু সংখ্যকের করা দুষ্কৃতির জন্য নিজেদের মৃত্যু দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাতে পেরেছিল। আর সে কথাই নায়ক শিশিরের মনের তন্ত্রীতে সত্যসন্ধ হওয়ার অভীপ্সা জাগিয়েছিল।—আমি বলব, এখানে সত্যসন্ধ সুবোধ ঘোষ, সর্বত্র মন্বন্তরের যে ভয়াবহ চরিত্রায়ণ ফুটিয়েছেন, তার তুলনা সাহিত্যে খুবই বিরল।

এ কাহিনীর নায়ক শিশিরের ভেতর দিয়ে যে অপরূপ এক পরিকল্পনা রূপ পেতে চেয়েছিল—তা রচয়িতারই এক সুন্দর আর সেই সঙ্গে সুসমঞ্জস মানসিকতা রূপে আজ দু-দশকের প্রান্তেও আমার পাঠক মনকে আবিষ্ট করাতে পেরেছে। এর কারণ সুবোধ ঘোষ গত মন্বন্তরের যে অমানবিক ধ্বংসলীলার মধ্যেও মানবিকতার অনুসন্ধান কোরে একটি আপন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিন্তায়ন তুলে ধরেছেন—তা শুধু রাজনীতির তত্ত্ব ও সামাজিক ভালমন্দের ন্যায়-অন্যায়ের তথ্যের ভারে কিন্তু—শিল্পের রসো বৈ সঃ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেনি। এই সঙ্গে মানুষের ভাললাগার আর ভালবাসার নম্র বৃত্তিগুলোর মঞ্জুল বিকাশ "তিলাঞ্চলি"কে মধুর কোরে তুলেছে। শিল্পীর সব চাইতে বড় কৃতিত্ব, যে তাঁর সমাজ সচেতন মনীষা সমাজের গণতান্ত্রিক পর্য্যালোচনা করার প্রাক্‌মুহূর্তেও ভুলে যেতে পারে নি সুন্দরের দূতী যৌবন দেশের প্রেম ভালবাসার সুমধুরিক লিপিবিবর্দ্ধনের রূপচর্চ্চা। গানের সুরের ভেতরে যখন অমা-ঢাকা পৃথিবীর পরিচয়টি নেওয়া যায়, তখন তাকে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। নায়ক শিশির সঙ্গীত শিল্পী। তার নিজের জীবনেও ফুটেছিল মীড় গমক্ মূর্ছনা—বিদূষী কন্যা সীতা বসুর রূপময় দেহমঞ্জিল থেকে নির্ঝরিত মঞ্জু আভাসে আর প্রীতির বিভাসে। শিশিরের ভেতরে এই সুতনুকার লাজাঞ্জলি নিবেদনে তুলসীদেওয়া তিলাঞ্জলীতে যে আকুতি মহৎ হয়ে ফুটেছিল, আমার মনে হয় তাই নায়ককে শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীনতার—পূতযুদ্ধে সংগ্রামী কোরে তুলেছিল। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঋষিদৃষ্টির ঋতায়ণে "আনন্দ মঠে' জীবানন্দ সমীপে বীরাঙ্গনা শান্তিকে প্রেরণার যে ব্যাপক উৎস কোরে তুলেছিলেন, সেই ধ্যানের আলোকেই একটা চিরায়ত অনু-ভূতির সুতীব্রতা "তিলাঞ্জলি"র কাহিনীকে সংগ্রামী জীবনের লিপিবিবেক কোরে তোয়ের করেছে। কথাশিল্পী এখানে আদর্শবাদী। তাঁর চিন্তা মাঝে মাঝে স্বকীয়তার রণনে চরিত্রগুলোর মধ্যে ভাবনার অনেক ঝিলিক রেখে গেছে। শিশির-সীতা ছাড়া অবনী ও অরুণার যে দাম্পত্য জীবনের রূপলিপি সাজানো হয়েছে, তার মধ্যেও দেখেছি ওদের মানবিকতা বহুজন সুখায় ও বহুজন হিতায় তত্ত্বে—বিশ্বাসী। এ কাহিনীতে গানের মৃদঙ্গ মূর্ছনা সেতারের তানে তুলে ধরেছিল একটি কথা—"জনতার শিল্পীর এই তো কাজ। শিল্পীরা একাধারে চারণ ও সৈনিক। জনতার গুণী শুধু কাজের পথে গান শোনায় না, গান শুনিয়ে কাজের পথে টেনে আনে।" সংগ্রামী

শিশির আরও বলে—"ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিনীর কৃপা ভরসা করে থাকলে আর চলবে না। নতুন এক রাগ সৃষ্টির লগ্ন ঘনিয়ে আসছে। আজ ভারতবর্ষ আর নারদ ঋষির দেশ নয়—সারা পৃথিবীর আত্মীয়। গীতময় ভারতের আকাঙ্ক্ষা আজ এক নূতন সুরস্বরূপকে খুঁজছে। গুণীর কাজ তাকে আবিষ্কার করা, তাকে চেনা, তাকে পূর্ণতা দেওয়া। মিঞা তানসেন একদিন তাই করেছিলেন। কিন্তু তারপর ? তারপর থেকে যুগের বাতাসে আমাদের জীবনে কত নূতন পাখী ডেকে গেল—আরও কত বিচিত্র ডাক আস্‌ছে, কিন্তু নূতন মুরলী আর তৈরী হলো না।"—জানি না এ মুরলী পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর কথাকে বুঝাতে চায় কি না! তবে বলব অন্য পরে কা কথা, আজও এই বর্তমানে আমাদের দেশ জন ও সমাজের অবস্থা যেই তিমিরে ছিল, আজও আছে সেই তিমিরে। কেন না, আজকের জগত আরও বেশী আত্মকেন্দ্রিক। সেদিনকার চাইতেও। তাই দেখি আজকে সৌন্দর্য্যবাদী সুবোধ ঘোষের সুদূরাভিসারী চিন্তা মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে যৌবন ঘটিত নায়ক-নায়িকার দাম্পত্য জীবনের কথা থেকেও—মহামারি রূপে দেখা দেওয়া আত্মকেন্দ্রিকতার মূলোৎপাটনে স্থিতধী। শিশির বুঝেছিল গানের চাইতেও 'গানাৎ পরতর' একটা উপলব্ধির জিনিস আছে, আর সে অনুভূতির বিষয় হলো এক সুজনা নারীর—প্রেম ভালবাসা। এরই সুন্দর অনুভূতির আবেশে শিশির খুব সুন্দর কথা শুনিয়েছে মহানগরী কোলকাতা সম্বন্ধে—"সব পথের শেষ কোলকাতায়। বাংলার রাজধানী, মহাযুদ্ধের স্কন্ধাধার, পণ্যের ভাণ্ডার, শস্যের গোলা কোলকাতা। বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রণ-নীতির জীবনের হেড অপিস কোলকাতা। লাটের মসনদ, উজিরের দপ্তর সাহিত্য বাণিজ্য ধর্ম শিল্প ও বেশ্যার ডিপো কোলকাতা। সারা বাংলায় স্নায়ু শিরা নাড়ি এখানে এসে এক হয়ে মিশে গেছে—একটি ভয়ানক মস্তিষ্ক একটি বিরাট হৃদপিণ্ড একটি প্রকাণ্ড উদর সৃষ্টি করেছে। এই হোল কোলকাতা। কোলকাতার সর্দি লাগলে সারা বাংলা হেঁচে মরে।"—আমি বলব, আর আজকের খণ্ডিত বাঙলার সর্দি লাগলে সারা ভারতবর্ষটাও হেঁচে মরে—রাজনীতির জন্যে, অর্থনীতির জন্যে, সর্বোপরি দেশের সামাজিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ইন্‌টেলিজেনশিয়ার—অভাবের জন্য!

সত্যি আমাদের সুবোধ ঘোষের শিল্পী-সত্ত্বার সান্ধ্য লগ্নেতে শুভদৃষ্টি বিনিময় হোয়েছিল হিংস্র, লোভী, বর্বর অথচ শিক্ষিত সভ্য জাতিতে জাতিতে তুচ্ছ স্বার্থের নিয়ন্ত্রণা নিয়ে শয়তানী যুদ্ধ-রাক্ষসী—মহাবিশ্বযুদ্ধ নামে বিশিষ্টা আত্মঘাতিনীর সঙ্গে। মানবতা তখন রাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্র—এই ত্রিমূর্তির সঙ্ঘর্ষে ধূলায় লুটিয়ে পড় পড় অবস্থা। এমনি এক সময়ে অস্থিরা, চঞ্চলা বিদেশিনীর ভাসমান চিন্তাধারার সঙ্গে সুধীর-সুস্থির ভারত-আত্মার ঔপনিষেদিক ব্যঞ্জনার সাহায্যে নীরস ও নিরেট

গণতন্ত্রকে হৃদয়গ্রাহী কোরে তুললেন সুবোধ ঘোষ—"অযান্ত্রিক" গল্পে। এ যেন ভারত আত্মারই বাণীমূর্তি। মহামনীষী জগদীশচন্দ্র বসু একদিন জড়ের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার কোরে প্রমাণ করেছিলেন তা বিশ্বের দরবারে। বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর দরবারে। আর সুবোধ ঘোষ সুন্দরী ভারতী সাহিত্যে এক অজড়, বৃদ্ধা, ফোর্ড ট্যাক্সি গাড়ীর মধ্যে প্রাণের মৃদুল উচ্ছলতার সরব অভিভাষণকে দেখতে পেয়েছিলেন। ঐ সময়েই তারাশঙ্কর রূপাভিসারে যাত্রা করেছেন ক্ষয়িষ্ণুমান ধনিক-তন্ত্র থেকে গণ-তন্ত্রের বেদীমূলে। আর তখন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রাভিসার চলেছে গণ-তন্ত্রের ধ্বজাধারী, তথাকথিত প্রলেটারিয়েটদের দেহলিতে। কী যেন একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে গিয়েছিলো এই দুই মনীষীর শিল্প-দৃষ্টিতে—যাঁদের উড়ানো পতাকার প্রতীক চিহ্ন ছিলো "গণতন্ত্র"। ভারতের মাটিতে অতি সাধারণ ঋষিকূল প্রবর্তিত চিরন্তন জীবনদর্শনের ওপর নির্ভর কোরে সুবোধ ঘোষের গণ-তান্ত্রিক মন—লেখা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল গণ-তন্ত্রেরই কোনো অন্দর মহলে—যেখানে কোনো রকমে বেঁচে থাকে বিমল ড্রাইভারেরা। একটি গাড়ী কিনে তাকে সোয়াড়িদের জন্য ব্যবহার কোরে রুজি রোজগার করে,—সেটাই কি সব ? গাড়ীটার কি কোনো ভূমিকা নেই ? তবে তার ভূমিকা অশেষভাবে আছে বলেই—আচার্য জগদীশচন্দ্রের দেশের একজন লেখক তার শিল্প প্রচেষ্টার সন্ধ্যালগ্নে আহ্বান করেছিলো—শতছিন্ন তালির হুড দেওয়া, তোবড়ানো বনেট, ইন্‌সুলিন করা টায়ার, ভেঁপু বাজানো ট্যাক্সিটিকে। ফোর্ড গাড়ীখানাও যে একদিন অজান্তে যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায়—লাস্যময়ী থেকে জবুথবু অথর্বার রূপে—বিমলেরই প্রিয়তমার সমানা হয়েছিলো—তা কি আমরা ভেবে দেখেছি ? একদিন দামী নতুন মডেল গাড়ীর মালিক পিয়ারা সিং বিমলকে পরামর্শ দিলো এই বুড়ীকে বিক্রী করে দেবার জন্য, তখন বিমলের পোড় খাওয়া চোখে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠলো—বিমল সটান উত্তর দিল—"হুঁ, তারপর তোমার মত একটা চটকদার হাল-মডেল বেশ্যে রাখি।" কি আশ্চর্য, যে বিমল একদিন তার এই তোবড়ানো গাড়ীটিকে বিক্রী কোরতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, যে বিমলকে শ্রীমতী ফোর্ড স্ত্রীর মমতা—পাশে আদরে ভুলিয়ে রেখেছিল—সেই বিমলকেই একদিন দেখলাম তার এলিয়ে পড়া মানবতাবাদকে চুপটি করে বসে থেকে চোখের জলের ভিতর দিয়ে—ঝরিয়ে দিচ্ছে। খটা খট, ঠক্ ঠকাস্ হাতুড়ির আঘাত পড়ছে বৃদ্ধার লৌহ শরীরে। আর সামনে বসে আছে রাজপুতানারই কোন এক গ্রামের ভাগ্যান্বেষী। মাথায় পাগড়ী। মোটা গোঁফের নীচে হিঃ হিঃ হাসি। সহৃদয়তার মুখোশের অন্তরালে হিঃ হিঃ হাসি দিয়ে বিমলকে সহানুভূতি জানাচ্ছে। কি বিশ্রী এক ক্রূর পরিকল্পনা ঐ পাগড়ী মাথায় ব্যক্তিটির চোখে মুখে ফুটে আছে। সুবোধ ঘোষ দেখলেন—বিমল সভ্যতার ঐশ্বর্য্যের ভারে হারিয়ে যাওয়া অবহেলিত

মানবতাবাদ। আর গাড়ীটি হলো গণ-মানসের প্রতিনিধি। স্থাবর ও জঙ্গমের মিলনসেতু!

মানবতাবাদী সুবোধ ঘোষের শিল্প বৈভবের দরজায় দেখা দিলো—"সুন্দরম", "ফসিল", "পরশুরামের কুঠার" প্রভৃতি গল্প। "সুন্দরমে"র নায়ক সুকুমার মানবতার সুনামেতে কলঙ্ক লেপন কোরেছে। সিভিল সার্জনের শিক্ষিত ছেলে সুকুমার আমাদের চোখে যে নৈষ্ঠিক রূপের পরিচয় দিয়েছে, সেখানে লেখক একটু পরিহাস করে খুঁজতে গিয়েছিলেন মনুষ্যত্বকে। সমস্ত কিছুতেই যে ছেলের এত নিষ্ঠা, পড়তে বসবার আগে যে তার নাভীতে কস্তুরী মৃগ ছুঁইয়ে মনকে প্রফুল্ল করে রাখতো, কেউই ভাবতে পারেনি মনুষ্যত্বকে সে একদিন আস্তাকুড়ে টেনে নিয়ে আসবে। ষোলো বছরের তুলসী, পেশা তার ভিক্ষা। ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ায় ডাক্তার সাহেবের বাড়ীর আঙ্গিনায়, ঠিক সুকুমারের পড়বার ঘরের সামনে। সমস্ত গায়ে প্রকৃতির ধূলায় ভর্তি। সাধারণ কথায় ময়লার পুরু আস্তরণ। তার চাইতেও ময়লা, ছেড়া, বিশ্রী গন্ধ মাখানো এক চিলতে কাপড়ের আনাচে কানাচে উদ্ভিন্ন যৌবনের পরিহাস সুস্পষ্ট। সুকুমার তা দেখে মনে যেন বলে,—দ্যুৎ। কত রূপবতী, ধনবতী তার কাছে আহ্বান জানায় সিভিল সার্জনের পুত্রবধূ হবার জন্য! তবু নৈষ্ঠিক সুকুমারের মুখের ভাষায় ফুটে ওঠে, দ্যুৎ। তারপর ? হ্যাঁ, তারপর একদিন সিভিল সার্জনের ময়না তদন্তের টেবিলে দেখা গেল তুলসী ভিখারিণীকে। এখানে সে এসেছে আত্মঘাতিনী হয়ে— এ যেন শিক্ষা আর সভ্যতার অভিমানে আত্মম্ভরী সমাজকে পরিহাস ঠুকে। হঠাৎ যদু ডোম বলে উঠলো শব-ব্যবচ্ছেদের পর—ভিখারিণীর রহস্যময় উদর দর্শনে, "শালা বুড়ো, লাতির মুখ দেখ্ছে।" বিস্ময় বিমূঢ় ডাক্তার তার পাশে দাঁড়িয়ে। কোনো কথা তার কানে গেলো না। ডাক্তারের গ্লাভস্ পরা হাতে ধরা এক টুকরো মাংসপিণ্ড—"শিশু এশিয়া"।—বুড়ো দেখেও দেখছে না। বুঝেও বুঝছে না। নির্বাক। নীরব। তারই ছেলের প্রতিদান। নৈষ্ঠিক অপকীর্তি।—"নিকেলের চিমটের সুচিক্কণ বাহুপুটে চেপে নিয়ে, স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে তুলে ধরলেন—পরিশল্কে ঢাকা সুডোল সুকোমল একটি পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্বর মানব জাতির মাংসলা ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট ও কুঞ্চিত যেন বিষিয়ে নীল হয়ে রয়েছে— এক শিশু এশিয়া।"—"সুন্দরম্" গল্পে মানুষের তথাকথিত শিক্ষা, রুচি, ঐশ্বর্য্য মনুষ্যত্বকে গুড়িয়ে দিয়েছে—মানবতাবাদের বেদীমূল থেকে।

যুগে যুগে পৃথিবীর শান্ত রূপকে আলোড়িত করে "পরশুরামের কুঠার" নারী জাতির ওপরে পুরুষের অপকীর্তিকে স্থাপন কোরে গেছে। সুবোধ ঘোষের এই গল্পে সদরের জেলারবাবু, মাষ্টারবাবু, হাকিমবাবু প্রত্যেকেরি বাড়ীতে বিশেষ সময়ে— সবিশেষ ডাক পড়তো—দাই ধনিয়ার। ওই সকলেরই বাড়ীর আসন্না গর্ভিণীদের

জন্যই তার দাম ছিল খুব বেশী। মাষ্টারবাবুর পলকা হাড়জিরজিরে বৌ-কে বছর বছর আঁতুড় ঘরে আশ্রয় নিতে হয়, এই ধনিয়া দাইয়েরই কাছে। সদরের যত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হেসে-খেলে-গেয়ে কল-কল, ছল-ছল, করে ঘুরে বেড়ায়—তাঁদের প্রত্যেকেরই জন্ম লগ্নে পৃথিবীর আলোতে এসে—সেই আলোক ধারায় রাঙ্গিয়ে তোলাতে পেরেছিল এই ধনিয়া দাই। এখন তার ভরা যৌবন। যখন বাবুদের কোন সন্তান হবার সম্ভাবনা দেখা দিত না, তখন তাকে স্বৈরিণীর ভূমিকায় অনেক পুরুষকে তৃপ্ত করাতে হয়েছে। প্রতিদান স্বরূপ—অনেকবার তাকে—প্রজাবতী হতে হোয়েছে। বয়েস থাকতে অনেক মৌমাছির ভিড় হয়েছিলো তাকে এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে। একদিন স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল। রূপ ঝরে গেল। যারা এতদিন বাহোবা দিত, বাহোবা পেতো, আজ তারা ফিরেও তাকায় না। শেষ পর্য্যন্ত তাকে অভাবের তাড়নায় পৃথিবীর অন্ধকার পিছল পথে আরো পিছলিয়ে যেতে হলো। ধনিয়া সব চাইতে মিথ্যা পরিচয়ে স্নেহ মমতাকে পদদলিত করে দিলো। মাষ্টারবাবুর যে ছেলেকে একদিন সে পৃথিবীর আলোতে জন্ম নিতে সাহায্য করেছিল, আজ অনেক বছর বাদে সেই ছেলেরই উত্তাল যৌবনের বল্‌গা হারানো রুচিহীন কামনা—পুনরায় পরশুরামের কুঠারকে হানলো—ধনিয়া দাইয়ের মাতৃ স্বভাবের ওপরে। আর একবার ভাবালো—মনুষ্যত্ব অর্থের কাছে, লোভের কাছে, নিজেকে বারনারীর মত করে তুলেছে। এই হলো শিক্ষা! এই হলো সভ্যতা! এই হলো যুদ্ধের অবদানে—পৃথিবী জুড়ে মূকবধির হাহাকার।

মানুষ চাইছে তার মুক্তি। এই মুক্তি সব রকমের মুক্তি। এরই জন্যে সাড়ে আটষট্টি বর্গ মাইলের ছোট নেটিভ্ ষ্টেট—অঞ্জনগড়ের পরাক্রমশালী মহারাজের অন্যায় অধিকার, অত্যাচার প্রতিটি প্রজা-সাধারণের মনেতে অসন্তোষের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিলো। তারা স্বাধীনতা চেয়েছিলো। মুক্ত হওয়ার স্বাধীনতা। তাদের মধ্যে আন্দোলন জেগে ওঠে। আর তা মহারাজার বিরুদ্ধে। সমর্থ প্রজার ওপর বিচক্ষণতার সঙ্গে নেতৃত্বের ভারও পর্য্যন্ত সমর্পিত হোয়েছিলো। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের চমকে ও দাপটে তাদের পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে যায়। কূট চক্রান্তের অন্তরালে খনির ধস ফেলে অনেক প্রজা-শ্রমিকের বিদ্রোহী অস্তিত্বকে পৃথিবীর অতলে হারিয়ে যেতে বাধ্য কোরেছিলো। আজ তারা "ফসিল"। "লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা যাদুঘরে, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতকগুলি ফসিল! অপরিণতবয়স্ক ও আত্মহত্যা প্রবণতার সাবহিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের অর্ধপশুগঠন, শিলীভূত অস্থিকঙ্কাল। আর ছেনি, হাতুড়ি, গাঁইতি কতকগুলি লোহার ক্রুড ও কিম্ভূত হাতিয়ার। অনুমান কোরছে তারা, প্রাচীন পৃথিবীর একদল হতভাগ্য মানুষ বোধহয় একদিন আকস্মিক কোন ভূবিপর্য্যায়ে কোয়ার্টস্ আর গ্র্যানিটের গহ্বরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতগুলি শাদা শাদা

ফসিল। তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই।" মানবতাবাদী সুবোধ ঘোষের অনিন্দ্য মনীষা রাঙিয়ে সাম্যবাদের মূল আদর্শ এখানে "ফসিলে"র মধ্যে সুন্দরতম অভিব্যক্তি পেয়েছে। এর আগে একদিন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও সাহিত্যে সাম্যবাদের রূপদ্যোতনাকে স্বাক্ষরিত কোরে গেছেন। আর তারপর মনীষী সুবোধ ঘোষ তাঁর মানব-পূজার বেদীতে অশেষ সার্থকতার সঙ্গেই সাম্যের সমদর্শিতাকে—এভাবে দরাজজান কোরেছেন।

পৃথিবী জোড়া প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক সমাজে বাস করা এক বিশেষ শ্রেণীর জাতিকে পুরুষের জীবনের অনিচ্ছাকৃত কতকগুলো উচ্ছৃঙ্খলতাকে—শান্ত করাতে হয়। তৃপ্ত করাতে হয়। পুরুষের এ ইচ্ছা জাগে তারই শারিরীক, মানসিক ও আর্থিক—এই তিন রকম অবস্থার—এলোমেলো ও দিশাহারা কারণ থেকে। আর তখন তাদের ঐ চাওয়া ঘিরে ধরে—এখানে-সেখানে যেখানকারই হোক না কেন, এমন কতক রঙ-করা মুখের—বিলোল-হিলোল কন্যাকুমারীকার দেউলে। কখনো অভাবের তাড়নায় পথে বেরিয়ে আসা কোন এক গৃহস্থ-বধূর শ্রীমতীময় ক্ষতবিক্ষত মনের কাছে—দেহজ ক্ষুধার ভিক্ষাপাত্র হাতে কোরে।—সমাজের চোখে পুরুষের নির্লজ্জ আকাঙ্ক্ষা এদের চিহ্নিত কোরে রেখেছে—ওরা দেহোপসারিণী। ওরা পাপ-বিদ্ধা। আর আমরাও তাই-ই মনে করি—ওদেরকে। ওদের তমসাচ্ছন্ন ঘন কুহেলী রূপকে। ওরা দেহ বিক্রী করে। ভাবি তাই। ভুলে যাই—কোন না কোন বিষয়ে অভাবগ্রস্ত পুরুষ তাই কেনে,—কিছু অর্থের বিনিময়ে। কিন্তু আমরা জানি না, খোঁজও রাখি না—সমাজের পিছলে যাওয়া রূপসীর দেহ-বিকিকিনির হাটেও সন্ধান মেলে এমন কোন এক বিশিষ্টার—যে দশজনের চোখের কৃত্রিম চাহনিতে—দেহোপসারিণী হোলেও, মনে আর প্রাণের উচ্ছলতায় কোন অংশে—কোন বরনারীর চাইতে, ছোট নয়। "পহেলা দর্শনধারী। পিছে গুণ বিচারী।"—আমরা শেষেরটা করি না বলেই ওদের পসারিণীর ভেতরকার বরবর্ণিনীর ভূমিকার কথা ভুলে গিয়ে দেখতে পাই না তার মাধুর্য্যময়ী সুন্দর রূপটুকুন।—এমন এক অপরূপ রূপের ছবিকেই তুলে ধরেছেন সুবোধ ঘোষ তাঁর সুন্দর রচনা "বারবধূ" গল্পটিতে।

এই গল্পের নায়িকা লতা। সে পূর্বাশ্রমের পরিচয়ে একজন কলঙ্কিতা—না, অন্যের দৃষ্টিতে সে বারনারী। এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু প্রতি নারীর মধ্যে সুপ্ত থাকে এক অশেষ নারীত্ব—যার তুলনা একমাত্র মেলে তার নীড় বাঁধতে চাওয়া এতটুকু ছোট এক সুখের সংসারের জন্য, যেখানে একজন বিশেষ পুরুষের প্রেমাতুর হৃদয়কে সবুজ রঙে ছোপাতে পারবে সে। আর তাই জমিদার প্রসাদ রায়ের নদীর ধারের নির্জন কুঠির নিরালা কোণেতে লতা একদিন শুধু "রাতকে রহনেবালী"রূপেই বোধ হয় আশ্রয় পেয়েছিল। কিন্তু তা হোলেও লতার অবস্থান সেখানে এক রকম

প্রায় স্থায়ীই হোয়ে উঠেছিল। প্রেম নিয়ে, তার ছলাকলা নিয়ে যতই প্রেমাভিনয় করুক না কেন, আসলে লতা ত এক যুবতী নারী—তাই প্রসাদ রায়ের অজস্র উচ্ছৃঙ্খলতার ভেতরে ছাপিয়ে ওঠা—এক শিশু-স্বভাব দর্শনে—লতা তাকে একটু একটু করে ভালোবাসতে লাগল। রমণীর রমণীয় আভায় দিনে দিনে সে উদ্ভাসিতা হোয়ে চলল। শুধু সুখ আর হাজার তৃপ্তির বিহ্বলতা ঘিরে রেখেছিল তাদের নিরালা মুহূর্তগুলোকে। লতা আস্তে আস্তে নারীর বড় আকাঙ্খার গৃহিণীপনায় মজে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে প্রেমেও মজছিল বারবনিতার বিলোল চপলতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে। কিন্তু লতার সুখের জগৎ অচিরেই তাসের মিনারে পরিণত হোল। অনাহূতভাবে একদিন প্রসাদ রায়ের বাড়ীতে যেচে আসা আভা নামে এক যুবতীর পরিচয় হোল। আর সে পরিচয়ের ফলে প্রসাদ রায়ের মন আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে গেল ঐ নব-পরিচিতার যৌবন-দেউলে। এখান থেকেই নারী-দেহ-লোভী প্রসাদের মনেতে বৃশ্চিক দংশনের মত জেগে উঠল, ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্ব। যুবতী আভার সামাজিক পরিচয় আছে, শিক্ষিতার পরিচয়ে। তাই সে ন্যায়। আর আভার দর্পণে বিচার কোরে প্রসাদ রায় বুঝল—পেছনে ফেলে আসা অসামাজিক প্রতিষ্ঠার লতা আজ প্রেমের আস্বাদে—বারনারী থেকে মিনতি জানিয়ে—বরনারী হোত চাইছে বলেই, —লতা হোল অন্যায়। যতই ইল্‌লেজিটিমেসির ভেতরে তাদের পরিচয় হোক না কেন, লতার ভেতরকার ঘুমিয়ে থাকা প্রেমিকার রূপ আকুতিতে ভেঙ্গে পড়েছিল ন্যায়-বিচারের আশায়, প্রসাদের কাছে—সে কি এর পরেও হোতে পারবে না প্রসাদ রায়ের উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে শান্ত কোরে তোলার—সঙ্গিনী। প্রসাদের জীবন-সর্বস্বা!—প্রসাদের 'বেটার-হাফ্'। কিন্তু তা হোতে পারলেও, হোতে দিল না স্বার্থপর পুরুষের বড় বেশী ন্যায়-নিষ্ঠার প্রীতি। লতা তার আগের পিছল পথেতে পিছলানো চরিত্রকে একবারে ভুলে গিয়ে সত্যি এক নিখুঁত বরনারী হোয়েছিল। আনন্দে গরবিনী হোত প্রসাদ রায়ের সমাজ-স্বীকৃত বধূর পরিচয়ে পরিচায়িত হবার জন্য। দারুণ আকুতি ঝরয়ে প্রেম-বর্ষণে ভাসাতে চায় পুরুষকে, তার দেহজ কামনাকে স্নিগ্ধ আর শান্ত করিয়ে। কিন্তু শিক্ষিতা কন্যা আভার মনের এক এলোমেলো ও ছটফট করা দম্ভের কাছে প্রসাদের আকর্ষণকে বন্দী করাতেই ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটলো লতার। তাই আভার উপরে প্রতিশোধ নিতে রায়বাঘিনীর মতই হোয়ে উঠেছিল বরনারী হোতে সুখলোভী লতার সেদিনকার মধুক্ষরা বারনারীর অভিনয়।—তাই লতা চাইল আর একবার অভিনয় কোরতে—"একবার যাচিয়ে দেখলে হয়। রেশমী পায়জামাটা পরে, বেণী দুলিয়ে, চোখে সুর্মা লেপে, একপাত্র হুইস্কি নিয়ে যদি কোলের উপর গিয়ে চড়ে বসি, চরিত্তিরওয়ালার মুরোদটা দেখি একবার! কিন্তু ছিঃ!"—সত্যি ছিঃ, ছিঃ-র এক ধিক্কার এসে লতাকে ঘিরে ফেলেছিল। কেন না প্রেমের জন্য ঘর বাঁধতে চাওয়া, আর তার জন্য অভিনয়

করা সত্ত্বেও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অপার স্নেহ প্রীতি ও শ্রদ্ধা পাওয়ায়, লতা আভাদের মতই মিষ্টি মনের যুবতী হোয়েই থাকতে চাচ্ছে। তাই লতার "সব সামর্থ্য যেন খসে পড়ে গিয়েছে, যেন সব দিক দিয়ে অসহায় হয়ে গিয়েছে লতা। শুধু একটু ছদ্মনামের গৌরবের লোভে! ঘোমটা আর সিঁদুর, শাঁখা আর নোয়া দিয়ে সাজানো তার নিজেরই এই ছদ্ম মূর্তিটার উপর বেশি মায়া পড়ে গিয়েছে। ভাঙতে পারে না এই মূর্তিকে, ভাঙবার চেষ্টাও করতে পারে না। বোধ হয় চেষ্টা করতেই ইচ্ছা করে না। কোন উপায় নেই।"—প্রেমের সোনার ছোঁয়াচ একবার পেয়েছে বলে আগের জীবনে ফিরে যাওয়ার আর তার উপায় নেই। তবু তাকে তার এই প্রেমের জন্য ভাল লাগার জীবনকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। এতে দুঃখ আছে। ব্যথা আছে খুবই এমন বিচ্ছেদে। তবু লতা একটু অভিমান সমাজের মানুষকে জানিয়ে বিদায় নিয়েছিল। লতার মধ্যেও আর একবার এক ধরনের অবহেলিত মনুষ্যত্ব শুধু অবহেলা পেয়েই শান্ত হোল। লতা তার দু'দিনের সাজানো ঘরের মায়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তখন "ভয় পেয়ে কম্পিত স্বরে প্রসাদ ডাকে—লতা। আমি ত তোমার কোন ক্ষতি করি নি।"—সত্যি ক্ষতি কোরেছে কিনা তা প্রসাদ বুঝতে চায় না। মানে প্রসাদেরা যুগ যুগ ধরে এমনি ভুল কোরেও আবার ভাবে—বোধ হয় কোন ক্ষতি করিনি। ক্ষতি এসেছে একদিক থেকে, যেখানে আভা নামের যুবতীর প্রজাপতি স্বভাবের রঙবাহার রূপের কাছে সে হারিয়ে ফেলেছিল নিজের পৌরুষ, ঠিক সেখানটিতে। তাই প্রসাদের সংশয় ভরা প্রশ্ন শুনে "আলোর ধাঁধানি থেকে চোখ দুটোকে আড়াল করার জন্য নিশ্চয় নয়, কিন্তু কে-জানে কেন আর কি আশ্চর্য, হেঁট মুখ হয়ে হঠাৎ মাথার উপর কাপড়টা বড় করে টেনে দিল লতা। যেন জীবনের একটা মোহময় ছদ্মবেশ শেষবারের মত গায়ে জড়িয়ে নিল। তার পরেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লতা শুধু আস্তে একবার ফুঁপিয়ে ওঠে—না, তুমি ক্ষতি করবে কেন, আভা-ঠাকুরঝি আমার এ সর্বনাশটা করল।"—সত্যি একথা ভাবিয়ে তোলে, একজন পিছল পথের নারীর সুজনা হোয়ে ওঠা নারী-প্রেমকে কিন্তু ঠকিয়ে দেয় সুরুচি, সুশিক্ষায় সাজানো এক সুভদ্রার মনের লোভ আর হঠকারিতা। আভার না বোঝা মন।

যুগ পালটায়। মানুষের ধ্যান ধারণাও সেই সঙ্গে পালটায়। এতদিন সুবোধ ঘোষ কতকগুলো চিরন্তন সত্যকে হিরন্ময় পাত্রের আড়াল থেকে মানুষের, সমাজের চোখে তুলে ধরেছিলেন শুধু একটি কারণে—তা মানবতা-বাদের জয়গানকে মুখরিত কোরে তুলতে। এ যেন ছিল তাঁর অশেষ করণীয় কাজ। শিল্প বৈভবের চরমতম স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে গণ-মানসের আধারে, অনিন্দ্য কল্পনার রূপায়ণে, বিশেষ করে প্রেমের তাগিদে ছিলেন আবিষ্ট। আজকে তিনি তাঁর শিল্পীসত্ত্বাকে মানুষের প্রয়োজনের

অতিরিক্ত অনেক কিছুর ভেতরে ভেতরে সাহিত্য নিয়ে রূপাভিসারে তথা প্রেমাভিসারে স্থিতধী। ভালবাসা, শুধু তাই নয়, ভালবাসা তার চরমতম সার্থকতায় আর শিল্পীর ধ্যানেতে মূর্ত হয়ে উঠেছে নরনারীর মিথুনরূপে ব্যঞ্জনা পেতে অভিলাষী—পরমতম আকাঙ্খিত পরিণয়ের মধ্যে। তা হোল ঈশ্বর অভিপ্রেত, মহাকবি শেলী, মহামনীষী রুসোর অনেক সাধের, অনেক কল্পনার সোনার জগৎ—ইউটোপিয়ার পারিজাত কাননে সংঘটিত—পবিত্র বিবাহ। ভালবাসা আর বিবাহ—এরা দুটি সবুজ জীবনের শুধু মধুর অভিব্যক্তির দুই পিঠ। এক পিঠে ভালবাসা—তারই সঙ্গে অপর পিঠে—বিবাহ। তাই মনীষী অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতনই আজ সুবোধ ঘোষের মনীষালব্ধ শিল্পসম্ভার—আজ প্রেম কি, পরিণয় কি—এর সাধনা লব্ধ দিকনির্দেশক নানান বিচিত্রতাকে ফুটিয়ে তুলেছে—"ভারত প্রেমকথা" এবং দুটি মানবিক ধর্মী উপন্যাস "ত্রিযামা" ও "শতকিয়া"-তে।

শুধু তার ব্যঞ্জনা, আর প্রকাশে শাশ্বত হয়ে আছে মহাভারত। এক এক সময় ভাবি—মানুষের কোন্ না কাজ, কোন্ না চিন্তাধারা এর মধ্যে নেই? সব আছে। আর এই সব "আছের" মধ্যেই আছে প্রেম। ব্যাপক কথা, আর কঠিন আদর্শের রূপাঞ্জন মাখা মহাভারতের সে সব প্রেমকাহিনী। সেখানে ভুল আছে। আছে তাদের জন্য মহান ক্ষমা আর মহৎ সুসমাধান। সেই সব কাহিনীরই প্রতীক-ধর্মীতাকে শুধু যুঁই চামেলীর ভুর ভুরে সুবাসে ভরিয়ে সর্বাধুনিক বাঙলা সাহিত্যের মজলিশে পরিবেশন কোরেছেন কল্পনার ইন্দ্রজালে, ভাষার ছান্দসী রূপায়ণে, বর্ণনার মদিরেক্ষণ চিত্র-বিচিত্রায় অনন্য রূপদক্ষ সুবোধ ঘোষ। এ যেন কবিসম্রাটের জীবন দেবতার প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করা হোয়েছ—

"নূতন করিয়া লহ আরবার চির পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়, নবীন জীবন ডোরে।"

পুরনো কথা যে কখনো পুরনো হয় না প্রেমের সরব ও আকুল আদর্শের গুঞ্জরণে ভরা থাকায়, সে কথাই ভাব-রূপ ও বোধের মিতাচারে ও মিতাক্ষরে সৌন্দর্য্যবাদী সুবোধ ঘোষের প্রখর মনীষা আলোকিত কোরে সৃষ্ট হোয়েছে এই "ভারত প্রেমকথা"য়। আমার ধারণায় এর রূপবেত্তা রচনারীতির কারুকাজে অতি আধুনিক মানসের প্রমিতিতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও, হোলেন এক অনিন্দ্য ধারার আদর্শবাদী। যিনি সাহিত্যের আসরে প্রথম পদার্পণের শুকতারা ফুটিয়ে তোলার সময়েই বোঝাতে পেরেছিলেন 'স্টার্ন রিয়ালিজম্'ও হতে পারে কত বড় সুন্দরের ঘরের বাসিন্দা—তিনিই শেষ পর্য্যন্ত এ-ও বোঝাতে পারলেন যে, তাঁর শিল্প-সত্তার 'স্টার্ন আইডিয়ালিষ্ট' হয়ে ওঠায় বিন্দুমাত্র বিরোধ বাধে নি দু-ধারার সাধারণে ভাবিত—আশমান্ জমিন ফারাকটুকু নিয়ে। অনেক শিল্পীরই চিন্তাধারার দৃষ্টি-নিমেষে বাস্তব

ও কল্পনার বিরোধিতা তাঁদের আপন আদর্শের সংঘাতে যখন প্রকটিত হোয়ে ওঠে-তখন দেখি সুবোধ ঘোষ নিজের স্বকীয় ধ্যানের কল্পনায় দু ধারারই সঙ্গমে আত্মনিষ্ঠ, আর শিল্পচেতনায় আত্মতৃপ্ত। সত্যি এমনটা মিলনে সুমধুরিক না হোলে পর জীবনের যত কিছু জটিলতা, জড়তা, যন্ত্রণা, আবিলতা, কাতরতা—এর সবেরই শান্ত আর শ্রীময় হোয়ে ওঠা সম্ভব হোত না তাঁর সৃষ্টির কাজে। এ চিন্তার অশেষ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রতা রূপঝরার প্রথম রোমান্টিকতার আশ্লেষে আবেশিত ধ্যান রূপে প্রকাশিত হোতে পেরেছে "ভারত প্রেমকথা"য়। এখানে বলে রাখতে চাই—কোন রূপদক্ষ শিল্পীর মনের রোমান্টিকতাকে আমি তাঁরই "strong personality" বলে অভিহিত করি। আর অস্বীকার করা যায় না যে, এই রোমান্টিক রীতির স্বনিষ্ঠ ও একান্ত আন্তরিকতা ভরা সৃষ্টি—কি সাহিত্য কি শিল্প—সর্বত্রই original কিছু না করিয়ে ওঠে না। সুবোধ ঘোষের রূপচিন্তা ও মনীষায় অলঙ্কৃত "ভারত প্রেমকথা" এই নিরীখেতেই হোয়ে উঠেছে এক অশেষ সুরের ক্ল্যাসিক। শিল্পীর সৌন্দর্য্যস্নাত আদর্শবাদ মধূরিম দৃষ্টিপাতে জানাতে পেরেছে—"মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানগুলির বৈচিত্র্য আরও বিস্ময়কর। উপাখ্যানগুলি যেন প্রণয়তত্ত্বেরই মনো-বিশ্লেষণ। সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা ইত্যাদি লোক-সমাজের অতি পরিচিত উপাখ্যানগুলি ছাড়াও এমন আরও বহু উপাখ্যান মহাভারতে আছে, যেগুলি লোকসমাজে তেমন কোন প্রচার লাভ করে নি। এই সব অল্প-প্রচারিত উপাখ্যানও প্রেমের রহস্য বৈচিত্র্য ও মহত্বের এক একটি বিশেষ রূপের পরিচয়। ভারত প্রেমকথার বিশটি গল্প এই রকমই বিশটি মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের পুনর্গঠিত অথবা নবনির্মিত রূপ। উপাখ্যানের মূল বক্তব্য অক্ষুণ্ণ রেখে এবং মূল বক্তব্যকে স্পষ্টতর অভিব্যক্তি দান করার জন্যই—মাঝে মাঝে নতুন ঘটনা কল্পিত হয়েছে।"—এর মুখবন্ধে শিল্পী 'নতুন ক'রে পাব বলে' যে ভাব সুষমার রূপনিকেতন তোয়ের করাতে পেরেছেন তা সত্যি পুরনো কথার সঙ্গে আধুনিক ধ্যানের—শুভবিবাহ সুম্পন্ন করানোর মধ্যে হোয়েছে—নামধেয় ক্ল্যাসিক।

মোট কুড়িটি সুমধুরিক কথা-রূপের বহুত আকুতির নির্ঝরণে "ভারত প্রেমকথা'র রূপকুট্টিমতা পাঠকের সৌহার্দ্য-প্রীতির ভুবনকে আশ্লেষিত কোরে তোলে। কাহিনীর বাস্তবতা তার বহু হাজার বছরের দূর-সুদূরের মধ্যে থেকেও তারুণ্যের সবুজাভায় হোয়ে উঠেছে আধুনিকতম। যুবকের, বিশেষ ভাবে তার যুবতীর মনের আকুতির সুখ আর আরতির খুশী সমেত দেহের যৌবন যে ভাবে লজ্জায়, তৃপ্তিতে, রভস চিন্তার সুনিশ্চিততায় হোয়ে ওঠে রিমঝিম করা লিরিক্—তা আগে পরে কা কথা—ও যে সর্বযুগেরই রমণীয় নিবেদন। ওরা যে অনুরাগবতী সন্ধ্যা—একে ও অপরে। প্রত্যেকে। সেকাল আর একাল সমতে। তাই দেখি পরীক্ষিৎ

ও সুশোভনা, সুমুখ ও গুণকেশী, সংবরণ ও তপতী ও অপরাদের কথা পরম্পরাতে—পুরুষ সমীপে রমণীর মিলিত জীবনযৌবন নিঙাড়িত ও আদর্শ রূপাঙ্কিত, আর সুন্দর অভীপ্সায় ভরা বসন্ত-সম্ভোগ-কথা অনুরণিত হোয়েছে। এ রণন আধুনিক পলে-অণুপলে আবেগ ভরা। মধুঋতা সুশোভনার কথা প্রথমেই মনে পড়ে।—এই মহাভারতী প্রেমকথা তার রূপকুট্টিম জগতে বহুত আকুতির রস নির্ঝরণের মধ্য নায়িকা সুশোভনাকে প্রথম দর্শনে তারই জন্য প্রতীক্ষারত রাজা পরীক্ষিতেরই প্রেম তাপিত হৃদয়কে শান্ত ঝড়ের তাণ্ডবে পাগলপারা কোরে মাতোয়ারা করাবার ভূমিকায় রূপায়িত কোরেছে। ঠিক সলাজ মধুর বীরাঙ্গনার সরব মূর্ছনায়। সুশোভনা কয়েক হাজার বছর আগের সত্যযুগের কোনো এক সে কালিনী বরবর্ণিকা হলেও তার রূপকথা সৌন্দর্য্যবাদী সুবোধ ঘোষের বাক্-বিভূতিতে অতি সহজ সুরেরই নামধেয়া আধুনিকা হোয়ে উঠেছে। প্রেম ভালবাসার জগতে যখন অকারণে আর অজানিতে বহুত মিনতি করার জন্য নিলাজ-চপল লগ্ন-শুভ মুহূর্তটি সহাস পদক্ষেপে নূপুরের মধুগুঞ্জন তুলে উপস্থিত হয়, তখনকার সময়ে মিষ্টি রাগে সাজানো সুশোভনার দেহবল্লরী যে ভাবে লজ্জা ঘৃণা ভয় থেকে মুক্ত হোয়ে চিরন্তণী যুবতী নারীর অতি আধুনিকার নিলাজতায় আবেশময় করাতে পেরেছিল—তার তুলনায় আজকের অতি আধুনিকারও এই পূর্বতনীকার কাছে হোতে পারে না পারঙ্গমা।

যখন রাজপ্রাসাদ থেকে অদূরে ছাউনিফেলা শত্র শিবিরেতে অপেক্ষায় রত নায়ক সমাগমে আসবার অভিলাষে—সুশোভনা তার যৌবন-আকুতির সাহসিকতায় মূর্ছনা তোলে, ঠিক তখন নিপুণিকা সখি সুবিনীতা জানতে চায় বিস্ময়ের ঘোরে—"কি বেশে সাজাব?" বোধ হয় লজ্জা ঝরিয়েই সুবিনীতা তার প্রগলভ যৌবনকে আহ্লাদে নাচিয়ে উত্তর দিয়েছিল—"বধূ বেশে।" এই 'বধূবেশে' সাজার মধ্যে সত্যি মহৎ ও চরম আদর্শের গরিমা প্রেম ও প্রণয়ের সমাজ নিহিত রূপদর্শনকে এক চিরায়ত মানবতাবোধে ভাবসিক্ত করাতে পেরেছে—আর তাই আধুনিক যুবক ও যুবতীর যৌবনের প্রাঞ্জলময় রূপকথায় তা এক মহত্বর নির্ঝরিণীর ধারায় অভিষিক্ত কোরেছে। —এর পরেই অনিবার্য্য কারণে মনে পড়ে সংবরণ ও তপতীর বিবাহিত জীবন-সম্ভোগের পুলক জাগানো সবুজ কথার অনুরণন—যা এক অকারণ পুলকের ঝুলন মেলায়—দোল দিয়ে যায় জীবন-সমুদ্রের কূলে কূলে। তপতী হোলেন ভগবান আদিত্যের আত্মজা। তার পিতা হোলেন সমাজের লোকপ্রদীপ। সমস্ত জাগতিক বিষয়ে সামাজিকতার মধ্যে কল্যাণসাধন ব্রতে সমদর্শিতার সুন্দর নীতির ধ্যানে সবাইকে আবেগ মথিত করাতে পেরেছিলেন। তাঁর এই বিরাট ভাবের মস্ত অংশ নিয়েছিলেন—শিষ্য-সংবরণ। আর তাঁর হাতে সঁপেছিলেন শুভ-পরিণয়ের কবোষ্ণ-

বাঁধনে আপন—আত্মজাকে। সমদর্শিতার শুভালোকে দুজনেই মিলেছিলেন মিতালি মধুরতায়। কিন্তু বুঝি আজকেরই কোনো আত্মকেন্দ্রিক পুরুষের একদেশদর্শিতার ছোঁয়াচ দেখা দিয়েছিল সংবরণের মধ্যে। তাই তিনি প্রজার মঙ্গল, দেশের মঙ্গল মায় সর্ববিষয়ের প্রীতি নিবদ্ধ সমদর্শিতার আদর্শকে ভুলতে বসেছিলেন আপন পরিণীতাকে ভুল পথেতে ভালবাসতে চাওয়ায়। স্ত্রী তপতীর প্রতি তাঁর ভালবাসা হোয়ে উঠেছিল বড় বেশী রকমের মোহান্ধময়। কিন্তু প্রজ্ঞাপারমিতা রূপী বরকন্যা তপতীর তাই আপন স্বামীর মঙ্গলের জন্য মনেতে আত্মশ্লাঘা জেগেছিল। আদর্শবর্তী প্রিয়ার আরতিতে ধীরে ধীরে সংবরণের মানসনেত্রে তুলে ধরেছিলেন তাঁরই ভুলগুলোকে। প্রিয়া তপতীর প্রণতির আভায় ঝালকিত হওয়ায় তাঁর চোখের মোহান্ধতা হোয়েছিল দূরীভূত।—তাই সংবরণ শেষের পটভূমিকায় প্রথমের মিতালি মধুরতায় কাকলী ফুটিয়ে—শান্তভাবে বলেন "বার বার তিনবার আমার ভুল হয়েছে তপতী, কিন্তু তুমিই চরম শাস্তি দিয়ে শেষ ভুল ভেঙে দিলে। ......উত্তর দেয় না তপতী। চরম শাস্তি গ্রহণের জন্য তপতীও আজ প্রস্তুত হয়েছে।......সংবরণ ধীর স্বরে বলেন—সত্যই তোমাকে আমি আজও আমার জীবনে পাইনি তপতী। কিন্তু এইবার পেতে হবে। ...চমকে ওঠে তপতীর শান্ত কঠোর দৃষ্টি। ...তপতীর হাত ধরবার জন্য এক হাত এগিয়ে দিয়ে সংবরণ বলেন...চল। ...তপতী—কোথায় ? ...সংবরণ—ঘরে, সমাজে, জগতে। ...তপতী বিস্মিত হয়। সংবরণ যেন সেই বিস্ময়কে চরম চমকে চকিত করে দিয়ে বলেন—চল তপতী, গুরু বশিষ্ঠ আমাদের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। ...লুব্ধা লুণ্ঠকীর মত তপতী তার দুই বাহু সাগ্রহে নিক্ষেপ করে সংবরণের কণ্ঠ নিবিড় আলিঙ্গনে আপন করে নিয়ে বক্ষে ধারণ করে। জীবনের আনন্দের সঙ্গীকে এতদিনে খুঁজে পেয়েছে তপতী ...হ্যাঁ, সারা জীবনের তৃষ্ণা যেন এতদিনে তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছে। সংবরণের মুখে সেই সুস্মিত আভাষ ফুটে ওঠে।......লতাবিতানের ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত হতে বের হয়ে অবারিত সূর্যালোকে আপ্লুত তৃনপথ ভূমির ওপর দুজনে দাঁড়ায়। মনে হয় সংবরণের, মনে হয় তপতীর যেন ক্ষুদ্র এক কারাগারের গ্রাস হতে মুক্ত হয়ে এই বার সত্যই জীবনের পথে এসে দুজনে দাঁড়াতে পেরেছে। ......তরুপল্লবের অন্তরালে হতে অকস্মাৎ পিকস্বর ধ্বনিত হয়। স্মিত সলজ্জ ও মুগ্ধ দৃষ্টি তুলে সংবরণ ও তপতী পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, যেন নবপরিণয়ে প্রীতমানস এক প্রেমিক ও এক প্রেমিকা। ...সংবরণ হাসেন—তুমি শাস্তি দিয়ে আমাকে ভালবেসেছ তপতী। ...তপতী লজ্জিত হয়—তুমি ভালবেসে আমাকে শাস্তি দিয়েছিলে সংবরণ।"

"ভারত প্রেমকথা"-র আলোচনায় সুন্দর ভাবেই প্রতীয়মান হোল যে রূপদক্ষ সুবোধ ঘোষ ভারতীয় ক্ল্যাসিক সাহিত্যের মস্ত বড় প্রেমিক। এ আলোচনার প্রথম

পরিচয়েতে জানানো হোয়েছে—সুবোধ ঘোষ সাহিত্যের এক ভাবগম্ভীর রূপচর্চার মধ্যে অতি সার্থকতার সঙ্গে গণতান্ত্রিক তত্ব ও তথ্যের যে মঞ্জুল সুরীতিতে, আর সত্যদ্রষ্ট শিল্পীর আর্তির মায়াময় অঞ্জন মাখিয়ে আপন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি কোরেছেন তার মূল সুরেতে গুঞ্জরিত হোয়েছে মানুষেরই প্রতিটি মানবিক চাওয়া ও পাওয়ার কথা। কখনো তা হাজার রীতির আর নীতির আর প্রবৃত্তির মায়াপাশে বাঁধা রঙছুট্ করা ভাবেতে দরাজজান। তবু সে সব কথার সাজঘরে অমানবিক কিছু প্রকাশ পেয়েও অচিরে তা মানব-প্রেমিক এই শিল্পীর ধ্যানের কাছে সংকট থেকে, আর সমস্যা থেকে শান্ত হোয়ে ফুটে ওঠে ফুল্ল-কুসুমশোভিত মানবিকতায়। এ হোল সুবোধ ঘোষের ভাবলোক আলোড়িত মনীষার মূর্ত পরিচিতি। শিল্পী যখন সৌন্দর্য্যে আর মাধুর্য্যে ভরাট কথার কাকলি ছড়িয়ে ঝরিয়ে গণতন্ত্র-বিলাসের স্থির অভিব্যাঞ্জনায় আবিষ্ট হন—তখন অতি স্বাভাবিক কারণেই আপন রস-স্বরূপের হ্লাদিত গতিবেগ থেকে তা ভালবাসতে পারেন। বাঙলার চৌদিকের উন্মুক্ত হাটে-বাটে, মাঠে-ঘাটে, সমস্ত জলস্থলী ও বনস্থলীকে কাঁপিয়ে হাসিয়ে কাঁদিয়ে অতি সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ কোরে রাজা উজির পর্য্যন্ত যে সব লোকগাথা রচনা করা হোয়েছিল, বা রটনা করা হোয়েছিল—তারই গভীরে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গরিমায় সঞ্জাত সুবোধ ঘোষের রূপচিন্তা অভিসার কোরেছিল। তারই এক শিল্প-সমৃদ্ধ লোকগাথার রূপায়ণ মানসে। আমাদের দেশটা হোল সুজলায় আর সুফলায় আকুল করা—কিংবদন্তীর দেশ। কান্ট্রি অফ্ হিয়ারসে! এ দেশের লোকগাথা ইতিহাসের পটভূমিকায় দামী ও নামী, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জানা ও না-জানা—হাজার এক কথা ও কাহিনী হয়ে আছে। সুবোধ ঘোষ বলেছেন, লোক-সাহিত্যের আবেশ রসে মনসিজ হোয়ে—"জনসমাজের মুখে-মুখে প্রচলিত কাহিনী মাত্রকেই কিংবদন্তী বলা ঠিক হবে না। ঐতিহাসিক অথবা প্রাকৃতিক কোনো বাস্তব নিদর্শনকে আশ্রয় করে যে কাহিনী জনগণের কোন কল্পনায় রূপ গ্রহণ করে, সেই কাহিনীকেই যথার্থ কিংবদন্তী বলা যায়।" তিনি আরও বলেছেন, "তাই আজ-ও দেখা যায় যে, জংলী অঞ্চলের নিভৃতে অবস্থিত কোন ডিহির অথবা ক্ষুদ্রতম গণ্ডগ্রামের সাধারণ নিরক্ষর মানুষও তার জীবনের চারিদিকে কাহিনীময় এক পরিবেশ রচনা করে রাখে। স্থানিক ঘটনা অথবা স্থানিক নদী দীঘি অরণ্য পাহাড় ও জলকুণ্ড অথবা একটি বটবৃক্ষ কিম্বা একটি প্রাচীন সমাধি-ক্ষেত্রকে আর শ্মশানভূমিকে প্রসঙ্গ করে নিয়ে সে বহু কাহিনী সৃষ্টি করে। তার মন তার নিজেরই রচিত এই কিংবদন্তীর দেশে ঘুরেফিরে তার বিস্ময় ও কৌতূহলের তৃপ্তি খুঁজে বেড়ায়। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে এই ধরণের এক একটি কিংবদন্তীর দেশ আছে। আমাদের বাংলা দেশেও আছে"।—তাই সত্যি হয়ে উঠেছে রূপধ্যানী সুবোধ ঘোষের শিল্প-বিচিত্রা রূপে রচিত এই আধুনিক "কিংবদন্তীর

দেশ"এ। এখানে এক একটি কিংবদন্তীর কথা মধুর হইতে সুমধুরিক লিপিবিলাসে সাজানো হয়েছে। এর মধ্যে কহ কৌশিকী, সখীসোনার পাঠশালা, মেহের হামারা, একটি বুলবুলের শিস, সবিতার দাসী সাবিত্রী, রাণী রায়বাঘিনী, লীলা ও চারণক প্রভৃতির আধুনিকীকরণ হয়ে উঠেছে এক একটা রূপের ধূপ-বিভাসের—প্রজ্জ্বল কুট্টিম। এই কিংবদন্তীর কাহিনী পরম্পরায় রসাবেশের মধ্যেও সুবোধ ঘোষ তার প্রেম চিন্তার নিকষ হেমাঙ্কনে—আদর্শ লোকের ভাবযান বনাম রূপযান তৈয়ার কোরেছেন। এরই ভেতরের সুতনুকার লম্বা বিনুনীতে নার্গিশ শোভিত রূপেতে শাহজাদী আমিনা সকালে মনসবদার ওসমানের যে ভালবাসাকে একটি বুলবুলের শিশ সমেত হত্যার মৌনতায় ট্র্যাজিক করেছিল হুসেন খাঁর কু-চক্রান্ত, তার কথা পাঠকের চোখের দৃষ্টিকে সজল বিলোল না কোরে ছাড়ে না। এর চাইতেও বড় বেশী আবেশে মনের আশান্ততাকে রিমঝিমিয়ে নাচিয়ে তোলে কিংবদন্তীর সেনাপতি লাউসেনের রাজকুমারী কানেড়াকে বুকের নিটোল উষ্ণপাশে প্রিয়তমা রূপে বন্দী করার জল্পনাটি। এই বরবর্ণিনীর প্রগল্‌ভতা যখন তার কুমারী হৃদয়ের শঙ্কা জড়ান লজ্জাকে ডালি সাজিয়ে নিলাজ হওয়ার জন্য 'কহ কৌশিকী' সম্বোধনে আকাশ বাতাস ও বনান্তরালকে কাঁপিয়ে তুলে প্রশ্ন করত, আর শেষ মুহূর্তে যখন লাউসেনের বুকের বন্দিনী হতে পারলে, তখনও সে প্রশ্ন করে, "কহ কৌশিকী" কেমন করে এমনটা হোল!

কথাশিল্পে রূপদক্ষ সুবোধ ঘোষ, আমার সুন্দর ধারণায় প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর বর্তমানের প্রজ্ঞাময় মানসদর্শনের মধ্যে প্রতীয়মান যে,—তিনি রূপবাদী রূপে সুন্দরের ঘরের অনন্য সাধারণ স্রষ্টার ভূমিকায় জোরালোভাবে পরিচয় রেখেছেন চরম ধারার মানবপ্রেমিকের। তারপরেও বলব, তিনি দেশপ্রেমের মায়ায় ভারতকে তার অখণ্ড রূপের মধ্যে ভালবেসেছেন—দরদী শিল্পীরূপে, এদেশেরই ঐতিহ্যময় আর সুসংস্কৃতিতে ঘেরা মানবতাবোধের পূজারীরূপে। তিনি এমন পরিবেশে শুধু কথা ও নানান কাহিনী পরম্পরার রূপদর্শনে প্রেমের কুট্টিম তৈয়ার করার আবেশতা থেকে দূরে ক্ষণকালের জন্য করা যাত্রার মধ্যে শৈল্পিক এ্যাড্‌ভেঞ্চার সমাপ্ত করাতে পেরেছেন। এদেশেরই সংস্কৃতির গাম্ভীর্য্য নিনাদিত ধ্যান-যানে ও ঐতিহ্যের ইতিহাস হয়েও মৌন নয় এমনই কিছু গতিময় কথা-যানে। তাই রূপবাদী সুবোধ ঘোষ অনন্য-সাধারণ শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে রচনা করাতে পেরেছেন "ভারত-প্রেমকথা" ও "কিংবদন্তীর দেশ"। এ-দুটি সৃষ্টি সাহিত্য আলোচনার রূপেরখায় সীমার মধ্যে অসীম রূপকল্পের জীয়ন-কাঠির সন্ধান দিয়ে হোয়ে উঠেছে সরবে উচ্ছলিত—ক্ল্যাসিক। এ ব্যাপারে অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিধিত হোয়েছে পাঠকে আর সমালোচকে—এই দুটি গ্রন্থের অনিন্দ্যতা নিরূপণে। কিন্তু-এর পরের শিল্প সমৃদ্ধির অনুসন্ধিৎসায় সুবোধ ঘোষ

আপন কথাযান নিয়ে পৌঁছেছিলেন ভারতীয়তার সংস্কৃতিময় আন্তর কোণে, যেখান থেকে তিনি শিল্প সম্বন্ধীয় নানান কথার চিন্তা ও প্রশ্নকে তুলে ধরেছিলেন যুগোপযোগী নানান নিবন্ধনে—প্রকটভাবে রচিত হওয়া "রঙ্গবল্লী"-তে। কথাসাহিত্যে সুবোধ ঘোষ যে অপরুপ মনন করা হৃদয়-সর্বস্বতার আকুল রসাবেশে বিভোর কোরে তোলেন, এ গ্রন্থের প্রকৃষ্ট চিন্তার বাঁধনে নিটোল ভাবে সাজানো প্রবন্ধগুলোর মধ্যে উজ্জ্বল হয়েছে শিল্পীর—বস্তুনিষ্ঠ মননশীলতা। আমাদের দেশেরই কতক নিজস্ব শৈলীর শিল্প সম্পর্কিত বিশ্লেষণী রচনা হিসাবে, মায় শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী রূপে "রঙ্গ-বল্লী"র একটা মূল্য থেকে গেছে,—যেহেতু তা একজন রূপবাদী কথাসাহিত্যিকের মনের শিল্প-জিজ্ঞাসারূপে—বিশ্লেষিত হয়েছে।

কিন্তু এর পরেও মহাভারতী প্রীতির প্রমিতিবোধ—সুবোধ ঘোষকে অশেষ আন্তরিকতার শিল্প-জিজ্ঞাসায় অনুপ্রাণিত করাতে পেরেছিল—বর্তমান ভারতেরই দুটি প্রধান বিষয়ের ব্যাপক সমস্যার প্রাণিধানমূলক কাজে। এর একটি বিষয় হোল ভারতীয় আদিবাসীর বিরাট সমস্যগুলো। সুবোধ ঘোষ তাঁর রচিত "ভারতের আদিবাসী" প্রসঙ্গে যে নিপুণতার সাহায্যে এর সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনীতিক, অর্থনীতিক মায় নৃ-ময় anthropological analysis স্বয়ং সম্পূর্ণ করাতে পেরেছিলেন—সেই প্রসঙ্গে আমরা খুবই জোরের সঙ্গে জানাতে চাই,—এদেশের তথাকথিত বহুমাথাওয়ালা স্যোসিওলজিষ্ট থেকে আরম্ভ করে তথাকথিত পরিকল্পনার ব্যর্থ হওয়া উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন সম্মানিত পর্য্যবেক্ষকগণ যখন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে—ডানলোপিলোতে বসে—'ট্রাইবাল্ ওয়েল্ফেয়ার' নিয়ে মাথা ঘামান, সেই মুহূর্তে মনে হয়—ওটা ওঁদের বিলাসিতা। এই মানস প্রতিবিম্বের উল্টো দিকের ছবিতে দেখছি সুবোধ ঘোষকে—একাত্ম হৃদয়ের সুরে মিলিত হয়েছেন আদিবাসীদের সুখ দুঃখের—জীবনরথের চক্রে। সেই দিক থেকে যবনিকার অন্তরালে থেকেও সুবোধ ঘোষ রাষ্ট্রীয় জীবনের সমাজবোধে উজ্জ্বল। আর তাই রাজনীতিক্ষেত্রেও নমস্য। তাই "ভারতের আদিবাসী" শুধু সাহিত্যিক মাধুর্য্যের সার্থকতার রূপ নিয়েই আসেনি—ওর মধ্যে রয়েছে প্রকৃত বাস্তবজীবনের রূপ আর ওদের উন্নতির পরিকল্পনার কথা। তিনি তাঁর এই গ্রন্থে অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত Statistical Index-এর ছবি তুলে ধরেছেন। আদিবাসীদের অনগ্রসরতার কারণ কি, এবং কেমন ভাবে, আর কি কি উপায়ে তার উন্নতির পথে হাজার রকম বাধাকে এড়িয়ে অগ্রসর হতে পারবে—সেই সবেরই নিখুঁত পরিসংখ্যানের কাজ ফুটিয়ে তুলেছেন—সম্মানিত ব্যক্তিদের ভবিতব্য চিন্তার রেখায় যা "Planning Target" নামে অলংকৃত হোয়েছে। অনিন্দ্য কথাকার, মানবপ্রেমী আর সৌন্দর্য্যলোকের প্রেমবাদীর ভূমিকা ছাড়িয়ে—সুবোধ ঘোষ এখানে হোয়ে উঠেছেন—নিখুঁত রীতির পরিসংখ্যানবিদ্। এত কিছু

থাকা সত্বেও কেন যে এই "ভারতের আদিবাসী" গ্রন্থটি বর্তমান ভারতের প্ল্যানিং-এর অন্দরমহলে উপেক্ষিতা হোয়ে থাকল—তার কারণ আমাদের জানা নেই। তার কারণ বোধ হয় ম্যাথু আর্নল্ডের প্রবক্তৃতায় বিশ্বাসী এই মানবপ্রেমী শিল্পীর "disinterested endeavour"—যা মহৎ প্রয়াসে এ সৃষ্টিকে যুগাতীত নির্দেশনায় আরো মহৎ কোরেই সৃষ্টি করিয়েছে। তাই তাঁর পাঠকের কাছে এর 'গ্র্যাঞ্জার' অপরিসীম। আর এই আদিবাসীদের নানান সমস্যায় জর্জরিত জীবনযাপনের দুনিয়ায় অদ্ভুত 'গ্র্যাঞ্জার' আছে বলেই তাদেরই বাস্তবতায় অভিজ্ঞ ও সৌহার্দ্যতায় তৃপ্ত সুবোধ ঘোষের মানবিক আবেদন আকুল করা রূপযান কোরে তুলেছে—দাশু ঘরামি ও মুরলীকে নিয়ে—"শতকিয়া"তে।

সুবোধ ঘোষের আরেকটি সাহিত্যিক দান হোয়ে ফুটেছে "ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস"। এ আমার মতে বাঙলা ভাষায় সর্ব প্রথম ভারতীয় সেনা ও তাদের ইতিহাস থেকে আরম্ভ কোরে প্রতিটি বিভাগীয় বিষয়াদি সমেত সুদীর্ঘ আলাপ ও আলোচনা, এবং স্থান বিশেষ মন্তব্য করার মধ্যে রচনা করা হোয়েছে—এই ব্যাপকতায় শীলিত ও সুচিন্তিত গ্রন্থটি। আমরা যে সুবোধ ঘোষকে প্রথমেই পরিচয় নিয়ে থাকি দারুণ বাস্তবিক বনাম কল্পনায় শ্রেষ্ঠ কথাকার রূপে—তিনি এই ফৌজী ইতিহাসের আলোচনায় গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত নৈষ্ঠিক ঐতিহাসিকের মত ভারতীয় ফৌজের গোড়াপত্তনের প্রাতিটি কথাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রণিধান করার মধ্যে ফুটিয়েছেন। অসাহিত্যিকও এ গ্রন্থের ভেতরে মনোনিবেশ না কোরে থাকতে পারবেন না,—কারণ ফৌজী জগতের যত কিছু এ্যাড্‌ভেঞ্চার ভারতের মাটিতে তার অভিজ্ঞতা রেখে রেখে চলে আসছে—সে সবই মুখর হোতে পেরেছে জ্ঞানপ্রেমী সুবোধ ঘোষের সুনিপুণ ভাবে করা প্রাতিটি data by data মেনে চলা এই আলোচনায়। ভারতীয় ফৌজের কথা প্রথম থেকে আধুনিক বিকেন্দ্রীকৃত নৌ, স্থল ও বিমান বিভাগীয়—ত্রিবেণী সঙ্গমে পৌঁছেছে। হোয়ে উঠেছে সেনাদলের অ্যানেকডোট্। নিঃসন্দেহে বলা যায় লেখকের এটা মহৎ সৃষ্টি। সেই সঙ্গে রূপদক্ষ ও প্রখর কল্পনাপ্রেমীর এটি হোল চরম ধারারই তীব্র বাস্তবিক নিষ্ঠার সাহিত্যিক পরিচিতি। তাই "ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস" আজ বাঙলা ভাষার এক মস্ত গৌরব।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিক হয় তারই মনুষ্যত্বের পরিপাটি বিকাশের মধ্যে। এ থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতি তাকে ন্যায়তই কোরে তোলে—অমানবিক। কেন না মানুষ তার অন্তরে ত নিশ্চয়, এমন কি বাইরের প্রকাশেও প্রায়ই রহস্যময় থাকে বলে সঠিক রকম বোধগম্য হয় না। উত্থানে পতনে এই দুইয়ে মিলে একটা জীবনের পরিগণ্ডিকে পরিসীমিত রাখলেও—মানুষ তার নিজেরই খেয়ালীপনার দুনিয়া কোরে সহজেই জীবনটাকে একটা অতি সাধারণ নিয়ম মাফিকই কাটাতে অভ্যস্ত থাকে। সে

একঘেয়েমি নামক বস্তুটিকেই ভাল না লাগিয়ে পারে না। কাজেই এমনতর হ-য-ব-র-ল জীবনের কাছে নিখুঁত মানবতার কোন দাম নেই। মানবতা যখন মূল্যহীন এ হেন কোন জীবন-নির্বাহকের কাছে,—তখন তার কাছে থেকে মনুষ্যত্বের অনুসন্ধান করা বৃথা হোয়ে ওঠে। সাংসারিক মায় সমাজবোধকে ডিঙিয়ে চলা রাজনীতির কুটিল প্রভাবে তমসাবৃত জীবন—তাই পাটোয়ারী ভঙ্গিতে পছন্দ করে বিকিকিনি করার কল-কৌশলাদি। বার্টার সিস্টেম'টাই হয় মূলমন্ত্র। আর নয় অন্য কিছু। কাজেই একই ছাঁচে গড়া জীবনপারির কাজ ও অকাজ দুইয়ে শেষ পর্য্যন্ত মানব মানসিকতাকে কোরে তোলে—অসুস্থ আর অপ্রকৃতিস্থ। সুস্থ দেহ-মনের বালাই নেই তেমন প্রাণের যে কোন ইচ্ছার কাছে। অসুস্থতার ঘোরপ্যাচে যখন 'জন্‌ডিসড্‌' চোখের দৃষ্টিতে সব কিছুকেই হলুদ বর্ণ বলে ভ্রম জাগে—তখন তার সে অবস্থায় দেহ-মনের শুদ্ধিকরণ একমাত্র সম্ভব হোতে পারে সুস্থ, আর শুচিময় জীবন ধারণের সাত্ত্বিকতায়। তবু বলব, আজকের সমস্যা ও শঙ্কায় জড়ীভূত অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার নয়।—কিন্তু, তবুও বলব, সমাজের হাজার হাজার বৈচিত্র্যভরা পরিবারের আলোচনায় তাদের সে সব পারিবারিক কথা এই পাটোয়ারী ভাবনাকে আরো জোরালো করে তুললেও,—আমরা জানি বাঙলা সাহিত্যের কয়েকজন অনন্য প্রতিভার বাস্তবনিষ্ঠ রোমান্টিক কথাশিল্পীর শুচিময় শুভ্রবিতানে—এর প্রতিচ্ছবি বিন্দুমাত্র ছায়াপাত কোরতে পারেনি। আজকের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে একদা যেমন ধর্মানুসরণের আনুষঙ্গিক কাজরূপে "আত্মার পরিশুদ্ধিকরণ" একটা মস্ত সামাজিক রীতি ছিল, এই কথারই আলোকে আমরা ভাবতে পারি সামাজিক জীবনযাত্রার পরিশুদ্ধিকরণের শুভ প্রচেষ্টাকে। সাহিত্যিকেরা অনিবার্য্য কারণ বলেই এই সম্পর্কে বড় বেশী ভাবিত না হোয়ে পারেন না। আর সেই কারণেই জোরের সঙ্গে জানাব—ওঁদেরই আন্তরিকতায় সৃষ্ট সাহিত্যই হোয়ে দাঁড়ায়—ভুল পথে চলার জীবনধারাকে—অশুভ থেকে শুভময় কোরে তোলার নির্মমে কঠোর হাতিয়ার। একটা কথা, সাম্প্রাতিকতার মায়া-বিভোরতায় মশগুল থাকায়—সব সাহিত্যিকই এই মহতী জীবনাদর্শের সার্থক রূপ আঁকতে পারেন না। যিনি পারেন, তিনি খণ্ডকালের সমস্ত দাবীকে মিটিয়ে অখণ্ডকালের মধ্যে একটা স্থায়ী আসন লাভ কোরতে পারেন। তিনি কালান্তরের পদযাত্রার এক মৃত্যুহীন পথিক—মহাশিল্পীর ভূমিকায়। তাই তিনি আপন সাহিত্য সৃষ্টি সমেত হোয়ে ওঠেন—কালাতীত। পৃথিবী ও প্রকৃতি আর তার সামাজিক কানুনে শুচিশুভ্র যে জীবন-মানসিকতা রেঙে ওঠে প্রেম ভালবাসার রূপদর্শনকে আবরিত করে, তেমনি এক রুচি-সুন্দর শিবচিন্তার রণন তুলে এ হেন প্রীতিতে আবেশ-মুগ্ধ যে কোন মানীষী কথাশিল্পীই গড়ে তোলেন—তাঁর আপন ভাবলোক। তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গেরই ভালবাসাবাসির নারীর আস্তিত্বকে দিয়ে কর্মী ও ধর্মী

পুরুষেরই—আসল রত্নত্বকে ফুটিয়ে তোলেন সার্থকতায়। সর্বোপরি প্রণয়রীতির মন্‌সুখ করা জীবন-সঙ্গমেতে নীত হওয়া ধী-তে আর শ্রী-তে।—এই রূপদৃষ্টির আলোকসম্পাতে আমরা বলব—আজকের দিনে মানবপ্রেমী সুবোধ ঘোষের মনীষা বহু ধারার শিল্পসৃষ্টির মননশীল স্বকীয়তায় ও অশেষ সার্থকতার পরিণত অবস্থার থেকে হোয়ে উঠেছে—যুবকের ঘন আকুতির সবুজ ভুবনের রূপদ্রষ্টা। এরই প্রগাঢ় তাগিদে তাঁর সত্যসন্ধ শৈল্পিক অভিভাষণ যুবতী বরবর্ণিনীর ভাল লাগা ভালবাসার আঙ্গিনাকে—বহুত মিনতিতে রাঙ্গিয়ে তুলেছে।

রূপসাগরের পারাপারে কল্পনার মনপবনের ভেলায় চড়ে বসন্তের ফাগরাঙা যে সমস্ত যৌবন—ন্যায়ের আর ধ্যানের মধ্যে প্রস্ফুটিত হোয়েছে সুবোধ ঘোষের প্রজ্ঞার প্রমিতিলোকে, সেখানে ভাবের শ্রেষ্ঠতম মঞ্জুষায় সালঙ্কৃত হোয়েছে—কথাযান "ত্রিযামা"। আলোচনায় এই উপন্যাসকে অভিন্দন জানিয়ে বলব, এর কথা সমস্ত জাগতিক নিছকতাগুলোকে কাটিয়ে উঠে এক সঘন আদর্শলোকের গুঞ্জরণে, মঞ্জুল চিন্তার রূপকথায় হোয়েছে পর্য্যবসতি। ন্যায়ের নিক্তিতে এর প্রতিটি চরিত্র পরীক্ষিত হোয়েছে। স্রষ্টা এখানে মানুষের ভালমন্দ পরিচয়ের 'কৃষ্টাল' রূপ থেকে বিচার কোরে দেখাতে চেয়েছেন—নির্মোকে ঢাকা কতকগুলো প্রাণের অন্যায় জিদ্ ও অমাবৃত চাওয়া ও পাওয়ার ইতিহাসটাই—মানুষের শেষ কথা,—না সুস্থ চিন্তায় জাগা নম্র বৃত্তির হৃদয়-সর্বস্ব স্নেহ ভালাবাসার মমতা প্রভৃতির উপচিকীর্ষা রূপটিই হোল আদি ও অন্ত মানবিক কথা ? শেষোক্ত ধারণারই শিবময় অস্তিত্বে বিশ্বাসী থেকে কথাশিল্পী এখানে তাঁর আপন রূপকথার জগত আলোকিত কোরে তুলেছেন। স্বরূপা ও কুশলকে নিয়ে মা মিত্রাদেবী, বিজয়বাবু, রাধেশবাবু, পাঠকজী প্রভৃতির স্বত্ব-স্বীকৃতি মানবিকতার জয়গানকে মুখর কোরেছে। মানবতাবাদী সুবোধ ঘোষের অন্যায়ের দর্পণে বিম্বিত "জীবন হোল সোনার গয়না, ডিজাইন বদলানই সুখ"-এ মতাবলম্বিনী নন্দা দেবী, "এই জীবন একটা স্পোর্ট, ইয়ে জিন্দেগী হ্যায় খেলে"র ঝানু খেলোয়াড় দেবী রয়, "জীবন হোল টাকা, আরো টাকা"র জন্য সর্বনাশা পথের অনুসন্ধানী মৃগেনবাবু, মায় "জীবন যেন রঙীন সুখের ছুটন্ত স্বপ্নে"র ধারণায় মশগুলা নবলার উগ্র আধুনিকা মূর্তি পর্য্যন্ত—ন্যায়ের চাবুক হেনে তাদের দুস্কৃতির অনাদর্শগুলোকে অচলতায় প্রস্তরীভূত ফসিল করাতে পেরেছেন। এদের প্রত্যেকেরই জীবন ও কাজের মধ্যে ছিল—ছন্নছাড়া অসংগতি। ভুল তারা কোরবে তাদের অন্যায় জীদ্ রক্ষার জন্য, তবু তারা রাজী নয় ভালো হোয়ে মন্দত্ব ত্যাগ কোরতে। আপন কৃত কর্মের জন্য তারা ভুলের মাশুল গুণতে তৈরী নয়। সমস্ত অনর্থের মূল যে অর্থ, তারই রূপালী চাক্‌তির ঝন্‌ঝনানীর মধ্যে দম্ভ, অন্যায়, হঠকারিতা, কপটতা, মিথ্যাচার, অভাবনীয় নোংরামি এবং যতপ্রকার কু-বৃত্তিগুলো আছে—তারাই আজকের দিনে

প্রতিধ্বনিত হোচ্ছে বাস্তবের বড় করুণ এক ইতিহাসে রূপে।—তবু ও-গুলোকে সময়মত ভেঙ্গে গুড়িয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় সুন্দর পৃথিবীর সুন্দরতম আদর্শঘরের কথা। আর তখনই জীবন যে একটা বিশ্বাস, এমনই বিরাট ও ব্যাপক ধারণার অখণ্ডত্বে বিশ্বাসী বিজয় মুখার্জীর জীবনধর্ম বলতে পারে—"সুন্দর, তুমি আমার বিশ্ব"। সব চাইতে ভালো লাগে যখন দেখি "ত্রিযামা"র মানবিক দৃষ্টি এই পরিণত বয়স্কের অভিজ্ঞতার আলোয় আপন আত্মজ কুশলের যৌবনকে ধ্যান-স্নাত হোতে বাধ্য করাতে পেরেছিল শেষ পর্য্যন্ত মধুকন্যা স্বরূপার বহু প্রতীক্ষায় অগ্নি-পরীক্ষিত স্বর্ণালী প্রেমের আভায়—যা ত্রিযামার তিনটি যাম পরম্পরায় প্রণয়ের অর্ঘ্যে, স্থৈর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে—সর্বোপরি রমণীয় ঔদার্য্যে বাস্তবের যৌবন বাসরের—পূর্ণমিদম্ অভিধায় হোয়েছে অভিষিক্ত। আপন আত্মজের দিশাহীন সবুজ জীবনকে কি ভাবে একদিন তারই স্নেহধন্যা প্রজ্ঞাপারমিতারূপে স্বরূপার সব ভাবনার দ্বিধা ও শঙ্কার শেষে তার মধুরিম ছন্দের মধ্যে অন্‌চানানো হৃদয়ের নম্র স্নিগ্ধ বাসরে যে অসম আন্তরিকতার সঙ্গে করাতে পেরেছিলেন—দু'টি তাপিত যৌবনের "করোনেশন্ অফ্ লাভ থ্রু অ্যাডোরেশন্'—সে সবই পৃথিবীর ও-পারে থেকে বিজয় বাবুর অখণ্ড বিশ্বাস আরো গভীরে, আর এক বিরাট অনুভূতিময় বিশ্বাসে খুঁজে পেয়েছিল নিশ্চয়ই।

আমরা রূপলোকের প্রণয়রাগের মধুবাতা ঋতায়ত মঞ্জুলিক রভসে মুগ্ধ থেকে বলব—সুবোধ ঘোষের শৈল্পিক চিন্তায় প্রতিভাসিত জীবনের দার্শনিকতা তার গভীরতায় ও মিতিময় প্রমুক্ততায় "ত্রিযামা"কে কোরে তুলেছে—আধুনিকতম যৌবন দেশের এক চিরায়ত ভালোবাসার দলিল। এর ভাবে-বিভাবের প্রতিটি অণু-পরিক্রমা সবুজ জীবনের বসন্তমাদক প্রেমরাগকে অনুরাগের কষ্টিপাথরে সাজিয়ে ধরেছে—শিবময় সাংকেতিকতায়। তিনি শিল্পীর মানসদর্শনে তাঁর রচিত অন্য কোন কাহিনীর রূপচর্চায় যা করেন নি—এই "ত্রিযামা"য় কিন্তু এক ভাবাকুল শিল্প-স্থাপত্যের প্রতীক-দ্যোতনার সহযোগে চিন্তাকুল করিয়ে তুলেছেন—যৌবনের রাজটীকায় সাজা যুবতীকে দিয়ে—উতাল-মাতাল যুবকের প্রমত্ততাকে। সে প্রমুগ্ধতাকে শেষ প্রহরের শান্তির সুনিকেতনে শ্রীময় কোরে আশ্লেষের আনন্দে টেনে আনার জন্য সংগ্রামী দেহ-মনের দ্বন্দ্বমধুর রূপকথা পর্য্যন্ত। আমাদের মতে প্রতীকের উদ্দেশ্য হোল মানুষের জীবনের চল্‌তি পথের কতকগুলো নিশানায়—দিশা ফুটিয়ে তোলার—বিনিদ্র প্রহরীত্ব। যান্ত্রিক প্রেম যখনই পথ হারাবে ক্লান্তিতে, অবসাদে কি পরাজয়ে—তখনি প্রতীকের সচল সংকেতময়তাই তাকে ভাবিয়ে ভাবিয়ে পথের সন্ধান পাইয়ে দেবে। এরই নাম 'সিম্‌বলিজম্'। আমার ধারণায়, জীবনের চলার পথেতে সকলেরই মধ্যে সুপ্ত থাকে এর প্রভাব। সাহিত্যই তাকে বারে বারে প্রকট কোরে তুলে দেখায়। "ত্রিযামা"ও সে কথারই রণনে আবিষ্ট হোয়েছে—সর্বোপরি বিশ্বাসই হোল জীবনের

মানে, —এমনি নিরীখে সাযুয্যমান দুটি ভিন্ন রীতির বাসন্তিক সুরসঙ্গম রূপে—কুশল ও স্বরূপার—ভাল লাগা ভালোবাসার রূপবিবর্ধনে। তাদের পঁচিশ ও তেইশ বসন্তের ঋতুভারে দ্বন্দ্ব-করুণ হোয়ে পড়া দুটি স্বত্বারই একেতে অদ্বিতীয় হওয়ার তাগিদে—পরে হোয়েছিল সংকেতানুসন্ধানে মিতালিমধুর। 'ত্রিযামা'র সমাপ্তির শেষ যাম পর্য্যন্ত কল্লোলিত-কান্তি গঙ্গামূর্তির দেবিকা সত্বাকে অশেষা মানবিকার লাজাঞ্জলি ভরা কাকলি মুখরতায় ভরাতে পেরেছিল—পুরুষ প্রতিমের জন্য—সত্যরূপের আরাধনা। কুশল নয়াক। তার থেকে বড় কথা—সে প্রত্নতাত্বিক। তার যৌবনে সবুজ পঁচিশটা বছর 'হরভবনে'র প্রত্নতত্ত্বশালায় খুঁজে পেয়েছিল এক সুস্মিতা দেবিকার ধোঁয়া রঙ্ পাথরের ক্ষুদিত মূর্তি। ও চিল গঙ্গা। কিন্তু তার মনে প্রশ্ন জেগেছিল নিজেরই প্রেমার্তির দুনিয়া রাঙিয়ে—গঙ্গা আছেন, কিন্তু গঙ্গাকে যিনি বক্ষে ধারণ মানসে বাম হস্তের আকর্ষণে কাছে টানেন—সেই গঙ্গাধর কোথায়?—আমাদের মতে, জীবনের পার্থিব চাওয়ার সুনীল আকাশ হোয়ে উঠেছিল সংকেতময় এই গঙ্গাধর মূর্তির পরিকল্পনায়, ও তার জন্য প্রণয়ে সিক্ত সোনার কাঠির—ধৃতিসাঙ্গ অন্বেষণে। এই ধৃতিই ত কৃতি করাবে সহাসিতা গঙ্গার কল্লেলিতা কান্তি আর শান্তিকে। মৃন্ময়ী কেন চিন্ময়ী হবে না! হবে না কেন হিরন্ময়ী! তাই আপনার নিজের ছোট জগতের সঙ্গে আপনারই একটা ব্যাপ্তির মানসিক বিবাদ কুশলকে দিনে দিনে কোরে তুলেছিল নিজেরই আদর্শের জন্য সংগ্রামে ও কাজের নৈষ্ঠিক 'প্রোগামে'—অবসাদগ্রস্ত। অসহনীয়। স্বজনের মধ্যে সুজন থেকেও না হোয়ে পারেনি—বিজনময়। ব্যাপ্তিতে এসেও সে খুঁজেছিল নিবৃত্তি। ধীরে ধীরে হচ্ছিল অশান্ত ঘুর্ণি। কিন্তু বেশীদূর এগোবার মাঝে একবার অন্তত কুশলের উষ্ণ প্রাণের তপ্ততা মাতাল না হয়ে পারে নি এক হ্লাদিনীর শ্রান্তি ঝরা বাদল ধারায়। বৃষ্টিতে সিক্ত করিয়েছিল স্বরূপার নরমে আর শরমে রঙীন প্রেমাকুলতা। আজকের আধুনিক যৌবন তার আধেয়কে উর্ম্মিমালায় অস্থির চঞ্চল না কোরে শ্রান্তি দেয় না! "ত্রিযামা"র কুশল তারই সবুজ প্রতীক। আর যুবকের এই স্বত্বময় অবসাদ থেকে মুক্তিতে সুক্তির মুক্তা হোয়ে ফোটায় যে সলজ্জ ও সম্ভ্রমিত প্রাণকণা—সে হোল রূপেরেখায় সবুজাভায় ঝলকিতা—সুস্মিতা স্বরূপা। কুশল সে কথা বুঝতে বাধ্য হয়েছিল। তাই "ত্রিযামা"র রূপলিপিকা থেকে দেখি—"ঘরের অদৃশ্য বাতাস নয়, কল্পনাও নয়, সত্যি সত্যিই দুটি হাত অলক্ষ্যে এসে হঠাৎ বন্দী ক'রে জড়িয়ে ধরেছে স্বরূপাকে। শিউরে উঠে স্বরূপা, মাথা হেঁট করতে গিয়ে খোঁপার দোপাটি খসে পড়ে যায় মেঝের উপর। ...এতদিন যেন বহু সন্ধানের পর, দুটি পরিশ্রান্ত সত্তা পথের দু'দিক থেকে এসে একই পান্থশালার আলোকের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। আর হঠাৎ দেখার আনন্দে শান্ত হয়ে গেছে। ...একেবারে শান্ত। দেয়ালের উপর দু'টি ছায়ার নিবিড় সান্নিধ্য একেবারে নিশ্চল

হয়ে আছে, দু'জনের মাঝখানে একটা বাতাসের রেখাও আর ব্যবধান হয়ে নেই। ...যদিও চোখের দৃষ্টিতা ঝাপসা হয়ে ওঠে কুশলের, তবুও ঐ ছায়ার দিকে তাকিয়ে আজ একেবারে স্পষ্ট করে বুঝতে পারে, যেন দশ বছরের জেদকে, ভালবাসার একটা নীরব তুফানের মূর্তিকে সে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। ধরে রাখবার অধিকার আর শক্তি এসেছে তার জীবনে, এতদিনে। দাবি করে না, জোর করে না, পথ রোধ করে না, পথের পাশের ফুলবনের মত সুরভিত হয় পড়ে থাকে যে ভালবাসার মন, তারই একটা রূপকে যেন বক্ষোলগ্ন ক'রে রেখেছে কুশল। কি কঠিন আর অপার্থিব, অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল এই মূর্তিকে! কিন্তু সে-ই তো আজ দুর্লভার ছদ্মবেশ ছেড়ে দিয়ে এতদিনে এসে ধরা দিয়েছে একটি সাধারণ মেয়ের লাজুক শরীর আর অলাজুক মনের মধুরতা হয়ে।—স্বরূপা।...কুশলের ডাক কানের কাছে বেজে উঠলেও মুখ তুলতে পারে না স্বরূপা। তার চোখের দৃষ্টি পড়েছিল কুশলের পায়ের দিকে। যেন মনে পড়ে গিয়েছে স্বরূপার ঐ পায়ের কাছে তার একটা দেনা রয়ে গেছে, যে দেনা সেদিন শোধ করতে পারে নি, প্রণাম না ক'রেই দুয়ার থেকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল কুশলকে। ...শান্তস্বরে ও অনুনয়ের সুরে স্বরূপা বলে—ছাড়, প্রণাম করতে দাও। ...কুশল—প্রণাম তো চিরকালই ক'রে এসেছ। ...স্বরূপা—আজ নতুন ক'রে আমার প্রণাম নাও। ...কুশল—নতুন ক'রে কেন? ...এই প্রশ্নের উত্তর জানে স্বরূপা, কিন্তু জানাতে পারে না। পুরনো অভ্যাসের জন্য নয়, লৌকিকতার নিয়ম রক্ষা করার জন্য নয়, তার জীবনের দাবিটাই যে এতদিন পরে প্রণাম হয়ে নেমে পড়বার সুযোগ পেয়েছে। ...আগের জীবনে আর আজকের জীবনে তফাৎ আছে অনেক। যে প্রণাম ছিল আবেদন, তাই আজ নিবেদন হয়ে উঠবার লগ্ন লাভ করেছে। নতুনতর এই পরিণামের কাছে প্রণামও নতুন হয়ে উঠবে বৈকি। ...প্রশ্ন করে কুশল—আমাকে ভালবেসেছে, তাই না? ...স্বরূপা—না, তার জন্য নয়। ... কুশল—তবে? ...স্বরূপা—তুমি ভালবেসেছো, তাই। ...দেয়ালের উপর দুটি সন্নিবদ্ধ ছায়া আবার কয়েকটি মুহূর্তের মত চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রণামের সুযোগ পাওয়ার আগে হেঁট মুখ তুলতে হয় স্বরূপাকে, সরিয়ে নেবার সামর্থ পায় না, ইচ্ছাও হয় না। রাঙা হয়ে ওঠে সারা মুখ, খোঁপা থেকে আরও কয়েকটি দোপাটি খসে পড়ে মেঝের উপর। সত্যি সত্যিই তার প্রণামের জীবনকে একেবারে নতুন ক'রে দেবার জন্যই যেন ভোরের আকাশ প্রান্তের মত একটি উৎসুক পিপাসার স্পর্শ এসে উষ্ণ ক'রে দিয়েছে তার ওষ্ঠাধার।"—

ওপরের এই রূপলিপিকার মধ্যে একদিকে প্রকাশ পেয়েছে তার ছোট শহর মহারাজাপুরের সমস্ত কিছুকে দূরে সরিয়ে দেওয়া—আনন্দ-সদনের ছেলে—আর ফুলবাড়ীর মেয়ের যৌবনে অভিষিক্ত রূপে-অরূপে ঝলমলানো প্রণয়কুট্টিম

আদর্শটি—আর অন্যদিকটি আলোক-সম্পাতের প্রণিধানে বুঝাতে পেরেছে, প্রেম ভালবাসার অন্তরঙ্গ সত্বার লিপিময় অলঙ্করণের অশেষ হৃদবৃত্তির মধ্যে সাজানো এ হেন রচনার ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে—সুবোধ ঘোষ অনন্যসাধারণ। প্রণয়রীতির সবুজে আর রক্তিমে প্রতিভাসিত হৃদয়সর্বস্বতায় রূপদক্ষ সুবোধ ঘোষের মাধুরীসৃষ্টির শিল্পকাজ তাঁর আজকের সমস্ত রচনায় অশেষ-বিশেষে সরবে স্বাক্ষরিত থাকলেও, মনে হয় এ ধারার শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত আছে "ত্রিযামা'র মধ্যে। কেন না প্রণয়ের কথার যে মহৎ আদর্শ, তার উদার ব্যাপ্তি আর সত্য প্রশান্তির বোধে সব রকম দ্বন্দ্ব আর ভ্রান্তি থেকে শ্রীময় শান্তির রূপঝরা ভুবন হোয়ে উঠতে পেরেছে—তা ভাবে ও অপরূপতায় স্রষ্টার মানবিক দৃষ্টিতে না হোয়ে পারে নি চিরায়ত আবেদন, নিবেদন মায় প্রতিবেদন। তাই গঙ্গার জন্য গঙ্গাধরের মূর্তি কল্পনার যে সংকেতটি জাগরূক হোয়েছিল কুশলের মনে উতাল স্বভাবকে ঘিরে, তাই শেষ পর্য্যন্ত তার মিউজিয়ামের হর্ম্যতলে দাঁড়িয়ে সুন্দর ভাবে পরীক্ষিত হয়ে উঠে। সুস্মিতার শুচিতায় মায়ারাগ ঝরা দেবিকা মূর্তির গঙ্গা রূপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল নির্জনে প্রতীক্ষারতা— স্বরূপা নিজে। এই দুইয়েরই রূপ দেখেছিল সেদিন কুশল তুলনামূলক ভাবে হৃদবৃত্তির তাগিদে। একজনা হোল পাথরে গড়া নিষ্প্রাণ রূপ—কিন্তু আরেকজনা ছিল।

দেহ-মনে-যৌবনে সলাজুকা প্রাণের বিপ্লব ভরা লহরদল। তাই মূর্তি পাষাণীর মধ্যে অহল্যার জাগরণ কখনো দেখতে না পাওয়া কুশলের তাপিত চোখ সত্যি দেখতে পেয়েছিল, এই স্বরূপার চোখের মেঘমেদুরতা জলের সিক্ততা নিয়ে নির্ঝরণী হোতে প্রস্তুত। তাই শেষ মুহূর্তে কুশল মনের সমস্ত বিষাদ আর যন্ত্রণাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বলতে পেরেছিল—"না ডাকতে যে বার বার এসেছে, অনেক ভুল ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছে, বীরভদ্রের কঠিন পাথুরে হাতের আঘাতে বিক্ষত এই কপালেই হাত বুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে, অবিশ্বাসের ধূলো ধুয়ে মুছে দিয়েছে স্রোতধারার মত, তারই কাছে গিয়ে শুধু বলে দিয়ে আসা—তুমিই ত গঙ্গা।"—হ্যাঁ, কুশলের জীবনের দীর্ঘ পঁচিশটা বছরের জেদ আর তৃষ্ণাকে শেষ পর্য্যন্ত শান্ত আর স্নিগ্ধ করাতেই— স্বরূপার দেহমনের তেইশটা বছরের বসন্তরূপই হোয়ে উঠেছিল তার 'প্রাণের গঙ্গা', সেই সঙ্গে—কল্লোলিতা কান্তি! গঙ্গাধরের সাংকেতিকতায় কুশলেরই যৌবনের রূপরেখায় বামবাহুলীনার মধ্যে এসে —স্বরূপার মনের গরিমা যেভাবে আবেশনির্ঝর হোতে পারল—তা "ত্রিযামা"কে প্রেমের অশেষ দীপাধার কোরে মুঠো মুঠো রূপবর্ণনায় ঝরিয়ে দিয়েছে—হৃদয় থেকে পুনরায় মননে। মনের গহনতায়।

হৃদয়ের রস নির্ঝরণতার আবেদন কাথাশিল্পীর সৃষ্টিকে আবেশের রূপসাজে মহৎ জীবনের কথা পরম্পরায় মানবিক কোরে তোলে—এই চিন্তারই অশেষ উপলব্ধির জগতে প্রণয়কুট্টিমতায় আকুল করিয়েছে, বিহ্বল করিয়েছে বিলোলতার

রাগলতায় কথাযান "ত্রিযামা"র রূপযানী সাংকেতিকতা। অশেষ বিশ্বাসের সঙ্গেই বলতে পারি, কুশল সমীপে স্বরূপার কল্লোলিতা কান্তিময়ী হ'য়ে ওঠার ইতিকথার শেষকথা জুড়েই রয়ে গেছে—ভালোবাসার রূপ কাঠি ধরে এগিয়ে চলা প্রাণময় সাংকেতিকতাটি। যে প্রণয় সবুজে আর্তির পলাশ রাঙিয়ে সিদ্ধপথের দিশারী হয়, বিনিদ্র প্রহরীর মত প্রতিটি উপদ্রব থেকে রক্ষা করায়—তারই অপর কোন নাম হোল প্রতীকধর্মী ভালোবাসা! রূপদক্ষ কথাকারের শিবচিন্তা এই "ত্রিযামা"র আধুনিক রূপকথার মধ্যে সমস্ত কুচক্রান্তের আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা যৌবনে স্বতঃস্ফূর্ত 'ক্রুসেড্' সম্পন্ন করাতে পেরেছে—যার আয়ুধ ছিল—ভালবাসা নামক নম্রে নির্মম বিশেষ কিছু। আর জীবন সম্পর্কে অখণ্ড বিশ্বাসের অশেষ কিছু অবিচলিত মিততা। তাই দেখি এরই আলোর বৃত্তে শ্রান্তি খুঁজে পেতে ত্রিযামা রাত্রির শেষ যামের মুখোমুখি কুশল তার ভালোবাসায় সক্রিয় হয়ে নিজে হোতেই এগিয়ে এসে আত্মসর্মপণ করাতে পারল অনায়াসে—স্বরূপার ধীময় চাওয়ার শ্রীমতার সুনিকেতনী সত্ত্বায় জাগ্রত বহৃত আকুতির আরাধনার মধ্যে। তাই দেখি—"স্বরূপাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কুশল বলে—আমাকে আর আমার ভালবাসাকে বিশ্বাস করলে, আর আমার হাতে ধরা দিলে, সে কি শুধু আমি আজ নিজে থেকে তোমার কাছে এসেছি বলে? ...স্বরূপার চোখের তারায় অদ্ভুত এক হাসিভরা হর্ষের বিদ্যুৎ যেন ঝলক দিয়ে ওঠে।—তুমি কথা দিয়েছিলে, আমার কাছে নিজেই আসবে। বড় লোভ করেছিলাম আমি, যেন একদিন তুমি নিজের থেকেই আস। কিন্তু তোমার কথা আর আমার লোভ হেরে গিয়েছে কুশল, তুমি আসতে পারনি। তোমার আমার সব চেষ্টার ওপর যার ইচ্ছার জয় হবে চিরকাল, তারই ইচ্ছার দান হয়ে তুমি আজ এসেছ, না হলে আসতে পারতে না। ...স্বরূপাও যেন তার আগল খোলা মনের আবেগে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে—বিনা কারণে যাকে ভাল লেগেছিল, না বুঝে যাকে ভালবেসে ছিলাম, আর সব বুঝেও যাকে এগার বছর ধরে খুঁজেছি, তুমিই ত সেই! বিশ্বাস করি কুশল, ফুলবাড়ির মেয়েকে ভালবেসেছ তুমি। আমি ব্রজ নই, গঙ্গাও নই, কিন্তু তুমিই ত আমার ...।"

ভালবাসা জিনিসটা যে অণু থেকে পরমাণু পর্য্যন্ত এক সূক্ষ্মতম অনুভবের আধার—এ কথা অনন্য মাধুর্য্যের বিভূতিতে সেজে প্রণয়রীতির ঋতুঘেরা সাজঘর হোয়ে তুলে ধরেছে কুশলের মঙ্গল কামনায় স্বরূপার খুশী ঝলমল মনেতে, আর তৃপ্তিতে রিমঝিমানো দেহেতে। আধুনিক যুব-মানসের দ্বন্দ্বে করুণ অথচ দিশা ফিরে পাওয়া ঐকান্তিক আত্মীয়তার মধ্যে যে ঋতুময় বিহ্বলতাগুলো সত্য, সুন্দর মায় শিবময়তায় মুখর হয়—তারই প্রিয়কথার মধ্যে রূপকথায় অভিষিক্ত হয়েছে সুবোধ ঘোষের এই "ত্রিযামা" উপন্যাস। কথাশিল্পীর রূপচর্চার লিপিবিলাসের ধৃতি-সাঙ্গ

হৃদয়-নির্ঝরণতার আমেজ থেকেই এই মধুর হোতে রসমধুরিক সংকেতময় মানসদর্শনটির প্রেম-প্রণয়ের শেষ কথায় জানতে পাই—"ত্রিযামা রাত্রি শেষ হ'য়ে আসে। কামরাঙা গাছের পাতার ঝোপে উসখুস করে ঘুম-ভাঙা নীলকণ্ঠ। লেখা থামিয়ে টেবিলের কাছ থেকে উঠে এসে জানলার কাছে দাঁড়ায় কুশল।...জানলার কাছ থেকে সরে এসে আবার টেবিলের কাছে বসে কুশল। আবার কলম হাতে তুলে নেয়। মহারাজাপুরের এই কর্পূরবাসিত রাত্রি শেষ হ'য়ে ভোরের আলোক ঝলক দিয়ে উঠবার আগেই রূপতত্ত্বের উপসংহার লিখে শেষ করতে থাকে কুশল। ...কল্লোলিতকান্তি গঙ্গার দুটি অপলক চোখের হাসিকে অনেকে প্রথমে দেখে ভুল বুঝতে পারে, কারণ অনেকেই এই মূর্তির আসল ইতিহাসটুকু জানে না। এমনিতেই দেখে ধারণা হয়, ব্রঞ্জের এই গঙ্গামূর্তির যেন কারও প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে তাকিয়ে আছে দূরান্তরের পথের দিকে। যেন কেউ আসছে, একদিন না একদিন আসবে। তারই প্রতীক্ষা। কিন্তু সে-আকুলতায় ও-রকম হাসি থাকতে পারে না। কপোল ও চিবুকের গঠনভঙ্গীর মধ্যেও তা হলে একটু বেদনা না থেকে পারতো না। চৌধুরী সাহেবের ধারণাই নির্ভুল বলে মনে হয়। ব্রঞ্জের গঙ্গা যুগলমূর্তির একটি, পাশেই ছিল গঙ্গাধর, এবং তারই বামবাহুর উপর গ্রীবাভারে সঁপে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল গঙ্গা। ...গঙ্গার চোখের হাসি হলো পরম নির্ভরতার প্রসন্ন রূপের হাসি। আমি এক নই, তুমি আছ আমার পাশেই, তুমি সুখী হ'লে আমি সুখী, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, এই অবিচল বিশ্বাসে ভরা প্রাণের হাসি।"

সবুজে উচ্ছল কোন সমবয়সী যুবকের হৃদয়ে ভালবাসার পলাশ ফোটাবার জন্য ঐকান্তিকতায় স্থৈর্য্যময়ী এক সুন্দরী সুস্মিতা রূপে মধুঋতা স্বরূপার প্রণয়াভায় ঝলমলানো "ত্রিযামা"র উপসংহারে দেখেছি তৃপ্ততায় খুশীবিভোর যুবক কুশল 'রূপতত্ত্বে'র অলোচনা লিখে শেষ করার জন্য হয়েছিল ব্যস্তসমস্ত। সত্যি এই পৃথিবী হাজার এক রূপে আর অরূপের আভাসে ও বিভাসে ধ্যানস্নাত। মৌনে সমাহিত। এই নিরীক্ষা থেকে বলব-শৈল্পিক ঋদ্ধির আধুনিকতায় রূপমদির থেকেও আজকের সুবোধ ঘোষের চিন্তার নৈষ্ঠিকতা তাঁকে অনন্যধারার প্রবক্তা কোরে তুলেছে যৌবন দেশের মধুরিম আশ্লেষের বহুবিচিত্র কথা ও কাহিনীর গুঞ্জরণে। শিল্পায়ণে। রূপতত্ব এমন এক অভাবনীয় জগতের ব্যাপকতা ধরে ক্রমঃপ্রসারে পরিচায়িত হয়, যার বিরাটত্ব ভূমার সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ। এই রূপতত্বকে বিশেষে আর অশেষে যৌবনের প্রেম-পরিণয়ের আধার ধরেই মানবপ্রেমী সুবোধ ঘোষের বর্তমানের প্রতিটি কথাসাহিত্যিক প্রতিদান সৃষ্টির কারুকাজ সমেত স্রষ্টার অনিন্দ্য মানসিকতার অনন্যসাধারণত্বকে স্বাক্ষরিত কোরে চলেছে। আমি জোর দিয়ে বলব—যৌবনের সজীবে সবুজ ভালবাসার সাহিত্যিক পারিকল্পনায় সুবোধ ঘোষের ভাব ও বিভাব চরম আদর্শবাদীর

স্বনিষ্ঠায় আপ্লুত। এ প্রেম যখন গল্প শোনায়—তখন তা চাওয়া পাওয়ার নিঃস্বার্থতার মিতাচারে স্থির। শুদ্ধাচারে ধীর। মূল সুরের সুরেলা লহরদলে ছুটানো প্রেমার্তিকথা যেমন হৃদয়ের রসে টইটম্বুর, তেমনি সে সবের শিল্পরীতিগত ভাব তীব্র অনুভূতির পারিপাট্যে, আর তারই নরমে ও শরমে দোলা জাগানো ভাষা প্রয়োগের অপার কুশলতায় অনন্যতাকেই প্রকাশ কোরে চলেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে আমরা যাকে 'নভেলেট্' বলি, তাকে বাঙলায় বলতে পারি ছোট উপন্যাস বা বড় গল্প। এমন রীতির ছোট উপন্যাসের ভেতরে সুবোধ ঘোষের "একটি নমস্কারে" "বহুত মিনতি" "সীমন্ত সরণী" "মীনপিয়াস" "নাগলতা" "রূপসাগর" "নবীন শাখী" "শুন বরনারি"র আপন পরিবেশ সৃষ্টির চমৎকারিত্বের ও কাহিনীর বিচিত্র সুরের মনোহারিত্বে, আর সবুজ জীবনেতিহাস ভোরের শুকতারা ফুটে ওঠা থেকে আরম্ভ কোরে পরস্পরের উচ্ছল প্রাণের শুভসন্ধ্যায় আরাধনা জানানোর যে মিতালি-মধুর কাকলি রবাবে মুখর হওয়ার রূপতত্ত্ব রাঙিয়ে গেছে—তার তুলনা একমাত্র এ সব কাহিনীর স্রষ্টার কাছেই মেলে। অন্যত্র নয়।

আজকের দিনে এ কথাটি অবিসংবাদিত রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে যে—গল্প রচনায় এক সবিশেষ স্টাইলের উদগাতা রূপে—সুবোধ ঘোষের প্রতিভার অনিন্দ্য কথা সর্ব শ্রেণীর পাঠকমানসে ব্যাপ্তির প্রশান্তিতে ভরিয়ে, আর আমেজরাঙা কোরে রেখেছে। বাঙলা ছোটগল্পের দুনিয়াদারি তাঁর শিল্প-ঋদ্ধির আলোয় একটি স্বতন্ত্রতা ফোটাতে পেরেছে। সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প বিশ্লেষণের ব্যাপারে 'বীরবল' প্রচারিত কানুনে বিচার করা মোটেই যায় না। কেন না গল্প রচনায় শুভযোগে দুটি রীতি মেনে চলার, অর্থাৎ তার আকারের স্বল্পত্ব ও প্রকারের গল্পত্ব নিয়ে সুবোধ ঘোষ কোন রকম বন্ধন কোথাও স্বীকার করেন নি। আর তাই তাঁর রচিত সেদিনকার "ফসিল" কি "অযান্ত্রিক" কি "জতুগৃহ" থেকে আরম্ভ করে অতি সাম্প্রতিক গল্পগুলো পর্য্যন্ত যে কোন ভাবনার মুক্ত রসস্বরূপ একটা ব্যাপ্তির উদার প্রসারতার মধ্যে প্রশান্তির ব্যাপকতাকেই সাজাতে পেরেছে। গোছাতে পেরেছে এই সমীক্ষায় তাঁর লেখা "বৈদেহী" "কুসুমেষু" "কথামালা" "চোখ গেল" "অর্কিড" "খদ্যোত" "স্নানযাত্রা" "শ্মশানচাঁপা" "মনোলোভা" "ছায়া" ও কায়া" "সতী ঠাকুরণের ভিটে" "মনোবাসিতা" "সায়ন্তনী" গল্পগুলো ভাবে, ভাষায়, রূপে ও রূপকে এক একটা যৌবনেতিহাসের প্রণয়দ্যোতক কুট্টিম হোয়েই সৃষ্টি হোয়েছে বলে অভিহিত হবে। সেই সঙ্গে কোন একটি আন্তর্জাতীকতার ধী-ময় ও শ্রী-ময় রূপারূপেতে পরিব্যাপ্তি পেয়েছে। পুনরায় আর একবার আমরা এ কথাটি বলতে চাই যে,—যুবক যুবতীর ভালো লাগা জগতের ঋতুসুন্দর ভালবাসার আদর্শভরা ছবির চিত্রাঙ্কনের মধ্যে অনন্য পরিবেশ ও আবেশ-নির্ঝর ফোটাতে—ইদানিংকালে বাঙলা সাহিত্যে সুবোধ ঘোষের

কবিকল্পনা ও প্রতিভার রোমন্টিক দৃষ্টিনিমেষ অনন্যতার অলঙ্করণই কোরেছে। তাই আর একবার তাঁর অন্য একটি রচনার থেকে উদাহরণ দিতে চাই। "একটি নমস্কারে"র কথাই মনে পড়েছে এ ব্যাপারে। গত স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে গ্রাম-বাঙলারই অনামধেয় কোন কাঞ্চীপুরের একজন সংগ্রামী যুবকের আত্মত্যাগের মহিমাধারায় এর কাহিনী—গল্প শুনিয়েছে। একটা কথা আমাদের মনে পড়ে—দেশপ্রেমের আগে প্রয়োজন—সংগ্রামীর জীবনেতে—যৌবনের ধ্যান করা privacy রাঙানো কোন সুচরিতার কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়ার ও দেবার পরিপূর্ণতাটি! সত্যি, ব্যক্তিক প্রেম হলো সবার আগে! দুটি "ইনডিভিজুয়াল" প্রাণ যখন ভালোবাসার চাহিদায় পূর্ণতা পায়, তখনি সম্ভব মুক্ত মনে আর নিঃস্বার্থতায়—দেশপ্রেমের সংগ্রামী জোয়ারে নেবে সেনা হওয়া, কি সেনানী হওয়াটা।—"একটি নমস্কারে"তে মানবপ্রেমী সুবোধ ঘোষ এই ধারণাকেই মহিমান্বিত করে এঁকেছেন। অনেক সময় ভেবেছি এই ছোট আয়তনের মধ্যে অত বড় একটি যুগ-মানসের সংগ্রামী ইতিহাস সমেত—নায়ক প্রবীর ও নায়িকা সোমার—প্রেমার্তির ভুবনকে রূপে ও রসে যে ভাবে অনুরঞ্জন করাতে পেরেছেন এর রচয়িতা, তা তাঁর অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষরকেই জোরালো কোরে গেছে। এর কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে নায়কের কারাবাসের মধ্যে, যখন নায়িকা সোমা একটি নমস্কারের প্রণতি জানানোর মধ্যে পরমপুরুষের জন্য প্রতীক্ষারতার আরতি নিবেদন করাতে পারলো প্রীতির অকপট আকুতির ঝড়ে। কাহিনীর মাঝে দেখেছি কি সুন্দর মানসকি তৃপ্তির তুফানে উড়িয়ে এনেছিল প্রবীরের চব্বিশটা বসন্তে আনচান করা তার কবোষ্ণ ছোঁয়াচের শুচি-স্নিগ্ধতায়—সুন্দরী সোমার বাইশটা গ্রীষ্মের তপ্ততায় মাতাল করা যৌবনবল্লরীর সুখাবেশকে।—"মৃদু দীপালোকের পেলব স্পর্শে এই মুহূর্তগুলি যেমন মধুর, তেমনি মধুর সোমার পেলবতর স্পর্শ। কাঠুরিয়ার মাণিক কুড়িয়ে পাওয়ার মত প্রবীরের জীবনে আকস্মিক এক উপহার। সোমাকে বুকের কাছে নিবিড় করে টেনে নিয়ে প্রবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—শুধু এরই জন্য আমি বাঁচতে চাই সোমা, এই প্রাণটার হেস্তনেস্ত করতে চাই না।...... দুটি ব্যগ্র বাহু দিয়ে ঘেরা এই ক্ষণিক স্বপ্নের আক্রমণের কাছে নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করে সোমা। মনে মনেই বলে—এর জন্যই যে আমিও এই হাহাকারের মধ্যে মরেও বেঁচে আছি।......প্রবীর কথা বলে, কথাগুলি শান্ত হাহাকারের মতই শোনায়—আজ আমি তোমায় চলে যেতে দিতে চাই সোমা, কিন্তু......। ......সোমার মনটাও নিঃশব্দে হেসে ওঠে বোধ হয়। এ তো বেশ ভাল কথা। দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চলে যেতে বলা!......প্রবীর বলে—কিন্তু তুমি যেও না। ......ব্যগ্র বাহু দিয়ে ঘেরা স্বপ্ন হঠাৎ মাত্রা ছাড়িয়ে ব্যাকুল ওয়ে ওঠে। তারই মধ্যে সোমা সকল অনুভব দিয়ে নিঃশব্দে বরণ করে নেয় কপালের উপর

একটি নতুন টিপ। বড় উষ্ণ। চন্দনতারার মত স্নিগ্ধশীতল নয়। ......প্রবীরের হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হবার জন্য একটু মৃদু চেষ্টা করে সোমা বলে—এমন করে সব কেড়ে নিলে মানুষ যায়ই বা কি করে ?......"

আর একটা কথা আছে। প্রাবন্ধিক হিসাবে বাঙলা সাহিত্যে সুবোধ ঘোষের নিজস্ব স্টাইল তাঁকে একটা বিশেষ আসন দিয়েছে। তিনি সুন্দর ধ্যানের জগতে রম্যরচনার গণ্ডীকে আরো আমেজমুখর কোরেছেন। "কাগজের নৌকা" আর "কালপুরুষের কথা" তার প্রমাণ। যিনি সেদিন তাঁর একটি রম্য-প্রবন্ধে 'মধুমালার দেশে'র রোমাণ্টিক চিন্তার মননে এক রূপকথার দর্শন নিয়ে যুক্তিতে-বিযুক্তিতে পাঠকমনে আলোড়ন তুলেছিলেন, তিনিই 'কবি ও বিজ্ঞানী' নামধেয় প্রবন্ধের চিন্তায়ণে যুক্তির বন্ধনকে আবেগের মুক্ততায় মিলিয়ে মিশিয়ে জানাতে পেরেছেন— "বাস্তবিকের ধ্যান রোমাণ্টিকের স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে গেছে. লক্ষ লক্ষ মুকুতা হারের মত লক্ষ প্রবাহিকা সারা ভারতভূমির বুকে ছড়িয়ে থাকবে। প্রাচীন আর্য্যাবর্তের হৃদয় প্রাচীনতর দ্রাবিড়ের সঙ্গে ধমনীতে যুক্ত হয়ে যাবে। লক্ষ বছরের এক একটি পিয়াসী প্রান্তর আর উদাস মৃৎ কণিকা রসিত হয়ে উঠবে। রেললাইন দিয়ে বাঁধা ভারতভূমির শৃঙ্খলিত মূর্তির বিষণ্ণতা ঘুচে যাবে প্রতি লহরের জলে গ্রামের ছায়া টলমল করবে। ......এবং হয় ত এক কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রে গ্রাম-বালিকার দল লহরের জলে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ ভাসিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। কোন এক উৎসবের প্রত্যুষে গ্রাম-বালকের দল লক্ষ কাগজের নৌকায় নাগকেশরের কুঁড়ি ভাসিয়ে দেবে। ......কবি এবং প্ল্যানার, রোমাণ্টিক ও বাস্তবিক, ধ্যান ও প্ল্যান—রূপ সৃষ্টিতে কেউ কারও চেয়ে কম নয়। কেউ কারও প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। গঙ্গা ও কাবেরীর স্বপ্ন এক হয়ে মিশে যাবে।"—শুধু কি তাই, এর চাইতেও গভীরে-প্রবেশ করে প্রাবন্ধিক সুবোধ ঘোষ একটা বড় সত্যকে আবিষ্কার কোরে না লিখে থাকতে পারেন নি সে কথাকে। তিনি প্রবন্ধে যুক্তির অবতারণায় বোঝাতে পারলেন—"

......'এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি দিল পাড়ি
কামরায় গাড়ী ভরা ঘুম রজনী নিঝুম।'

কবিরাই বা কম বস্তুবাদী। প্রাণকে রাতের রেলগাড়ির সঙ্গে তুলনা করলেন। রেলগাড়ির মত একটা আধুনিক কৃত্রিম সৃষ্টি, লৌহ কাষ্ঠ ও বাষ্পের একটা প্রচণ্ড পদার্থ-কীর্তির জিনিসকে উপমা হিসাবে প্রাণের মত দুর্জ্ঞেয় বিচিত্র ও অপার রহস্যের পাশে বসিয়ে দিলেন ? রেলগাড়ীকে প্রাণ পবনের ডিঙ্গা নাম দিতে পারতেন কবি, কিন্তু দেন নি। কবিরা রূপবাদী বাস্তবিক, কবিরা বস্তুবাদী রূপস্রষ্টা।"—সত্যি প্রাবন্ধিক সুবোধ ঘোষের কবিতে আর বিজ্ঞানীতে এক প্রকল্প কোরে তোলা এই চিন্তার রণনকে ছাড়িয়ে অন্য কিছু বলতে চাওয়া হোল—এহো বাহ্য।

রূপদক্ষ আর প্রেম, প্রত্যয় ও পরিধির সীমারেখায় অসীমের শিল্পদ্যোতক সুবোধ ঘোষের কথা-সাহিত্যের ব্যাপক সৃষ্টির আমেজে মশগুল হোয়ে আমরা শেষ কথায় তাঁর আপন প্রমিতিতে রাঙা সবুজে আর পলাশে ঝলমলানো ভালবাসারই রূপবিবর্ধনের মানবিক কথায় শুধু এইটাই বলতে চাই—

জানিস্ তো সব বন্ধু তোরা—
কাণ্ডটাই বা কয় দিনের—
বাস্তুভিটায় কাট্‌ল যে মোর
নূতন বিয়ের স্ফূর্তি জোর।
বন্ধ্যা বধূ যুক্তিদেবী—
সেই রাতে তার নির্বাসন,—
সেই বাসরে নতূন বধূ
আঙুরলতার সম্ভাষণ।"

—আর এর পরে খৈয়ামের এই অসাধারণ কবির স্বকীয় কথাতেই মন ওঠে গুনগুনিয়ে—

"কোন সাহারায় রাত্রিশেষে গাঁথ্‌ছ তারার মালায়
নিজের বোনা তাঁবুর মাঝে জাগে সে কোন্ বালা ?
পেয়ালা হাতে কাট্‌বে রাতি ? সুর্‌মা-পরা আঁখি
পিয়াস্-আকুল পথ্-চাওয়া তার সফল হবে নাকি !"

(—কবি ব্যারীস্টার কান্তিচন্দ্র ঘোষ।)

তিরিশে অক্টোবর, ১৯৬০
(শুচিস্মিতা সন্ধ্যার জন্মদিনে।)

আই. সি. এস সুকুমার সেন

আসি নয়—আসছেনই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—জানাতে সুকুমার সেনই গৌরচন্দ্রিকার—প্রিলিউডী—টাচ নিয়ে।

কিন্তু—ভাসাভাসিতে আগুয়ান—রবির সখা, আচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র, হেতুতে যেহেতু বেশ কয়েক বছর আগে রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া সংগীতের মনসবদারনী শ্রীমতী মালতী ঘোষাল—যিনি জগদীশের একমাত্র বোন শ্রীমতী স্বর্ণময়ীর—দেবর কন্যা।

এই মালতী মাসী বলেছিলেন, সে সময় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের এক কর্নার প্লটের ত্রিতল বাড়ির—একতলার বাসিন্দা। ও বাড়ি গৌরী সেনের। অর্থাৎ স্বরাজ্যে স্বরাট প্রশাসক, আই. সি. এস.—সুকুমার সেনের ঘরণী।

বয়সের ভারে ন্যুব্জা মালতী মাসী ঢাউস সোফায় হেলান দিয়ে বসে। সামনে তেমতিকায় শ্রীমতী গৌরী সেন। দুজনেই আশির এ পারে। যেন সংসার থেকে বিবাগী ধারায় সুস্নাতা। দু'জন বিশিষ্টা।

হাসতে হাসতে জানিয়েছিলেন মালতী মাসী—'আরে জেনে রাখো গৌরীর বিয়ে সুকুমারদার সঙ্গে হয়েছিল মূলত রবিকাকার আগ্রহে। একথা অনেকেই জানে না। তুমি জেনে রাখো।'

মুখর আমি তখনই জানিয়েছিলুম—'এটা আমি জানি।' সহাস্যে মালতী মাসী জানতে চান 'কোথা থেকে। সোর্স কী ?'

ওঁর আগ্রহান্বিত মুখের দিকে বারে বারে তখনই দৃষ্টি ঘুরছিল মিটিমিটি খুশির হাসি ভরা,—'আশিতে-পরা গৌরী মাসীর দিকে।'

'একথা জেনেছিলাম শ্রীযুক্ত সুধীর সোমের কাছ থেকে। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। সারাটা জীবন—অবসর না নেওয়া পর্যন্ত সপরিবারের কাটিয়েছিলেন—আরবের শহরে শহরে। তিনি সুকুমার সেনের ছোটো ভাই—অধুনা বোস্টন নিবাসী ডা. অরুণ সেনের সহপাঠী। স্কুলে ও কলেজে—এই অরুণ সেন পৃথিবীর কয়েকজন ব্যতিক্রমী প্রতিভার একজন। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ম্যাসাচুসেটস্ থেকে মাস্টার অফ্ সায়েন্স। আবার তিনি দক্ষ চিকিৎসকও। স্ট্যানফোর্ডে প্রথম শ্রেণী থেকে ফাইনাল পর্যন্ত পড়াশুনা করে হয়ে যান সুদক্ষ চিকিৎসকও। এক্স ডক্টর। ওঁর বয়স এখন একশো ছুঁই-ছুঁই। শ্রীযুক্ত সোম আজ নেই। তিনি দারুণ উদ্দীপনায় জানিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ গুরুদেবই শান্তিনিকেতন থেকে সুকুমারদার বিয়ের কলকাঠি নেড়েছিলেন। ভায়া—সুরেন ঠাকুরের বড়ো জামাই ক্ষিতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এই ক্ষিতি নেতাজী সুভাষ, দিলীপ রায় সি. সি. দেশাই এবং সুকুমার সেনের সঙ্গে আই. সি. এস. পরীক্ষা

দিয়ে অকৃতকার্য হন। তখন নৃ-বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করে ফিরে আসেন প্রথম সারির অ্যানথ্রোপলজিস্ট হয়ে।" বলেই শ্রীযুক্ত সোম কথা বলছিলেন 'সুখাবতী ভবনের' এক তলায়—আই. সি. এস. রায় গুণাকর অন্নদাশঙ্কর রায়ের ফ্ল্যাটে বসে—মুখোমুখি। সামনে আমি আর মেসোমশাইয়ের পেছনে বসে—ওঁরই বেটার হাফ, আমাদের মাসীমা—ভারত-নারী-আত্মার পরাকাষ্ঠা—শ্রীমতী লীলা রায়। ওই বাড়িরই তেতলায় সুধীরবাবু থাকতেন। ছেলে গৌতমের ফ্ল্যাটে। হঠাৎ করে উঠে 'আসছি বলেই'—বেরিয়ে গেলেন। পলকেই ফিরে এলেন অক্টোজেনেরিয়ান শ্রীযুক্ত সোম—দেয়ালে ঝোলানো একটি বড়ো মাপের বাঁধানো ফটো হাতে। 'এই যে অশোক, এই যে আপনারা সবাই ভালো করে তাকিয়ে দেখুন ফটোর মাঝখানে বর-বধূর বেশে দাদা ও বউদি—সুকুমার সেন ও গৌরী সেন। ওঁদের ডান পাশে আমি ও বাম ধারে অরুণ। আর অল্প দেখা যাচ্ছে শ্রীমান পাণ্ডাকে। পাণ্ডা মানে ভারতের এক নম্বর ব্যারিস্টার ও বহু বছর কেন্দ্রের ক্যাবিনেট মন্ত্রী থাকা—শ্রীমান অশোক সেনকে।

অনেক বিখ্যাত জনের জন্য—পাত্র ও পাত্রী আপন পছন্দে প্রায় রাজযোটকীয় পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন কিংবদন্তিতুল্য—'পুরুষোত্তম' রবীন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, মনস্বী অমল হোম—তোমাকে স্মরণ করি। যে তুমি বহুদিন অবধি এক দিকে কালিদাস নাগ অন্য দিকে চাটুজ্জে সুনীতিকুমার—এই দুই সতীর্থকে নিয়ে গুরুদেবের অতি নিষ্ঠাবান সেক্রেটারির কাজ করেছিলে। সেকথা আমরা জানি। ভুলিনি। যেমন ভুলিনি মহালানবীশ প্রশান্ত, চক্রবর্তী অমিয়, চাটুজ্জে কেদারনাথ, চন্দ অনিল কুমার, দাশ সজনীকান্ত, মুখুজ্যে কানন বিহারী, রায়চৌধুরী সুধুড়িয়া—অমল হোমের সাথে সাথে তোমাদেরও ভুলিনি। নাহে নাহে এ প্রসঙ্গ অবান্তর।

স্বয়ং সুকুমার সেন সেই মারাত্মক অসুখে আক্রান্ত হবার আগে শেষবারের মতো—প্রেসিডেন্সির বন্ধু সতীর্থ, সেই 'রমলা'-খ্যাত মণীন্দ্রলাল বসুর আবাস পি-৩০ গড়িয়াহাট রোডের বাড়িতে এসেছিলেন—যে ঐতিহাসিক বাড়িটি আজ হাত বদল হয়ে বিখ্যাত ও সুহৃদয় হৃদয়ী সুসংস্কৃতিমনস্ক পি. সি. চন্দ্রের—সুদৃশ্য শোরুম। উপস্থিত আমার সামনে একত্রিত হওয়া দুই বন্ধু পুরোনো কথা নিয়ে অনেক কথা আলোচনার মধ্যে আনেন। সুকুমার সেন দস্তুরী পুরোতে। উপস্থিত ছিলেন আরও তিনি সতীর্থ প্রেসিডেন্সিয়ান—স্থপতি ভূপতি চৌধুরী, প্রধান বিচারপতি ফণিভূষণ চক্রবর্তী এবং বাম মার্গীয় নেতা অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য। মনে আছে—সে হয়েছিল এক বৈকালিক মেলমেশ। নট্ টু ফরগেট, যাহা ছিল বাহারী বাহানা।

যা বলছিলাম। মালতী মাসী মানে ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের মালতী ঘোষাল ছিলেন— সেন বাড়ির কমনফ্রেন্ড। একদিকে রবীন্দ্রনাথের আপন হাতে গড়া গানের

ভাণ্ডারী, অন্যদিকে পারিবারিক সূত্রে—ভারত গৌরব, দেশের প্রথম র‍্যাংলার আনন্দ মোহন বসুর (স্যার জগদীশের ভগ্নীপতী) দাদা, দেশখ্যাত ভারতীয় পারফিউমার এইচ. বোসের আদরের কন্যা, যাঁর দাদারা দেশ বিখ্যাত। যেমন—পৃথিবীতে ছায়াছবির জন্য প্রচলিত প্লে-ব্যাক মিউজিকের উদ্‌গাতা—শ্রীযুক্ত নীতিন বসু। আর, দাদারা এক্স ক্রিকেটিয়ার্স কার্তিক বোস ও মুকুল বোস। মা ছিলেন কবিগুরুর শ্রদ্ধাভাজনীয়া শ্রীমতী মৃণালিনী বোস। তিনি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছোটো বোন এবং সুকুমার রায়ের পিসী ও আন্তর্জাতিক সত্যজিতের ঠাকুমা। কহতব্য খুবই এবং স্মর্তব্য দারুণ, এই কারণে যে আপন প্রিয়া—স্ত্রী মৃণালিনী দেবী যেন কবির মানস পটে আরও খুশির ঝিলিক আনত—বিখ্যাত আরও তিন মৃণালিনী। এই মৃণালিনীর মহীয়সী মাতৃত্বকে ঔজ্জ্বল্যে রেখেছিল তাদের—চোদ্দ জন ভাইবোনই। আর একজন শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রী—মৃণালিনী ঘোষ। এবং শেষোক্তজনা, কেশব-তনয় আই. সি. এস. নির্মল সেনের স্ত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী সেন—কবি ও সমাজ সেবিকা। যিনি যৌবনকালে ছিলেন পাকপাড়া স্টেটের মহারানী—পূর্ব পরিচিতিতে। জানার কথা—রবীন্দ্রনাথের জন্যই নির্মল-মৃণালিনী পেয়েছিল বিবাহের মেলবন্ধন। একথা—আলোচ্য সেন-দম্পতি সুকুমার ও গৌরী দুজনের কাছেই শুনেছি।

জানানোর মতো কথা গৌরী সেন তখন অথর্ব। সুকুমার সেন তখন অন্য লোকে গেছেন। বড়ো ছেলে দীপক তখন বিহারের প্রধান বিচারপতি, সেই সুবাদে কিছুদিনের জন্য বিহারের রাজ্যপালও। ছোটে ছেলে রাহুল। দেশের বিখাত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গিল্যান্ডার আরবুথনট-এর চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর। দুই মেয়ে ও জামাইরাও প্রতিষ্ঠিত। কাজের সংসারে ঝাড়া হাত-পা। স্বামী সুকুমার সেন বেঁচে থাকতে যে প্রতিষ্ঠানটিকে পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন—সেই লেডি রমলা সিংহ প্রতিষ্ঠিত অল বেঙ্গল উইমেনেস ইউনিয়ন-এর সহ-সভানেত্রী ছিলেন গৌরী সেন—আজীবন। সেই সুযোগে মনের প্রসন্নতা বাড়াতে রামকৃষ্ণের অর্ডারে—শিষ্যা হন। গৌরী সেনের কেপিবিলিটি ছিল অসাধারণ। যখন চলতে পারতেন না—দেখেছি ফোন করলেই স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মহারাজ গাড়ি পাঠাতে বলে—সেই গাড়িতে এসে দেখা করে যেতেন। দেখেছি বিরেশ্বরানন্দজী এসেছেন। এসে গেছেন গম্ভীরানন্দজী। এমনকি আশা-যাওয়া থেকে ভূতেশ্বানন্দজীও বাদ জাননি, যদিও তিনি সভাপতি নন তখন মিশনের। একথাই একদিন মাসীমা গৌরী সেনকে বলেছিলাম। সুকুমার সেন তো নেই উনি থাকলে কী যে খুশি হতেন তা বলার নয়। পাল্টে বলি—মাচ য়্যাডো য়্যাবাউট নাথিং।

সেন সুকুমারে লিখতে বসে তাঁরই তরে বলার ফাঁকে আমি কি মশা মারতে কামান দাগছি, কেননা কেন আসছেন 'স্যার জগদীশ' আর 'স্যার রবীন্দ্রনাথ' (স্বয়ং

রবীন্দ্রনাথ সেই বিরাট ঘটনায় তিতিবিরক্ত হয়ে ত্যাগ করেন নাইটহুড। যদিও ব্রিটিশ ক্রাউন নেভার উইলিংলি অ্যাকসেপটেড দ্য রিজেকশান অফ কে.টি। পরবর্তী কালে দেখেছি ১৯৩৫ এ যখন স্নেহভাজন স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান—দেশ-বিদেশ থেকে এ বাঞ্চ অফ লেটার্স, মানে শতখানেক চিঠি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—তখন তার অধিকাংশতেই লেখা আছে—চিঠির শুরুতে 'মাই রিভিয়ার্ড স্যার রবীন্দ্রনাথ টেগোর'। এমনকি খামের ওপরও লেখা থাকত 'স্যার' কথাটি নামের আগে। যাইহোক কবিগুরুর উপর আরোপিত ওই খেতাবের সামনে-পিছনে সত্যি ছিল না কোনো স্বার্থের অভিসন্ধির কারচুপি। তাই সুন্দর মনে ওই খেতাব জুড়লে এই আজ এই মুহূর্তে—হবে না কো—কোনো মহাভারতের অশুদ্ধি) বারে বারে আসছেন ঘুরছেন, যেন মাদল বাতাসে করছেন মাতামাতি—সহিতে কজ্—তাই করি লাজ—টু ডজ্ অ্যাওয়ে—স্মৃতির স্মরণ-করণ।

সুকুমার সেন, তোমায় লিখতে বসে পাচ্ছি দারুণ—এ সেন্স অ্যান্ড সেন্সেবিলিটিস—সাথ সাথ আরুণী সেনস্ সেনশেসনস্। কবিগুরু স্ট্রেচারে শুয়ে বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে স্যার নীলরতনকে বলছেন—'শোনো বন্ধু, আমার নার্সিং মেয়েরা না করায় করবে আই. সি. এস. সুকুমামরবাবুর ছোটো ভাই অমিয় ও রানির দাদা সত্যসখা? কী দারুণ যোগাযোগ, ওগো সেন সুকুমার'—অন্তিম মুহূর্তের কিছু আগে অচৈতন্য লোকে আশ্রয় নেবার পূর্বাহ্নে কবিগুরু খোঁজ নিয়েছিল—তোমারি সার্জন ভাই-এর। একী কম কথা। হাজার কথার কথা। পরবর্তীকালে লেকগার্ডেন্সের বাড়িতে বসে অমিয় সেনের মুখ থেকে অনেক কথা শুনেছি এই সেদিনকার ঘটিত সেই রাজসূয় যজ্ঞতুল্য অস্ত্রোপচারের কথা ও কাহিনী। সেইদিন নেতৃত্বে ছিলেন—ভারতরত্ন বিধানচন্দ্র রায়। ছুরি ধরেছিলেন প্রবাদপ্রতিম ললিত ব্যানার্জী। নার্সিং-এ দুই পুরুষ—ডা. সত্যসখা মৈত্র ও ডা. অমিয়কুমার সেন। সঙ্গে ১৪ জন বিখ্যাত ডাক্তারদের একটি দল। পাশের ঘরে উৎকণ্ঠায় বসে কবিবন্ধু স্যার নীলরতন সরকার সমেত স্যার ইউ. এন. ব্রহ্মচারী, স্যার কৈলাশনাথ বোস এবং স্যার কেদারনাথ দাস প্রমুখ ডাক্তারেরা। এই গল্প সেই কবে শোনা বাহান্ন-এ প্রথম সর্বভারতীয় নির্বাচন সমাপনান্তে—ছোটো ভাই অমিয়র লেক প্লেসের ভাড়াবাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন—দোর্দণ্ডপ্রতাপ সুকুমার সেন সাহেব, যিনি দিল্লিওয়ালা বড়োকর্তা জওহরলালজিকে কেয়ার পর্যন্ত করতেন না—ধার ধারতেন না তালিমী কুর্নীশ-এর। তবু প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কোনোদিন এড়াতে পারেননি। খাস্তালুকের হননি হয়েও—একজন মেম্বার অফ অয়োলোলজি।

বলি কেমন করে এলাম সুকুমারি সাক্ষাতে। লেক প্লেস যখন হুমড়ি খেয়ে পড়ল লেকের ধারে—চাটুজ্জে শরৎচন্দ্রের অ্যাভেনিউ-এ, সেই সংযোগে এককোণায় নবদ্বীপ থেকে সদ্য নির্বাচিতা, এম. পি.,—বিশিষ্ট খানদান জমিদারনী, অনেক

ভাষায় বিদুষী শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরীর বাড়ি, তারাই অপর কোণে মজুমদার সাহেব—সতীশ চন্দ্রের বিরাট তিনতলা বাড়ি। দুঁদে আই. আর. এস.। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় চিফ ইঞ্জিনিয়ার—একটি জোনাল রেলওয়ের। ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার ওঁর অনুজ। এই সতীশ চন্দ্র ছিলেন ভবানীপুরের হরিশ মুখার্জী রোডে থাকাকালীন সেই বিশ্বগৌরব স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের বৈঠকী আড্ডার—এক ও আর এক জ্ঞানী আড্ডাবাজ। এই বন্ধুত্ব ছিল আমৃত্যু। তাঁরই ছোটো মেয়ে বাণী ছিল—স্যার রাধাকৃষ্ণাণের প্রিয়পাত্রী হিসাবে—দত্তক-কন্যা। বাণীর স্বামী ছিলেন আমাদের পারিবারিক কাকু—বাবার বিলেতের বন্ধু আই. পি. এস.—কর্নেল নির্মল সেনগুপ্ত। একসময় এই নির্মলকাকু ছুটির দিন পেলেই সাদার্ন অ্যাভেনিউ থেকে ছুটে আসতেন হনহনিয়ে—এক ঝকঝকে র‍্যালির বাই-সাইকেল চেপে। আস্তিন গোটানো শার্ট পরা। মালকোচা মেরে ধুতি পরা। একাধারে তাস খেলতেন বাবার সঙ্গে। ছোটো বড়ো সবরকম খাওয়া গ্রহণান্তে। ভাবা যায় একজন ফৌজী কর্নেল ফৌজ ছেড়ে—হয়েছেন নমিনেটেড্ আই. পি. এস. (পুলিশ নয়, ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিস) গাড়ি থাকা সত্ত্বেও এই দেশীয় পোশাকে আসতেন নির্মল সেন—টু স্যালুট দ্য এনসিয়েন্ট ভেহিক্যাল—এই দুই চাকার সাইকেলকে। হ্যাঁ, জানানোর আছে সেই প্রথম আই. সি. এস. থেকে শেষ আই. সি. এস. পর্যন্ত প্রত্যেককেই বিলেতের মাটিতে—কি শহর কি গ্রামের মসৃণ-অমসৃণ পথে—নিজের সাইকেলে সওয়ার হয়ে সঠিকভাবে চালানোর পরীক্ষা দিয়ে তাতে পাশ করে—তবে আই. সি. এস. বনতে হত।

স্কুলের শেষ দিকে একদিন নির্মল কাকুর ওই শ্বশুরবাড়িতে হাজির। ওঁর বড়ো শ্যালক বিনয় মজুমদার বাবার বন্ধু ছিলেন। সেই মুহূর্তে বিনয় কাকু বেরোচ্ছেন। আমায় বললেন, 'এসেছ ভালোই হল, চলো একজনদের বাড়ি চলো, পায়ে হেঁটে আমাদের বাড়ি আসবে। ওঁরই ফুটবাত ধরে সাদার্ন অ্যাভেনিউ-এর দিকে আমাদের প্রস্তুতি। বেশি এগোতে হল না। খানকয়েক বাড়ি পরেই একটি খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, 'এসো ভেতরে যাই সুকুদার কাছে। এখানে আছে আমাদের আত্মীয় আর তোমার বাবারও খুবই চেনা। দুদিন হল মিশর থেকে ফিরেছেন—এখানকার যেমন প্রথম, তেমনি ওদেশীও প্রথম নির্বাচন উনি সুষ্ঠুভাবে তদারকি করে ফিরলেন।' দেখি ভেতরের ড্রয়িংরুম থেকে বেরুচ্ছেন ওয়েল স্যুটেড্ ও বুটেড্ দীর্ঘদেহী এক সুদর্শন মানুষ। ডান ধার দিয়ে মাথার সিঁথি কাটা। বললেন, 'আরে আমাদের বিনয় যে। নিমু ও বাণী কোথায় ? আরে এ ছেলেটি, আবার কাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ ? একে তো চিনলাম না।' কাকু জানালেন, 'আমাদের বাবলু। ওর বাবা বি. কে. রায়কে তুমি ভালোভাবেই চেনো। তা এখন কোথায় যাচ্ছ ?' উত্তরে সুকুমার সেন জানালেন—'যাচ্ছি অশোকের বাড়িতে। এবার লম্বা ছুটি

পেয়েছি। মাকে নিয়ে ভারতের তীর্থস্থানগুলি দর্শন করাতে বেরোচ্ছি। অশোক টিকিট পত্র সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমার গাড়ি নেই। অমিয় আর. জি. কর থেকে তার গাড়িটা ফেরত পাঠাচ্ছে। তাই অপেক্ষা করছি।' আমার দিকে স্মিত মুখে তাকিয়ে বললেন, 'বাবা তো ইঞ্জিনিয়ার! ছেলের চোখের চাউনি দেখে বুঝছি মতিগতি অন্যদিকে। কবিতা, না গল্প, না প্রবন্ধ লেখো? যাই করো, দাগ রাখার চেষ্টা করো ভবিষ্যতে আপন মুন্সিয়ানায়। মনের রাখবে দেশটা আর ভাষাটা—রবীন্দ্রনাথের। ঘুরে আসি ভারতের এখান ওখান। ফিরে এসে তোমার সঙ্গে কথা হবে অনেক।' এরই মধ্যে দুয়ারে এসে হাজির অমিয়র গাড়ি। উর্দি পরা সোফার, সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দাঁড়াল হাসিমুখে। 'আসি বিনয়, আসি বাবা।' বলে গাড়িতে উঠতেই উধাও হল গাড়ি—সেন সাহেবকে নিয়ে। ওটাই আমার ওঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ।

একটু কথা আছে—যে নির্মলকাকুর কথা বললাম, যে বাণী কাকিমার কথা বললাম—এঁরা ছিল, যদিও স্ত্রীর জন্যই—স্যার স্বর্বপল্লীর অতি স্নেহের, অতি কাছের। এই কাকু ব্যাঙ্গালোরের টেলিফোন সংস্থা আই. টি. আই.-এর এম. ডি. হয়ে বদলি হন এ রাজ্যেরই রূপনারায়ণপুরের হিন্দুস্থান কেবলস্-এর এম. ডি.-তে। বছর দুই-আড়াই-এর মাথায় দুর্গাপুরের এম. এ. এম. সি-র এম. ডি.। তারপর কলকাতা টেলিফোনস-এর অখণ্ড জি. এম.। তখন এটিকে সি. জি. এম. বলা হত না। এখান থেকে ডাক ও তার পরিষদের মেম্বার হয়ে দিল্লি এবং কিছুদিনের মধ্যেই অবসরের আগে সেষ অ্যাসাইনমেন্ট ওঁরই সর্বোচ্চ পদ—চেয়ারম্যান। এই কাকু যখন রূপনারায়ণপুরে তখন দত্তক কন্যারূপী তাঁর স্ত্রী বাণীকে দেখার জন্য যখনই রাষ্ট্রপতি স্যার সর্বপল্লী—কোনো কাজে পশ্চিমবঙ্গে আসতেন তখন উনি এই বাণীর জন্যই পরিহার করতেন সবরকম বিমান যাত্রা। তখন ভারতের একমাত্র সুপার ফাস্ট ট্রেন ছিল, হেরিটেজ ঘেঁষা 'কালকা মেল'। সেদিনকার ওয়ান আপ টু ডাউন। উনি রূপনারায়ণপুরে নেমে যেতেন এবং সশস্ত্র প্রহরায় লাইনে সাইডিং করা থাকত রাষ্ট্রপিতর জন্য রাখা কয়েক বগির—সেলুন কার্। এ জিনিস আজকের দিনে ভাবা যায় না। কোন রাষ্ট্রপতি আজকের দিনে হাজার সুবিধার বাতানুকুল ট্রেন পরিহার করে চলতে ভালোবাসেন—সেন্ট পার্সেন্ট।

তারপর সেন সাহেবের কথাতেই ফিরছি।

বছর দুয়ের মাথায়—সুকুমার সেন অবসর নিলেন। রিটায়ারের পর এমন দুঁদে ও জবরদস্ত আই. সি. এস.-কে কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল বা কোনো বিদেশস্থ রাষ্ট্রদূতের পদে বসাতে গররাজি ছিলেন—জওহরলালজী। এমন লোককে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘর করা খুব মুস্কিল ছিল। সেই সময় মহানুভব স্যার উদয় চাঁদ ও মহারাণী অধিরাণী রাধারাণী তাঁদের বর্ধমানের কোটি কোটি টাকার রাজ্যপাট দান করেন—বিধানচন্দ্রের হাতে তা সঁপে দেন—ইউনিভার্সিটি তৈরির জন্য। একজন

জবরদস্ত উপাচার্য দরকার। যেই শুনলেন নেহরুজী বর্ধমানের মাধ্যমে কলকাতায় সুকুমার বাবুর কাছে নিয়োগ পত্র পাঠিয়ে দেন। অবশ্য অনিচ্ছা থাকলেও হাসিমুখ বিধানচন্দ্রের আবদার অস্বীকার করতে পারেননি। উনি সানন্দে যোগ দেন। রাজপ্রাসাদ হল ওঁর বসবার দপ্তর ও আবাস। আর অন্যান্য প্রাসাদে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হল।

আমি বলি—যা। কাজটি আজাদ সাহেব ভালো করেননি। জওহরের নির্দেশে তড়িঘড়ি মৌলানা আবুল কালামের দেওয়া এই নতুন নিয়োগ—ভায়া সচিব হুমায়ুন কবীর। যেন সাত তাড়াতাড়ি ব্যাপক কিছুর জন্য তাঁকে না রেখে—দাও বসায়ে আসন এক উপাচার্যের। বিধান রায়ের তা পছন্দ হয়নি। কারুরই নয়। সেন্ ওয়াজ অফ্ সো হাই ক্যালিভারস্ সেলিব্রিটি, তাঁকে যেন এভাবে ধপাস্ করে টেনে নামানো হল—নীচে,—দ্য পোস্ট্ অফ V.C. তে—যা নট আপটু হিজ ডিগনিটি ! এক কথা প্রাক্তন মহারাজ, স্যার উদয় চাঁদের সঙ্গে ক্যালকাটা ক্লাবে আমার দেখা। আমি সে মুহূর্তে গেস্ট, কবির ভাগিনেয় স্যার জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল, আই. সি. এস.-এর চা-চক্রে। আমি বলি বর্ধমানের লোকেরা বেইমান। পুরোদস্তুর। সবাই যে অত্যাচারিত ছিলেন, রাজ শাসনে—তা নয়। বেশিরভাগই স্বার্থ মেটান ধনীদের থেকে। সব রাজ্য-পাট, বসত-বাটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি দানের বিনিময় মূল্যটা অচিরেই পেয়ে যান—স্যার উদয় চাঁদ। প্রথম সেই নির্বাচনে দাঁড়িয়ে হারেন গো-হারা। বলতে চাই, এটা ছিল সুবিধাভোগী বর্ধমান বাসীদের অসাধারণ বেইমানগিরি। আন্‌ফেইথফুলনেস্। বিধানচন্দ্র রুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এক রি-ইলেকশানে একালের বিদুষী ও রূপবতী রাজপুত রাজকন্যে—মহারাণী অধিরাণী রাধারাণী দারুণ গরিষ্ঠতায় জিতে আসেন বিরোধীর জামানতকে বাজেয়াপ্তায়ানে। রাজরাণীর ব্যবহারের তুলনা ছিল না। উনি আপামর জনতার ঘরে ঘরে ঘুরে, বসে এমন কি—চা চেয়ে পর্যন্ত খেয়েছেন। রাখেননি কোনো বাছ-বিচার। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত ডেমলার কী মিনার্ভায় সওয়ার হয়ে গরীবের পর্ণকুটীরে পায়ে হেঁটে ঢুকে—ক্যাম্পেন করেছেন। জোড় হাতে 'স্বামীকে আপনারা চাননি ভালো কথা তো। একবার আমাকেই চেয়ে দেখুন না। ভালোও করতে পারি।' তারপর জেতেন। মন্ত্রীও হন। কিন্তু সাত তাড়াতাড়ি—দারুণ অসুখের হাতছানি স্বীকার করে চলে যান কাঁদিয়ে সবাইকে। বেশী মাত্রায় বেইমানগিরির বর্ধমানবাসীদের। বিধান রায়, জওহরলালকে কনডোলেন্স সভায় বলেছিলেন—'শি ওয়াজ টু ওয়ার্দি ফর আওয়ার মিনিষ্ট্রি।'

যাক। উপাচার্যের পদ কিন্তু সময়সীমার মধ্যে বেঁধে রাখতে পারেনি সেন সাহেবকে। দারুণ ঝামেলা দেখানো হয়, ইচ্ছে করেই পাকায় দলীয় কোন্দল, সেই পরগাছী পরচর্চায়ী শিক্ষাবিদেরা—বলি আদৌ তাঁরা শিক্ষাবিদ ছিলেন না। ছিলেন সেলফ লাভিঙ স্বার্থপরবাহী। উনি—রিজাইনড ফ্রম দেয়ার। খুবই অনায়াসে।

তুমি সন্ধ্যার রভস

সন্ধ্যাতে গৌতম রোমাঞ্চিত। হতচকিত। তাই ত সত্যি বলে খুশী গমক-রাঙা হোতে চায়। ওগো সন্ধ্যা, সুন্দরী সন্ধ্যা...

কিন্তু প্রিয়া সানন্দিতা—নিজের সম্বন্ধে এত গুণগাথা শোনাটা অস্বস্তিকর মনে করা মাত্র—নিত্যকার মতো নরম হাতের আড়াল দিয়ে চেপে ধরে—স্বামীর সহাসে ঘেরা অধর। ওভাবে বুজিয়ে দেয়—মধুরিম কথার ফুলঝুরি।

আজ আবার এই এখন এত, আনন্দ-স্নাত রুমুরুমু মুহূর্তে আলিঙ্গনের ঘন তাপে আবেশ ধরার পর—কথা বলার মধ্যে হঠাৎই অকারণে খুশীয়ালিন সন্ধ্যাকে এভাবে সুন্দরীধারার কান্নায় ভেসে যেতে দেখে—স্বামী গৌতম বিহ্বল সুরে না ধাঁধালেও—হোল চঞ্চল। রেপথুমন। তারই মধ্যে প্রিয়াকে নিজের তাপঝরা বুকের সুনিশ্চিত সুখের কারাগরে আর একটু বেশী ঘনতার নিভৃতি দেওয়া বাঁধনে টেনে নিল। সোহাগ সিঁদুরে। আদরে।

সন্ধ্যার পিঠময় হাতের ওই বুলানো আদর ঝরাতে থেকে গৌতম জানতে চাইলো—

—"সন্ধ্যা, আমার লাভলি, তুমি যে কি না! তোমাদের বোঝাবুঝি দেবতাকুলেরও নাগালের বাইরে থেকে যায়। এমন খুশীর এই দেশটি সুখের ধারে—আনন্দের ভারসাম্য রাখতে না পারারই যে পরিচায়ক, তা জানি। কিন্তু, কিন্তু সাঁঝের বেলা এত, পরিপাটি ক'রে তোমার মুখরুচিরায় যে প্রসাধন সযতনে সাজিয়ে তুলেছিল, বলি, দু'ধারার অশ্রুধারা ভেসে গিয়ে—করালো না কি তা এলো ? দিলো না কি মুছিয়ে ভিজিয়ে দেওয়ায় ? সত্যি, তোমার ছবি হোয়ে সব সময় ফুটে থাকা—এ মুখশ্রী এভাবে কাজলে পরাগে ঠোঁটের লাল রঙে একাকার হোলে পর—আরেক ধারার শোভায় তোমায় করায় যে—অনিন্দিতা! তুমি কেঁদো। আরো বেশী কোরে। তা দেখতে আমার বড়ো মিষ্টি লাগে। মধুরের চাইতেও মধুর। সুন্দরের চাইতেও শোভনীয়। সন্ধ্যা, তবু না কেঁদে পারো না ? বল।"

হ্যাঁ, কান্নারও আছে এক ধরনের মস্ত আর্ট। শিল্পত্ব। বিশেষ ভাবে যুবতীদের মহালে। তাদেরই রীতি মাফিক। অকারণের যতি ধরে। সত্যি-সত্যি, কখনো কোনো কারণের কণামাত্র ধার—না ধাররই মধ্যে!—স্বামী গৌতম তার বিবাহিত জীবনে এর যথার্থ রূপ চরম সার্থকতার মধ্যে দিয়ে নির্ঝরিত হোতে দেখেছে—আপন ছান্দসিকারই কাজল আঁকা, টানা-টানা দু'খানা—কালো হরিণ চোখে।—হ্যাঁ, এ কান্না তার সন্ধ্যার মনের সুখকেই করায়—ছন্দের সিমফনি। যতির রিদ্‌মিক মিটার।

ছোট্ট এক আবদারের রেশ তুলে গৌতম বলল—"সংস্কৃতটা শোনাবে আমায়।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়।" মাথা সেখান থেকে না তুলেই আমেজ ধরা স্বরলহরে সন্ধ্যা ঝন্‌ঝনালো মেঘদূতী ছন্দের কারাগারে বাঁধা থাকার মতোই—"শোন গৌতম। ওতে আছে, 'নীবিবন্ধোচ্ছ্বসনশিথিলং যত্র বক্ষাঙ্গনানাং/বাসঃ কামাদানিভৃতকরেশ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু/অচ্চিসত্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্ন-প্রদীপান/হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফল-প্রেরণশ্চূর্ণমুষ্টিঃ!' এই, বলি হোল এবার? শুনলে নিশ্চয় ভালো ক'রে।"

সন্ধ্যা সন্ধ্যারই মতো রঙীন অনুরাগে ঝলমলালো তখনি—কথা শেষে—আদরায়নে যখন ওর আবেশময় অবস্থা 'হরিছে অবিরাম প্রিয়ের বাহু-পীড়া পীড়িতা রমণীর দেহের ক্লেশ, যখন তারে প্রিয় শিথিল করি' বাহু ছাড়িয়া দেয় হতে বক্ষদেশ।'

ওই মধুরাগ ভরা কাব্যিক অনুভবে আকুল হোয়ে সন্ধ্যা বলল বেপমান গলায়—

"এই। একবারটি ছাড়ো আমায়। গৌতম, হাতের বাঁধন কোরবে না শিথিল বারেক তরে? ওগো লক্ষ্মী ছেলে। শোন।"

"কেন? ঈষ্, মুক্তি চাইছো।" শুধালো সুজনক।

"হ্যাঁ। এত' জোরে তোমার শরীরের সব শক্তি জড়ো ক'রে আমায় তুমি নিজের বুকে কেড়ে রাখো না বাব্ বা, তাইতো মাঝে-মাঝে ব্যথা কোরে ওঠে। হ্যাঁ, মুখ ফুটেই বলছি, তুমি একজন মস্ত দস্যু। তায় দুর্দান্ত।" কথা শেষ কোরেই ছোট্ট এক শিশুর মতো প্রাণখোলা হাসির উদ্দামতায় আছড়ে পড়ে—সন্ধ্যা উঠলো খিলখিলিয়ে। ঝকমকিয়ে।

তখনি অল্প একটু চমক ছোঁয়ায় বিহ্বল হওয়ার মতো হোয়ে জানতে চাইলো গৌতম—

"এই মেয়ে, মন থেকে বিশ্বাস করো কি যা বললে তাই?"

প্রাণপ্রতিমের কাঁধের উপাধানে ন্যস্ত রাখা মাথা তুলে—সমস্ত মুখময় ছান্দস্ দুলুনি ভরিয়ে—দীঘল চোখের চাহনি মিটিমিটি ভাবতরঙ্গিমায় ফোটানোর একান্ত মেয়েলি আর্ট দেখাতে-দেখাতে বলল সন্ধ্যা—সুন্দরী সাঁঝের মায়ারাগ ধরে—

"করি। করি। করি। এই দস্যু ছেলে, এই ত' বার-বার তিনবার বললাম। আর আমারই মনের অতল পারাবার থেকে জানালামও।"

খিলখিলানো সরবতায় মুখর সেই শিশুর মতো দেয়ালা হাসি তখনো লেগে আছে—সন্ধ্যা শুচিস্মিতার অধরে—মধুঋতা কথা নিয়ে থামার পরেও।

"তাই ঠিক? আচ্ছা। বেশ, তবে বোঝো এইবারটি এমন বিশ্বাস রাখার ফল কি।"

কথার সাথে-সাথে যৌবনিক দুষ্টুপনায় দুর্নিবার থাকা দুরন্ত স্বভাবকে চালাচালি করার প্রয়াস দেখালো—স্বামী গৌতম—দারুণ ছন্দ-খুশীয়ালে।

শিউরে উঠলো প্রিয়ার সমস্ত বরতনু।

যুবতীপনা প্রায় কান্নার সামিল হোল দুষ্টুমান গৌতমের সজোরে বিস্তার ক'রে রাখা বাহুলতায় তৈরী বাঁধন—সংকোচন করার মধ্যে।

"না-না। ছেড়ো দাও। লাগছে বড়ো। এই গৌতম, কী যে না তুমি। এই লক্ষ্মী ছেলে হোয়ে আছো কি, মুহূর্তের টানে হোয়ে ওঠো অসম দুষ্টুবুদ্ধিতে দুরন্ত ছেলেটি! তোমায় নিয়ে পারা সত্যি মুস্কিল। ছাড়ো না, লাগছে খুব। এমন দস্যির মতো জোরে আমায় তোমার বুকে ধরে রেখেছো দেখলে মনে হয় যেন অন্যে কেউ আমায় পাছে কখনো যদি চুরি করে নিয়ে যায়—ঠিক তেমনি।"

মুহূর্তের যৌবনিক প্রণয়ে যুবক তার সজোর আলিঙ্গনা—লৌহকপাটের কঠিন ঘেরাটোপে ঘিরে ধরায়—তখনি যেন উবে গেলো তার রত্নাবধূর লাল অধরে দুলতে থাকা—সেই খিলখিলানো স্ফূর্তির জোয়ার! চোখের ঘন আঁধার ভরা কুট্টিম আর অপাঙ্গ চাহনির ফাঁকে মিটমিট তারার মতো জ্বলছে না তখন—মুক্তাদানার ঝলকে জল থৈ থৈ ক'রে ওঠায়।

মিষ্টি গলার স্বরে কারণ বিহ্বলতা ভরিয়ে—সন্ধ্যা কাঁদো-কাঁদো হোয়ে জানালো, তখন-তখনি—

—"বেশ। ছাড়বে না ত'? আচ্ছা রাতে যখন শরীর ব্যথায় টনটন ক'রবে—তখন কিন্তু তোমার এক্তিয়ারে থাকবে টুলটুল। দেখো, তখন কত আরাম লাগে। ভালোয় ভালোয় আমায় এখন লক্ষ্মীটি ছেড়ে দাও। রাতে দেখবে কত বেশী নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে—নিরুপম এক ঘুমের রাজ্যে চলে গেছো। সত্যি বলছি, ছাড়ো। রাতে ভালো ভাবেই তুমি আজ আমায় পাবে। এখনকার মতো সব দুষ্টুপনা জমা রেখে দাও, কেমন? না-না, কথা দিচ্ছি, শান্ত হোয়ে ঘুমিয়ে থাকা টুলটুলকে তখন আমাদের মাঝখানে থেকে সন্তর্পণে তুলে নিয়ে—দেওয়ালের ধারে শুইয়ে দেবো। না-না, তাই বলে বেবীকটে শোয়াবো না। সেটা হবে স্বার্থপরের মতো। চারদিকে ওর বালিশের ব্যূহ ঘন ভাবে রচনা ক'রবো—যাতে এমতাটা ওকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাখতে পারে সুপ্ত। নিরুপদ্রব। বুঝলে? বাঃ, এই ত' লক্ষ্মী ছেলে। বেশ কথা শুনলে তা হোলে।"

নিজের ডান হাত তুলে তর্জনী দিয়ে চোখে ছেপে ওঠা জলরেখা মুছে নিতে-নিতে সন্ধ্যা বলল—চিরকালীন স্বভাবস্নিগ্ধ যুবতীত্বে রেঙে—

"তুমি এত' ভালো ছেলে যে তার তুলনা নেই। সত্যি ভালো। হ্যাঁ-হ্যাঁ, গৌতম, এই দ্যাখো না কত সুন্দর কোরে তুমি আমায় আদর কোরলে—যতো বেশী শরীরী জোর থাকতে পারে একজন স্বাস্থ্যবান ছেলের, ঠিক তারই সজোর বাহুবন্ধনে। বুঝতে পারছি এর পরিচয়—আমার পিঠের দু'ধারে—তোমার হাতের ছাপ তুলে দিয়েছে।

অল্পস্বল্প ব্যথা ক'রছে। যাক্, তবু ভালো বলতে হ'বে যে রাতের কথায় আমায় ছেড়ে দিলে শেষ অবধি।"

আগের মতোই দেয়ালা হাসির লাল ঝলক ফুটে এলো সন্ধ্যার রঙীন ঠোঁটের চোহদ্দি ছাপিয়ে।

—"গৌতম, ওকি, অমন অবাক বিস্ময়ে তাকাচ্ছো কেন আমার প্রতি? বাব্‌বা, দুষ্টুমিকে আর মাত্রা ছাড়িয়ে নিতে পারলে না বলেই বুঝি—অভিমান ক'রতে চাইছো আমার 'পরে? কৈ, কথা বল।"

কথার মধ্যে প্রিয়ার শুচিস্নিগ্ধ ভাব ঝল্‌মলিয়ে গেল—আমেজ ছড়িয়ে। ঝরিয়ে। নাচিয়ে।

"এই? বলি, লক্ষ্মী ছেলে, টুলটুলকে ঘুমে ও-ভাবে নিশ্চিন্ত রাখার পর কী কোরবো বলত' দেখি।"

আনন্দের ঝরনাধারা তখন সন্ধ্যার দীঘল চোখের কাজলদৃষ্টিতে ঝকঝক্ কোরে উঠেছে। দুলুনি ভরিয়ে।

"কৈ, বল গৌতম। আমার মনের গোপন কথাটি পারো কি বলে দিতে? ওগো মধুর, বল, হোয়ো না কণামাত্র এ নিয়ে অধীর।"

"পারলেও আমি কখন বলতে পারবো না সন্ধ্যা।" একটু থামলো পলক তরে। তারপর বলল অসহায়ের মতো হোয়ে—"সন্ধ্যা, আমার আদর, তোমার কথা তুমিই বলে শেষ কর। কেমন?"—কথা শেষে সেই ক্ষণেকের অসহায় ভাবটিকে লুকোতে তো চাইলো গৌতম—প্রিয়ার সুরভিত মস্ত খোঁপার রেশমী অনুভবে—নিজের মুখ ডুবিয়ে দিয়ে।

সুমসৃণ দুটি পেলব হাতের নরম বাঁধন মালার মতো ক'রে সুদর্শন স্বামীর গলায় জড়িয়ে রেখে—প্রিয়ংবদার পরিচয় ধরে সন্ধ্যা জানাতে লাগল কাকলী-নির্ঝরে—রুমঝুমিয়ে,

"জানো গৌতম, আজ থেকে ঠিক ক'রেছি টুলটুলকে ও-ভাবে ঘুমের রাজত্বে নির্বাসন দিয়ে, বুঝলে, যা বলছিলাম আর কি, ওর প্রথম রাতের লম্বা একটানা ঘুমটি যতক্ষণ না ভাঙ্গছে, হ্যাঁ, ঠিক সেই টানা সময় ধরে—তোমার পাশে শুয়ে আদুরে মেয়র মতো নিজেকে সঁপে দিয়ে রাখবো তোমারই বুকে। তোমারই তাপনির্ঝর কোলে। তারপর আমায় তোমার বুকে নিয়ে, কোলে পেয়ে যুবকোচিত রীতিতে—যতো দুষ্টুমির দুরন্ত লোকে টেনে নিয়েই যাও না কেন,—তাতে বুঝলে গৌতম—আমি খুশী হবো চরমে। সুখী হবো অসমে। কেন, জানো? বলতে পারো এত,

বেশী নিশ্চিন্তি পেলাম কোথা থেকে—দারুণ সহজ পদক্ষেপ যে কোনো মিথুনসম্পর্ক ধরে—মিতালিসুন্দর হোতো চাইছি?"

কবির আপন মনের মাধুরী মিশায়ে রচনা করারই মতো এ মধুরিম ব্যাখ্যার সঠিক অনুধাবনে নামতে না পেরে—শ্রীমতীরত্না এই মঞ্জুলিকা সন্ধ্যার ছবির মতো মুখের প্রতি বিস্ময়বিস্ফারিত অপলক চাহনি তুলে ধরে মৌন হোয়েই থাকলো—তার এই বরপুরুষ। কোন হদিস খুঁজে পেলো না গৌতম—এই প্রশ্নায়িত কেন'র রহস্য উন্মোচনে।

"মধুর, তুমি অবুঝ ছেলে নও ত' কী? আজই বাড়ী ফিরে তুমি, জানলে না এই গরিমা রাঙা কথাটি, যে,—দু'মাস হোল আই হ্যাভ্ কন্সীভড্ আওয়ার সেকেণ্ড চাইল্ড। আবার খুবই শিগ্গির ক'রে হোলেও, ভাববার মধ্যে দারুণ রোমাঞ্চ আছে। কেন, জানো?"

ছোট্ট এক ছেলের মতো অবুঝ মনে ব্যাকুলতা নিয়ে চুপটি কোরে রইল স্বামী গৌতম—প্রিয়ার ছড়িয়ে রাখা নরম বাহুলতার ঘেরে।

"সত্যি, জানি না সন্ধ্যা। জানা থাকলেও এখন তোমার প্রশ্নের ছায়ায় তা ঢেকে গেছে—অজানারই জিনিস হ'য়ে। হ্যাঁ, তুমি জানাও তা বুঝিয়ে। সাজিয়ে। জানো ত' যৌবনের মধুর কথাগুলো তুমি যতো সুন্দর ভাবে পরিবেশন করাতে পারো,—আদর, আমি কি পারি তা তত'টা? সন্ধ্যা, আমার লাভলি!"

চোখে-মুখে চাহনি ও হাসির নির্বিকার হ'য়ে ওঠা ভাব গৌতমকে অবুঝ শিশুই ক'রে তুলেছে। শান্ত। সমাহিত সৌম্য। সন্ধ্যাকর!

"সন্ধ্যা, এই?"

"বল। শুনছি গৌতম।"

"বলছি, এমন কি রোমাঞ্চের কথা আছে, যার বিষয় ধরে তুমি এত' খুশীয়াল হোচ্ছ? সন্ধ্যা, বল।"

"শুনলেই যে সব মাধুর্য্য শেষ হোয়ে যাবে। গৌতম, তাই জানাতে অল্প-স্বল্প গড়িমসি ক'রছি।"

মুক্তার মতো ঝকঝকে দাঁতে—নিজের ঠোঁট ছাপানো পাগল করা হাসির তীব্রতা রোধ করার জন্য—চেপে ধরলো সন্ধ্যা। তবু সেই মারাত্মক হাসির রেশ শেষ হোয়েও—হোচ্ছে না শেষ। চাপা দু' ঠোঁটের বাঁকাচোরা কোণ দিয়ে গমক ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ঠিকরে। আছড়ে।

নয়নাভিরাম চোখের দীঘল দীঘিতে—টলায়মান মদিরা কাজল আঁকা পাতামধ্যে ঢেকে রেখে—বলল সন্ধ্যা আদর করার ভঙ্গিমায়—

"গৌতম, বলি জানো, এখন আমাদের অবস্থা কত' মুক্ত। কত' বেশী নিশ্চিন্তি নিতে পেরেছে।" সন্ধ্যা-প্রিয়া চুপ কোরল এটুকু বলেই।

ঔৎসুক্য ঝরলো গৌতমের গলায়—

"এই মেয়ে, বলি কি ব্যাপারে?"

"ব্যাপার ত' আমাদের নিয়েই। তা তোমার জন্য। তোমার এই লক্ষ্মী মেয়েটির জন্যও। যাতে তুমি তোমার সন্ধ্যার সাজানো-গোছানো দেহী অবস্থাটি অস্বীকার করার অভিলাষে মেতে—ভয়ানক বেশী দুষ্টু হ'তে পারো, এ হোল সেই তারই বিষয়।"

আরো গাঢ় হোল ঔৎসুক্য। গৌতম জানতে চাইলো—"তার মানে?"

"মানে খুঁজতে চাইছো গৌতম!" বলতে-বলতে চোখ বন্ধ রেখেই মধুর যুবকের ঈষৎ ছোপ ধরা অধরসমীপবর্তী হোল সন্ধ্যা সানন্দিতা—নিজের মুখের সাথে দু'ধারার ঘনতা সংস্থাপনার্থে।

বলল সন্ধ্যা দারুণ এক নিলাজিতার মঞ্জুলে রাখা ধ্যানে আকুল হ'তে হ'তে—

"গৌতম। আমার আদর। তুমি আজ যেমন ভাবে আমায় চাইবে, পাবে ঠিক তেমনি ভাবে। অনায়াসে। বিনা দ্বিধায়। প্রিয়া এরই মধ্যে আজ তোমার সৃজনী শোণিতে পুনরায় দ্বিতীয় সন্তানের সম্ভাবনায় পুষ্পিতা হ'য়ে পড়েছে। জানো ত' তাই আজ আমার পরিচয়—দেহীবিলাসে পুরোপুরি মুক্তিপ্রিয়া। মিথুন যতোই তুফান হোয়ে আমার যৌবন নিয়ে তোমায় মাতাল করাক না কেন—এ জানবে তাই স্বাভাবিক—আমার এই সৃষ্টিশীল পৃথিবীতে। আর ভয় নেই। দ্বিধা আসবে না কণামাত্র। থাকছে না অহেতুক ভাব-ভাবনার টানাটানি। ওগো, তোমার ইচ্ছার যুবকত্ব নিয়ে। আমার অনিচ্ছার যুবতীত্ব ঘিরে। হবে না কোন জারিজুরি। কেন, জানো?"

আলতো চুমার স্নিগ্ধ আদর বারেকের জন্য গৌতমের বাক্‌শূন্য ঠোঁটে বসিয়ে দিয়ে—সলাজুকার তরঙ্গিমায় দুলতে দুলতে ওর রত্নাবধূ জানালো এক বহুত করা মিনতি—

"আমার এখনকার অবস্থায়, মানে এইমাত্র দু'মাসের কন্‌ফাইন্‌মেন্ট পিরিয়ডে তোমার, হ্যাঁ আদর, তোমার কোলে আমি রাতের আঁধারে প্রণয়ের জ্যোৎস্না হোয়ে যখন নিজেকে সঁপে দেবো, বুঝলে তখন, হ্যাঁ, গৌতম, তখন তোমাতে-আমাতে যুগলিত মিলন-মেলায় লগ্ন-শুভ মিথুন নিয়ে আর আমি হবো না—ভীতিবিহ্বলা। তুমি হবে না সসংকোচে—শঙ্কিত। এবার এখন থেকে আমার থাকবে না—বিন্দুপরিমাণ ভয়ের শিহরণ। তুমি হবে না মোটেই শঙ্কায় দিশেহারা।"

কাকলি ধরা কথা স্ফূর্ত হাসির গমকে টাল খেয়ে পড়লো—ক্ষণেকের জন্য।

শুধালো গৌতম—"কেন?"

"ভারী দুষ্টু তুমি! কিচ্ছু যেন বোঝো না দেখাচ্ছো এমনই এক ভাব। না!" তাই বলার মধ্যে সন্ধ্যা নিজের বক্তব্য করাতে চাইলো এইবারটি সহজ সরল— "গৌতম, আমার সম্ভাবিত দ্বিতীয় সন্তান যত'দিন না পৃথিবীর মধুর আলোকধারায় চোখ মেলে—পুন্যশ্লোক হ'তে পারছে,—তত'দিন ঠিক আর আমার কোনো ভয় থাকছে না। আমার মধ্যে পুষ্পিত এই আনকোরা নতুন প্রাণ তার স্বত্বা নিয়ে ছিমছাম এক ডল্ পুতুলের আকারে দিন-দিনে পরিপূর্ণ রূপ নিতে থাকায়,—ও, মানে এই সম্ভাবিত প্রাণকণা আর অন্য কোন উপায় খোলা রাখলো না—যাতে তোমার আবদার অনুযায়ী মিথুনে লাজহরা হোয়ে—ইন্ ইটস্ ট্রিমেণ্ডাস্ য়্যাক্সটেসিতে—যতোই মাতি না কেন,—তবু আর তোমার দেহের পবিত্র কোন অণু পরিমাণ শোণিতকণা—আমার মধ্যে খুঁজে পাবে না সৃষ্টির—সেই উৎসটিকে। কাজেই, উই হ্যাভ নো মোর এনি নীড্ অফ্ প্রিকোশান।"

প্রজ্ঞাপারমিতার সেই নামধেয় মাধুর্য্য—তখন এই সাঁঝের সুন্দর পরিবেশ ধরে সন্ধ্যাকে কোরে তুলেছে—অপার রহস্যময়ী। অথির বিজুরিকা।

সব কিছু জানাকে যেন ভুলে গেছে এমনি এক অসহায় অবস্থার মুখোমুখি এসে দাঁড়ানো গৌতম বলল আকুলতা দেখিয়ে—

"কেন? কি কারণে?"

"ভারী অবুঝ সেজে বসছো, না?" তাই শুধিয়ে নিয়ে সন্ধ্যা বলে উঠল রূপকথার মায়াঞ্জন ভরিয়ে, তারই প্রভা প্রাণাধিকের মনে পরশ বুলিয়ে দেওয়ার মতোই—

"শোন গৌতম, 'ইট্ হ্যাজ বিন অবজার্ভড্ দ্যাট্ মোর দ্যান ওয়ান মেল সেল্ ক্যান এণ্টার দ্য এগ্—বাট ইজ থট দ্যাট ওনলি দ্য ফার্স্ট টু রীচ দ্য ফিমেল নিউক্লিয়াস ক্যান কমপ্লিট ফার্টিলাইজেশন,—দেয়ারবাই শাটিং আউট দ্য কম্পিটিং স্পার্ম সেলস্।'—বুঝলে, আশা করি। শ্রীমতী জেরালাডাইন্ লাক্স ফ্লানাগান—এ কথা বলে গেছেন মেয়েদের কন্ফাইনটেন্ট পিরিয়ডের প্রথম মুহূর্ত থেকে ধরে—প্রতিটি দিন, সপ্তাহ, আর মাসে-মাসে ঘটে চলা—সৃষ্টিকাজের নানান পর্যায়গত ডেভলপ্মেণ্টের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ব্যাখ্যা করা—ঐ 'দ্য ফার্স্ট নাইন মান্থস্ অফ লাইফ্' নামী গ্রন্থে। টুলটুল হওয়ার আগে বইটি ছিল আমার পথপ্রদর্শক। অনেক বার পড়ার দরুণ এই কথা মনে র'য়ে গেছে। তাই বলছিলাম কি, হ্যাঁ, বলছিলাম এবার থেকে নির্ভাবনায় নিঃশঙ্ক চিত্তে তুমি আমার রাতের প্রমত্ত প্রহর ধরে—মিথুনলোকে খুশী হ'তে হ'তে রাখতে পারবে—সুখী। দারুণ রভসিতা। ধ্যাৎ, বাজে কথা বলছি না? লোকে এমন

অবস্থায় আমার মুখে এই লাজহীন অভিলাষে—স্বেচ্ছায় ডুবে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রতে দেখে ভাববে—তোমার সন্ধ্যা কত লোভী ! কত বেশরম !" একটু বিরতির ছন্দ ধরে বলতে লাগলো সন্ধ্যা মধুরিকার আর্তিতে—

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি আমার গৌতম আমায় ভুল বুঝবে না।"

সে কথা বলেই প্রাণাধিকের সুস্মিত ঠোঁটে সশব্দে ঘেরা সেই চুম-চুমা-চুম আলপনা দীর্ঘ ক'রে এঁকে দিয়ে—সুধীরা হোয়ে সন্ধ্যা জানালো—

"এই মনে আছে ? মনে করাবো ?"

"কী ? লাভলি, তুমিই মনে করিয়ে দাও।"

"দিচ্ছি।" আবেশ ঝরা গলায় নিবেদনে নামলো সন্ধ্যা—"যৌবনকালে শুধু শুচিতা নিয়েই বিবাহিত যুবক সকাশে—যুবতীর প্রসঙ্গ পৌছয় মিথুনের আসঙ্গ নিয়ে। এ কথা বিয়ের আগে আমায় কোর্টশিপ্, করার ফাঁকে—একদিন ভাবে জ্বল্‌জ্বল্ হোয়ে তুমিই বলেছিলে। আর, তারপর গৌতম তুমি এ-ও বলেছিলে যে, যৌবনে পরস্পরের যৌবনকে ব্যবহারে—যেন আমরা যৌবনের সুধা নিয়েই মাতি। ড্রিঙ্ক দ্য গ্যাষ্টো অফ লাভ টু দ্য ইয়্যুথ্ ! মনে পড়ে গৌতম, একদিন তুমি তোমার মনের কথা খোলাখুলি ভাবকুট্টিম করার মধ্যে—একখানা সুন্দর চিঠি হাজারীবাগ বেড়াতে গিয়ে লিখেছিলে,

'জানো সন্ধ্যা, এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ আমায় এত মুগ্ধ কোরে তুলছে যে, খালি জন কীটসের মতো নিজেকে মনে হোচ্ছে—ওয়ান হু হ্যাজ বিন্ লঙ্ ইন্ দ্য সিটি পেন্ট। এখানের বন-বাংলাতো থাকতে-থাকতে, গাছ গাছালির শুধু সবুজ সমারোহে অহরহ যাচ্ছে আমার চোখ ধাঁধিয়ে। অনুভব ক'রছি দারুণ অস্বস্তির সঙ্গে যে, এখানে তুমি অনুপস্থিত। মাঝে-মাঝে দুপুরে ছায়াসুনিবিড় মৌনতা ছড়িয়ে রাখা কোন গাছের নীচে শতরঞ্চি বিছিয়ে হাল্‌কা মেজাজের বই শুয়ে-শুয়ে যখন পড়ি, তখন প্রায়ই কবি হোতে ইচ্ছে যায়। মনে গুনগুনিয়ে ওঠে কয়েক লাইন। ছন্দে ঘিরে। ভাবে মাখামাখি হ'য়ে। কিন্তু আমার কাছে অমন অবস্থায় অমারই বুকে—নিজস্ব গুচ্ছ-গুচ্ছ সোনালী চুলে ভরা মাথাটি রেখে কোন ফ্যানি ব্রন্ প্রণয়সাধিকার আর্তিতে ঝল্‌মলাতে থেকে, নীল-নীল দুটি ডাগর চোখের মিষ্টি চাহনি দূর-সুদূরের আকাশে ধরে রেখে—বারে বারে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে না—ওর এই বিশেষ ধরনেরই স্লিপিং-কাম-সিটিং ভঙ্গিমায় শ্বেতশুভ্র দু'খানি হাঁটু ছাড়িয়ে রেশমী স্কার্ট হাওয়ার দাপটে সরে-সরে যাচ্ছে কিনা—তাই দেখা নিয়ে। হয় ত' বা লাজের গুরুভারে ভেঙ্গে পড়তো—লিজারেরই প্লেজারেবল মুডে—আমারই বুকে শায়িতা ঐ শ্রীমতী—যখন যুবক তার যৌবনিক স্বভাবে দুষ্টু হ'তে-হ'তে আপন হাতে মধুরিকার

নিখুঁত ছবির মতো বুকখানার ধারালো সুষমায় আদর করার কানুনে—ভরাতো মুঠো-মুঠো শিহরণ। গুচ্ছ-গুচ্ছ আরক্তিম চন্দ্রমল্লিকা তোলাতো ফুটিয়ে—যেমন সত্যেন দত্তের সেই লিমেরিক কবিতার জাপানী মেয়ে ও'হারুর যৌবনতরী বুকেতে উঠতো ফুটে। থরে থরে। বৃন্তে বৃন্তে। ইষ্, লজ্জায় উঠছো ত' ভয়ানকরকমে রেঙে ? সন্ধ্যা, তাই না ? আমি ত' তোমার মন দিয়ে আগাগোড়া ক'রেছি—মনসিজা। মনোবাসিতা। জানি, অনেক আধুনিক আজ যেখান ধার ধারে না কণামাত্র লজ্জার—সেখানে তুমি অসম ভাবে ভালো বলে ভালোবাসো—লাজুকার নম্র ছন্দটিকে। ব্রীড়াবনতাকে।

জানো সন্ধ্যা, লজ্জা শব্দটি যত বেশী ভাবগাঢ়, —তেমনি ঐ ইংরেজীর 'শাই' বা 'কয়' বা 'মডেষ্টী'—অতটা গভীর নয় লাজময়তা বোঝানোর ব্যাপারে। এ আমার নিজস্ব ধারণা। জানতে ইচ্ছা করে, তোমারও কি তাই ?

শোন সন্ধ্যা, গাছ-গাছালির সুনিবিড়ী মধ্যয়ায়—আমি তোমাকে ভাবছি। তোমাকে দেখছি। মজা পাচ্ছি ভেবে চলায়। তুমি যদি কাছে থাকতে, আমারই শতরঞ্চে ঐ শোয়ায়-বসায় কখনো পা ছড়িয়ে, নয় ত' শাড়ির আড়ালে গুটিয়ে, হাতে থাকতো ক্যাডবেরীর ফ্রাই, তা খাঁজে-খাঁজে টুকরো ক'রে ভেঙ্গে নিজের মুখে দিতে, আর বলতে 'এই, হাঁ কর'। আর কথা মতো তা'করার সাথে পলকও পড়তো না—তুমি তা পুরে দিতে আমার মুখে। ভারী মজার, না ? তোমার লাল পাড় শাড়ী উড়তো বাদলার পাগলা হাওয়ায়। পিঠ এড়িয়ে, আর শৈল্পিকতায় ঝকমকানো বুক ছাড়িয়ে। এড়িয়ে। কেয়ারফুলি কেয়ারলেসলি।

তুবি বলতে অস্ফুটে 'না-না, দ্যুৎ। ছাড়ান দাও দুষ্টমি'। কিন্তু ওটা ত' তোমাদের মনের কথা নয়।

মনের কথা ইশারায় জানায়, ওগো সুন্দরমন, তোমার যুবক স্বভাবে মধুর হ'য়ে 'রাঙাও আমারই বুকের কাঁচলি।' তুমি যখন আঁচলে আবার আড়াল দেওয়াবে,—তখন কানে-কানে তোমায় শুধাতাম নিশ্চয় 'কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে/বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,/তারি মাঝখানে কি যে রয়েছে লুকায়ে/অতিশয় সযতনে গোপন হৃদয়।'—তাই, হ্যাঁ, আজ এখানের সবুজ বনানীর সাথে আরো সবুজ হোয়ে চুপি-চুপি শুধাই 'সেই নিরালায়, সেই কোমল আসনে,/দুইখানা স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়' রাখবে না কি আমায়—নিরবধিকালের জন্য ? ওগো সন্ধ্যা, মাই লাভলিয়েস্ট্ ইভেনিঙ্ ?

মধুমিতা, জানো, আমার ভালোবাসা আমারই জীবনপণ করা ধর্ম। আর তার প্রবাহমান পথের উৎস বল, আর লক্ষ্যই বল না কেন—সে হোলে তুমি। তুমি। তুমি-ই। আমার জানাতে ইচ্ছুক শতেকেরও বেশী বছর আগে,—বুঝলে আনন্দিতা ঠিক

তাঁরই জবানবন্দীতে—'Love is my religion—I can die for that. I could did for you. My Creed is Love and you ane is only tenet. You have revished me away by a power I cannot resist....I cannot breathe without you....'

এ কথা উদ্ধৃত ক'রছি দারুণ পুলক থেকে। তারই ঝলকে দুলে উঠে বিহ্বল হ'য়ে। আমি লিখছি। কিন্তু লেখা ফুরাতে চাইছে না কিছুতেই। প্রিয়ার কাছে পত্রবিলাসে নামলে পর বোধ হয় কেন, হয় ত' নিশ্চয়ই—এমন বাদুলে পাগলামি পেয়ে বসে! কত পাগলামিই না পেয়ে বসেছে আমায়। দেখলে পর তুমি নিজেই হেসে লুটোপুটি খেতে। হেসে—গড়িয়ে কুটোপাট।

সেই বিয়ে বাড়ীতে আর সবার ফোটো তোলার ফাঁকে—প্রথম পরিচয়ে তুমি আমায় অনুমতি দিয়েছিল—তোমারও একটি স্ন্যাপ্ নিতে চাওয়ায়। গেভাপন ফিল্মে তোলার সে ফোটো তোমার চেহারা ও সাজ-পোশাক প্রতিটি নিয়েই—হু-বহু রঙ-বেরঙে ফুটেছিল। জানো সন্ধ্যা, তারই ক্যাবিনেট সাইজ এক এনলার্জমেন্ট সঙ্গে ক'রে এনেছি। রোলাঁর মহাগ্রন্থ 'জ্যাঁ ক্রিস্তফে'র মধ্যে ছিল। বার ক'রে তার গায়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

জানো, দু'চোখ দিয়ে দেখছি। তারিয়ে তারিয়ে ছবির মধ্যে ব্যঞ্জিত তোমার ম্যাচলেশ সুষমার রূপাঞ্জন চোখে মাখছি। তোমার বাম ধারের প্রোফাইলে তোলা। ঐ মুহূর্তে মনে পড়ে তুমি তোমার লাল পিওর সিল্কের সোনালী পাড় শাড়ী পরেছিলে—গাছকোমরে টাইট কোরে। ব্লাউজখানা ছিল সাদা দুগ্ধফেননিভ। তাতে ব্রোকেডের কাজ করা। তুমি পেছনে দু'খানা হাত রেখেছিলে মুষ্টিবদ্ধ—একটা খাবারের রেকাবিকে ছবির আওতা থেকে বাদ দেবার জন্য। চমৎকার ছবি উঠেছিল। তুমি ছোট্ট মেয়ের মতো পরে তা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে—'কি সুন্দর! ঈষ্, আমি কী এত' সুন্দর!' বলতে বলতে একটা নাচের ছন্দ খেলিয়েছিলে তুমি—তোমার সমস্ত শরীরময়। যার ফলে তোমার মাথার লাল বিরন বোধ হয় আল্গা ভাবে ফুল হ'য়ে থাকায়—খুলে গিয়েছিল। তুমি পরমুহূর্তে আমায় চমক দিয়ে—আমারই সামনে কেঁদে ফেলেছিলে।

বলেছিলে, 'এ কি কোরেছো তুমি ফোটোতে।'

'জানো গৌতম, আমি কত লক্ষ্মী মেয়ে। আর এই ফোটোর আমি দেখতে হ'য়েছি ভয়ানক দুষ্টু মতন। খু-উ-ব আধুনিক। ধ্যাৎ। এ আমি নই।'

আর তখনি তোমার মা তোমায় ডেকে ওঠায়—তুমি পড়ি কি মরি ক'রে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলে। দরজার কাছে গিয়ে ফ্রেম থেকে দু'ভাগ করা ক্রেপ কাপড়ের আকাশ রঙ্ পর্দায়—তাড়াতাড়ি জোরে জোরে ঘষে মুছে নিয়েছিলে—চোখের জল।

তারপর কিছুক্ষণ পরে বাইরে থেকেই খিল্‌খিলানো হাসিতে ছুটতে ছুটতে ঘরে এসেছিল—এক হাতে চায়ের পেয়ালা অন্য হাতে খাবারের রেকাবি নিয়ে। সমস্ত শরীরের যৌবনিক কন্টুর (contour) ভরিয়ে এক নাচের মুদ্রা খেলিয়ে—সামনের টেবিলে রাখতে রাখাত—লাল সোয়েটসের স্লিপারে ঝরিয়েছিলে নাচের শেষ বোল—ছান্দষ্‌ভাবে পা ফেলে ফেলে। সপ্রগলভা হোয়ে নিজের দু'হাত জড়ো ক'রে সামনে আমার ওপের হুমড়ি খেয়ে পড়ার মতো হোয়েই বলেছিলে 'গৌতম? এই, হুজুরে হাজির আছি। তা' এই বার কালবিলম্ব না ক'রে আপনি ভুজপাশে বান্ধি করো দ্বন্দ্ব। কেমন?

তোমার কোনো এক ছোট্ট মেয়ের মতো দেয়ালা হাসিতে ঝলসে উঠে। বলেছিলে তখনি, 'অনার্সে বিদ্যাপতি পড়তে হ'য়েছিলো। আচ্ছা গৌতম ফোটোতে তুমি যে আমায় একেবারে বানিয়ে দিয়েছো বিদ্যাপতির আঁকা শ্রীরাধা। কী দুষ্টু মেয়ে আমি! বল, তা না হোলে অমন পোজে এই প্রোফাইল ছবিটি তুলতে দিলাম কেন? তোমার সন্ধ্যা যে তোমার ক্যামেরায় শ্রীরাধা হোয়ে উঠে 'ফুলের গেরুয়া ধরয়ে লুকিয়ে সঘনে দেখায় পাশ। উঁচু কুচযুগে বসন ঘুচে মুচকি হাস।' ঠিক তা যে।'

তারপর আমার একখানা এনলার্জ করা কপিতে তুমি দিয়েছিলে তোমার নাম লিখে। সেটাই আমার কাছে রয়েছে এখন। আমিও দিয়েছিলাম নিজের হস্তাক্ষরে মন্তব্য ভরিয়ে—যেটি তোমার দেরাজে কোন না কোন শাড়ীর ভাঁজে রেখেছো সযত্নে। জানো সন্ধ্যা, তোমার ঐ জন্ কীটসের ধ্যানে ভাবিত ও অনুরঞ্জিত হোয়ে এই পত্রালী মারফৎ জানাচ্ছি আমার রুচিস্নিগ্ধ এক মিনতিভার—

'O, let me once more rest
My soul upon that dazzling breast!
Let once again those achin arms be plac'd
The tender gaolers of thy waist!
And let me feel that warm breath here and there,
To spread rapture in my every hair.'

নিজের মহাকবি পরিচিতের মতোই, ব্যক্তিক জীবনে ছাব্বিশ বছরের স্বল্পায়ু এই কীটস্ ছিলেন মহাপ্রেমিকও। সন্ধ্যা, আমার লাভ্‌লি, একটিবার ভেবে দ্যাখো ত' তা হোলেই বুঝবে—কত গভীর ভালোবাসার অনুধ্যান জানতেন এই মহাকবি। এই চির সৌন্দর্যের মহান সাধক। ভাবলে মুঠো মুঠো অবাক বিস্ময়ে মন-প্রাণ ছেয়ে যায়। রেঙে ওঠে। জানো সন্ধ্যা, আজ যেমন এক একবার অসীম আকাশের নীল নির্জনতার দিকে তাকিয়ে উদার ব্যাপ্তির ছোঁয়ায় সীমা-সীমাহীনতার হদিশ নিয়ে

বিবাগী হ'চ্ছি, বুঝলে তেমনি ওপর থেকে দৃষ্টি নামিয়ে এনে যেই সামনে রাখা ফোটোতে তোমায় দেখছি, ঠিক তখনই বুঝতে পারছি—আমারই যৌবনের সীমা। জীবনের ধর্ম। গেভা-প্রিন্টে ফুটে উঠেছে তোমার লাল লাল ঠোঁট। ঝল্সে আছে তার কিনারা জুড়ে—তোমারই শুচিস্মিতা রূপ। তার ধ্যানস্নিগ্ধতা।

জানো সন্ধ্যা, তোমার এ ঠোঁট এত ভাবময়তার ছন্দ নিয়েও—আকুল হয়ে আছে—দুষ্টু অনেক কিছু অভিলাষে। অভিমানে। এখনও জানি এ ঠোঁট কৌমার্য্য হারায় নি—যদিও তুমি আমায় কয়েকদিন আগেই দিয়েছিলে এক সানন্দিতার অধরে—থরে থরে মন্ পসন্দ্ যুবকেরই অধরায়ন সমাপ্ত করার জন্য—রীতিসুন্দর অধিকারটী। তার স্বাধিকারকে।

সন্ধ্যা তখন কথার গতি হারিয়ে মৌনতার ধ্যানে—অধরে অধরে ক্ষণিকের জন্য ঘটিয়েছিত—প্রণয়সম্মিলন। সম্পন্ন হোয়েছিল রুমুঝুম্ সন্ধ্যালী লগনের—নির্জন স্বাক্ষরিল—One small bethothed kiss. আজ সে কথা মনে ঝল্মল্ ক'রতে থাকায়, আর মাদুরে রাখা বইয়ে ঠেস দিয়ে থাকা তোমার ঐ গেভাপ্রিন্ট ফটো অপলক চোখে দেখায়—মনমদির স্ফূর্তিতে ভাসতে ভাসতে ভাবছি—সেদিন আমার যুবকাধর তোমারই অভিলাস অনুযায়ী 'met in embrace with your red lips, 'It was the juxtaposiion of two orbicularies oris muscles in a state of contraction.' সন্ধ্যা। সেই যৌবনের দু'তরফাই তেমন ভাবগাঢ় লাজগাঢ় ক্ষণিকের অধিবাসে—প্রাথমিক কুমারবিস্ময়টির উন্মোচনে সহযোগী হ'য়েছিল—এমন ব্যাখ্যায়। এমনই ধ্যানের আকর্ষণে। নিলাজে মৃদুল—কনট্রাক্শানে। জাক্সটাপজিশানে। স্বাভাবিক রঙে ফুটে ওঠা এই ফটোর তোমায় লাল-লাল অধর জোড়া শুচিস্মিতা-তরঙ্গিমা—আমার মনে গুন-গুনিয়ে তুলছে—লর্ড বায়রনকে। তুমি আমার হেইডী। আমি তোমার জুয়ান। তাই মনে হোচ্ছে—

'A long, long kiss, a kiss of youth and love,
And beauty, all concentrating like rays,
Into one focus kindled from above;
Such kisses as belong to early days,
Where heart and soul and sense in concert move,
And blood's, have and the pulse a blaze
Each kiss a heart–quake and for a kiss—is strength,
I think it must be reckoned by its length.'

জানো সন্ধ্যা, তারপর দেখছি তোমার লাল রেশমী শাড়ীর আঁচলে আড়াল দেওয়া সত্বেও—গাছকোমরে তা পরার জন্যই তোমার মধুছন্দায়ী বক্ষসুষমা—ভাষাময় রূপতরঙ্গ নিয়ে ঝলসে আছে। তুমি সন্ধ্যা, আধুনিক প্রেমমানসের অসম জটিলাদি সমেত ব্যাপক বিশ্লেষণাত্মক কাহিনী—গদ্যে লেখা মহাকাব্যোচিত 'রত্ন ও শ্রীমতী' পড়েছো তা' ? মনীষী-শিল্পী অন্নদাশঙ্কর কৃত নায়ক রত্নর চোখের সামনে নায়িকা শ্রীমতী গোরীর রূপবর্ণনার ঐ 'বজ্রশ্রী'র মতো এক মূর্তি নিয়ে—তুমি নিজেও বিভাসিত হোয়েছো—আমার হাতে তোলা—ঐ গেভাপ্রিন্টে—দ্যাট হোয়াইট লুসেন্ট, ওয়ার্ম, মিলিয়ন প্লেজার্ড ব্রেস্টস—তোমার লাল আঁচলের কারাগারে—দুষ্টু আভাষ ফুটিয়ে রেখেছে।—ঝলকে ঝলকে। সন্ধ্যা, সেই অনিন্দ্য সুষমার সাগরে কী আমায় একদিন করাবে না—জন কীটসের মতো ধ্যানস্নিগ্ধ প্রণয়ে, রভসময় ? বহুত মিনতি করার পর শুদ্ধশীলা সন্ধ্যা কি নিজে থেকে আমার আদর ভরা আধারের অবস্থান স্থাপন করাতে নিলাজিকা হবে না,—যাতে ক'রে আমার প্রণয়ার্তি সমেত আমি 'Pillowed upon my fair loves ripening breasts/ To feel forever its soft fall and sweel' এ—রুচিস্নাত হোতে পারি ? জানো ত সন্ধ্যা, কীটস্ তাঁর সাহিত্যিক ভুবনে শ্রীমতী ফ্যানী ব্রন্ সমক্ষে ঐ সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রখরতায় রেঙে উঠে না জানিয়ে পারেন নি—'Ode To Fanny' তে—

'Physician Nature! let my spirit blood!
O ease my heart of Verse and let me rest;
Throw me upon thy Tripod, till the flood
Of stifling numbers ebbs from my full breast.
A theme! a theme! great nature! give a theme;
Let me begin my dream.
I come—I see thee, as thou standest there,
Beckon me not into the wintry air.'

না-গো-না, সন্ধ্যা,—এত' লাজমধুর কথা আর শোনাতে চাই না—আপাতত। তুমি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক যুবতীপনায় মনে-মনে সায় খুঁজে পেলেও—তোমার একলা থাকার গৃহকোণে এ-কথা পড়তে-পড়তে শরীরে লাজময় ছন্দ দোলন জাগাতে থাকায়—খুব ব্যাকুল হোচ্ছ। কেমন, তাই না ? এ কথা বাদ দিচ্ছি। সাক্ষাতে আমার প্রণয়—ওপরের কথার যাথার্থতা নিরূপণে তোমারই স্বত্বায় মুঠো মুঠো আবীর মাখানোর মধ্যে—ন্যায়তঃ পেতে চাইবে এরই সত্যসন্ধ একান্ত যৌবনিক রীতির নিলাজক সমীক্ষাটি। অভিজ্ঞা অর্জনের অভিজ্ঞতাটি। শোন সন্ধ্যা, কিছুক্ষণ আগে

মহান কথাকার ও নিঃসঙ্গ বিপ্লবী রোমাঁ রোংলাঁর 'জ্যাঁ ক্রিস্তফ' পড়াছিলুম। এর মহাজীবনীক ধ্যান ও কর্মে নিয়োজিত নায়ক তার যৌবনে—যুবকল্পনার সপ্রতিভ দুনিয়ায়—শ্রীমতী য়্যাডা নাম্নী এক সবুজ বয়োসিনীর—সজীব ফুলের মতো সৌগন্ধময় দেহমনের মিতা হোয়ে প্রণয় মিতালি পাতানোর রূপবাসরটি—রোলাঁর পল্লী প্রীতির দারুণ আন্তরিকতায় ঝল্‌মলিয়ে—কী সুন্দর ক'রে না জানাচ্ছে,—তা শোন সন্ধ্যা একটিবার—'Respect for property had not developed in Christophe since the days of his expedition with Otto : he accepted without hesitation. She (Ada) amused herself with petting him wih plums. When he had eaten she said : "Now..." He took a wicked pleasure in keeping her waiting. She grew impatient on her wall. At last he said : "Come, then!" Held his hand upto her. ...But just as she was about to jump down, she thought a moment. ....“Wait! We must make provesion first!"...She gathered finest plums within reach and filled the front of her blouse with them. ... "Carefully! Don't crush them!" He felt almost inclined to do...she lowered herself from the wall and jumped into his arins. Although he was sturdy he bent under her weight and all but dragged her down. They were of the same height. Their faces came together. He kissed her lips, moist and sweet with the juice of the plums, and she returned her kiss without more ceremony...."Where are you going?" he asked. ...."I don't know." ..."Are you out alone?"... "No, I am with friends. But I have lost them. ...Hi! Hi!" She called suddenly as loudly as she could.. .... No answer...She didnot bother about it any more. They began to walk, at random..." দেখলে ত' সন্ধ্যা, শ্রীমতী য়্যাডা প্রথম-প্রথম তার প্রণয়ী যুবক সমক্ষে অনিচ্ছার আড়াল দেখিয়ে—ওর যুবকোচিত দুষ্টুমিকে বাধা দিয়েছিল। কারণ ওটাই হোল মেয়েলি রীতিকা। হ্যাঁ, আর তারই ক্ষণকাল পরে যে স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ কোরল—আপন যুবতীকায়—সেই দুষ্টুমিরই সমীক্ষার লাজ-স্বাক্ষরিত হওয়ার জন্য,—ওগো সন্ধ্যা, তোমার মতে তোমাদের এই ব্যবহারটিই নাকি—অরিজিনাল যুবতীত্ব। তারই ইটার্নাল ট্রুথ্। আমার আদর, মনে পড়ে তুমিই একদিন কোন বই থেকে কোট ক'রে জানিয়েছিলে আমায়, যে, প্রণয়িনীদের মনপসন্দ করা রীতির সবুজ ঘরে 'It is characteristic of the male to desire the woman who is

not too readily attained—the obstacles of amorous pursuit stimulating the ardour of the lover. Modesty and reluctance therefore become an asset to woman—as the love object.' একটু থেমে কি ভেবে নিয়ে তুমি আমার বুকে ঘনিষ্ঠ হ'তে-হ'তে বলেছিলে, "পাচ্ছো, তাই বলে কোন দুষ্টুমি চাপিয়ে দিও না কিন্তু। তোমায় গৌতম, দুষ্টবুদ্ধি এখন যেন না পেয়ে বসে।' তাই মুখের কাছে আড়াআড়ি ভাবে তোমার মুখ রেখে সহাস গুঞ্জনে পড়ে গিয়েছিলে আরো কিছুটা, যেখানে আছে সুন্দরতম বিশ্লেষণ প্রেমময়ী যুবতীদের আমমহলী কথায়, 'Even the woman of easy virture may assume the defensive mantle of modesty, and indeed may do so quite naturally and legitimately, as modesty in the valid expression of the feminine erotic impulse. The spontaneous modesty of the young, unsophisticated-girl, however, has a quality of its own, a charm that her more worldly-wise sister can hardly affect convincingly.' হ্যাঁ সন্ধ্যা, তাই বলি, সময় মতো নিশ্চয় তুমি কবি—সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-দোদুল কথায়, আমার কানে-কানে আলতো ভাবে তোমার লাল অধর থেকে ঝরা শিহর—লতি পর্য্যন্ত ছোঁয়ানোর ভেতরে—আবদারের সুরে ঝন-ঝনালো।

ডান হাতে গৌতম প্রিয়ার পিঠময় বুলনো আদরে ঢেকে দিচ্ছিল—কথা বলতে বলতে। রেশমী আঁচল আর ব্লাউজের মোলায়েম ভাব—ওর হাতের পরশ মধ্যে ভরিয়ে তুলছিল—পিছল অনুভব। আদর অবশ্য হড়কে পড়ছিল না পোশাকেরই পিছলতায়।

"জানো সন্ধ্যা, তোমাদের মতো মধুরিকার শ্রীরাধা হোয়ে হঠাৎ কাজল-কালো চোখে দোল খাওয়া সেই টল্‌মলানো মদিরতা নিয়ে অপাকে আর্ধেকেরও আর্ধেক করা চাহনির মধ্যে সাজায় যে সেই দুষ্টকী ইশারাটি—হ্যাঁ, তা তোমার গৌতমকে তখনি সাড়া ভরিয়ে করায় সজাগী রাজ। প্রিয়ার ঐ বিলোলে-হিল্লোলে ধরা আবদারানুযায়ী আমাদের প্রণয়াকুল ভুবনে তখন 'সেথায় প্রিয়গণ সোহাগে প্রিয়াদের টানিয়া ল'তে চায় দেহের বাস ;/ চপল করে যবে নীবীর খুলিয়া ফেলি' দেয় ছড়ায়ে হাস, /সরমে নারীগণ নিবাতে আলো তরে ফাগের মুঠি ছোঁড়ে দীপশিখায়/ ; সে কাজে বৃথা হায়, নেবে না মণি-দীপ ঘুচাতে রমণীর সে-লজ্জায়।'—কি গো মধুমিতা, বেশ সুন্দর না ?"

সুজন স্বামীর কাঁধে মাথার ভার ন্যস্ত রাখার মধ্যেই খুশীয়াল গলায় সন্ধ্যা ঝরালো কাকলি—

"বেশ সুন্দর না! খালি প্রশ্ন। বাব্‌বা, অত শত জানার কি আছে?" কথার শেষে তুমুল হাসির দোলা ঠোঁটে দোদুল হওয়ায়—তা আছাড় খেলো ওর জামায়। কাঁধের পুটে।

"যদি বলি এমনি? অকারণে। হঠাৎ আলোর ঝলকে মন আমার চমক পাওয়ায়। বিহ্বলে ভেঙ্গে পড়ায়।" তাই ব্যক্ত ক'রলো গৌতম।

ছররর‍া ফোটা হাসির রবাব তুলে সন্ধ্যা না বলে পারলো না—"এই বুঝি শুধু! আর নয় বেশী কিছুটা, না?"

"সত্যি। এইটুকুই।" শুরুতেই কথা শেষ হোল।

"বলি।" কথার রেশ কাটা-কাটা হোল সন্ধ্যার সুবচনের লালিমা জুড়ে, "পরের করা অনুবাদ ত' শোনালে। বাঙলায় শোনা মানে—তা, একরাশ লজ্জা নিয়ে বোঝা। এই ত! বলি অরিজিনালে গেলে না কেন?"

"গেলাম না, সেই আসল সংস্কৃতের মণিকাঞ্চন তোমার জানা আছে বলে—সন্ধ্যা?"

"কী? বল। ফারমাশ কর গৌতম।"

'তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রঙ্ আছে উজ্জ্বলি হ্যাঁ গো সন্ধ্যা, মাই গ্লোরিয়াস ইভেনিঙ্,—এর বেশী আর কিছুটি জানাতে চাই না। বলতে চাই না। এই লিপি অনেক বড়ো হোয়ে গেছে—আমারই জানার মধ্যে। আমারই ইচ্ছায়।

জানো সন্ধ্যা, এ চিঠি শেষ করার শুভমুহূর্তে আবার জন কীটস্ থেকে মুক্তা দানার মতো ঝকঝকে সূক্তি উদ্ধৃতি করার—দারুণ লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এই চিঠি পেয়ে—সময় মতো এরই উত্তরলিপিকাটি সাজাবার সময়—ওগো সন্ধ্যা, জন্ কীটসের কথায় জানাই তোমার পত্রালী সমাপ্ত হওয়ার পর—এন্‌ভেলাপের কারাগারে বন্দী করার আগেই—'...make it as rich as a draught of poppies to intioxicate me—write the softest words and kiss them that I may at least touch my lips where yours have been'."

ঈষ্। দেখেছো সন্ধ্যা, ভুলে গিয়েছিলুম একটা কথা। তাই শেষ মুহূর্তে জানাচ্ছি। আমাদের বাঙালী সমাজে—দাম্পত্যজীবনে দু'টি স্বত্বা তাঁদের পারস্পরিক চিঠি-পত্রের আদান-প্রদানী ভাষায় মধুনির্ঝর নিরালাটি কেমন ভাবে রচনা ক'রে—তার নিদর্শন 'ভাই ছুটি' নাম অভিহিতা স্ত্রী মৃণালিনীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছে। উনি ত' বাঙালা পত্র-সাহিত্যের রাজা। কিন্তু এ ছাড়াও ওঁর মধ্যম অগ্রজ—ভারতের প্রথম আই. সি. এস, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,—হ্যাঁ, এই তিনিও তাঁর সাহিত্যিকা স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে (যাঁর লেখা 'সাত ভাই চম্পা' ও 'আগডুম বাগডুম' ছিল তোমার

ছোট-বেলাকার প্রিয় সাথী) লেখা চিঠিপত্রে অকপটে 'privacy of glorious light' ভরিয়ে দাম্পত্যিক প্রণয়ের শুচিস্নিগ্ধতা রেখে গেছেন। সেই সব সাহিত্যিক মূল্য ভরা চিঠিপত্রের একটি ছিমছাম সংকলন 'পুরাতনী' নাম নিয়ে প্রকাশ ক'রেছেন—তারই শ্লাঘধন্যা কন্যা ইন্দরা দেবী চৌধুরাণী, যিনি শান্তিনিকেতনের আবালবৃদ্ধবনিতার আদরের 'বিবি-দি'। যাক্ ও কথা। শোন সন্ধ্যা, শেষ কথা শেষ হতে যেয়েও—শেষ হোতে চাইছে না আজ—এই প্রকৃতির খোলামেলা অনাবিল নিরালার মধ্যে। তোমার মতো স্বভাব-দুষ্টু যুবতীকে নিয়ে পত্র রচনায় নেমে—আমার খুশীয়াল মনটিও খালি দুষ্টুমির কথালাপে মেতে থাকছে না, এইবারটি শেষ ক'রছি। লোভ সামলাতে না পেরে—শেষ মুহূর্তে এখানকার পরিবেশগত মিল থাকায়—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই কোন চিঠির শেষটুকু কোট্ ক'রছি—"এখানকার আমোদ আহ্লাদ এখনকার মতো শেষ হইল। আমাদের এখানে....বাবা....কিছুই নাই—মেঘ দেখা যায় বটে, কিন্তু জলদ জল দেন না। তোমাকে এই পত্র মধ্যে চুম্বন প্রেরণ করিতেছি—অনেক অনেক।' তবু পুনশ্চের মধ্যে না জানিয়ে থাকতে পারছি না যে, ঐ স্বনাধন্য সত্যেন ঠাকুর সেই, পুরানো কালের 'স্টীল ফ্রেমে'র কঠোর শাসক হোলেও কি হ'বে তাঁর হৃদয়টি ছিল ফুলের মতো নরম। ছিলেন খাঁটি ভারতীয়।...."

মধুরিকা স্ত্রীর আসঙ্গ ধরে সন্ধ্যা বেশ খানিক সময় টেনে নিয়ে গেল এমনি ক'রে—স্মৃতিচারণার সরণি দিয়ে—প্রিয়তমর সেদিনকার বিহ্বলিত প্রসঙ্গে।

"আর নয়।" হাসতে লাগলো সন্ধ্যা।

"কেন, আরো কিছু যদি স্মৃতির নিলয় ঘেঁটে জানাবার থাকে, তা জানাও না। পুরানো প্রসঙ্গে, জানো ত' সন্ধ্যা, শুনতে বসলে আমেজ ধরায়। আনন্দ দেওয়ায়।"

"ঠিক-ঠিক। আমারও সেই অভিমত।"

পরিষ্কার ক'রে গৌতম তখন শুধালো—"তবে কি জানো তুমি একটু বেশী ভালোবাসো পুরনোকে।"

"এই, কে বললো। কেন বলছো ও কথা।" সন্ধ্যার চোখের দীঘলতায় বিস্ময় জড়িয়ে উঠেছে—তখন-তখনি। ধারালো হোয়ে।

হাসিতে রাঙানো থেকে গৌতম বললো—"ঈষ্। জেনেও তুমি দেখাচ্ছো তা তোমার জানা নেই।

"ধ্যাৎ। বাজে কথা। অপরে বললে মানতুম।"

আবেশময় গলায় কাটা-কাটা ভাবে জানালো সন্ধ্যা।

"এই যা অপরের বলার কি দরকার শুনি। আমি নিজের মুখেই ত' রাখছি এই প্রশস্তি। তবে, সন্ধ্যা ?"

যুবক-চাহনির সবুজ রঙ্ বিস্ময়ে জড়ানো গৌতম—কথা নিয়ে থামলো।

শুচিস্মিতার মতো রঙীন হোতে-হোতে সন্ধ্যা জানালো ঝল্‌মলিয়ে—

"এই। শোন।"

ক্ষণিকের বিরতি রাখলো কথার পিঠে।

"আমার মানে তোমার এই সন্ধ্যার সব কিছুর মধ্যেই তুমি খুঁজে পাও বিশিষ্টতা। তাই ভয় হয় এত' ভালোর আকর হওয়া—সুখের ভার না জানি ম্লান করায়। এবার দোহাই তোমার। আমার মধ্যে ভালো নয় এমন মন্দ কিছুর সন্ধান ক'রো। পারবে না গৌতম ?"

দুষ্টু হাসির ছর্‌ররায় আছড়ে পড়লো তখনি সন্ধ্যা। আমেজ পেতে পেতে।

"না। তা কখনোই সম্ভব নয়। বলি, দুষ্টু মেয়ে, আমায় ছাড়া পারবে কি কখনো অনায়াসে অপর কারুর সাক্ষাতে অকারণে আদুরে বিহ্বলাতায় রেঙে, অভিমানে শিহরণ তোলা এমন কান্না কাঁদতে ? বল, পারো তা ?"

ছোট্ট একে মেয়ের মতো মাথা দুলিয়ে সম্মতির রঙ্ মাখালো আপন সুজনককে।

"বাব্‌বা। সে কি কথা ! তুমি ছাড়া অপরের সামনে তা দেখানো অসম্ভব। বলি মশাই,—অপরের সাথে ত' আর তোমার মতো সম্পর্ক হওয়ার কারণ নেই। তা হোলে হয় ত' পারতুম।"

বলতে-বলতে নিজের অধরের লাল রঙ্ ছাপিয়ে লুটোপুটি করা দুরন্ত হাসির ছর্‌ররা—ঝুঁকে পড়ে আলতো ক'রে ছোঁয়ালো—গৌতমের ঠোঁটে। তারই পলকান্তরে শুধু চাইলো সন্ধ্যা সানন্দিতা—

"এই বলি জানো ত' ?"

"না। জানি না। এই-এই, এমনটা বারেবারে বলে জানিয়ে দাও সন্ধ্যা কি বলতে চাও।

"বলি।" বলেই আবেশের ছন্দ ধরে জানালো সন্ধ্যা—"তোমার সামনে অভিমান ক'রে কাঁদতে খু-উ-ব ভালো লাগে বলেই—মান-অভিমান করার ছোটখাটো সুযোগ ছায় যেই তখনি আমি চোখে ফোটাই ছল্‌ছলানো চাহনি। অভিমান যত গাঢ় হয় কান্নার মাত্র তত বেড়ে যায়।"

সপ্রগল্‌ভ হাসিতে ঝকমকাচ্ছে তখন সন্ধ্যা।

"না কাঁদলেই পারো।" শুধালো গৌতম।

"তা কি হয় !" জানালো সন্ধ্যা সহজায়।

"হবে না। হয় না কখনোই। এ জন্য যে—এটি তোমাদের ছেলেদের ব্যাপার নয়। আমাদের যুবতীদের এক্তিয়ার। বলতে পারো, নিছক এক যুবতীপনা। কিন্তু,

এই নিছক কিছুটিই সময় বিশেষে—আমাদের দারণ ভাবে ভালোবাসার জোয়ারে ভাসিয়ে নেয়।"

কাজল-কালো চোখে মদিরার ঘন ভাব দুলিয়ে তুলেছে তখন—কথা বলার মধ্যে।

"আচ্ছা সন্ধ্যা, সে ত' বুঝলুম। কিন্তু বল কি ভাবে তা পাও।"

বিস্ময়-গাঢ় চোখে তাকালো গৌতম।

"পাই হ্যাঁ, পাই ঐ কান্না ফুটিয়ে। আর তোমায় তা দেখিয়ে। গৌতম, তোমারই বুকের বাঁধনে, এই এখন যেমন বন্দী রয়েছি, ঠিক তেমনি ভাবে থাকতে-থাকতেই ভেসে যাই চোখের জলে।"

সজোরে প্রিয়-সুজনকাক আপন বুকের আরামঝরার নিটোলতায়—খুশীয়াল করার মধ্যে আলিঙ্গনে সংক্ষিপ্ততা দেওয়ালো। আর তারই রভসে বলল সন্ধ্যা—

"হ্যাঁ, তখন তুমি আমার চোখে জলরেখা দেখা মাত্রই ভয়ানক অস্থির হ'তে হ'তে—প্রণয়ে হোয়ে পড়ো দুর্বার। দুরন্ত। ঝড় হ'তে হ'তে শেষে সময়ান্তরে—তুফানও হোয়ে ওঠো। ভালোবাসার যুবতীদের একান্ত নিয়মমাফিক তোমার এই সন্ধ্যাও—তার যুবতীপনা নিয়ে তোমার কাছে—আকাঙ্খা ক'রে, তুমি প্রণয়ে দুরন্ত হও। দুর্বার থাকো। তাই যখন দেখি তুমি গৌতম আমার পছন্দ মাফিক দুরন্ত দুষ্টুপনায় মাততে চাইছো না, হ্যাঁ, ঠিক তখনি তোমায় দুরন্ত-দুর্বার করার সেই আবহমানকালের মেয়েলি অস্ত্রের ঝন্-ঝনানি বাজিয়ে—ক্রন্দসী হই আপন যুবতীপনায়।"

কথা নিয়ে থামতে-থামতে, সন্ধ্যা তার অধরাধারের শুচিস্মিত ব্যঞ্জনা ধরে কাঁপানো বিশেষ যৌবিনিক অভিলাষটিকে—ঈষৎ মৃদুল অস্ফুটতায়, আর তাকালো দু'চোখের কালো কুট্টিমে ঘন তমসা দুলিয়ে রেখে। ঐ ইপ্সায় সাঁঝের আলো হ'য়ে।

গৌতম প্রিয়ার অস্ফুটে কাঁপানো ঠোঁটে ভেসে ওঠা ঈপ্সার যোগ দেওয়ার মধ্যে জানালো—

"তাই বুঝি ? আমার লাভ্‌লি। আমার গ্লোরিয়াস্ ইভেনিভ্।"

দুষ্টু অভিলাষে মাতাল হওয়া মুখের শুচিতা নিঙড়ানো অভিব্যক্তিতে ঝল্‌মলিয়ে পড়ে সন্ধ্যা রাখলো এক আদরণীয় কথা—

"ঠিক-ঠিক। তাই ঠিক।" চোখের মদিরা আরও ঘন করাতে-করাতে বলে উঠলো—"ধ্যাৎ"।

"আবার ও কথা কেন ?" সবিস্ময়ে জানতে চাইলো—গৌতমের খুশীর দারুণ ছোঁয়া ধরা মন।

"তা নয় ত'কি !" বলার মধ্যেই সন্ধ্যা তীব্র হাসির পার ভাঙ্গা ছর্‌ররায় আছড়ে পড়ার মতোই—সুজনকের কাঁধে আপন মাথা সুখের আমেজ থেকে শোয়ানো অবস্থায় রাখলো।

আর তখনি কাটা-কাটা কথায়, যুবতীপনার আবদারে বললো সন্ধ্যা—

"কৈ, এবার ? মানে, তুমি গৌতম আমাদের বিশেষ ভাবে জানানোর ঐ প্রণয় সম্পর্কিত ধরন-ধারণের সবিশেষ ব্যাখ্যা—প্রিয়ার মুখ থেকে শোনার পরেও রয়েছো এমন নির্বাক ! এমন নিরুপায় ! এত শোভন ?"

সুজনকের ডান ধারের কাঁধে—নিজের অধরায়ন দিয়ে জামার পুট বরাবর করাতে চাইলো সিক্ত। বলল তারই মধ্যে—

"আমার নিরুপম ! পরিচিতি অশোভন কী হোতে পারো না আপন যুবক ধরে আমারই কাছ থেকে পাওয়া বিশেষ কিছুর ব্যাখ্যায়, যা এইমাত্র জানলে। শুনলে। না-না, গৌতম তোমরা ছেলেরা মাঝেসাঝে অবুঝ হ'তে খুবই পছন্দ ক'রে থাকো, না ?"

"না গো না। তা নয়। সন্ধ্যা, একটু কি সময় দেবে না ভাষাহীনকে ভাষাময় ক'রে তোলাতে। লাভলি, তোমাদের বিশেষ মুহূর্তে হোয়ে পড়া মধুছন্দা প্রগল্‌ভতা আভাষের চাহনিতে আর ইঙ্গিতময় অস্ফুটতায় যা চায়, বলি, তা আমাদের মানে তোমার গৌতমেরও শতেক বার ক'রে চাওয়ার দুনিয়ায়—ভয়ানক বেশী অভিলাষিত। আকাঙ্খিত।"

[*বাইশে অক্টোবর, ১৯৬৪*]

পারফর্মী আন্-প্যারালালে সুচিত্রা সেনের সেন্স ও সেন্সিবিলিটিস

সে সময় বালীগঞ্জ প্লেস ছিল খুবই পশ্ এরিয়া। দেশের বাঘা বাঘা শিক্ষাবিদদের আবাসস্থল—হিসেবায়। কিংবদন্তীয় অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অভিনয়-প্রিয় ডাঃ মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, সেন-ব্রাদার্সের অমিয় সেন ও অরুণ সেন, অর্থনীতির ডাঃ জে,. পি. নিয়োগী এবং জজ্-সাহেবের বিজ্ঞানী পুত্র ডাঃ শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, শরৎ-মাতুল সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আর বিজ্ঞানী কাম,- কবি–কাম চিকিৎসক ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, এম.ডি., ডি. এস.সি.। এঁদের কারুর বাড়ীতে—বড়ো বড়ো হলেও—নাহি ছিলো বাগান। আর পাড় বাঁধানো পাথরী সোপান নেমে যাওয়া,—কোনো পুকুর—ম্যাথ্মেটিক্যালী স্কোয়ারা। এ বাড়ীর চারোধার রেলিঙে ঘেরা। ঘুটিঙ্ বিছানো পথ—পোটির্কো অবধি। আবার শ্বেত পাথরের চওড়াই সিড়ি, বৈঠকখানায় প্রবেশিতে। খোলামেলা এই চার্মিং রেলিং দিয়ে—এনি প্যাসারবাই ক্যান হ্যাভ্ দ্য ইনটিরীয়োরী গ্ল্যান্স্। বাঁধানো পুকুরী সিড়ির শেষ ধাপে বাঁধা থাকতো— ছোটো একটি নৌকা। প্লেজার ট্রীপী বোট লাইক্। ঠিকানার নম্বরা—বত্রিশ নং। এ বাড়ীর মালিক বেদ-উপনিষদে সুসংহতীয়—এক প্রবুদ্ধয়ীত্ প্রবক্তা। অন্য ধারে কাজের খাতিরায়—দ্য অনারেবল মিঃ জ্যাস্টিস্ আদিনাথ সেন আই.সি.এস.। বিক্রমপুরী কাঠ বাঙ্গাল। তায় কবি রবীন্দ্রের অতি স্নেহভাজন, শান্তিনিকেতনী মানসার খানদান মনস্বী। জ্যাস্টিস সেনের সাথে কলকাতার ও শান্তিনিকেতনের প্রতিটি বিদগ্ধ বাসিন্দার—একটা অনামধেয় আত্মীয়তা ছিলো। যাক্! ও কথা।

এই বাড়ীর মালিক সুযোগ পেলেই শান্তিনিকেতনে ছুটতেন, সস্ত্রীক পুত্র-কন্যা নিয়ে। শ্রীমতী সেনের—এখানকার একটি আশ্রমিক কন্যার ছুটন্তয়ী দুরন্তপনার মধ্যেও দেখতে পান—শ্রীময়ী শান্ত অন্য এক ছোপ। আর, আর এই ষোলো ক্রশ করা, পাবনাইয়া ষোড়শী কন্যার শারীরী সুষমীত্ রূপ যেন—ম্যাচ্লেশ। মেয়েটিকে দেখেন—আর মনে মনে শ্রীমতী সেন, ঐ জজ্-গিন্নী ঠিকঠাক করে বসলেন— একেই একমাত্র ছেলের—পুত্রবধূ করবেন।

শান্তিনিকেতনে—তখনকার নামী ঠান্‌দি, তখন বেঁচে, শ্রীমতী কিরণবালা সেন। আচার্য্য ক্ষিতিমোহনের স্ত্রী—ও ভাবীকালের স্বনামধন্য অমর্ত্যর দিদিমা। ইনার কাছ থেকে খবরাখবর চয়নান্তে—সেন দম্পতি ষোড়শী রূপবতী রমাকে,— রমা দাসগুপ্তাকে—এককথায় হাকিমী ভার্দিক্টি রেখে—করে নেন সাথ সাথ আদরের পুত্রবধূ,—হয়—দিবানাথ জায়া।

এখানকার শ্বশুরালয়ের রম্য পরিবেশে—নববধূ তার দুষ্টমি স্বভাবায়—ঐ নৌকাটি নিয়ে সাঁঝেরবেলায়—ঘুরতো এ ধার ও ধার। ননদকে নিয়ে, বৈঠা ঠেলে। এই রমাই তো কিছুদিন পরেকার—এই শ্রীমতী সুচিত্রা সেন।

নামী ও অনন্যয়ী অধ্যাপক ডাঃ মোহিনী ভট্টাচার্য ঠিকানা বোঝাতে নির্দেশীতে জানাতেন—'সুচিত্রাকে চেনো। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু আদিদার পুত্রবধূ। তার সামনের বাড়ীটাই, আমার পর্ণকুটীরা।' হ্যাঁ, এই তিনতলা বাড়ীও হয় কুটীরী—পর্ণ। "চলোর্ম্মী" নাটকগোষ্ঠী হিসাবে বাড়ীটি ছিল খুবই নাম করা।

অমিয় সেন,—শেলী ও কীট্সের অসাধারণ প্রবক্তা। রামমোহনের ইংরেজি বায়োগ্রাফার ও "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" য়্যানালসীসী থীসীস্ যাঁর,—তিনিও জানান "রমার মানে সুচিত্রার বাড়ীর সামনে দিয়ে চলতে চলতে যে বাড়ীতে এসে ধাক্কা খাবে—সেটিই আমার আর অরুণের আর ডাঃ অনিলের।"

স্থাবর, নয়-নয়, তখনও জঙ্গম রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, দ্য গ্রেট স্কলার। তিনি হাসতে হাসতে জানাতেন—লাঠি নিয়ে বাড়ীর সামনায় করছি পায়চারীর বৈকালিকীতে। কেউ জিজ্ঞাসা করল—বত্রিশ নং বাড়ীটা কোথায়। আমি হাসি মুখে লাঠির ডগা উঁচিয়ে পথিককে দেখালাম, 'ঐ যে—উটি।'

একথা তার বিখ্যাত দাদুকে নিয়ে—বন্ধুবর ব্যারীস্টার জয়ন্ত মিত্রকে বলতেই কী হাসি, 'তুমি মনে রেখেছ। আমরা ভুলে গেছি।'

খুবই ইরোটিকা ভরা চেহারার, আগাগোড়া—পোশাকিতে থাকতো আবডালিয়াতে আড়ালাই—সেন সুচিত্রার। পায়ের টো-য়ী টিপ থেকে গ্রীবায়ী মরাল তক্—হোল্ডী দাই শোল্ডার! বাম কাঁধ রেশমী কী তাঁত আঁচলায় টিপটোপী ঘেরালা। এল্-বো অবধিয়ী। আর ডান ধারী কাঁধ ব্লাউজী ভালে। হাতের পেলবতাটুকুই ছিল ওপেন। বরাবরই শ্লিভ-গ্রেশী হাসোয়া। রাহি ভরাটী হাই। হাচীতে থাকতোয়া তবু আর্ম-পিট্ই আঁক্শীই আশ্লীর্ষার। কীভ্-এ তবু ঢাকা পেয়েও যেন পীভারীল্—রোভারীল্। শিষ্ ভরা যেন ডাক যৌবনার। তবে পরে—ডাহিনী কোমরায় গোঁজা শাড়ীর উপরি উত্তরায়ণটি তেরচায় যেন—সুষিমায়িত বুক শোভাভারকে শাসন দিয়ে যাচলিত্ আঁচলতর বাম কাঁধ ক্রশান্তে ঝুলতোয়া—পিঠময়ে। এই ছবিয়ী সাজ ছিল তাঁর খুবই প্রিয়ল্। যতই রাখুক না শ্রীয়লায় বক্ষ-শাসনা, ঐ আঁচলিত কায়দায়—তবুও অপরার চোখ আদায়ায় পেয়ে যেত—ফর্মী টাইটায়—ওঠাকার ওঠা-নামার কবিতায়ী ছবিতাটা। যৌবনীতে চাঞ্চলিত, কিন্তু জানাই শরীরী যতো ডন্ট্লেস সেক্সীটা—শুধুই প্রস্ফুটায় থাকতো স্থানীকতায়—মুখশ্রীতে। ফেসীয়াল্ কাট্ কাট্ গার্টস্-এ। পবিত্র ঐ যৌনতা যেন উনার চোখের কাজল চাহনায়। অধরেরই চাপী-জাঁপী-ঝাঁপী হাসিরই ঐ ঐ শিশুয়ী দেয়ালায়। আর আর দুই কপোলীতে—খাওয়ী আর

ছাওয়ী—ঐ ড্যান্স অফ্ শাই,—বাই প্রমালগামেটেড্ ইন্ সীন্-ই শেম্ অফ শেম্স। এই হল সেন সুচিত্রার সেন্সিবিলিটিয়ী—সব সব সাসেপ্বিলিটিস। অল্ হার বিউটি ইন্ সেন্সিবল্ স্যেনস্যুয়ালে—স্টোরড্ য়্যাণ্ড স্কোরড্—ইন হার ফেস্ অনলি। সেক্স্ ইন্ পিকচারেস্ক—ইজ্ হাইলী ডেকোরড্,—মেইন্লি টু হার লাভেবলী লাভলী ফেস্। এমন স্নিগ্ধশীলাতায়ীত—অথচ কাম্লী এ গ্রেট্ কন্টেক্সট্ অফ্ ইরোটিসিটী। এ অমূল্য চেহারাই নেহারাটা—আর পরে আর নাহি ছিল আর কারুতে, নান্ দ্য এলস্।

সবাই বলে, আজ এই নতুনী শতেকায় নস্টালজিয়াতে ঐ পেছুনার ঘরে,—ফর হার্ গোল্ডেন সময়ীতার তরে—তত্ত্বয়ে ও তলাশে। সুচিত্রা একটা চির রহস্যময়ীতায় নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে—প্রথম থেকেই। পুণ্যশ্লোক দেবকীকুমার বসুর মাস্টার ক্রীয়েশন্—ঐ 'ভগবান শ্রীচৈতন্য' থেকে,—সেই সেন্সেসেনী অসাধারণ অভিনয়টা থেকে—দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া রূপী সুচিত্রা সেন। সো রীজার্ভড্—সো কনশাসলি প্রীজার্ভড্ ইন্ হারশেল্ফ, কী ইন্ নট্ শোহিঙ্ দ্য পরমাপ্রকৃতিয়ী ঐ আপন ফীজীক্ ফীমেলিয়াটা—বাই এনি ডীয়ার কজ্। বলি, দেবীর দেবীত্বে বলিপ্রদত্তা ঐ বিষ্ণুপ্রিয়া—যথার্থই হন্ য়্যাম্বডীড্—সুচিত্রার অভিনয়ে। সুচিত্রা তার পোশাকী আড়ালা কিছুটায় ছাড় দিয়েছিল। ঐ আটপৌরেয়ী শাড়ীটা পরিধানে, আপন ডান ধারী ঐ ধারালো যৌবনটাকে স্নিগ্ধয়ী ফ্লেভারায়—ব্লাউজী শাসনটা সরিয়ে—শিল্পয়ী খোলামেলে—রাইটী হাতের পুরোটা, আর রাইটী কাঁধটার বাঁধা লজ্জাটাকে দূরে সরিয়ে,—বক্ষসাজোয়ার রাজোয়ারী ডান ধার তেরচায়, যেন ত্রিভুজী আঁকে ধরেছিলো—ওঠাকার মাধুর্য্যা, যথাকার প্রাচুর্য্যা। কিন্তু, কিন্তকায় কখনোই কি ভুলে সুচিত্রা সেন অভিনয়ী অতিকুশলী অভিনিবেশায় থেকেই—কখনোই ওপরার দিকে ঐ ডান হাতটি তুলে ধরে পর—নেভার এভারায় দেখায়নি—মেয়েদেরই যুবতীকী ভরাটীল—ঐ ঐ আর্ম-পীটই সুখমসৃণায়ী—যৌনয়ী প্রভাসা। যেটা, আজ আকছারীলী এক অভিনয়ী টেক্সট্—সেনস্যুয়ালে—ফর দ্য চোখ-লোভা, দর্শকদের। বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিনয় ছিল আগাগোড়া সাব্লাইম্ য়্যাশীমিলেশনে। নো স্কোপ্ ফর্ দর্শাতেয়ে—কোই ঐ কোনোয়ী সপ্রগলভতা—মেয়েলিকীর। এরপরে বেশ কয়েক বছরী তফাতের "চন্দ্রনাথে" সরযূর ভূমিকা—শেষ দৃশ্য ঐ বিয়েতে এবং বাসর ঘরে ছাড়া—সর্বত্রই সব মেজাজী পরিবেশে ঐ পোশাকী ঐ শুধুমাত্র পরিধানী শাড়ীর আটপোরেয়ী য়্যাটাচায় থেকেও—ইভেন্ ইন্ দৌড় কী ঝাঁপ,—লিভেন্ ইন্ রাইমী গ্রামীনী কালচারার যুবতী হোয়েও—কোথাও অভিনয়ে সাম্রাজ্ঞী এই সুচিত্রা সেন—পলকতরেও দেখাননি—পেলবায়িত পেশ পেশ পেশালীন রেশ-রেশ, যৌনতায় হেসে হেসে—কোনো এক চার্মী আর্ম-পীট্, তুলে পর দোলেয়ে ধর—ডান কী বামেরে।

সে সময়ে ব্রীজীটি বার্ডোট (ইনি, গুণবতী মহিলা। সেক্স সিম্বল থাকলেও)—ইন্ হার সেভেনটিস্ শী কেম্ য়্যাট্ হিয়ার,—টু হেল্প ফিনানসিয়ালী স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, টু মেমোরাইজ ইটস্ কাউণ্ডার—স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ, দ্য চিন্তামন মহারাজ। জীনা লোলোব্রীজীডা কী টীপ্ টু টো—মিসেস পন্টি য়্যালায়েস্ সোফিয়া লোরেন্স। এঁরা হাত তুলে আর্টিস্টিক্যালী স্লীভ্লেশালিতে থেকে—এটি দেখভালে—দেখাতোয়া। এখন যা করে থাকে নাইস্লি নয়নাভিরামে পপ্ সিঙ্গার বৃট্নী স্পীয়ারস্, কী এনজেলীনা জোলী বা মিসেস কেটি মস্ বা মিসেস্ টম্ ক্রুইজ বা জেসীকা আলভা।

যাক্ এ কথা। ফীমেল্ ফীজীয়ুগনমী ইন ইয়্যুথা যায়—তার সৌন্দর্য্যে সুচিত্রা সেন অনেকর থেকে এগিয়েই ছিলেন—তালে ভাল তাল রাখতায়া অভিনয়ে—এক্সট্রা অর্ডিনারীলী হিসেবে। আমার জানা, আমার দেখা, আমার পরিচিতীয়ী—পিতৃবন্ধু প্রবীন-ব্যকিত্ব হিমাংশু রায়ের স্ত্রী দেবীকারানী ও প্রথম ভারতীয় জীওলজিস্ট ঐ প্রবাদীত পি.এন. বাসুর ছোটো বৌমা—ও পারিবারিক সূত্রে ব্রহ্মানন্দের নাতনি সাধনা বসু, কমন পিসীমা দেবযানী, ওরফায় উষা খান, কী মালিয়াড়ার জমিদার কন্যা সুমিত্রা দেবী প্রমুখা পরমা-সুন্দরীদের—থেকেও। তবে, এক অজানিত রহস্য ঘেরা অন্য ধারার মিস্টিসিজমি মিস্টিকার প্রলেপায়—ভয়ানকী আড়ালায়। আগাগোড়া সুচিত্রা, নিজেকে মুড়ে রেখে আছে।

মনে আছে—সে সময়, কলকাতার সিটি আর্কিটেক্ট শ্রীযুত রহমানের হিন্দু ঘরণী, সুন্দরী ইন্দ্রানী দুই সন্তানের জননী হয়েও—কোড অফ কনডাক্ট গুড়িয়ে প্রতিযোগিতায় নেমে—পঁচিশ বছরের কাছাকাছি মিস্ ইণ্ডিয়া হয়েছিলেন। পরে, বিশ্বসুন্দরীও। এ কথা প্রায় সকলেই ভুলে গেছে। পরবর্তী শহর আর্কিটেক্ট, সুনামী ও আড্ডাপ্রিয় শ্রীযুত প্রিয় গুহর হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ীতে—প্রায়ই অবসরলী আড্ডা বসতো। সেদিন স্থপতি লেখক ভূপতি চৌধূরী, প্রধান বিচারপতি ফণী চক্রবর্তী, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, 'রমলা'র মণি বোস উপস্থিত। আর উপস্থিত ইন্দ্রানীকে নিয়ে শ্রীযুত রহমান। কথায় কথায় এই প্রৌঢ়েরা সুচিত্রা সেনে নেমে যান—আড্ডায়। সুচিত্রার গুণে সকলেই যখন সপ্রশংস, তখন ইন্দ্রানী, দ্য ডান্সার অফ্ রীপিউট্, জানালেন—"আমি আর কী সুন্দরী, পাশাপাশি দাঁড়ালে রূপের হাটে সুচিত্রা আমাদের অনেক, অনেক পেছনে টেনে নামাতো।" বলার মধ্যে খুশী খুশী ভাব ঝলকেছিল—সুন্দরী ইন্দ্রানীর।

আবারো যাক্। মিশনের স্বনামধন্য ভরত মহারাজের প্রিয় শিষ্য,—নিজের হাতে দীক্ষা দেওয়া এই সুচিত্রাকে—এতো স্নেহ করতেন যা ভাবা যায় না। সন্ন্যাসী হয়েও—আরেক শিষ্যার মেয়ে-শিষ্যা ভারতেশ্বরী ইন্দিরা, প্রিয় ইন্দুর সাথে অভয়ানন্দজী বলেছিলেন আমায় একদিন বেলুড়ে—সম আসনে বসিয়ে—"ইন্দু দেশ

চালায়। আর সুচিত্রা, মানে রমা—সে দেশের লোকেদের সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান অনুসারে, আনন্দময়ী প্রসাদ বিতরণ কোরছে।"

একথা অভয়ানন্দজীর আমার সামনায়—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজীর সামনায়—কেম্ ফ্রম এ মঙ্ক অফ্ গ্রেট য়্যাপটিচ্যুড্স্।

কেন তা হবে না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শুভাষীশী আদরায় যে জড়ানোয়ী ঐ এক দুষ্টুয়ী কাম শিষ্টয়ী কাম মিষ্টয়ী কন্যা—ঐ দশ বছরার ঐ রমাতে। দাশগুপ্তা রমাতে। তখন শান্তিনিকেতনে পালা করে থাকি হয় মটরুদার 'শেষের কবিতায়'—নয় ভারতাত্মা তান্ য়ুন সানের বিবাটি বাড়ীর—ওপরতলার কোনো এক ছিমছাম ঘরে—আর নয়ত অতি আটপৌরে জীবনেরই দোসর—রায় রায়ান্ অন্নদাশঙ্করের ও দেবীময়ী লীলা রায়ের একতলা ছোট্ট কুটীরায়,—যেটি শিল্পী মুকুল দের ছিল।

একদিন গ্রন্থাগারিক বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় বৈকালিক চায়ের আসরে—হোস্ট তান্ য়ুন্ সানের, সুন্দর বৈঠকখানায় উপস্থিত। নানান কথার প্রসঙ্গায় উঠে আসে—সুচিত্রার, মানে রমার আশ্রমবাসের কথা।

বীরেনবাবুর সঙ্গীতজ্ঞা পত্নী তখন নামী—কণিকা নামে। আর দামীও। ডাক নাম—মোহর। কবিগুরুর দেওয়া। জানান এই মোহর—একদিন প্রায় সমবয়সী রমাকে নিয়ে কবির সামনায়—হাজির করান।

পরিচয় দিয়ে মোহর বলেন—"পাবনাই বাঙাল এই মেয়েটি নতুন আশ্রমিক হয়ে পড়তে এসেছে। কী সুন্দর দেখুন। এখন এত চুপ দেখছেন, কিন্তু সময় বিশেষে দুষ্টুমিও করতে জানে। নাম রমা।"

প্রণাম করতেই দশ বছরের এই রমাকে—কাছের স্নেহছায়ে নিয়ে কবি হাসতে হাসতে জানান—"রমা ত তোমার সার্থক এক নাম। এ যে দেখি সাক্ষাৎ এক লক্ষ্মী প্রতিমের মতো। তুমি খুব বড়ো হবে। দেশ জোড়া নাম হবে। আসবে, মাঝে মাঝে আসবে, গল্প করব। তুমি তোমার দেয়ালা হাসিটা, বারবার দেখাবে কেমন ?"

বলি, সেই রমা—বয়স দশ ছুঁই-ছুঁই—আর সময়টা তখন—শন উনচল্লিশ। কতোদিন আগের কথা। কবির আশীর্বাদ পাওয়া কী কম কথা! ভবিষ্যত রমাকে—সুচিত্রার মধ্যে সে সময় দেশময় ছেড়ে বিদেশায়ও পৌঁছে দিয়েছিল—সুনামী অভিনয়ী শিল্প-সৌকর্য্যায়। তাই ত খোদ সোভিয়েত রাশিয়া—একদিন সেই রমা নামের সুচিত্রাকে অভিনন্দনী শিরোপায়ে বসায়—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা অভিনেত্রীর আসনে। কিন্তু, কাল সাক্ষী—রহস্যময় এক অনামধেয় তৃপ্তিলোকীয় ভুবনায়—সুচিত্রা নিজেকে কিংবদন্তীময়ী শ্রেষ্ঠত্বেয় রেখে—এড়িয়ে গেলেন। সরিয়ে নিলেন নিজেকে। অন্য এক ট্রান্সসেণ্ডেন্টালীল্ ভুবনায়। যেখানে উনাকে ধরা ছোঁয়া অসম্ভব।

স্বনামধন্য চন্দ্রাবতীর কথায়—'রমার সারাদিন কাটে পূজা ও অর্চনায়, কারুর সাথে মেলামেশা ত দূরের—কথা বলে না কখনও। ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে বেজে থেমে যায়। নো কেয়ার ফর দ্যাট্। হাজার বাজলেও কখনও রিসিভ করে না—যত জরুরী হোক ঐ 'কল্'। এ জীবন আমরা কেউই পাইনি।' তাই—হ্যাঁ তাই ঐ শুনশান শান্তির ঐ দারুণ পশ্ এরিয়ার বী.সি. রোডের—আঠারো কাঠার বিরাট বাড়ি ছেড়ে—যখন কোনো কারণে উঠে যান সাময়িক বিরতি নিয়ে সামনারই—দেবদ্বার স্ট্রিটে। তখন, যাবার কালে 'অনেক পেয়েছি, অনেক দেখেছি'-র ঐ দর্শনায় বিদগ্ধা—সেন সুচিত্রা, যান ফেলে—সব কিছু। ঘর-ভরা জিনিসপত্র। দেখা গেছে—দেওয়ালে থাকা নানান স্বীকৃতির মানপত্রগুলো—এখানে ওখানে ছড়ানো—যেন ওয়েস্ট পেপার হিসেবে। রাশিয়ার দেওয়া—সেই বিশ্ব সেরা এক নম্বরা অভিনেত্রীর সার্টিফিকেটটা, শ্বেত-পাথরী মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। শুধুই নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যান। নিজেকেই। এ যেন সেক্ল্যুডী রীনানশিয়েশনে নিয়েছেন। তবে বুক ভরা সুধা নিতে ভোলেননি। বিশ্ববিধাতায়ী রবীন্দ্রনাথের—এবং দীক্ষা নেওয়া ভরত মহারাজের ছবি দুটিকে—ও যে প্রাণের প্রিয়তম সম্পদ। ওয়েলথ্ অফ ওয়েলথ্। আসবাব, পোশাকাদি—কোনো কিছুই নেননি। যার সবই খানদান স্টাইলীর ছিলো—ইভেন্ দ্য ডেইলী ইউটেন্শীলস্ ইন্ নীড্।

সুচিত্রার ভেতরায় নিহীত ছিল এক কবিময়ী শিল্পীতয়ী ন্যাচারার অতি ন্যাচারালিস্টিক—অলঙ্কারী এক অহঙ্কার। হ্যাঁ, বলিতে চাহি—এ অহঙ্কার—সত্যি হয় সাজিতয়ী রাজ-রাজোয়ারে—একমাত্র সুচিত্রাতেই। যেমনটি—শোভাময়ে আত্ম-পোলদ্ধিকী মেজাজাই রাজাজাই ছিল মানিকদাতে, বিশ্ব-বিশ্রুত—ঐ রায় সত্যজিতে।

"অগ্নিপরীক্ষা" যুগ থেকে যুগান্তের পথে নিয়ে যায়—অভিনয়ী অসাধারণী পরম্পরায় সুচিত্রাকে। অবশ্য দোসর ছিল—পাড়ারই অরুণদা। যাঁর জীবনদর্শন মেকেথ্ দ্য এনাদার লীজেন্ড—সেই, সেইয়ের উত্তমকুমার। দুজনাই সমান তাল, সমমানের—ক্ষমতার মধ্যে ভাস্বর ছিলেন। হ্যাঁ, কেউ কাউকে বড়ো করাননি। কিন্তু বড়োর হওয়ার পথে দুজনাই ছিলেন—দুজনারই পরিপূরক। পরিসম্ভারী সম্পর্ক। প্রিয়-প্রিয়ার ছবিতায়—কবিময় রূপ মোস্ট প্র্যাকটিক্যাল্ ভ্যালারে ভেলোসিটি দিয়েছিল সুচিত্রা সেনই, উত্তমকুমার সহিতায়। এতো ভালোবাসার ইনটিমেট্ প্রকাশ ও বিকাশনা, আর কেউ বা কারা দেখাতে পারেননি। একটা লিখিতয়ী ও মাপিতয়ী বোঝাবুঝি ছিল—দুজনায়। তাই কোনো নতুন ছবির কনট্রাক্টে নামার আগে—প্রণয়-পরিণয়ী কার নির্ঝরার অঝোর ধারা প্রবাহিতে—অতি পারঙ্গমা এই সুচিত্রা বলে রাখতো—"অভিনয়ে এতো ইন্‌টিমেট্—উত্তম ছাড়া আমি আর কারুর সাথে—হতে পারবো না। না-না-না।"

উনার যখন স্যুটিং হত—কী ইনডোর কী আউট্ ডোরে—কলাকুশলী ছাড়া কোনো থার্ড পার্সন উপস্থিত থাকতে পারতো না। আর অভিনয়ে—তার ওপর জারিজুরি করানো যাবে না। হ্যাঁ, এমনি লিখিতয়ী কনট্রাক্ট থাকতো। যেটা, উনি ছাড়া আর কেউ করতে সাহস পায়নি। স্বয়ং মহানায়কও নয়। উনারা সারা জীবনে একসাথে চব্বিশটা বই করেছিলেন। যৌথয়ী ভেঞ্চরাস্ অ্যাডভেঞ্চারে—যার সময়সীমা ছিল দীর্ঘ বাইশটা বছর। হেলাফেলায় নয়, সবই হত সাধ ভরা সাধনায়।

ফেসিয়াল্ মাধুর্য্যর আর সৌন্দর্য্যের অনন্যতায়—সুচিত্রার সব যৌবন, সব যৌনয়ী আবেদনা—স্টোরড্ অনলি্ য়্যাট্ হীয়ার। সারা শরীর ঝলমলী পোশাকার—ঐ শাড়িতে আর ঐ ব্লাউজায়—কভারড্ থাকতো—ওভার অল্। তবু, তবু যেন মাধুরার ঘরের এক রাধায়ী আওয়াজা—যাজোয়াতে—যেন ছন্দয়ী পাখোয়াজ দোলাতোয়। এ আঁচল ঘেরাটোপার বন্দীত্বেও—সুষমিত বুক-যুগলারে, ফাইনালী ফাইনেসীতে, যেন যেন বোলতোয়া জীবন দেবতাকে—অর্ঘ্য দিতেছে—সোনার দুই দোদুলাই অর্নামেণ্টী আণ্ডুলেশন—মানব-দুহিতা সুচিত্রা সেন। রঙ্গমায়, জঙ্গমায়, রাগরঙ্গে।

একটা ছবির কথা বলি। কারুরই মনে নেই। আমার জীবনে, সেই ষোলোয়ী রাগ-বাসারার যৌবন-শুরুয়ায় সুচিত্রা সেনকে—খুঁজে পাই তারই কুশলী অভিনয়ে—নায়িকা চরিত্রে নয়, রোল্‌ই সাইডায়। শুচিস্মিতা সন্ধ্যার করা—পাতী আলোকায়—হাসির ফ্যানটাসী। নাম—"য়্যাটম বোম্"। তনুবাবুর, তরুণ মজুমদারের হয়ত এটাই প্রথম পদক্ষেপ। নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুন্দরী মেয়েদের ভীড়ে—সাইড্ রোলে সেন সুচিত্রা। সেই মুখের অধরা-ছোপীল্ হাসি, কাজলী চোখের রহস্য আর্তা। পরনে, শার্টের মত ঝুল্ ব্লাউজ্, নীচয়ী কোমর তক। আর ঝালয়ী ঘাগরা। নী ছুঁয়ে একটু নীচ পর্য্যন্ত—ঝুলীতয়ী। খালি পা। একটা কুণ্ডলী হয়ে, নায়িকাকে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে—প্রতি নায়িকরা। কিন্তু হোক সাইডী ওয়ান, ট্রাইডী টোনে প্রাইডী চেহারার সুন্দরী সুচিত্রা ছিল,—সবাইকে ছাপিয়ে। দাপিয়েও। জাঁকিয়েও। সে রূপ যে সব পেয়েছিল, সব নিয়েছিল। ছবি যাই হোক, বাঙালী পেল—সর্বকালের শ্রেষ্ঠা মহানায়িকাকে।

দেখতে গিয়ে ছবি শেষে, দুষ্টু সন্ধ্যা বলেছিল—"তাকিয়ে দেখেছি, তুমি সুচিত্রার বুকের শোভা র্যালীশ্ করছিলে। নো আঁচলী আড়াল। শুধু কাঁচলীরী শাসন। সত্যি, সুচিত্রার বক্ষসুধা স্ট্রেঞ্জলী গ্র্যাঞ্জারাস। সুচিত্রা—সেদিন যে অভিময়ী অভিব্যঞ্জনায়—কবির রাধা তাঁর ঐ তৃষ্টির বৃষ্টিয়ী রিমঝিমে সালঙ্কারা থাকার আর ঢাকার—উঁচু কুচযুগে বসন ঘুচে, মুচকি মুচকি হাস, সঘনে দেখায় পাশ......" তাই তাই—শুচিস্মিতা সন্ধ্যা, সপ্রলভিতায় আমায় জানায়, "আমি তোমাতে

সাজাতে কবিয়ী কথে তবে পরে কোন ছাড়। এ যে ভরাটী তথ্ ধরাটী যথ জড়াটী পথ ও পাথেয়ায়—রূপসায়রার মধ্যয়ায়—এক ম্যাচলেশ।"

ও দেশে—অভিনয়-জাগতী নায়িকাদের মধ্যে সুন্দরী খুউব হলেও—একটা কেমন যেন স্নিগ্ধয়ী কোমলতা থেকে—বঞ্চিতা। তবু, কুশলী শিল্পয়ী অভিনয়-কলায়, রীতা হেওয়ার্থ, আভা গার্ডনার বা লেডী ভিভিয়ান লে—স্বভাবী শিল্পতায়, এই মিষ্টিয়ী স্নিগ্ধতায় পরিচিতি। সুচিত্রা সেন—তুমি, বাঙালিনী, তায় শান্তির আর শ্রান্তির দেশ ঐ শান্তিনেকেতনী মানসিকতার। ওঁদেরই ওপরায়। সত্যি। একমাত্র মেরীলীন্ মুনরো,—রূপে, গুণে, প্রভাসী বিভাসময়তায়, সদালসা চাহনিতে ও রভসিলী হাসিরী অধরায়,—দ্য অন্‌লি উয়োম্যান্,—উইথ্ হুম্ সুচিত্রা সেন, ডস্ট্ দাউ ইজ সীনসীয়ারলী কম্পারেবল। শতভাগ শতভিধায়ায়—রাশ রাশ আবেশায়।

তোমাকে হাজারো বার দেখে দেখে ঐ মাধ্যমী রূপালী পর্দায়—বলি আস্পর্ধায়—তুমি ত এ বাড়ীর মেয়ে, ও বাড়ীর আটপৌরী বৌ, অন্য বাড়ীর বৌদিদি কী ননদিনী,—নট্ নট্, দ্য রায় বাঘিনী। আবারো কারুর বোন ! তোমাতে তোমারই অভিনয়ী অতি প্রাণচঞ্চলতার ঐ জ্বাজ্বল্যতার মধ্যে—তাই ত তাইই পেয়েছি। আর চেয়েছিও যে, তাই দেখতে।

চিত্তচকোরায়, মত্তমাতোয়ারে,—প্রোষিতভর্তিকার নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেয়েই—প্রিয়ারা ঝটিকায় এক ঝাঁপে বুকে বন্দী করায় আপন প্রিয়র সাথ মাতী আতীলায়। সন্ধ্যা শুচিস্মিতা,—কিন্তু ঐ শেষ দৃশ্যেকার প্রিয় সঙ্গমায় প্রিয়ার সমার্পিতয়ী সমাপতনে খুঁজে পেয়েছিল—সুচিত্রার ঐ বিশেষ আশ্লেষ মুহূর্তয়ীটা—অতি ইনটীমেটে সাজাতে চেয়ে যে কুশলী অভিনয় রাখতো—তা তাঁর নিজেরই—অতি আর্টময় শৈলয়ী অভিনয়। প্রিয় অল্পটাক তফাতে স্থানুর। স্ট্যাণ্ডস্টিল্। নড়ছেও না, সরছেও না। প্রিয়া রূপী সুচিত্রা কিছুটা দূর থেকে আসছে—শরীরী বেপমানে—নয় দ্রুতলীত্—নয় শ্লো মোশানীত্। এই হাঁটা কাব্যিকীটা ছন্দে ছন্দে যে অভিব্যক্তি ফোটাতোয়া ইন্ য়্যাকশনী মাধুরায়,—কী আধো আধো বোল বোলালে, কাঁদো কাঁদো জেশ্চারায়—তা অনবদ্য। তা অকল্পনীয়। আর কেউ তা কখনো পারেনি, দর্শককে মুঠো মুঠো বিস্ময়তে, আনচানানান্তে। গোয়িঙ্ শ্লো, বাট্ স্টেপিঙ্ স্টেডীলী। এ যেন নৃত্যকুশলার নামধেয় উর্বশীয়ী ছাঁদেল। জাঁকেল। সুচিত্রা প্রিয়র বুকে নীতয়ী সুবিনীতায়—শেষ আশ্রয়েতে জমজমাটি পীকচার করাতে—রাখতোয়া ট্রীকী ফ্রীকশন অফ হার ফেস্,—কখনো প্রিয়র কাঁধে, প্রিয়র বুকে, কখনো বা গালে গালে। চীক্ বাই চীক্ য়্যাডোয়ারে, ম্যাডোয়ারে। নেভার এভার ওভার লিপস্ টু বী লীপ্-লক্ড। সন্ধ্যা দুষ্টুমি করে বলতো আমায়—অশোক রায়, ইজ্ ইট্ নট্ মোর দ্যান কীসীংস ?—হ্যাঁ, একমাত্র সুচিত্রাই তা শিল্পীত করাতে পারতো। আবারো

হ্যাঁ, যদি অপরদিকে থাকতো—প্রিয়-রূপী—উত্তম মহানায়ক। আদারওয়াইজ, নেভার-এভার !

রূপে-অরূপায়—সাধয়ী আধারার—বলি দ্য গ্রেটেস্ট তুমি শ্রীমতী সুচিত্রা সেন। কবিসম্রাটের স্নেহাদরের পুতুলী—ও পুণ্যশ্লোক ভরত মহারাজের মন্ত্রয়ীতে দীক্ষীতা—বলিতে চাহি, যে তুমি দেবী সাইকীর অতি নীয়ারার, যতি ডীয়ারার, মতি রীয়ারার—নহি, নহি সঁপিলা এ সায়রী ভরা—মাচ য়্যাডো য়্যাবাউটায় রাইমী থিংস, নট্ টু ভ্যালুট্ ইয়্যু বাই স্যালুট্। তুমি যে তোয়াক্কা করো না কিছুতে, প্রথম থেকেই—আজ তকীল এ অবধায়। আর কারুতেও।

বান্দীতয়ীত্ বিস্ময়ীল বিশ্বতোযেয়—রায় সত্যজিৎ কিন্তু তোমাকেই ভেবে ভেবে ঠিকঠাকই প্রায় করে ফেলেছিল। তুমিই হবে নান্ দ্য এলস্ ফ্রম্ নো—হোয়ার—আ—নায়িকা চরিত্র বিমলার চরিত্রায়ণটায়। ঐ মহা উপন্যাস বিশ্বকবির "ঘরে বাইরে"য়। কিন্তু ইগো যে বড়ো নটিলী ফাইল্ করে নোটিশায়—নটিফায়েডটা ! তা সত্যজিতেরও মালুম ছিলো না। সুচিত্রা, তোমারও। তীরে এসে তরীটা ডুবে গেলো। রূপনারায়ণের কূলে—ভেসে উঠলো দুইটি—ইগো। বড়ো বড়ো। ইন্ কনক্লিক্ট্।

আবার—আরার কিছু পরেই—সেকেণ্ড বলে চেষ্টা সত্যজিতের—সেকেণ্ডারিলী জন্যে—তোমায় নায়িকা কোরে,—টু সেলুলয়েড্ ঐ এ্যাপিক্—"দেবী চৌধুরানী"। তাও, আর্জি শোনামাত্র—তুমি কোরে দাও অত্রজ্ঞাতে,—প্রত্যাখ্যান। নো কন্‌ফিউজড্। অনলি, রীফীউজড্।

জানাই পরে অবশ্য, সত্যজিতের অসুস্থতার সময়, তাঁরই আত্মজ—চিত্ররূপ দেয় "ঘরে বাইরে"তে। আমি বলবো, তুমিহীন ঐ ছবি ফ্লপ্ না করলেও,—আমাদের কারুরই ভালো লাগেনি। স্রষ্টা না আঁকলেও—সেলুলয়েডী কর্তারা কর্মাশিয়ালী অতি বাজে প্রদর্শনায় চুমাচুমি দেখিয়েছিল,—একবার নয়, তিন তিন বার। অতি শ্লথগতির এক চিত্র—চুমা সাজিয়েও পেতে পারেনি কোনো গতিময়তা। হতে পারেনি সৃষ্টিয়ী ক্ল্যাসিক্ কিছু। চুমু খাওয়া দেখতে—কে না ভালোবাসে। অল্ মোস্ট্ অল্,—সকলেই। ফন্দি ব্যবসায়ী মন্দাটা কাটাতে—চুমার সীন খুবই কটুয়ী পাত্ পাত্ দৃষ্টি ছড়ায়। এটা—নট্ য়্যাক্‌সেপ্টেবল্,—হোয়েন দ্য ক্রীয়েটর ইজ্ টেগোর, দ্য ভার্সেটাইল্।

সন্ধ্যা শুচিস্মিতা, জানো, বোলতো তোমাকে নিয়ে, "তোমার এতো বিউটীফায়েড্ ফীজীয়গনমীর এতো স্নিগ্ধশীল রূপাভা, এতো রুচী-ঋদ্ধি মাধুর্য্যা—কিন্তু, কিন্তু সৌন্দর্য্যের ঘরের পূজারীরা তা দেখতে পেল না,—তোমারই অল্প বিস্তরায় ঐ ভিক্টোরীয়ান হেরীটেজের—ঐ মানস য়্যাশীমিলেশনে। কারুর শরীরী

রূপ,—সে ত শ্রী ভগবানের, দ্য অল্‌মাইটী ওম্‌নিপোটেন্টের—শিল্পসম্ভারই দান। শিল্পরসারারই কৃত। দেয়ার ইজ্‌ নো য়্যাড্‌ভার্সিটী। নো, অব্‌সীনীটি। তুমি এটাকে অপসংস্কৃতির অপবিত্র বলে, জোর কোরে ভাবতে পারো। তার বেশি নয়। কেননা, ছেলেরা নয়, ঐ পরম কর্মীর অমনিপোটেন্সী, যে—মেয়েদের সারা দেহ জুড়ে আর জড়ায়ে—আন্‌কমন্‌ বিউটির সম্ভার থেকে—সম্ভারায় সাজিয়ে ফিরেছেন।—দৃপ্ততায় মিষ্টি মেয়ে সন্ধ্যার অভিমত ছিল, এসব লুকোবার নয়। আর তা দেখবার, বা দেখাবার মধ্যে নাই কোনো আবিলতা। কোন নীচ্‌ মনই নোংরা কিছুয়া।

আলোচনায়, মাঝে মধ্যিখানে সেই চার দশকের ওধারে, শুচিস্মিতা সন্ধ্যা মধুছন্দা অনুভূতিময়ী অভিমতে রঙ্গীনা হতো, খোলোসায় নেমে খোলামেলী য়্যাসেসে—"সুচিত্রা সেন তাঁর মরাল গ্রীবার নীচয় থেকে কাঁধী বাম ধার ঘুরীলী ঐ শাড়ীর আঁচলী ঘেরাটোপ মধ্যায়, যতোই কাঁচল দোলী ব্লাউজ রোলী চাপান-উতারায় বন্দী কোরেই রাখুক না কেন, এই ত্রয়ীর ত্রিধারালীর বাঁধন কিন্তু,—আড়ালেও আব্‌ডালীকেও ফোটাতোয়া ওঠাকার স্থানীক আর ত্রি-কোণিকী প্রকাশীল্‌ প্রকোটিতা। সুচিত্রার ওঠায় যে ছিল—বজ্রশ্রীর রূপ। শ্রীরাধার রূপ।

আরো এগুতায়, সন্ধ্যা শুচিস্মিতে, দ্য গ্রেট মেন্টী ক্রেটী য়্যাড্‌মায়ারার,—তোমারই বলি সুচিত্রা, তুমিময়ী স্বত্বাই যত্নয়ীত রাখা—ঐ রত্নসম্ভারায়। বোলতো দুষ্টকা সন্ধ্যা আমায় আবেশায়—জানবে অশোক, সারা বিশ্বে চিত্রনায়িকা হিসেবে শ্রীমতী মেরীলীন মুনরোই, একমাত্র তোমার রাইভেলা। সৌহার্দ্যয়ী অভিনয়ে, আর সৃষ্টিলী মধুবাতা খাতয়ী সৌন্দর্য্যায়,—এঁর প্রতিভা ছিল, সুচিত্রার মতই—আন্‌ প্যারালাল্‌। মুনরোর জীবনটা, যৌবনটা—স্বপ্নের সব, সব কিছুই অর্জন করেও, হয়ে যায় ভাগ্যতাড়িতয়া। অর্থ, মোক্ষ, কাম, কর্ম—সবই মিলেছিল অম্বুরী ভরা—ঘরা ঘরা টইটম্বুরায়। মুনরো ধ্বংস হতে চাননি। জানা গেছে, উনি নিজের সর্বনাশের দেশলাই কাঠিটায় আগুন লাগাবার আগে—বার বার মার্লন ব্র্যাণ্ডেকে—একবারটি কাছে আসতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। "আর পারি না। মার্লন্‌, বী মাই সুইট্‌ হার্ট য়্যাট দিস্‌ ক্রুশীয়াল টাইম। রেণ্ডার হেল্ড। প্লীজ নেভার ডীলে ট্যু গীভ্‌ মী ইয়োর অর্নেস্ট্‌ কো-অপারেশন।" তোমারই হতভাগীনী এই মেরিলীন।" চিঠিতে এই আর্তি রেখেছিলেন—মুনরো, মিসেস মুনরো,—ডিভোর্সী অফ স্যার আর্থার মীলার,—য়্যাণ্ড, য়্যাণ্ড দ্য প্রেজেন্ট ফ্রেণ্ড-কনসর্টীয়া অফ ফার্স্ট সিটিজেন অফ আমেরিকা—দ্য জে. এফ. কে,—য়্যাণ্ড্‌ মোর্‌ টু হিজ্‌ ব্রাদার—ববি। রবার্ট। যাক্‌।

সুচিত্রা সেন—তোমাকে নিয়ে কথালাপি এই আলাপনি আলাপায়—সন্ধ্যার সেই অনেক দিন আগের বলাবলিতায় উঠে আসা সিমিলী ধর্‌ এই মুনরোকে বাদ দিয়ে নয়, আর্জ ভরা কার্য্যকারণে আবারোয় জানাই—এ লেখার সমাপ্তি টানার

আগে য়্যাজ্ এ কনক্লুশান—সুচিত্রা সেন, গর্ব কহিতায় বহিতায় বলি, পোশাকে, তারই পরিপাটি মাধুর্য্যায়—তুমি যে এক নতুনা দেবী, তখন। সবার কাছে। সবারই ঐ অন্দরমহলায়ও। অর্নামেন্টালী ওরিয়েন্টেশনে গডেস্ লাইক্—নায়িকা। হাইক্লিও। আবারো ধবারোয়ে বলি আর লেখি কথা কণিকায়—স্ফুলিঙ্গয়ীত এ ফায়ারী ফ্লাইজায় রূপবতী সুচিত্রা, গুণবতী সুচিত্রা, তুমি তোমার যৌবন ঢাল্ যৌবন ভাল্ যে জমাহারী রমাহারের হিত মিতয়ী সমাহার—তা কবি সম্রাটেরই 'প্রভাতে'-র তুমি পূজারিণী ঐ দেবীকা, কিন্তু তোমারই কাউন্টার পার্টে থাকা, শ্রীমতী মেরীলীন মুনরো যে ঐ কবিসম্রাটেরই 'রাত্রে'-র যৌনয়ী দীপবর্তিকা হাতে ধরা সাজানো ডালির—তখনকার সেই নিরালার সাথ সাথী নির্জনতার সাক্ষ্য—পুরো নিরাভরণার ঐ পবিত্র প্রকাশ,—ঐ মুন্‌রোস্ মেরীলী মেরীলী ফেয়ারী মেরীলিনী ন্যুডীটী কিন্তু যে কিন্তু—দেব-অর্ঘ্যে যাচিতয়ী এক 'ডেইটী' ছাড়া—আর কিছুটি নয়। নয়। জীবনে সত্যিকারের অ্যাফ্‌রোদিতের খোঁজ না পেলেও—সীক্রেসী ন্যুড়ে সেক্রেডী মুড্-ই ঐ মুনরো—যে দেবী সাইকি। দেবী হেলেন। বলি, ভগবান সুনিপুণার যে রমণী দেহ তৈয়ার করলেন তা যে নিরাভরণায়। ন্যুড-এ। নট্ ড্রেশড্ আপ্। নট্ হ্যাভিঙ্-এ ফাইবার! জানো সেন সুচিত্রা, তোমার ছবিতায়ী ঐ হাসি ভরা মুখ যেমন নাচায় আমার মন মাঝে চিত্‌চকোরায়, কবিতায়ী রীদমাস্ রাইমাস্। হাঁ, ঠিক ঠিক তেমতাই শ্রীমতী মুন্‌রোর ঐ শরীরী কবিতাটা—যখন গড়িড়ী জড়িড়ী ভরিয়ী—ন্যুড্-ই। মেয়েলী যুবতীকাতা—ইজ্ দ্য মোস্ট্ বিউটিফুল্ য়্যাসেট হোয়েন দে আর ফ্রী ফ্রম্—রোব্। ডিস্ রোবেড্‌লী। পোয়েমস্ ইন মেটোরীক্ ডীকশনাল্ ডাঙ্গেস—'য়্যাজ স্যুন য়্যাজ এ গ্রীন্ ফীমেলীয়া—ড্রপস্ হার ড্রেপস্। আমি লিখতেয়ে বসে ভাবি—দাব ধরার ধাবেলে, খুবই কাবরঙ্গীমাতে—সুচিত্রা সেন, তুমি তোমার ঐ রাজোয়ারী শরীরায় বাজতয়ী সব সব রুণি লজ্জারাশকে—যখন শাসনী পাশে রেখে ঢেকে সাজ-সাজিতয়ীতা,—তখন তুমি তোমার প্রতি পদক্ষেপে, প্রতিটি ছায়ায়ী ছবিতায়—মায়ায়ী রবিতায়, আ—সত্যি সত্যি তোমাতে জেয়ে ও গেয়ে গেয়ে—ইফ্ এনি চান্স্ পারমিটস্ টু বী এ সীয়েবল্ রীলম্ অফ্ দাই ফীজীক,—ইয়েস্ দ্যাট্ মাস্ট বী এ ন্যুড্ ইন্ বিউটি—লাইক্‌লি য়্যাণ্ড হাইকলি। প্রাইড্‌লী। প্রাইভেসিলী।

সেন ও মুনরো—দুজনাই কম্‌পেয়ারে মূল্যয়ীতে—এক ও সমানা। সবার থেকে দূরে, বজায়েতে অনতিক্রম্য দূরত্বটা—নো সেকেণ্ড্ ওয়ান্ রাইভেলস্—উইথ দ্য টু দ্যা ভাউ টু—ইয়্যু সুচিত্রা, য়্যাণ্ড শী মেরীলীন্। নান্ দ্য এলস্। ইভেন্ নট্ য়্যাট্ সাম্ হোয়ার্ এল্‌স-ও।

নয় আর কোথা। অন্য কোথা। অন্য কোনোখানে।

নট্ হিয়ার্, নট্ হিয়ার। মে বী—সাম্ হোয়ার এলস্। বাট—হাউ দ্য দাউ—সাম হোয়ারা এলস্।

মঞ্জুলী এক অনবদ্য ছবির মতো ঐ রঞ্জুলী চেহারার ভরাটী সেন্স্যুয়ালা সুচিত্রা সেনকে প্রথম দেখি—বিজলী সিনেমার প্রেস-শো—'সাজঘর' নিয়ে। ঐ ছবির নায়িকা—তিনি।

সামনের বিরাট কোর্ট-ইয়ার্ড—লোকে গিজগিজ, লোকে সরগরম—নায়িকাকে এক পলক দেখার জন্য।

উনি এলেন। বিলেত বেড়াতে গিয়ে কিনে আনা সেই কালো রঙের আঠারো হাতি বুইক্ কনভার্টেবল্ থেকে নামলেন। ধীরে, অবশ্যই কম্প্রবক্ষে। নেমেই সটান হেঁটে চললেন। দৃষ্টি নীচের দিকে। সেই কালো সেই হরিণ চোখ। অতি সূক্ষ্মে কজ্জলিতত। হাসির সেই অনিন্দ্য-রূপী ফোয়ারা—তখন লাল অধরায়—কাঁপটিতে রূপসাড়, ঝাঁপটিতে রূপকাড়। সীফন্ লাইক্ রেশমলি হাইক্—লাল শাড়ী। পুরোটা সোনালী জড়ির কাজ ভরা। মাচ্ ট্রান্সপারেন্ট্। লুক্ থ্রু আবরণীর রোব্—রবড্ বাই আদারস্ সীইঙ্। লাল ব্লাউজ। লাল শায়া। আবরিতা সুছাঁদী বক্ষশোভা—তারই মধ্যে যেন দুলিতায় আন্-রুল্ড্—বাই চুনি চুনি ভত্র কাচুও ফাটলি। জাস্ট্ দ্য কাস্ট্ অফ—আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাঙ্। বাস-বাসনা রক্তিমী রাগম। পিঠময় ছড়ানো—বিদিশার নিশা ভরা ঐ কেশদাম। আজানু নয়—তা আ-কোমড়া। ঝুলন্ত আঁচলী পিঠময়তা—তা আধার দিয়েছে। ঘোমটায়ী কাল্চারা বাঙালীয়ানার—উপস্থাপিতায়ী ম্যাচ্ করা ওড়নায়। মাথার ওপর দিয়ে, দুই কাঁধ ছুঁয়ে সামনায় এসে দুটি প্রান্ত—বুকের ওপরায় ঝাঁপতালে—রক্ষিত। মুখও ঢাকা তারই আড়ালী ট্রান্সপারেন্সীতে। তবু তবু—আমার শিল্পীত মনের পরিশীলিত ঐ দেখা'টা, যেন বারে বারে খুঁজে পেয়েছিলো, সেদিনের সেই সাঁঝে, সেই সুচিত্রায়ী সাজে—তবু যে—দেয়ারবাই আন্ডুলেশন্ কামেথ্, সামেথ্ দেয়ারস্ বিউটি সোয়েলস্ য়্যাণ্ড্ ফলস্—যেন, যেন ওঠাবার ওঠা আর নামা—এক জন্ কীট্সীয় রাইম্, সঙ্ অফ সঙ্সের হীম্। কয়েক পলকের হাঁটাতেই—যেন যেন কবি বিদ্যাপতি হাজির, এই এই জাজী বাজীরায়। চার প্রস্থ পোশাকী শাসন বক্ষে থেকেও—নাই কোরলোয়া রক্ষে—তথাকার বার্স্ট অফ্ সেন্স্যুয়ালিটিকে। ওড়না, শাড়ী, অঙ্গরাখা আর কঞ্চুলিকার অর্ডারকে যেন আন্-রুল্ী বিভাসাতায় নিয়ে আভাসিত—ঐ সঘন পাশ উঁচু কুঁচ-যুগে বসন ঘুচায়ে মুচকি মুচকি হাস্। সৌন্দর্য্যের পূজারীলে গান চয়ীলাম মাধুর্য্যয়ী ঔদর্য্যায়। হাঁ, তাই তাইতেই, মম চিত করে পরে তা তা থৈ থৈয়ালীতে—এ নিতি নৃত্য।

হাঁটছেন, শ্রীমতী গোরী গোরোচনা, 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে'র নায়িকা বিষ্ণুপ্রিয়া, 'অগ্নিপরীক্ষা'র নায়িকা তাপসী, 'সাগরিকা', 'শিল্পী'র—ঐ দশ দিশি ধন্য ধন্য করা নায়িকা—হাই হীল্-এ, সোনালী ফিতার স্ট্র্যাপে, দুই পা চলি-চলি, চলিতায়ে। পাশে স্ত্রী সুচিত্রার ডান কাঁধে হাতের ভার রেখে, বাম পাশে পাশে ব্যারীস্টার দিবানাথ সেন, সে সময়কার শিপিঙ্ কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়ার—নাম্বার টু ব্যক্তিত্ব। উনারা চলেছেন। অতটুকু পথ, কিন্তু যেন সহজায় নাহি ফুরোতয়ী, দ্য জাস্ট্। কোনো পুলিশ নেই। জনসমাগম খুবই স্টেবল্ ধারার ছিলো। দু লাইনে দাঁড়িয়ে। কয়েক হাত তফাত্ থেকে।

ধীরাদত্তায়ী যেন নায়িকা অতি সাবধানে এগুচ্ছিলো। এগুচ্ছিলো পা ফেলে ফেলে—হীল্-ই ঝপরার তাল ঠুকেয়ে—মিল ধরা মেলতায়ে। চোখের দৃষ্টি, নীচয় নিশ্চিতী নিঃশব্দতায়।

'সাজঘর' দেখেছি। ভালো বই—উঁচু মার্গের অভিনয় সুচিত্রার দরদীত্ দরজীতে। কিন্তু কাঠ-কাঠ ভিলেনী চেহারার বিকাশ রায়কে—অপজিট হিসেবে ভালো লাগেনি, হোলেও মস্ত অভিনেতা। উনাকে 'ভুলি নাই'—য়ের সেই নিখুঁতীত্ অত্যাচারী পুলিশ হিসাবেই গ্রহণযোগ্য—অভিনয়ী অনবদ্যতায়। দেবকী বসুর "ভালোবাসায়" সব ভালো থাকা সত্ত্বেও গুণগতত্তায়—ভালো লাগেনি বিকাশ রায়কে নায়ক মানতে—সুচিত্রার সুবিনীত্ সুচিত্রতায়ী, ভালো রকমার হোলেও।

ক্ল্যাসিক সৃষ্টির ঐ 'অগ্নিপরীক্ষা' হোতো না রোমান্টিকী বীক্ষার অভিজ্ঞা—যদি না থাকতো মূলত সুচিত্রা সেন—পাশ-পাশি উত্তম অভিনয়ের—উত্তম সঙ্গে। প্রোডিয়োসার মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় চেয়েছিলেন—তাপসী হোক অনুভা গুপ্তা ও কীরীটি হোক বিকাশ রায়। কিন্তু বাদ সাধেন—দুই বন্ধু কলাকুশলী। সাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার যতীন দত্ত ও ক্যামেরাম্যান্ বিভূতি লাহা। সুভদ্র মুরলীবাবুর অভিমত—সুচিত্রা কেষ্টনগরের সুন্দর এক পুতুল ছাড়া আর কিচ্ছু নয়। আর ওটা ত একটা মাকাল ফল। মানে উত্তম। ছবি ত ফ্লপ্ কোরবেই—এ দু'জনার জন্য। মনে আছে, এক জুনই সন্ধ্যায়, নিউ আলিপুরের নিজের বাড়ীর সামনায় ঘোরা-ফেরা কোরছিলেন—ছিয়াশী বছরের বিভূতি লাহা। যতীন দত্ত তখন অন্যলোকে। নিঃসঙ্গ নায়কের মতো ভাব জমালেন। আমার সাথে। সুচিত্রাকে অন্য পরিচয়ে, শান্তিনিকেতনী হ্যাবিচ্যুয়ালে জানি বলে, আর উত্তমের পাড়ার কাছাকাছি থাকি বলে—খুব খুশী তখন, বিভূতি লাহা। মানুষটি খুবই মার্জিত রুচির। থাকেনও পশ্ এরিয়ায়। বললেন, "হোক্ না মুরলীদার টাকায় তোলা বই। সব ত মানা যায় না—কাজের খাতিরে। উনার প্ল্যান্ উল্টে দিয়ে—আমরা দু'জন সুচিত্রা আর উত্তমকেই অভিনয়ের বরাত দেই। ভাগ্যিস তাই কোরেছিলুম বলে—একমাত্র ওদের

দু'জনার অনবদ্য অভিনয়ে—একজনের টু মাচ্ য়্যাক্‌টিভ্, আর একজনার অল্প-বিস্তর প্যাসিভিটির জন্য—বইটি পেলো—গ্র্যাণ্ড্ স্যাক্‌সেস্। এ পাওয়া কোটিকে গোটিকে জোটে। তাই না ?"

তাই। ঠিক তাই। বাঙলা ছবির মোড় ঘুরলো। মোড্ হোলো আরো মডিফায়েড্। উত্তমের স্মৃতিচারণায় শ্রদ্ধাঞ্জলি রাখতে নেমে মহান ব্যক্তির সত্যজিত রায়—এই আন্-প্যারালাল্ জুটির কথায়, বার বার সুচিত্রার মিলিজুলি মেলমেশী আন্তরিক স্বাভাবিকী অভিনয়ের কথায়—গুণ না গেয়ে পারেননি।

একটি পাঁচতারা হোটেলে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে, সেদিনকার কলকাতার শেরীফ্, অতি পরিশীলিত মনের আর ব্যবহারের, আর অতি সুশিক্ষিত বসন্ত চৌধুরী বলেই ফেলেন—নায়িকা সুচিত্রা ছাড়া এক সময় আর কিছুই ভাবতে অপারগ ছিলাম। এজন্য নয়, যে—শুধুমাত্র রূপসাগরে চান করা ছিলেন না—এই সুচিত্রা ছিলেন আপন ফীমেলীয়ায় ভরাট এক ভাড়ার, এ স্টোর হাউজ্ অফ্ ট্যালেন্টস্।

ঠিক তাই। তাই বলেই ত—এই ত সেদিন—বেলুড়ে হাজার হাজার ভক্তের সম্মিলনে—সুচিত্রা উপস্থিত কন্যা মুনমুনকে নিয়ে শাদা থান্ শাড়ীতে সাজয়ালীল্ ঐ আন্প্যারালাল্ এক ক্যমাণ্ডে—যার দরুণ দেখলাম—ঘাসের ওপর শান-গ্লাস পরা সুচিত্রা—বোসে আছেন। প্যাথোজ ভরা বাহানায়। গুরুজী ভরত মহারাজ অর্থাৎ অভয়ানন্দজীর শেষ কাজ তখন সাড়া হচ্ছে। উনাকে রেখে, অতি গড়া তফাতীতে—যেন তফাৎ থাকোর কানুনায়ী জারীতে—হাজার হাজার ভক্ত দূরত্ব রেখে—চলাফেরা কোরছে। এতো দুঃখের মধ্যেও দেখা গেছে—ফিসফিসীলী কথা ওদের মধ্যয়—সুচিত্রাকে ঘিরে। একে নিয়ে। বারেক তরে তাকিয়ে দেখতে চেয়েও—পথিকরা খুব সহজায় কিন্তু পারছিলো না আপন আপন চোখের দৃষ্টিতে মানা জারী করাতে—আর নয়। এবার চোখ ফেরাও—স্থাণুরা সুচিত্রার অল্ হোয়াইটে আবৃত ঐ উপস্থিতি থেকে। একি, তোমরা চোখেরা এ কী অভ্যবতায় আছো। পলকটায় দেখলেই ত যথেষ্ট দেখা নয় কী ? চোখ যে ফিরছো না—তা দেখা থেকে।

প্রত্নতাত্ত্বিক বসন্ত চৌধুরী, তুমি ঠিকই বলেছিলে—সুচিত্রা সেন, একমাত্র ব্যক্তিত্ব, যিনি আমাদের মধ্যে থেকেই—আজ এক কিংবদন্তী। এ হীয়ার্-সে। এ প্রাপ্তি, আর নেই কারুর।

মনে আছে—পি.ই.এন. ক্লাব একবার 'রমলা'র মণীন্দ্রলাল বসুর বাড়ীতে একটি ঘরোয়া সভার আয়োজন করে। সে সময়কার রথী-মহারথীরা সবাই উপস্থিত সে সভায়। দুটি বিষয় ছিলো। এক "রমলা"র চিত্ররূপ দিতে চান—চট্টগ্রাম আর্মায়ী রেইড্ খ্যাত বিপ্লবী অনন্ত সিংহ। পরিচালক—হলেন দেবকীকুমার বসু। সঙ্গীত পঙ্কজকুমার মল্লিক। নায়িকা রমলা সুচিত্রা সেন, নায়ক রজত হবে উত্তম। কথাবার্তা

হবে। আর বন্ধু সুকুমার রায়ের ছেলেবেলা নিয়ে, বিলেত থেকে এক সাথে থাকা ও ফেরা তক—স্মৃতির রেখা আঁকবেন—কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। সবার সাথে উপস্থিত জংলীদা, সুকুমারের মাতুল, সুকুমারের ছোটো ভাই সুবিনয় রায়—ও ভারত খ্যাত সত্যজিত রায়ও। সব কথার সব জানার সব বলার শেষে—বিখ্যাত তুষারকান্তি ঘোষ তাঁর স্বভাবজ রসিকতা ছুঁড়ে দিয়ে জানতে চাইলেন—"মানকে, তুই অনেক কিছুই কোরলি। কিন্তু সুচিত্রা সেনকে দুই দুইবার জানালি প্রেসের লোক ডেকে, যে "ঘরে বাইরে" করবি। আবারো জানালি "দেবী চৌধুরানী" করবি। তা কি হোলো। কোনোটাই ত দেখলাম না।"

সস্নেহে বন্ধুপুত্রের পিঠে হাত রেখে—কেদারনাথ জানালেন—"ব্যস্ত"-তার দরুণ, কোরতে পারোনি, তাই ত মাণিক। যাক, এই নামী জুটি সুচিত্রা-উত্তম সম্পর্কে তোমার য়্যাসেস্‌মেন্ট কী, জানাবে।"

সে কথায়, সত্যজিত মুখর হোলেন, "কেদার-কাকু, এই জুটির প্রতিভা অপেক্ষা রাখে না—কারুর সার্টিফিকেটের। তবে এটা খুবই সত্য, যে—ওদের বিখ্যাত হওয়ার পেছনে—সব বড়ো বড়োরা এসে দাঁড়াতো। ভালো বোঝদার প্রযোজক, তুখর পরিচালক, জ্ঞানী সঙ্গীতবিদ্, এস্ ক্যামেরাম্যান, বুদ্ধিদীপ্ত এডিটর, স্বনামধন্য লেখক, সফল চিত্রনাট্যকার আর সৌন্দর্য্য-সচেতন গীতীকার। জানবেন এঁদের সবার মিলিত জমাহারী প্রয়াস ও প্রচেষ্টা—জুটিবদ্ধ সুচিত্রাকে উত্তম সমেত এতোটা পীক্ পজিশনে টানতে পেরেছিলো। তবে একটা কথা—অত বড়ো মাপের অভিনেতা এই উত্তমকুমার কিন্তু কেন জানি না—সুচিত্রার সাথে অভিনয়ে নেমে—আপন প্রতিভার সদ্ ব্যবহার কোরতে পারেননি। কেমন যেন—ম্লান। প্রশ্ন একটাই, তবে কী সুচিত্রাকে ওঁর এ হেন নিশ্চলতা পথ কোরে দিতো—অভিনয়ী শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে!

শেষ কথার আগের কথায় বলি—সুচিত্রাকে শেষ দেখি—হ্যাঁ, ঐ রোমান্স ভরাটী থীম্ দরাটী রোমান্টিকা জুটিতে—"রবীন্দ্র সদনে" আয়োজিত—"রঙ্গসভার" রজত-জয়ন্তীতে। প্রকাশনা জগতের বিখ্যাত নাম—সবার 'বাচ্চুদা' ঐ সুপ্রিয় সরকার—তার ব্যক্তিক ক্ষমতায়ী আন্তরীল আবেদনে—সত্যি ঐ জুটিকে আনতে পেরেছিলেন—এমনি কোনো পাবলিক্ পারফরমেন্সে। সমাপ্তি পর্য্যন্ত ছিলেন। সেই দেবীময়ী কান্তির ও দেবোপম কান্তার—এঁরা দুজনা। পাশাপাশী দুটি কেদারায় বোসে—এরা সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন কোরলেন—সেই "মোম জ্যোৎস্নায়......." গান সেধে, দ্বৈতয়ীতে, কোরাসায়। একজনের চুনোট করা ধূতির কোঁচা স্টেজে ঝাঁপর দিচ্ছে, পড়ে থেকে। গিলে করা পাঞ্জাবী দুলছে। আর, আর সুচিত্রার লাল বেনারসী লাল করা ঐ সন্ধ্যায়—লালিভারী ইভ্ জানাচ্ছে সবাইকে—যেন, এ

তোমাদেরই সবাকার খুশীলবী চেতনার মাধ্যমায় ফোটাচ্ছে যে—কালারার এই ভ্যালিডী পার্ল-রুবী, দ্য রেড্, ঐ ঐ হাজারো লাল লাল চুণীরে।

সবাই তখন—স্পেল্‌বাউণ্ড্। স্কেল্-ডাউণ্ড্।

এবার শেষ কথাটি—জানাই, টু ড্র দ্য লাস্ট্ রে অফ্ রোমান্টিসিজমায়।

কলেজে পড়ছি। তখন ফার্স্ট ইয়ার। পূজোর শেষ। কলেজ খুলেছে। ত পারার ম্যাটিনীতে বার বার—দশ দশবার—দেখেছি—'অগ্নি পরীক্ষা'। একদিন দেখে, "শ্রী" হল থেকে হেঁটেই রোমান্সী মন নিয়ে—বাড়ী ফিরছি। ভবানীপুরের বিধানে। ধর্মতলায় দিয়ে যাচ্ছি। 'সিনে য়্যাড্‌ভান্সে'র অফিস পেয়ে ওপরে উঠে যাই। দরজা ঠেলে দেখি—সরোজদা, সম্পাদক সরোজদা (সেনগুপ্ত) একটা ছবি নিয়ে—অন্যদের কাছে জানতে চাইছেন—কী ক্যাপশন্ রাখা যায়। ব্যাপারটা, ক'দিন হোলো সুচিত্রা ফ্যামিলী নিয়ে মাটির দেশ ঐ বিলেতটা—ঘুরে এলেন। সঙ্গে কিনে আনলেন—সে সময়কার দামী গাড়ীদের মধ্যে, বত্রিশ হাজার টাকায়—আঠারো হাতি, 'ব্যুইক্' কনর্ভাটেবল্। কলকাতায় বাড়ীতে গাড়ীটার শিপমেন্ট থেকে মুক্তি পেয়ে এলো, সেদিন কন্যা মুনমুনকে কাঁধে নিয়ে—গরবিতা মায়ের গরিমার জড়িতায়, সামনে ঝুঁকে, ছবিতে হাসি হাসি—সুচিত্রা সেন। সরোজদা দেখেই বলেন—'নতুন লেখক। বল ও কী ক্যাপশন হতে পারে। আমি ছবিটার ক্যাপসন রচিতায় বোলেছিলাম, রাখো—"ইফ্ সুচিত্রা ড্রাইভস্"—দিয়ে চিহ্ন প্রশ্নটা।

আজ বলি—সেই ক্যাপসন ছাপা হোয়েছিলো, প্রথম পাতার ওপরে ছবি দিয়ে, ছবির ওপরায়।

তাই আজ আবারো বলি—সুচিত্রা সেন—ইফ্ নয়, রীয়েলী তুমি ড্রাইভড্ দ্য লাখস্ অফ্ সিনেমা গোয়াস্ ইন সহিত—টু ফুল ফীল্ এ গ্রেট্ গাস্টো!

সুচিত্রা, আজ আর নাহি তোমার ঐ ড্রাইভ্। তবু তবু—আজও বিন গড়িতায় দিন আর বছর এতোয়ে—ইয়্যু, দ্য গ্রেট পার্সোনালিটি, সো স্যুইটী, সো ক্যোয়ায়েটী—এখনও দারুণ ভাবে—থ্রাইভস্ অলমোস্ট অল্ অফ্ আস—হু এটেইনড্ নাউ থ্রী য়্যাণ্ড হাফ্ স্কোর ছুঁই-ছুঁই। সাউণ্ড্লি, বাউণ্ড্লি, প্রাউড্লি য়্যাণ্ড ক্রাউড্লি। লাফ্টারী আপটারায়ও।

দশই মার্চ, ২০০৭

ছাব্বিশে ফাল্গুন, ১৪১৪

RK- 2454 9811

Ph- 2454 9811